বাবরের আত্মকথা

শচীন্দ্রলাল রায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬৭

—সাড়ে পাঁচ টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—কানাই পাল

মুদ্রণ—ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন হইতে শ্রীফণিভূষণ হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত

এই লেখকের লেখা—

জহর ও অমৃত

নেশার ঘোরে

দাবী-দাওয়া

গেঁয়ো

রক্তের সম্বন্ধ

কমলবন

ভূমিকা

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর আত্মচরিত লেখেন তাঁর মাতৃভাষা তুর্কিতে। এর অনুবাদ হয় ফারসী ভাষায় একাধিকবার। পরে অবশ্য পাশ্চাত্যের নানা ভাষায় এই অদ্ভুত আত্মচরিতের অনুবাদ হয়েছে। ইংরাজীতে এর অনুবাদ করেন জন লিডেন (John Leyden) এবং উইলিয়াম আর্সকিন্ (William Erskine) এবং সে বই ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয়। তারপর অনেক দিন আর এ বই পুনঃ প্রকাশিত হয়নি। এই মহামূল্য আত্মচরিতের কথা বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে যায়। ইংরাজী অনুবাদক দুইজনের সূত্র ধরে আর একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বের করেন—লেফটেনেণ্ট কর্ণেল এফ, জি, টালবট্ (F. G. Talbot)। বইখানি ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়। মিসেস্ এ, এস্, বেভারিজ আসল তুর্কি থেকে অনুবাদ করেন 'বাবুর-নামা' এবং এই অনুবাদ গ্রন্থ দুই খণ্ডে ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয়।

বাবরকে আমরা জানি এক দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধ-বিশারদ ব'লে—যিনি তাঁর বাহুবলে ভারত আক্রমণ করেন এবং বারবার পর্যুদস্ত হয়েও শেষে এ দেশ জয় করেন ও ভারতে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গৌরব লাভ করেন। ইতিহাস পাঠে অবশ্য তাঁর শৌর্য বীর্যের কথা, তাঁর অদম্য অধ্যবসায়ের কথা, ছলে বলে কৌশলে রাজ্য জয়ের কথা, ধর্মে গোঁড়ামির আতিশয্যের কথা এমন কি তাঁর সন্তানবাৎসল্যের কথা জানা যায়—কিন্তু সমগ্রভাবে তাঁর জীবন দর্শন জানতে হলে তাঁর নিজের লেখা আত্মচরিতের শরণাপন্ন হতেই হবে।

ষ্টানলি লেন্‌পুল (Mr. Stanley Lanepoole) তাঁর 'বাবর' গ্রন্থের ভূমিকায় এই আত্ম-চরিত সম্বন্ধে লিখেছেন যে এই আত্মচরিতে জগতের তদানীন্তন কালের একজন সুশিক্ষিত কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিজস্ব ভাবধারা এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নানা প্রাচ্য ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ ছিল, পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর ফলাফল তিনি সঠিক অনুধাবন করতে পারতেন। মানবচরিত্র বিশ্লেষণে তিনি পারদর্শী ছিলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যে মোহিত হওয়ার মত তাঁর মন ছিল। তাঁর নিজের ধ্যান ধারণা, ভাবনা চিন্তা এবং নানা ঘটনাবলীর বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তিনি সুষ্ঠু ও জোরালো ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তাঁর লেখার মধ্যে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং মনের ভাবনাগুলি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। বাবরের সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ আশাবাদী মনের পরিচয় তাঁর আত্মচরিত থেকেই আমরা পাই। নিজেকেও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তাঁর লেখার মধ্যে। নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি, দোষগুণ অকুণ্ঠ সততার সঙ্গে তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তাঁর আত্মচরিত সমকালীন ঘটনার প্রকৃত বিবরণ; এতে সন্দেহ করবার কিছু নেই।

লেন্‌পুল আরও বলেছেন—কখন এবং কি ভাবে বাবর আত্মচরিত লেখেন তা বলা কঠিন। তবে তিনি যে নিয়মিতভাবে লেখেননি একথা আত্মচরিত পড়লে বোঝা যায়। তিনি এক সময় লেখা শুরু করেন আবার থেমে যান। হয়তো সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আবার লিখতে শুরু করেন। এটা বোঝা যায় তাঁর লেখার ধরন দেখে। তিনি ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে করতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন—সেটা শেষ না করেই আবার অন্য সূত্র ধরে আরম্ভ করেছেন কয়েক বছর পর—যার কৈফিয়ৎ তিনি লেখার মধ্যে দেননি। প্রথম দিকের লেখার ভঙ্গী শেষের দিকের লেখা থেকে

পৃথক। এটা বোঝা যায় যে প্রথম দিকের লেখা অনেক পরে অদল বদল করেছেন। অনুমান করা যায় এই আত্মচরিত বিভিন্ন সময়ে লেখা এবং আগেকার লেখা ভারত অভিযানের পর সংশোধন করেছেন। তখন পূর্বস্মৃতি ঝাপসা হয়ে যাওয়ার জন্যই হোক কিংবা সময়ের অভাবের জন্যই হোক, ভিন্ন সূত্রগুলি আর তিনি জোড়া লাগাতে পারেননি।

লেন্‌পুল আরও বলেছেন—বাবরের আত্মচরিত একাধিকবার তুর্কি থেকে ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তুর্কি ও ফারসী ভাষার অনেকগুলি হস্তলিপি বিচার করে দেখা গিয়েছে যে আসল পুঁথির সঙ্গে কোনও গরমিল নাই এবং কোনও কিছু প্রক্ষিপ্ত করার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা হয়নি। এই বিখ্যাত আত্মচরিতের অসংখ্য বার অনুবাদ হলেও মূলের কোনও বিকৃতি হয়নি—যা সাধারণতঃ অনুবাদ করতে গেলে ঘটে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এসিয়া মহাদেশের প্রসিদ্ধ এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন বীরপুরুষের লেখা আত্মজীবনী অপরিবর্তিত-ভাবেই আমাদের হাতে পৌঁচেছে। মোগলসাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতার বংশগরিমা অনেক দিন লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু তাঁর লেখা আত্মচরিতের মর্যাদা কালজয়ী, তা নষ্ট হবার নয়।

মিষ্টার ট্যালবট বলেছেন—বাবরের আত্মচরিত অগাষ্টাইন ও রুসোর এবং গিবন ও নিউটনের আত্মকাহিনীর সমপর্যায়ভুক্ত। এসিয়ায় এর জুড়ি নেই।

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর এসিয়া মহাদেশ বিধ্বংসকারী তৈমুরের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ এবং মাতৃকুলের দিকে আর এক ধ্বংসলীলার অধিনায়ক চেন্‌গিজ খাঁয়ের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ। বিস্ময়ের কথা—কেন তাঁকে এবং তাঁর উত্তরাধিকারিগণকে মোগল বংশসম্ভূত বলা হয়। তাঁর মাতৃকুল মোগল হলেও পিতৃকুল মোগল নয়। তিনি নিজেও মোগল জাতিকে ঘৃণা করে এসেছেন। তবে চেন্‌গিজ খাঁয়ের সময় থেকে উত্তর দিক দিয়ে যারাই ভারত আক্রমণ করেছে—তারাই মোগল বলে পরিচিত হয়েছে।

বাবর তাঁর পিতার মৃত্যুর পর মাত্র বার বৎসর বয়সে ফারগানার সিংহাসনে বসেন। পারস্যের পূর্ব সীমান্তে এই ক্ষুদ্র রাজ্য। রাজধানী ছিল আন্দেজান। রাজা হবার পর ভারত জয় পর্যন্ত মোটামুটি সব ঘটনাই আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি।

বাবর ছিলেন একাধারে বীর সৈনিক ও সুচতুর রাজনীতিবিদ্। শুধু তাই নয়—তিনি ছিলেন দার্শনিক এবং কবি। ফারসী ভাষায় লেখা তাঁর কবিতাগুলি সুন্দর। তুর্কি ভাষাতে গদ্য ও পদ্য রচনায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তিনি। তিনি শিকারে পারদর্শী ছিলেন। উদ্যান রচনায় তাঁর অনেক অর্থ ও সময় ব্যয় হতো। তিনি পুষ্প-বিলাসী ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেই অনেক সময় ফুলের বাগানে প্রবেশ করতেন এবং একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যেতেন। তাঁর লেখায় যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনার পাশেই ফুলের বিবরণ দেখা যায়।

তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি ব্যবহার প্রীতিপূর্ণ ছিল। বীর ছিলেন, কিন্তু নির্মম ছিলেন না তিনি। শত্রুকেও তিনি ক্ষমা করতে জানতেন। প্রবল সন্তান-বাৎসল্য তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষত্ব। নিজের জীবনের বিনিময়ে তিনি ভগবানের কাছে পুত্র হুমায়ুনের রোগমুক্তি কামনা করেন। জনশ্রুতি তাঁর এই প্রার্থনার ফলে হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু বাবরকে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

॥ ১ ॥

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রমজান মাসে আমার বার বৎসর বয়সে ফারগানার রাজা হই।

ফারগানা জন-অধ্যুষিত পৃথিবীর প্রান্তসীমায় অবস্থিত। এই রাজ্যের আয়তন ক্ষুদ্র—পশ্চিম দিক ভিন্ন অন্য তিনদিকই পাহাড় দিয়ে ঘেরা।

ফল আর শস্যে ভরা এই দেশ। এখানে আঙ্গুর আর খুবানী পর্যন্ত ফলে এবং স্বাদেও চমৎকার। ডালিম আর ফুটির জন্য এদেশ বিখ্যাত। এখানকার লোকেরা খুবানীর বীচি বের করে অদ্ভুত কায়দায় সেই জায়গায় বাদাম ভরে দেয়—যা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু।

স্রোতস্বতী নদীর জলে ধৌত হয়ে এদেশের মাটি সরস। বসন্তকালে এদেশ নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে।

নদীর তীরে তীরে অসংখ্য উদ্যান—সেখানে ফোটে অজস্র মল্লিকা আর গোলাপ। গাছের ছায়ায় ঘেরা বাগানে পথিকেরা বিশ্রাম করতে ভালবাসে। বাগানগুলি যেন রং-বেরং-এর গালিচায় মোড়া।

পাখী আর শিকারের পশু এখানে পর্যাপ্ত। এদেশের ফেজান্ট (Pheasant) পাখী এমন বড় যে এর মাংস চার জন লোকও খেয়ে শেষ করতে পারে না। মৃগ-মাংসের স্বাদ চমৎকার।

ভাল শিকারের দেশ এটি। শ্বেত হরিণ, পাহাড়ী ছাগল, লাল হরিণ আর খরগোশ এখানে যথেষ্ট দেখা যায়। শিকারীদের ভাল শিকারের সুযোগ আছে এখানে।

পাহাড়ে আছে মূল্যবান টারকুইস পাথর ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য। সমতলভূমির লোক বেগুনী কাপড় বোনে।

ফারগানার আদায়ী রাজস্বে অনায়াসে চার হাজার সেনা রাখা চলে।

আমার পিতা ওমর শেখ মির্জা উচ্চাভিলাষী রাজা ছিলেন। জমকালো জীবন যাপনের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। রাজ্যজয়ের কোনও না কোনও পরিকল্পনা তাঁর মাথায় ঘুরতো। সমরকন্দ বিজয়ের জন্য তিনি বারবার আক্রমণ করেছেন এবং প্রত্যেকবারই পরাস্ত হয়েছেন।

১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদ খাঁ এবং সুলতান আমেদ মির্জা তাঁর আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে একজোট হলেন। পিতার রাজ্যের বিরুদ্ধে একজন আক্রমণ চালালেন উত্তর দিক থেকে—আর একজন দক্ষিণ দিক থেকে।

এমনি সময়ে এক দুর্ঘটনা ঘটলো। আখ্‌সি দুর্গ ছিল খাড়া পাহাড়ের ওপর। এর কিনারায় কয়েকটি বাড়ীও তৈরী করেছিলেন আমার পিতা।

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রমজানের চার তারিখে বাবা তাঁর পায়রাদের খাওয়ানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর পায়ের নীচের পাটাতন সরে গেল। যার ফলে পাহাড়ের মাথা থেকে খাঁচা সমেত পায়রা নিয়ে তিনি ছিট্‌কে পড়লেন একেবারে পাহাড়ের তলে—আর তাঁর পেয়ারের পায়রাদের নিয়েই পরপারের যাত্রী হলেন তিনি।

বাবা ছিলেন খর্বাকৃতি কিন্তু মোটা-সোটা। তাঁর দাড়ি ছিল খাটো কিন্তু ঘন। তিনি ল্যাঙ্গোট পরতেন খুব আঁটসাঁট করে। কোমর দস্তুরমত সঙ্কোচ করে তিনি ফিতে বাঁধতেন। তারপর কোমর ফুলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় ফিতে ছিঁড়ে যেত। খাওয়ার জিনিস কিংবা পোশাকের দিকে তাঁর বিশেষ কোনও নজর ছিল না। নিভাঁজ পাগড়ি পরতেন তিনি। পাগড়ির প্রান্ত ভাগ ঝুলে থাকতো। তিনি উদাব চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁর অন্তর ছিল মহান, অথচ তিনি অত্যন্ত সাহসী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। ধনুর্বিদ্যায় তাঁর মাঝারি ধরণের নিপুণতা ছিল। কিন্তু তাঁর হাতের কব্জির জোর ছিল অসাধারণ। তাঁর মুষ্টাঘাতে ভূমিশয্যা নেয়নি এমন লোক বিরল ছিল।

তিনি মানুষের মত মানুষ ছিলেন। পাশা খেলতে তিনি ভালবাসতেন।

* * * *

তাঁর শ্বশুর অর্থাৎ আমার মাতামহ ইউনুস্‌ খাঁ ছিলেন ইউরেটের মোগল শিবিরের প্রধান এবং চেঙ্গিজ্‌ খাঁয়ের দ্বিতীয় পুত্র চাঘতাই খাঁয়ের বংশধর। মাঝে মাঝে তাঁকে আমার পিতা নিজের দেশে নিয়ে আসতেন। যখনই তিনি আসতেন তখনই তাঁকে কিছু জমি দান করা হত। কিন্তু তাঁর দিক থেকে কিছু অসদাচরণের জন্যই হোক অথবা মোগল স্বভাবজাত বেয়াড়াপনার জন্যই হোক, আমার পিতার ইচ্ছামত ব্যাপার চলতো না এবং ইউনুস্‌ খাঁ তাঁর জামাতার কাছে থাকতে না পেরে পুনরায় মোগলিস্থানে চলে যান। মির্জা শেষবার যখন খাঁকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন তখন তাসকন্দ তাঁর দখলে ছিল। তাসকন্দকে বইয়ে 'শাস্‌' অথবা কখনও কখনও 'চাচ্‌' বলেও উল্লেখ আছে। মির্জা এই তাসকন্দ তাঁর শ্বশুর খাঁ'কে দান করেন যা সেই সময় থেকে অর্থাৎ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সারুখিয়া প্রদেশ সহ চাঘতাই খাঁদের দখলে ছিল।

এই সময় অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ খাঁ মোগলদের সর্দার ছিলেন। তিনি আমার মায়ের সৎভাই। ওমর শেখ মির্জার বড় ভাই সুলতান আমেদ মির্জা তখন সমরকন্দের রাজা। তিনি তাঁর এক কন্যার বিবাহ সুলতান মামুদ খাঁর সঙ্গে দিয়েছিলেন।

* * * *

আমার বাবার বয়স তখন উনচল্লিশ বছর। তিনি সমরকন্দে ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুলতান আবু সৈয়দ মির্জার চতুর্থ পুত্র ছিলেন তিনি। সুলতান আমেদ মির্জা, সুলতান মহম্মদ মির্জা এবং সুলতান মামুদ মির্জার তিনি ছোট ভাই।

তাঁর পিতা সুলতান আবু সৈয়দ মির্জা ছিলেন তাইমুর বেগের তৃতীয় পুত্র মিরণ শা মির্জার পুত্র সুলতান মহম্মদ শা মির্জার পুত্র। তিনি ওমর শেখ মির্জা এবং জাহাঙ্গীর মির্জার ছোট ভাই কিন্তু সারুখ মির্জার চেয়ে বড়।

ওমর শেখ মির্জার রাজ্য

তাঁর পিতা তাঁকে প্রথমে কাবুল রাজ্য দেন ও বাবা-কাবুলিকে অভিভাবক নিযুক্ত করে তাঁকে কাবুলে যেতে অনুমতি দেন। কিন্তু মির্জার সুন্নৎ উৎসবের ভোজের ব্যাপারে তাঁকে তামারিস্ক উপত্যকা থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। উৎসব শেষে তিনি তাইমুর বেগের পুত্র বড় ওমর শেখ মির্জাকে ফারগানা দান করার দৃষ্টান্ত অনুসারে তাঁকে (অর্থাৎ ছোট ওমর শেখ মির্জাকে) আন্দেজান দান করেন। তারপর খুদাবর্দি তাইমুরতাসকে অভিভাবক নিযুক্ত করে তাঁকে সেই দেশে পাঠিয়ে দেন।

ফারগানা প্রদেশ তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে পান। তাসকন্দ এবং সৈরাম তিনি পান তাঁর বড় ভাই সুলতান আমেদ মির্জার কাছ থেকে। এই দুইটি জায়গা কিছুদিন তাঁর দখলে ছিল। ধাপ্পা দিয়ে তিনি সারুখিয়া প্রদেশ লাভ করেন এবং কিছুদিন তাঁর দখলে রাখেন। পরে তাসকন্দ ও সারুখিয়া তাঁর হস্তচ্যুত হয়। তাঁর দখলে তখন থাকে ফারগানা প্রদেশ, খুজেন্দ (অনেকে খুজেন্দ ফারগানা প্রদেশের মধ্যে মনে করেন না) এবং উরাতিপা, যার পূর্বের নাম ছিল উরুসনা, যাকে অনেকে উরুসও বলে থাকেন। সুলতান আমেদ মির্জা যখন তাসকন্দে মোগলদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং চির নদীর তীরে পরাস্ত হন (১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে) তখন

হাফিজ বেগ উরাতিপার শাসক। তিনি ওমর শেখ মির্জার হাতে উরাতিপা অর্পণ করেন। সেই সময় থেকে উরাতিপা তাঁর দখলে ছিল।

তাঁর পুত্র কন্যা

তাঁর তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা। আমি জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমার মায়ের নাম কুতলুক নিগার খানুম।

তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জাহাঙ্গীর মির্জা আমার চেয়ে দুই বছরের ছোট। তার মার নাম—ফতেমা সুলতান। তিনি মোগল তুমান বেগ বংশসম্ভূতা।

তাঁর তৃতীয় পুত্র নাসির মির্জা আমার চেয়ে চার বছরের ছোট। তার মা উমিদ আন্দেজানের অধিবাসিনী এবং বাবার উপপত্নী।

ওমর শেখ মির্জার বড় মেয়ে আমার সহোদরার নাম—খানজাদা বেগম। তিনি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। সির-ই-পুলে পরাজয়ের পরও যখন আমি দ্বিতীয়বার সমরকন্দ দখল করি এবং পাঁচ মাস অবরোধ বজায় রাখি, কিন্তু আমার আহ্বানেও যখন নিকটবর্তী কোনও আমির ও বেগদের নিকট থেকে কোনওরকম সাহায্য বা সৈন্য পাওয়া গেল না তখন আমি হতাশ হয়ে সমরকন্দ ছেড়ে চলে যাই। এই সময় আমার সিংহাসনচ্যুত অবস্থায় আমার বোন খানজাদা বেগম মহম্মদ সেবানি খাঁর হাতে পড়ে। তার ঔরসে আমার দিদির খুরুম শা নামে এক পুত্র হয়। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে তার পিতার মৃত্যুর পর সেও আল্লার কাছে চলে যায়।

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে যখন শা ইসমাইল উজবেগদের মার্ভের সন্নিকটে পরাস্ত করেন তখন খানজাদা বেগম সেই শহরে ছিলেন। আমার খাতিরে তিনি আমার ভগ্নীর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেন এবং একদল রক্ষীর সঙ্গে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। আমরা পুনর্মিলিত হই। প্রায় দশ বৎসর আমাদের পরস্পরের মধ্যে দেখাশোনা নাই। যখন আমি ও মহম্মদ গোকুলতাস তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন আমার কথা শুনেও তিনি কিংবা তাঁর সঙ্গীরা কেউই আমাদের চিনতে পারেনি। কিছুক্ষণ পর অবশ্য চিন্‌তে পারেন।

তাঁর আর এক কন্যার নাম মেহেরবানু বেগম—নাসির মির্জার সহোদরা। আমার চেয়ে দুই বছরের ছোট। নাসির মির্জার আর একজন সহোদরা সেহেরবানু বেগম। সে আমার চেয়ে আট বছরের ছোট।

আর এক কন্যার নাম—ইয়াদগার সুলতান বেগম। তার মা ছিলেন বাবার উপপত্নী—নাম আগা সুলতান।

আর এক কন্যার নাম—রুকুইয়া সুলতান বেগম। তার মায়ের নাম—মকদুম সুলতান বেগম। এখানকার লোকেরা বলতো কারাগুজ বেগম—কৃষ্ণচক্ষু বেগম। শেষোক্ত দুই কন্যার জন্ম হয় মির্জার মৃত্যুর পর। ইয়াদগার সুলতান বেগমকে আমার পিতামহী আইষা দৌলত বেগম লালন পালন করেন। ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন সেবানি খাঁ আন্দেজান ও আখ্‌সি জয় করে সেই সময় ইয়াদগার সুলতান বেগম হাম্‌জে সুলতানের পুত্র আব্দুল লতিফ সুলতানের হাতে পড়ে। ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি হাম্‌জে সুলতান ও অন্যান্য সুলতানদের যুদ্ধে পরাস্ত করি সেই সময় সে আমার সঙ্গে মিলিত হয়। আমার যখন রাজ্যচ্যুত অবস্থা সেই সময় রুকুইয়া সুলতান বেগমও জানি বেগ সুলতানের (উজবেক্) হাতে পড়ে। তার একটি দুটি সন্তানও হয় কিন্তু তারা বেশীদিন বাঁচেনি। কিছুদিন পর সংবাদ আসে সেও জীবিত নেই।

তাঁর পত্নী ও উপপত্নী

কুতলুক নিগার খানুম ইউনুস খাঁয়ের দ্বিতীয়া কন্যা এবং সুলতান মামুদ খাঁ ও সুলতান আমেদ খাঁর সৎবোন।

ওমর সেখ মির্জার অন্তঃপুরে ছিলেন খাজা হোসেন বেগের কন্যা—আউলাস আগা। তাঁর এক কন্যার শৈশবেই মৃত্যু হয় এবং তার এক দেড় বছর পরই তাঁকে হারেম থেকে বের করে দেওয়া হয়।

আর একজনের নাম—ফতেমা সুলতান আগা। তিনি ছিলেন মোগল তুমান বেগ বংশসম্ভূতা। তাঁকেই মির্জা সর্বপ্রথম স্ত্রী বলে গ্রহণ করেন।

আর একজনের নাম—কারাগুজ বেগম (মকদুম সুলতান আগা)। মির্জার জীবনের শেষের দিকে তাঁকে গ্রহণ করেন। ইনি মির্জার বিশেষ ভালবাসার পাত্রী ছিলেন। মির্জাকে সন্তুষ্ট করার জন্য লোকে বলতো যে এই বেগম তাঁর পিতৃব্য আবু সৈয়দ মির্জার বড় ভাই মিনুচির মির্জার বংশসম্ভূতা।

তাঁর হারেমে অনেক উপপত্নী ও রক্ষিতা ছিল—তাদের একজন উমিদ আগুচা তাঁর মৃত্যুর আগেই মারা যান। শেষের দিকে মোগল বংশীয়া তুন্ সুলতান এবং আগা সুলতানও তাঁর হারেমে স্থান পান।

তাঁর অধীনস্থ আমীরগণ

তাঁর আমীরদের মধ্যে একজনের নাম তাইমুরতাস্। গৃহস্থালি পরিচালনার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন প্রধান কর্মকর্তা। তাঁর বয়স ছিল বছর পঁচিশের মত। অল্পবয়স হলেও তাঁর কাজের রীতি, ব্যবস্থা ও নিয়ম কানুন ছিল ত্রুটিহীন। দুই বছর পরে এক যুদ্ধে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ জরুরী জানানো দরকার বলে সংবাদবাহক পাঁচশ মাইল পথ চার-দিনে নিয়ে আসে।

তাঁর আর একজন আমীরের নাম হাফেজ বেগ। আমি যখন কাবুল অধিকার করি তার আগে মক্কা তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করেন তিনি। কিন্তু পথেই তিনি আল্লার ডাকে ইহলোক ছেড়ে চলে যান। তিনি সাদাসিধে, নিরহঙ্কার এবং অল্প কথার লোক ছিলেন। তাঁর জ্ঞান খুব গভীর ছিল না।

হুসেন বেগ ছিলেন আমুদে, সরল লোক। সুরাপান ও মজলিসে গান করে তিনি সকলকে মাতিয়ে তুলতেন।

মজিদ বেগ প্রথমে আমাকে দেখাশোনার ভার পান। তাঁর ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা খুব উঁচুদরের ছিল। আমার বাবার কাছে তাঁর মত খাতির আর কেউ পান নি। কিন্তু তিনি অতি নীচুস্তরের কামাসক্ত পুরুষ ছিলেন।

আলি মজিদ ছিলেন আর একজন আমীর। তিনি ছিলেন কামুক, বিশ্বাসঘাতক, অপদার্থ, ভণ্ড।

আর একজন ছিলেন হাসান ইয়াকুব বেগ। স্পষ্টবাদী, চতুর এবং কর্মঠ ছিলেন তিনি। তিনি কবিতা লিখতে পারতেন। তিনি ছিলেন ভাল তীরন্দাজ। পোলো ও অন্যান্য খেলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর আমার গৃহস্থালি পরিচালনার কর্তা হন তিনি। কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল সঙ্কীর্ণ, কাজে নিপুণতারও অভাব ছিল। ঝগড়া বিবাদ বাধিয়ে দিতেও ওস্তাদ ছিলেন তিনি।

হাসান বেগের পর কাসিম বেগ আমার গৃহস্থালি পরিচালনার ভার পান। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন তাঁর ওপর আমার শ্রদ্ধা এবং সেই সঙ্গে তাঁর ক্ষমতাও বাধাহীনভাবে বেড়ে গিয়েছিল। তিনি খুব সাহসী ছিলেন। একদল উজবেক্ যখন লুটপাট করে এদেশ থেকে ফিরে যাচ্ছিল তখন পিছু ধাওয়া করে তাদের ধরে ফেলেন এবং তাদের ভীষণভাবে পরাস্ত করেন। তরবারি চালনায় তাঁর খ্যাতি ছিল। আমি কাবুল ফিরে যাওয়ার পর তাঁকে আমার পুত্র হুমায়ুনের গভর্নর পদে নিযুক্ত করি। আমি যখন জেমিন্ অধিকার

করি সেই সময় আল্লা তাঁকে কাছে টেনে নেন। তিনি ধার্মিক এবং সৎ মোসলেম ছিলেন। সন্দেহজনক মাংস তিনি কখনও খেতেন না। তাঁর বিচারবুদ্ধি প্রগাঢ় ছিল। তিনি আমুদে লোক ছিলেন। নিরক্ষর হলেও তাঁর উঁচুদরের কৌতুক-প্রবণতা তাঁর অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিত।

আর একজন ছিলেন বাবা কুলি বেগ। তিনি পরে আমার গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। তাঁর অধীনে সৈন্য বেশ ভালভাবে রাখতেন। তাদের পোশাক এবং সাজসরঞ্জাম খুব সুন্দর ছিল। ভৃত্যদের ওপর তাঁর কড়া নজর ছিল। কিন্তু নমাজ পড়া কিংবা রোজা করার ধার ধারতেন না তিনি। তিনি ক্রূর-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর সমস্ত আচার ব্যবহারে নাস্তিকতাই প্রকাশ পেত।

আর একজন আমীরের নাম ছিল মীর আলি দোস্ত তাখাই। তিনি আমার মাতামহী আইষা-দৌলত বেগমের আত্মীয় ছিলেন। আমাকে বলা হয় যে তিনি খুব কাজের লোক হবেন। তিনি আমার অনুগ্রহভাজন ছিলেন। কিন্তু যে কয় বছর তিনি আমার কাছে ছিলেন, আমি বলতে পারিনে তিনি আমার কি কাজ করেছেন। তিনি যাদুবিদ্যা জানেন এই রকম ভান করতেন। তিনি ভাল শিকারী ছিলেন। তাঁর ব্যবহার ছিল কদর্য। তিনি ছিলেন নীচ, কুচক্রী, অকৃতজ্ঞ, হামবড়া, রূঢ়-ভাষী এবং কুদর্শন।

আর একজনের নাম লাখারি। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন তিনি, কিন্তু মাঝে মাঝে ঝগড়া বিবাদের দিকে তাঁর ঝোঁক দেখা যেত।

মগর গিয়াস্ তাখাই খুব কৌতুকপ্রিয় এবং স্ফূর্তিবাজ হলেও বেপরোয়া কামুক প্রকৃতির লোক ছিলেন।

খোরাসানবাসী আলিদরবেশ বেশ সাহসী ছিলেন। নাস্তালিক লিপিতে এক বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁর লেখার অভ্যাস ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত খোসামুদে, নীচ প্রকৃতি এবং কঞ্জুস ছিলেন।

কামবার আলি মোগল ছিলেন আর একজন। তাঁর বাবা কিছুদিন এদেশে চামড়ার ব্যবসা করেন। সেই জন্য তাঁকে চামড়াওয়ালার ব্যাটা বলে লোকে ডাকতো। আমার কাছে অনেক অনুগ্রহ পেয়েছিলেন তিনি। যতদিন তাঁর পদবৃদ্ধি না হয় ততদিন তাঁর স্বভাব ছিল অতি সুন্দর। কিন্তু কিছুটা পদবৃদ্ধি হওয়ার পর তিনি কর্তব্যে উদাসীন এবং বেয়াড়া মেজাজী হয়েছিলেন। তিনি কথা বলতেন বেশী যার বেশীর ভাগই বাজে, অর্থহীন।

প্রকৃতপক্ষে যারা বেশী কথা বলে তারা প্রায়ই নির্বোধের মত কথা বলে। তাঁর কর্মপটুতার অভাব ছিল এবং তার মস্তিষ্কেও বিশেষ পদার্থ ছিল না।

যখন বাবা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাণ, সে সময় আমি আন্দেজানের উদ্যান-প্রাসাদে ছিলাম। রমজান মাসের পাঁচ তারিখে মঙ্গলবারে এই আন্দেজানে পৌঁছি। যে সব সঙ্গী আমার কাছাকাছি ছিল তাদের নিয়ে দুর্গরক্ষার জন্য ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়লাম। মির্জা ফটকে পৌঁছিতেই সিরাম তাঘাই আমার ঘোড়ার লাগাম ধরে একপাশে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেলেন। তাঁর মনে এই সন্দেহ হয় যে সুলতান মির্জার মত পরাক্রান্ত রাজা যখন দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য নিয়ে এই দিকে আসছেন তখন হয়তো আন্দেজানের আমীররা আমাকে আর এই দেশকে তাঁর হাতে সমর্পণ করবে। তার ইচ্ছা ছিল আমাকে উরকেন্দে নিযে যাবেন। কারণ, সে জায়গা পাহাড়ে ঘেরা। দেশ শত্রুর হাতে চলে গেলেও আমি তার হাতে পড়বো না আর সেখান থেকে আমার মামা ইল্‌চে খাঁর কাছে যেতে পারবো।

যে সব কাজি এবং আমীররা দুর্গ প্রাসাদে ছিলেন তারা আমাদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে আমাদের আশঙ্কা দূর করার জন্য একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠালেন। সে আমাদের ধরে ফেললো ; ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে আমাদের দুর্গের মধ্যে নিয়ে গেল। আমি ঘোড়া থেকে নামলাম। খাজা কাজি এবং আমীররা আমার সামনেই আলোচনা শুরু করলেন। তাঁরা আলোচনা করে স্থির করলেন যে এই দুর্গ সুরক্ষিত কবার সব ব্যবস্থা করতে হবে। শত্রুর আক্রমণ যে কোনও উপায়ে প্রতিরোধ করতেই হবে। হাসান ইয়াকুব, কাসিম এবং আর কয়েকজন আমীর বাইরে ছিলেন। তাঁরা ফিরে এসে আমার কাজে যোগদান করলেন। সবাই এক দিল্‌ হযে দুর্গরক্ষার কাজে লেগে গেলেন।

সুলতান আমেদ মির্জা খোজেন্দ জয় করে আরও অগ্রসর হয়ে আন্দেজানের আট মাইলের মধ্যে এসে শিবির স্থাপন করলেন। এই সময় দরবেশ গ নামে আন্দেজানের একজন মাতব্বর লোককে রাজদ্রোহকর উক্তির জন্য প্রাণদণ্ড দেওয়া হলো। এই ব্যাপার দেখে আর সব অধিবাসী প্রাণের ভয়ে অনুগত থাকতে বাধ্য হলো।

এরপর আমি সুলতান আমেদ মির্জার কাছে দুতের মারফৎ এক চিঠি পাঠাই। তাতে লিখেছিলাম—জনাব, আপনি এই দেশ জয় করে আপনারই কোনও কর্মচারীর ওপর এর শাসনভার অর্পণ করবেন।

আমি তো আপনারই আপনজন এবং সম্বন্ধে ভ্রাতুষ্পুত্র। আমাকে বিশ্বাস করে যদি এই কাজের ভার দেন তাহলে আপনার মনোবাসনা কি খুব সহজ ও সুন্দরভাবে সিদ্ধ হবে না?

সুলতান আমেদ মির্জা দুর্বল দুর্জন প্রকৃতির মানুষ। তিনি সব সময়েই তাঁর অনুগত আমীরদের কথায় সায় দিয়ে চলতেন। আমার প্রস্তাব তাঁদের মনঃপূত হলোনা। সুতরাং আমি পেলাম কর্কশ ভাষায় উত্তর। তিনি সসৈন্যে অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু যে সর্বশক্তিমান, করুণাময় পরমেশ্বর আমার মনের অভিলাষ পার্থিব শক্তির সাহায্য ছাড়াই বরাবর পূরণ করে এসেছেন তিনিই আমার সহায় হলেন। তিনি এমন অঘটন ঘটালেন যাতে শত্রুপক্ষ বিষম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লো, তাদের অভিযান রুদ্ধ হলো। তাদের এত উদ্যম ফলপ্রসূ না হওয়ায় ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে ফিরতে বাধ্য হলো।

তাদের বিপর্যয়ের কারণের মধ্যে প্রথমটা হলো এই। কাবা নদীর কালো জল বিষাক্ত। জলে নেমে কেউ পার হতে পারেনা। নদীটি চওড়ায় খুব ছোট। সাঁকো দিয়ে পার হবার ব্যবস্থা আছে। শত্রুপক্ষের সেনা তাড়াতাড়ি পার হওয়ার জন্য সাঁকোর ওপর এমন ভিড় করলো যে তাদের সঙ্গের অনেক উট আর ঘোড়া সাঁকো থেকে জলে পড়ে গেল আর প্রাণ হারালো। তিন চার বছর পূর্বে এক যুদ্ধে তারা ভীষণভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল। এবারকার এই বিপদ তাদের সেই আগেকার কথা স্মরণ করিয়ে দিল এবং তারা ভাবী বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। দ্বিতীয় কারণ এই সময়েই তাদের ঘোড়াগুলো এক গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশীর ভাগই মরতে লাগলো। তৃতীয় কারণ তারা দেখতে পেলো আমার সেনা ও প্রজাদের ঐক্য ও স্থির প্রতিজ্ঞা। তারা বুঝতে পেরেছিল আমার সৈন্যরা দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে জীবন উৎসর্গ করবে কিন্তু কখনও এদেশের মাটি শত্রুর পদানত হতে দেবে না। আন্দেজানের এক মাইলের মধ্যে এসেও তারা এইসব ব্যাপারে আতঙ্কিত হয়ে তাদের তরফ থেকে মহম্মদ তারখানকে দূত হিসাবে পাঠায়। আমাদের তরফ থেকে দূত হিসাবে দুর্গ থেকে খান হাসান ইয়াকুব। দুই দূতের আলোচনার পর কোনও রকমের একটা শান্তিচুক্তি স্থির করা হলো, যার ফলে অবিলম্বে শত্রুপক্ষ এদেশ ছেড়ে চলে গেল।

॥ ২ ॥

এই সময় সুলতান মামুদ খাঁ খোজেন্দ নদীর উত্তর দিক দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে আখ্‌সি দুর্গ অবরোধ করেন। আখ্‌সির কাছাকাছি খাঁয়ের সৈন্য পৌঁছতেই কয়েকজন আমীর তাঁর সঙ্গে দেখা করে কাসানের অধিকার তাঁর হাতে সমর্পণ করে। তারপর তিনি আখ্‌সির দিকে অগ্রসর হয়ে বারবার আক্রমণ চালিয়েও ব্যর্থ হন। আখ্‌সির আমীর এবং যুবকরা অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে। এই সঙ্কট সময়ে সুলতান মহম্মদ খাঁ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধে বীতস্পৃহ হয়ে নিজের দেশে ফিরে যান।

এই সব বিশেষ বিশেষ ঘটনার সময় যে সব আমীর এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবকেরা আমার বাবার অনুগত ছিলেন—তাঁরা একতাবদ্ধ হয়ে মহান হৃদয়ের পরিচয় দেন এবং আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করেন। তাঁরা আমার পিতামহী শা সুলতান বেগমকে এবং হারেমের আর আর সকলকে আখ্‌সি থেকে আন্দেজানে নিয়ে আসেন। সেখানে বাবার পারলৌকিক কাজ সমাপন করা হয়। এই উপলক্ষে দরিদ্রজন ও ফকিরদের প্রচুর খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এখন বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার পর দেশের শাসনব্যবস্থা এবং উন্নতির দিকে মন দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। হাসান ইয়াকুবের উপর আন্দেজান শাসনের ভার এবং তাঁকে শাসন পরিসদের প্রধান করা হলো। বাবার আমলের প্রত্যেক আমীর ও সম্ভ্রান্ত তরুণদের এক একটি জেলা অথবা গ্রাম অথবা কিছু ভূসম্পত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা গেল। তাদের পদগৌরব অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ সম্মানেও ভূষিত করা হলো।

সুলতান আমেদ মির্জা তাঁর স্বদেশে ফিরবার পথে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে চুয়াল্লিশ বছর বয়সে এই অস্থায়ী সংসার থেকে চিরবিদায় নিলেন।

সুলতান আমেদ ছিলেন লম্বা, গৌরবর্ণ এবং স্থূলকায়। তাঁর চিবুকের ওপরের অংশে দাড়ি ছিল কিন্তু গালের নীচের দিকে কোনও চুল ছিল না। তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মোলায়েম।

তিনি হানিফা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সত্যিকার গোঁড়া বিশ্বাসী মুসলমান ছিলেন তিনি, দিনে পাঁচবার নমাজ পড়তেন—এমন কি সুরাপান উৎসবে উপস্থিত থেকেও এই নিয়ম ভঙ্গ করেননি কোনও সময়। খাজা আবদুল্লা তাঁর ধর্মগুরু ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। আচার ব্যবহারে তিনি বরাবরই শিষ্ট—

বিশেষভাবে খাজার সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর নম্রতা আদর্শস্থানীয় ছিল। জনশ্রুতি এই যে খাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি একইভাবে দীর্ঘসময় বসে থাকতেন স্থির হয়ে। একবার শুধু এর ব্যতিক্রম হয়। তিনি সেদিন যেভাবে বসে ছিলেন—কিছুক্ষণ পর সে ভঙ্গি পরিবর্তন করেন। মির্জা উঠবার পর খাজা যেখানে মির্জা বসেছিলেন সেখানে কিছু আছে কিনা দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দেখা গেল একটুকরো হাড় সেখানে পড়ে আছে।

তিনি বেশী লেখাপড়া করেননি। শহরের মানুষ হয়েও তিনি প্রায় অশিক্ষিত ও গেঁয়ো ধরণের লোক ছিলেন। তিনি সাদাসিধে সাধু প্রকৃতির তুর্কী ছিলেন। জ্ঞানী না হলেও তিনি খাঁটি মানুষ ছিলেন। সর্বদাই তাঁর গুরু মাননীয় খাজার পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং সব ব্যাপারেই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতেন। তিনি কথার খেলাপ করতেন না এবং কোনও দিনই কোনও চুক্তি বা সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করেননি। তিনি সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছেন খুব কমই—কিন্তু কেউ কেউ বলে থাকেন যে অনেক যুদ্ধে তিনি বীরত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। ধনুর্বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর বহুমুখী তীরফলাকা অভ্রান্তভাবে লক্ষ্যভেদ করতো। অশ্বারোহণে এদিক ওদিক ছুটে চলবার সময়ও দূরের লক্ষ্যবস্তু অভ্রান্তভাবে বিদ্ধ করতে পারতেন তিনি। শেষের দিকে যখন তিনি স্থূলাকায় হয়ে পড়েছিলেন, তখন পোষা বাজপাখী উড়িয়ে অনেক ফেজান্ট ও তিতির পাখী শিকার করেছেন এবং এই শিকারে বিফল হতেন খুবই কম। বাজপাখী দিয়ে শিকার করতে তিনি ভালবাসতেন এবং এই ব্যসনে তিনি প্রায়ই মত্ত হয়ে থাকতেন। উলুক্ বেগ মির্জা ছাড়া আর কোনও রাজাই তাঁর মত ক্রীড়াবিদ্ ছিলেন না।

বাহ্য-শালীনতা তিনি বিশেষভাবে রক্ষা করতেন। নিজের লোকজন এমন কি নিকটতম আত্মীয়ের সম্মুখেও তাঁর পা অনাবৃত রাখতেন না। তিনি একবার শুরু করলে একনাগাড়ে বিশ ত্রিশ দিন সুরাপান করতেন; এবং তারপর বিশ ত্রিশ দিন সুরা স্পর্শ করতেন না। সামাজিক উৎসবে অনেক সময় দিনরাত্রি একইভাবে বসে প্রচুর মদ্যপান করতেন। যে কয়দিন মদ খেতেন না সে কয়দিন ঝাঁঝালো জিনিষ খাওয়ার অভ্যাস ছিল তাঁর। তিনি স্বভাবে ছিলেন কৃপণ, প্রকৃতিতে ছিলেন সরল, কথা বলতেন অল্প এবং সব সময়ই তাঁর আমীরদের কথায় উঠতেন বসতেন।

তাঁর দুইটি পুত্র সন্তান ছিল। তারা অল্প বয়সেই মারা যায়। তাঁর কন্যা সন্তান পাঁচটি। যখন আমার পাঁচ বছর বয়সে সমরকন্দে যাই, সেই সময়

তাঁর তৃতীয়া কন্যা আইষা বেগমের সঙ্গে আমার বিবাহের কথা পাকা হয়। গোলযোগের সময়টাতেই সে খোজেন্দে আসে—তখনই তাকে বিবাহ করি। তার গর্ভে আমার একটি কন্যা হয়। তাঁর সর্বকনিষ্ঠা কন্যার নাম—মাসুমা বেগম। যখন আমি খোরাসানে যাই তখন তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিবাহের প্রস্তাব করে তাকে কাবুলে নিয়ে আসি এবং সেখানেই বিবাহ করি। তার গর্ভেও আমার এক কন্যা জন্মে। সেই সময় তার অসুখ হয় এবং আল্লা তাকে কাছে টেনে নেন।

তাঁর বেগমদের মধ্যে একজনের নাম কটক বেগম। তিনি তাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। তার ওপর তাঁর ভালবাসা ছিল খুবই গভীর। কিন্তু এই স্ত্রী তাঁকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতো। তার জীবিতকালে সুলতান অন্য কোনও নারীর সঙ্গ করতে সাহস করতেন না। অবশেষে তিনিই তাকে হত্যা করেন। এক কবিতায় তিনি তাঁর মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

"সৎ লোকের ভাগ্যে যদি
দুষ্টা স্ত্রী জোটে।
এই পৃথিবীর মাটিতেই তার
নরক ভোগ ঘটে।"

তাঁর আমীরদের মধ্যে একজনের নাম জানি বেগ। তাঁর স্বভাব এবং ব্যবহার ছিল বিচিত্র। তাঁর সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। তাঁর মধ্যে একটি হচ্ছে—যখন তিনি সমরকন্দের শাসক ছিলেন তখন উজবেক্‌দের পক্ষ থেকে একজন দূত আসে। উজবেক্‌রা বলিষ্ঠ লোককে বলে—বুকে। জানি বেগ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনাকে কেন ওরা 'বুকে' বলে? যদি আপনি 'বুকে' হন তা'হলে আমার সঙ্গে একটু লড়ুন তো। দূত মহাশয় আর করেন কি? স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। জানি বেগ তাঁকে জাপ্‌টে ধরে তুলে আছাড় দিলেন। তিনি অতি শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন।

তাঁর আর একজন আমীরের নাম—আমেদ বেগ। তিনি উঁচু দরের কবি ছিলেন। তাঁর কবিতার মধ্যে একটির মর্মার্থ এই:

"হে গুণী বিচারক, আজ আমায় একলা থাকতে দাও, কারণ আজ আমি মাতাল। যেদিন অমত্ত অবস্থায় ধরতে পারবে, সেইদিন আমার বিচার করো।"

তিনি নিপুণ অশ্বারোহী ছিলেন। ভাল জাতের ঘোড়া তিনি পুষতেন। বীর হলেও সাহসের অনুপাতে যুদ্ধ পরিচালনার যোগ্যতা তাঁর কম ছিল। তিনি কাজে অমনোযোগী ছিলেন। সমস্ত ব্যাপার ও উদ্যমে তিনি কর্মচারী ও আশ্রিত জনের উপর নির্ভর করতেন। বোখারার যুদ্ধে তিনি বন্দী হন এবং তাঁকে অগৌরবের মৃত্যু বরণ করতে হয়।

তাঁর আর একজন আমিরের নাম—মহম্মদ তারখান। তিনি ছিলেন সৎ মুসলিম, ধার্মিক ও সরল প্রকৃতির লোক। সব সময়েই কোরাণ পাঠ করতেন তিনি। দাবা খেলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অনেকটা সময় এই খেলায় কাটাতেন এবং খুব ভাল খেলতেন। শিকারী পাখী নিয়ে খেলাতেও তিনি নিপুণ ছিলেন। পোষা বাজপাখী ওড়াতে তিনি খুব ভালবাসতেন।

আর একজনের নাম—আবদল আলি তারখান। যদিও মহম্মদ তারখান আবদল আলির চেয়ে মর্যাদায় অনেক বড় ছিলেন—শুধু পদগৌরব নয় লোকচক্ষুতেও—তবুও ফারাও-সদৃশ এই উদ্ধত আমীর এমন ভাব দেখাতেন যেন তিনি মহম্মদ তারখানের চেয়ে অনেক উঁচুদরের লোক। যে বার বছর তিনি বোখারার শাসনকর্তা ছিলেন—তাঁর ভৃত্যের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তাদের খুব জমকালোভাবে রাখতেন। তাঁর সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা, বিচার-পদ্ধতি, তাঁর বাসস্থান, উৎসব, ব্যসন সবই রাজকীয় মর্যাদামণ্ডিত ছিল। তিনি শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন কঠোর শাসনে। তিনি নির্মম, কামুক এবং উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন।

আর একজনের নাম বাকি তারখান। সুলতান আলি মির্জার সময় তিনি খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর সৈন্যসংখ্যা পাঁচ ছয় হাজার পর্য্যন্ত উঠেছিল। তিনি যে সুলতান আলি মির্জার অধীনে বা দলে ছিলেন একথা বলা ঠিক হবে না। বাজপাখী দিয়ে শিকার করা তাঁর বিলাস ছিল। শোনা যায় এক সময় তাঁর সাতশত শিকারী পাখী ছিল। তিনি শিক্ষিত ছিলেন এবং জমকালো জীবনযাত্রা এবং প্রাচুর্যের মধ্যে তিনি বর্দ্ধিত হয়েছিলেন।

সুলতান আলির পর সুলতান মামুদ মির্জা সমরকন্দের সিংহাসনে বসলেন। তাঁর ব্যবহারে এবং কার্যকলাপে ধনীদরিদ্র, সৈন্যসামন্ত, কর্মচারী জনসাধারণ তাঁর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলো। অনেকেই তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেল। তাঁর প্রথম নিষ্ঠুর কাজ হলো তাঁর জামাতা মহম্মদ মির্জাকে হত্যা করা। তাঁর শাসন-পদ্ধতি প্রশংসার যোগ্য ছিল এবং যদিও তিনি

সাধারণভাবে বলতে গেলে ন্যায়নীতিসম্পন্নও ছিলেন এবং অঙ্কশাস্ত্রে জ্ঞান থাকায় রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তাঁর কর্মপদ্ধতিও উৎকৃষ্ট ছিল কিন্তু তিনি এমন নির্দয় ও পাপাসক্ত ছিলেন যে তিনি মোটেই জনপ্রিয় হতে পারেননি। সমরকন্দে আসবার পরই তিনি তাঁর উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতিতে কর আদায় ও শাসনব্যবস্থা প্রচলন করলেন।

রাজা যখন অত্যাচারী ও কামাসক্ত হন—তাঁর কর্মচারী ও ভৃত্যরাও তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। হিসারের অধিবাসীরা বিশেষ করে যে সব সেনানীরা খসরু শার পরিচালনাধীন ছিল—তারা সর্বদাই সুরা আর নারী নিয়ে উন্মত্ত থাকতো। এই সব ব্যাপার এতদূর গড়ায় যে একদিন খসরু শার দেহরক্ষী সৈন্যরা কোনও লোকের স্ত্রীকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। স্বামী উপায়ান্তর না দেখে খসরু শার কাছে অভিযোগ জানায়। কিন্তু স্বামী এই জবাব পেলে—অনেক বছর তো তুমি তোমার স্ত্রীকে উপভোগ করেছ। এটা খুবই ঠিক হয়েছে, যে কিছুদিনের জন্য তোমার স্ত্রীকে অন্যে উপভোগ করবে। আর একটা ব্যাপারেও জনগণ উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। কোনও নাগরিক অথবা ব্যবসায়ী, এমন কি সৈন্যরাও বাড়ী ছেড়ে বাইরে কাজে বেরোতে চাইতো না—কারণ তাদের ভয় ছিল যে তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস করবে।

সমরকন্দের জনসাধারণ সুলতান আমেদ মির্জার পঁচিশ বছর রাজত্ব কালে সুখে ও শান্তিতে জীবনযাপন করেছিল। কারণ সে সময়ে মহামান্য খাজা সাহেবের প্রভাবে সকল ব্যাপারই ন্যায়নীতি এবং আইন মাফিক পরিচালিত হতো। এখন তারা এই রকম অমানুষিক দৌরাত্ম্যে ও কামাচরণে অতিষ্ঠ হযে উঠলো। সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ ধনী ও দরিদ্র আল্লার উদ্দেশ্যে হাত তুলে প্রার্থনা জানাতে লাগলো এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে—আর অভিশাপ দিতে লাগলো মির্জাকে :

'অন্তরের ক্ষত হতে সাবধান হও, কারণ এর জ্বালা একদিন বাইরে প্রকাশ হবেই। যদি পার, একটি প্রাণীকেও ব্যথা দিও না, কারণ একটি নিশ্বাস গোটা পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করতে পারে।'

ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারে এমন পাপ কাজ, এমন অত্যাচার, এমন নৃশংসতা বেশী দিন চলতে পারে না। তাই পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই তাঁর সমরকন্দে রাজত্বের মেয়াদ শেষ হলো।

॥ ৩ ॥

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

এই বছর আব্দুল কাদ্দুস বেগ দূত হয়ে এলেন সুলতান মামুদ মির্জার তরফ থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে উপঢৌকন নিয়ে। তিনি অবশ্য প্রকাশ্যে বলতে লাগলেন যে—তিনি হাসান ইয়াকুবের আত্মীয়, কিন্তু তাঁর যে উদ্দেশ্যে আসা সেই কাজ গোপনে করতে লাগলেন। তাঁর অভিসন্ধি ছিল নানারকম মনোহারি প্রলোভন দেখিয়ে হাসান ইয়াকুবকে তার কর্তব্যকর্ম থেকে ভ্রষ্ট করে তাঁর মনিব মির্জার স্বার্থের অনুকূলে কাজ করানো। হাসান ইয়াকুব তাঁর কথায় সায় দেন অর্থাৎ তিনি ঐ দলেই ভিড়ে গেলেন। সামাজিক শিষ্টাচার দেখানোর কাজ শেষ করে দূত ফিরে গেলেন। পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই হাসান ইয়াকুবের ব্যবহারে পরিবর্তন দেখা গেল। আমার বিশ্বস্ত অনুচরদের সঙ্গে সে দুর্ব্যবহার করতে আরম্ভ করলে। স্পষ্টই বোঝা গেল যে তার উদ্দেশ্য হলো আমাকে সিংহাসনচ্যুত করে জাহাঙ্গীর মির্জাকে রাজা করা। আমার আমীরদের এবং সৈনিকদের ওপর তার ব্যবহার এমন কদর্য হয়ে উঠলো যে কারও বুঝতে বাকি রইলো না যে—তার মাথায় কি দুষ্টবুদ্ধি খেলছে। যাঁরা আমার হিতচিন্তা করেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আমার পিতামহী আইষা দৌলত বেগমের সঙ্গে দেখা করে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন। ঠিক হলো যে হাসান ইয়াকুবকে পদচ্যুত করে ষড়যন্ত্রমূলক উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে হবে।

বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতায় আমার পিতামহীর মত ব্যক্তি স্ত্রীজাতির মধ্যে অল্পই দেখা যায়। তিনি অসাধারণ দূরদর্শী এবং বিচক্ষণ ছিলেন। অনেক প্রধান প্রধান ব্যাপারে তাঁরই পরামর্শ নিয়ে কাজ করা হতো।

হাসান ইয়াকুব ছিল নগর-দুর্গে। আমার মা ও ঠাকুমা ছিলেন প্রস্তর-দুর্গে। আমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে আমি বেরিয়ে পড়লাম নগর-দুর্গের দিকে। হাসান ইয়াকুব সে সময় শিকার করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গিয়েছিল দুর্গ থেকে। ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে জানতে পেরে সে সমরকন্দের পথে রওনা হলো। তাঁর অনুগত আমীরদের এবং লোকদের বন্দী করা হলো। তাদের মধ্যে অনেককে আমি সমরকন্দে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। কাশিম কোচিনকে আমার গৃহস্থালি পরিচালনার সর্বময় কর্তা করা হলো। আন্দেজান শাসনের ভারও তাকে দেওয়া হলো।

সমরকন্দের পথে কান্দবাদামে পৌঁছলো হাসান ইয়াকুব। মনে তার শয়তানি বুদ্ধি। ভাবলো আখ্‌সি প্রদেশটা আক্রমণ করলে হয় এই সময়। এই মনে করে খোকান রাজ্যে উপস্থিত হলো সে। এই সংবাদ জানতে পেরে তার গতিরোধ করার জন্য কয়েকজন আমীরকে সৈন্যসামন্ত সঙ্গে দিয়ে তাকে আক্রমণ করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম।

আমার দলের কিছু সৈন্য এগিয়ে গিয়ে রাত্রে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করে। রাত্রির অন্ধকারে এই বিচ্ছিন্ন সেনাদলের শিবির আক্রমণ করে হাসান ইয়াকুব। শর নিক্ষেপে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে আমার সৈন্যরা। কিন্তু আল্লার বিচিত্র লীলা। নিজের লোকেরই শরাঘাতে হাসান ইয়াকুব ধরাশায়ী হলো। সে আর ফিরে যেতে পারলো না। তার বিশ্বাসঘাতকতার ফল হাতে হাতেই পেয়ে গেল।

'যদি তুমি অন্যায় করো, ভুলেও ভেবোনা সে পাপ থেকে পরিত্রাণের কোনও রক্ষাকবচ আছে তোমার। প্রতি কাজেরই যোগ্য প্রতিক্রিয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

এই বছরেই আমি নিষিদ্ধ বা সন্দেহজনক মাংস খেতে বিরত হই। ছুরি, চামচ বা টেবিল ঢাকা বস্ত্রের ব্যবহারেও সাবধান হই। মাঝ রাতের নমাজও কোনও দিন বাদ দিইনি।

রবিউল-আখির মাসে সুলতান মামুদ মির্জা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছয় দিন অসুখে ভুগে তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নেন।

সুলতান আবু সৈয়দ মির্জার তিনি তৃতীয় পুত্র। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দেখতে তিনি খর্বকায়, কিন্তু মোটা-সোটা ছিলেন। তাঁর শরীরের গঠন বেশ মজবুত ছিল, আর দাড়ি ছিল খুব পাতলা।

নমাজ পড়তে তিনি অবহেলা করেননি। তাঁর ব্যবস্থাপনা এবং কাজের ধারা ছিল সুন্দর। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। রাজস্বের এক কপর্দকও তাঁর অজ্ঞাতসারে ব্যয় করার উপায় ছিল না। ভৃত্যদের নিয়মিতভাবে মাইনে দিতেন তিনি। তাঁর উৎসবাদি, তাঁর দাতব্য ব্যাপারে, দরবারের বিধিব্যবস্থা এবং তাঁর আশ্রিতজনের আদর-আপ্যায়নের নিয়মগুলি ছিল চমৎকার। সেগুলো পরিচালিত হতো নির্দিষ্ট বিধিনিষেধের ধারা অনুসারে। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ ছিল হাল ফ্যাসানানুযায়ী সুন্দর। তিনি যে সব আইন কানুন প্রবর্তন করতেন, তা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত

হওয়ার অধিকার তাঁর সেনামণ্ডলীর কিংবা প্রজাসাধারণের ছিল না। প্রথম জীবনে শিকারী-পাখী নিয়ে খেলায় তিনি মেতে থাকতেন। অনেক শিকারী-বাজ তিনি পুষতেন। শেষের দিকে হরিণ শিকার তাঁর প্রধান ব্যসন হয়েছিল। অনেক সময় তাঁর নৃশংসতা এবং অসচ্চরিত্রতা মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। তিনি সব সময়েই সুরা পান করতেন। অনেক ক্রীতদাস রাখতেন তিনি। তাঁর বিস্তৃত রাজ্যে সুশ্রী বালক কিংবা যুবা দেখলেই তাদের যে কোনও রকমে হরণ করে এনে ক্রীতদাস করতেন। তাঁর আমীরদের, এমন কি আত্মীয়দের ছেলেদেরও ক্রীতদাস করতে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না। তাঁর ঘৃণ্য আদর্শ এমন চালু হয়ে গিয়েছিল যে—প্রত্যেক মানুষের অন্ততঃ একজন ক্রীতদাস রাখাটা বিলাস হয়ে উঠেছিল। ক্রীতদাস রাখাটা একটা মহৎ কাজ বলে মনে করা হ'তো। তাঁর দুষ্কার্যের ফলও তাঁকে পেতে হয়। তাঁর সমস্ত পুত্রসন্তানই অল্প বয়সে নিহত হয়েছিল।

তাঁর কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল। কিন্তু সেগুলো ভাবলেশহীন নীচুদরের কবিতা ছিল। ওরকম কবিতা লেখার চেয়ে না লিখলেই বোধ হয় ভাল হ'তো।

তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না। খাজা আবদুল্লার সঙ্গে তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত কদর্য ছিল। তিনি কাপুরুষ ছিলেন—শালীনতা-বোধও তাঁর খুব উঁচুদরের ছিল না। তাঁর সঙ্গী ছিল কতকগুলো মোসাহেব আর বদমায়েস। রাজদরবার, এমন কি জনসাধারণের সম্মুখে তাদের অবাধে ভাড়ামি করতে লজ্জা হতো না।

তিনি কর্কশভাষী ছিলেন। তিনি কি যে বলতে চান তাও অনেক সময় বোঝা যেত না। তিনি দুইবার ধর্ম রক্ষার নামে যুদ্ধ করতে যান। সেই সময় তিনি গাজি এই পদবী গ্রহণ করেন।

তাঁর পাঁচ পুত্র, এগারটি কন্যা ছিল। তাঁর একটি কন্যাকে আমি বিবাহ করি আমার মায়েব নির্দেশ মত। আমাদের মধ্যে মনের মিল হয়নি। বিবাহের দুই কি তিন বছরের মধ্যে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

তাঁর আমীরদের মধ্যে প্রথম স্থান ছিল খসরু শার। তিনি তুর্কিস্থানের অধিবাসী। যৌবনে তিনি তারখানের বেগ্‌দের অধীনে কাজ করতেন। বল্‌তে গেলে তিনি ক্রীতদাসই ছিলেন। তারপর তিনি মজিদ বেগের অধীনে কাজ করেন। মজিদ বেগ তাঁকে খুবই অনুগ্রহ করতেন।

সুলতান মামুদ যখন ইরাকে তাঁর দুর্ভাগ্যজনক ব্যর্থ অভিযান চালান, সেই সময় খসরু শা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ইরাক যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে ফিরবার পথে খসরু তাঁকে অনেক সাহায্য করেন। তাতে সন্তুষ্ট হয়ে মির্জা বিশেষভাবে খসরু শাকে সম্মানিত করেন। এর পর তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। সুলতান মামুদ মির্জার সময় তাঁর অধীনে পাঁচ ছয় হাজার লোক কাজ করতো। আমু নদীর তটভূমি থেকে হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত শুধু বাদাখসান ভিন্ন সমস্ত দেশ তাঁর অধীন ছিল এবং তিনি সমস্ত রাজস্ব ভোগ করতেন। মুক্ত হস্তে খাদ্য বিতরণ করার জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি তুর্কি হলেও রাজস্ব বৃদ্ধির দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তা নির্বিচারে খরচ করতেন।

সুলতান মামুদ মির্জার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের রাজত্বকালে তিনি ক্ষমতার উচ্চশিখরে উঠেছিলেন এবং প্রকৃতই তিনি স্বাধীন হয়েছিলেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা কুড়ি হাজার পর্যন্ত হয়েছিল। তিনি নিয়মিত নমাজ পড়তেন এবং নিষিদ্ধ মাংস গ্রহণ করতেন না; কিন্তু তবুও তাঁর অন্তর ছিল কলুষিত। তিনি হীন, দুষ্টবুদ্ধি, নীচমনা এবং বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। এই নশ্বর পৃথিবীতে অলীক খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভের জন্য যাঁর অধীনে তিনি কাজ করতেন এবং যাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বড় হয়েছিলেন এবং যিনি তাঁকে বরাবর রক্ষা করে এসেছেন—তারই পুত্রদের একজনের দুই চোখ উৎপাটন করেন এবং আর একজনকে হত্যা করেন। এই কুকাজের জন্য আল্লার অভিশাপ আর মানুষের ঘৃণা লাভ করতে হয়েছে—যার ফল তাঁকে মৃত্যুর পরও ভোগ করতে হবে শেষ বিচারের দিনে। এই সব ঘৃণিত কাজ শুধু হীন অহঙ্কার এবং পার্থিব সুখ সম্ভোগের জন্যই তিনি করেছিলেন। জনবহুল প্রদেশের ওপর আধিপত্য, যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদের প্রাচুর্য এবং অগণিত ভৃত্যের আনুগত্য থাকলেও তাঁর নিজের এমন তেজবীর্য ছিল না, যাতে তিনি একটা মুরগীর বাচ্চার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন। এই আত্মকথায় তাঁর বিষয়ে প্রায়ই উল্লেখ থাকবে।

সুলতান মামুদ মির্জার আর একজন আমীরের নাম ওয়ালি। খসরু শার তিনি আপন সহোদর। ভৃত্যদের তিনি খুবই যত্নে রাখতেন। এঁরই প্ররোচনায় সুলতান মামুদ মির্জাকে অন্ধ এবং বাইসনঘর মির্জাকে হত্যা

করা হয়। অসাক্ষাতে লোকের কুৎসা করা তাঁর অভ্যাস ছিল। তিনি কটুভাষী, কদর্যমনোবৃত্তিসম্পন্ন, অহঙ্কারী, হীনবুদ্ধির লোক ছিলেন। তিনি কখনও কারও কথা শুনতেন না এবং কারও কাজ অনুমোদন করতেন না। নিজের খেয়াল খুসিতেই বরাবর তিনি চলতেন। যখন আমি খসরু শাকে তাঁর ভৃত্যদের কাছ থেকে সরিয়ে নিই, ওয়ালি তখন উজবেকদের ভয়ে আন্দেরাব এবং সিরাবে চলে যান। এই স্থানে আইমাক জাতি তাঁকে পরাস্ত করে তাঁর জিনিষ পত্র লুণ্ঠন করে। তারপর আমার অনুমতি নিয়ে তিনি কাবুলে চলে যান। ওয়ালি পরে মহম্মদ সেবানির কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর আদেশে সমরকন্দে ওয়ালির শিরশ্ছেদ করা হয়।

তাঁর আর একজন সর্দারের নাম শেখ আবতুল্লা। তিনি আঁটসাট কোট পরতেন—সেটা আবার বেল্টে বাঁধা থাকতো। তিনি সাধু ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন।

সুলতান মহম্মদ মির্জার মৃত্যুর পর খসরু শা মৃত্যুর কথা গোপন করে তাঁর ধনরত্ন সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু এ ব্যাপার কি কখনও গোপন থাকে? সমরকন্দবাসী সকলেই একথা জানতে পারলো। সেদিন একটা উৎসবের দিন ছিল। সৈন্য ও নাগরিকরা একযোগে হৈ হল্লা করে খসরু শার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। খসরু শাকে বিতাড়িত করার পর সমরকন্দ ও হিসারের সর্দাররা একযোগে বাইসন্‌ঘর মির্জার কাছে সংবাদ পাঠায়। তিনি তখন বোখারায় ছিলেন, তাঁকে সমরকন্দে নিয়ে এসে সিংহাসনে বসানো হলো। তখন তাঁর বয়স আঠারো বৎসর।

এই সঙ্কট সময়ে সমরকন্দ আক্রমণ করার জন্য সুলতান মহম্মদ খাঁ সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হন। খুব দ্রুত এবং দক্ষতার সঙ্গে একদল রণনিপুণ সৈন্য নিয়ে বাইসন্‌ঘর মির্জা বেরিয়ে যান এবং কানবাইয়ের নিকটে শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হন। সমরকন্দ ও হিসারের সুদক্ষ সৈন্যরা যখন একযোগে আক্রমণ করলো, হায়দার গোকুলতাসের অধীনে মহম্মদ খাঁর সৈন্যরা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। তাদের এই দুর্দশা দেখে তাদের সহযাত্রী অন্য সেনাদল আর সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে সাহস করলো না; তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলো। অসংখ্য মোগল এই ব্যাপারে প্রাণ হারায়। শত্রুসৈন্য এক একজনকে ধরে এনে বাইসন্‌ঘর মির্জার সম্মুখে শিরশ্ছেদ করা হলো। মৃতের স্তূপ এমন হয়ে উঠলো যে বাইসন্‌ঘর মির্জার শিবির তিন তিনবার বদল করতে হয়।

এই সময় ইব্রাহিম সারু আসফেরা দুর্গে উপস্থিত হয়ে এক প্রার্থনা সভার আয়োজন করে এবং বাইসন্‌ঘর মির্জাকে সেই সভায় রাজা বলে ঘোষণা করে। এই ইব্রাহিম সারু শিশুকাল থেকে আমার মায়ের কাজে নিযুক্ত ছিল এবং যথেষ্ট সম্মান লাভ করেছিল। কিন্তু অসদ্‌ব্যবহারের জন্য তাকে পদচ্যুত করা হয়। বাইসন্‌ঘর মির্জার পক্ষ নিয়ে সে এখন আমার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করে।

শাবান মাসে এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য আমি অশ্বারোহী সৈন্য চালনা করি। মাসের শেষের দিকে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে পর্যবেক্ষণের কাজ সুরু করি। যেদিন আমরা পৌঁছাই সেইদিনই তরুণ যোদ্ধারা আক্রমণ সুরু করার জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠে। দুর্গ সীমানায় পৌঁছে তাড়াতাড়ি তারা নতুন তৈরী একটি দুর্গ-প্রাচীরের ওপরে ওঠে এবং দুর্গের একটা বাহিরের অংশ অধিকার করে নেয়। সৈয়দ কাশিম সেদিন অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়েছিলেন। সকলকে পিছনে ফেলে তরবারি আস্ফালন করতে করতে তিনি এগিয়ে যান। সুলতান আমেদ তাম্বল এবং মহম্মদ দোস্ত তাঘাইও অবশ্য বীরের মত তরবারি চালান। কিন্তু বীরত্বের পুরস্কার সেদিন সৈয়দ কাশিমই লাভ করেন। কোনও উৎসবে যিনি সবচেয়ে বীরত্বব্যঞ্জক তরবারির খেলা দেখাতে পারেন তাঁকেই পুরস্কার দেওয়ার একটা নিয়ম আছে।

প্রথম দিনের সঙ্ঘর্ষে আমার গভর্ণর খোদা-বর্দি শরাহত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। আমার সৈন্যরা উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র না নিয়ে দুর্গ দখলের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ায় তাদের কতক হত হয় এবং অনেকেই আহত হয়। ইব্রাহিম সারুর দলে একজন ওস্তাদ তীরন্দাজ ছিল। সে অদ্ভুত কৌশলে শর নিক্ষেপ করতো। তার মত নিপুণ তীরন্দাজ আমি আর কোথাও দেখিনি। দুর্গের পতনের পরে সে আমার অধীনে কাজে নিযুক্ত হয়।

এই দুর্গ অবরোধ অনেকদিন ধরে চলছে দেখে হুকুম দিলাম—যে দুই জায়গায় উঁচু মাটির স্তূপ নির্মাণ করে তার ওপর থেকে কামানের গোলা ছুঁড়তে হবে। আর দুর্গ জয়ের জন্য যে সব আসবাবপত্র দরকার, তাও তাড়াতাড়ি তৈরী করে ফেলতে হবে। চল্লিশ দিন এই অবরোধ চলেছিল। অবশেষে ইব্রাহিম সারু অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়ে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায়। শওয়াল মাসে সে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে। বশ্যতার স্বীকৃতির নিদর্শন হিসাবে গলায় ঝুলানো তরবারি নিয়ে সে আমার সামনে উপস্থিত হয় এবং দুর্গ আমার হাতে সমর্পণ করে।

খোজেন্দ প্রদেশ অনেকদিন আমার পিতার অধিকারে ছিল। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে যুদ্ধের সময় সুলতান আমেদ মির্জা সেটা দখল করে নেন। ভাবলাম, যখন এই প্রদেশের এত কাছাকাছি এসে পড়েছি তখন এর বিরুদ্ধে, অভিযান চালিয়ে দেখা যাকনা কি হয়। বিনা আয়াসেই খোজেন্দ দুর্গ আমার হস্তগত হলো।

এই সময় সুলতান মহম্মদ খাঁ সারুখিয়াতে ছিলেন। কিছুদিন আগে যখন সুলতান আমেদ মির্জা আন্দেজানেব দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন এই খাঁ মির্জার পক্ষ নিয়ে আখ্‌সি অবরোধ করেন একথা আগেই বলেছি। আমার মনে হলো যখন এত কাছে এসেও পড়েছি এবং যখন তিনি বয়সে আমার বাপের কিংবা বড় ভাইয়ের মত, তখন আমার তাঁর কাছে গিয়ে সম্মান দেখানো উচিত—তাতে হয়তো বিগত ঘটনার দরুণ তাঁর মনে আমার প্রতি যে বিরুদ্ধভাব আছে তা দূর হয়ে যেতে পারে। আমি আরও ভেবেছিলাম—তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে আর একটা বিষয়ে সুবিধে হবে যে—তাঁর দরবারের হালচাল এবং অন্যান্য বিষয়েও একটা ধারণা করতে সক্ষম হবো।

এই রকম স্থির করে, আমি খাঁয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য অগ্রসর হলাম। হায়দার বেগের পরিকল্পনা অনুসারে তৈরী উদ্যানের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। খাঁ বাগানের মাঝখানে এক বাঁধানো বেদির উপর বসেছিলেন। বাগানে প্রবেশ করেই আমি নত হয়ে তিনবার তাঁকে অভিবাদন করি। খাঁ আসন থেকে উঠে প্রত্যভিবাদন করে আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। আমি পিছু হটে আবার অভিবাদন করি। খাঁ আমাকে এগিয়ে আসতে বলেন এবং তাঁব আসনের পাশে আমাকে বসতে নির্দেশ দেন। আমার সঙ্গে তিনি খুবই সস্নেহ ও সদয় ব্যবহার করেন। দুই একদিন বাদেই আমি আখ্‌সি ও আন্দেজানের পথে অগ্রসর হই। আখ্‌সিতে উপস্থিত হয়ে আমার পিতার কবর দেখতে যাই। শুক্রবার দুপুরের নমাজের পর আন্দেজানের উদ্দেশ্যে রওনা হই। সন্ধ্যা এবং রাতের নমাজের মাঝামাঝি সময় সেখানে পৌঁছে যাই।

আন্দেজানের আরণ্যক অঞ্চলে 'জাগ্রে' নামে এক সম্প্রদায় বাস করে। তাদের সংখ্যা অনেক, প্রায় পাঁচ ছয় হাজার পরিবার। ফারগানা এবং কাসঘরের মাঝামাঝি পর্বতশ্রেণীতে তাদের বসতি। তাদের অগণিত ঘোড়া এবং ভেড়া আছে। তারা সাধারণ ষাঁড়ের পরিবর্তে অনেক পাহাড়ি

ষাঁড় রাখে। দুরধিগম্য পর্বতের অধিবাসী হওয়ায় তারা রাজস্ব দিতে চায় না। সেজন্য কাশিম বেগের অধীনে একদল নিপুণ সৈন্যকে 'জাগ্রেদের' বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠাই, যাতে তাদের কিছু কিছু সম্পত্তি অধিকার করে আমার সেনাদলের মধ্যে বিতরণ করতে পারি। কাশিম বেগ এই অভিযানে কুড়ি হাজার ভেড়া আর পনরো হাজার ঘোড়া লুঠ করে নিয়ে আসে। সেগুলো আমার সেনাদলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

জাগ্রেদের দেশ থেকে সৈন্যদের ফেরার পর উরাতিপার বিরুদ্ধে অভিযান করতে বেরিয়ে পড়ি। উরাতিপা অনেকদিন আমার পিতার অধীন ছিল। তাঁর মৃত্যুর বৎসরে তিনি এই স্থান হারান। বর্তমানে বাইসন্‌ঘর মির্জার পক্ষে তাঁর ছোট ভাই এই জায়গা দখল করে ছিলেন। আমার আগমনের সংবাদ পেয়ে তিনি উরাতিপার গভর্ণরকে সেখানে রেখে 'মাসিখার' পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যান। পালাবার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য খলিফাকে দূত স্বরূপ পাঠাই। কিন্তু এই দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি আমার কাছে কোনও উত্তর না পাঠিয়ে খলিফাকে বন্দী করেন এবং তাকে হত্যা করার হুকুম দেন। কিন্তু সেটা আল্লার অভিপ্রেত ছিল না। খলিফা কোনও রকমে পালিয়ে আসেন। দুই তিন দিন পর অজস্র দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে পদব্রজে নগ্নদেহে আমার কাছে ফিরে আসেন। আমি উরাতিপায় প্রবেশ করি। তখন শীতকাল সুরু হয়েছে। গ্রামবাসীরা ক্ষেত থেকে সব ফসল ঘরে তুলেছে। খাদ্যাভাবের দরুণ আন্দেজানেই ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। আমার ফেরার পর খাঁয়ের সৈন্য উরাতিপা আক্রমণ করে। স্থানীয় অধিবাসীরা আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়ে আক্রমণকারীর হাতে নগর সমর্পণ করে। খাঁ 'উরাতিপার' শাসনভার মহম্মদ হোসেন কোরকানের হাতে তুলে দেন। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর হাতেই এর কর্তৃত্ব ছিল।

॥ ৪ ॥

১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

সুলতান মামুদ মির্জা সমরকন্দে পলায়নের পর তাঁর প্রধান প্রধান আমীর আমার কাছে আগে থেকেই তাঁদের আগমনের বার্তা জানিয়ে রমজান মাসে আন্দেজানে উপস্থিত হন। তৈমুর রাজবংশের প্রথা অনুযায়ী আমি কুশনের

আসনে বসে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুত হই। হামজে সুলতান, মেহেদি সুলতান ও মামক সুলতানকে নিয়ে প্রবেশ করতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতি সম্মান দেখাই। আসন থেকে নেমে এসে তাঁদের আলিঙ্গন করি এবং আমার ডান পাশে গালিচার ওপর তাঁদের বসাই।

সুলতান হোসেন মির্জা হিসার দুর্গ অধিকারের জন্য দুর্গের কাছাকাছি আস্তানা গাড়লেন। দুর্গ অধিকারের জন্য দিবারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে গোলা-বর্ষণ, সুড়ঙ্গ পথ খনন, নানাস্থানে কামান স্থাপন ইত্যাদি কাজে তিনি ব্যস্ত রইলেন। চার পাঁচ জায়গা থেকে সুড়ঙ্গ পথ খনন করা হয় এবং একটা পথ নগর-ফটকের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। অবরুদ্ধ নগরবাসীরা ব্যাপারটা জানতে পেরে অপর দিক থেকে গর্ত খুড়ে ভেতরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করে। অবরোধকারীরা বুঝতে পেরে সুড়ঙ্গের মুখ ও পাশ বন্ধ করে দেয়। সেই ধোঁয়ার জাল বেরোবার রাস্তা না পেয়ে আবার এই দিকেই ধাওয়া করে। তখন অবরুদ্ধ দুর্গবাসীদের নিজেদেরই সৃষ্ট ধোঁয়ায় শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। যাহোক, তারা কলসী কলসী জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে ফেলে এবং আক্রমণকারীদের তাড়িয়ে দেয়। আর একদিন এক দল দক্ষ যোদ্ধা বিদ্যুৎগতিতে দুর্গ থেকে বেরিয়ে একদল শত্রুসৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে।

উত্তর দিকে যেখানে মির্জা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন সেইখান থেকে অনবরত গোলা নিক্ষেপ চলছিল দুর্গের দিকে। গোলার আঘাতে দুর্গের একটা অংশ চূড়াসমেত ঠিক রাত্তিরের নমাজের সময় ভেঙ্গে পড়ে। একদল উৎসাহী সেনা তখনই দুর্গ সরাসরি আক্রমণের জন্য মির্জার অনুমতি চায়। মির্জা কিন্তু রাত্রির ঘন অন্ধকারে আক্রমণ সমীচীন হবে না বলে তাদের অনুমতি দেন না। প্রভাতের পুর্বেই দুর্গের ভগ্ন স্থান মেরামত করা হয়ে গেছে দেখতে পেয়ে—আর সরাসরি আক্রমণ করার সুযোগ হয় না। দুই আড়াই মাস ধরে দুর্গ অধিকারের জন্য সুড়ঙ্গ-খনন, দুর্গ প্রাচীর টপকানোর চেষ্টা, গোলাবর্ষণ করা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

সুলতান হোসেন মির্জা যখন বুঝলেন যে দুর্গ জয়ের আশা নিষ্ফল হতে চলেছে এবং শীগ্‌গিরই বৃষ্টি সুরু হবে বলে সেনাদলও ভগ্নমনোরথ হয়ে পড়েছে, তখন তিনি শান্তি স্থাপনের একটা প্রস্তাব করলেন। এই প্রস্তাবের কথা শুনে মহম্মদ বিরলাস্‌ দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে অবরোধ-কারীদের পক্ষের কয়েকজন বিশিষ্ট সর্দারের সঙ্গে দেখা করলেন। চুক্তি

হলো—সুলতান মামুদ মির্জার বড় মেয়ের সঙ্গে সুলতান হোসেন মির্জার ছেলের বিয়ে দিয়ে স্থায়ী শান্তি আনতে হবে। অল্প সময়ের মধ্যে যতগুলো সম্ভব গায়ক আর বাজনদার সংগ্রহ করে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর সুলতান হিসার থেকে ফিরে কুন্দেজের দিকে চললেন।

এই রমজান মাসেই সমরকন্দে তারখানদের বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। বাইসন্‌ঘর মির্জার আচরণের জন্যই তারখানরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর দহরম মহরম ছিল হিসারের সর্দারদের এবং সেনাদের সঙ্গেই বেশী। সমরকন্দের সর্দারদের ও সেনাদের ওপর তাঁর আস্থা ছিল খুব কম। শেখ আবদুল্লা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত সর্দার এবং প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ছেলেদের সঙ্গে মির্জার এমন ভাব ও মেলামেশা ছিল যে দেখে মনে হতো—এরা প্রণয়াসক্ত যুবকযুবতী। এই ব্যাপারে তারখানের সম্ভ্রান্ত আমীররা এবং সর্দাররা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। তারা সুলতান আলি মির্জাকে রাজা বলে ঘোষণা করে। বাইসন্‌ঘর মির্জাকে বন্দী করার জন্য তারা অগ্রসর হয় সমরকন্দের দিকে। তিনি তখন ছিলেন সমরকন্দের নতুন বাগান বাড়ীতে। সেইখানে তারা কৌশলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে তাঁর ভৃত্য এবং দেহরক্ষীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে তাঁকে দুর্গের মধ্যে নিয়ে আসে। বাইসন্‌ঘর মির্জা ও সুলতান আলি মির্জাকে এক জায়গায় রাখা হয়।

অপরাহ্নের নমাজের সময় বিদ্রোহীরা পরামর্শ করে গুরুতর সঙ্কল্প করে যে বাইসন্‌ঘর মির্জাকে গকৃসরাইয়ে পাঠাতে হবে। বাইসন্‌ঘর মির্জা ব্যাপার কি হতে চলেছে বুঝতে পেরে একটা ছুতা করে প্রাসাদসংলগ্ন বাগানের উত্তর-পূর্ব দিকের একটা কক্ষে চলে যান। তারখান্‌রা দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে। এই কক্ষের পেছনের দিকে একটা দরজা ছিল—যার মধ্য দিয়ে বাইরে যাওয়া যেত। দরজাটা ইঁটের পর ইঁট সাজিয়ে বন্ধ করা হয়েছিল। তরুণ রাজা কয়েকখানা ইঁট সরিয়ে বাইরে বেরোবার পথ করে নেন এবং সেই ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়ে আসেন। তারপর গড়খাইয়ের উপরের সাঁকো দিয়ে পার হয়ে এসে দুর্গ-প্রাচীরের ওপর কোনও রকমে উঠে লাফ দিয়ে বাইরে পড়েন এবং কোনওক্রমে ছুটতে ছুটতে খাজে খাঁর বাড়ীতে পৌঁছে যান। যারা দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল তারা কিছুক্ষণ পরে ঘরে প্রবেশ করে দেখে যে মির্জা পালিয়েছেন।

যখন বিদ্রোহীদের নেতা তারখানকে ধরে নিয়ে আসা হয় তখন

বাইসন্‌ঘর মির্জা ছিলেন আমেদ হাজির বাড়ীতে। তাকে দু'একটা প্রশ্ন করা হয়—যার কোনও সদুত্তর সে দিতে পারেনি। যে কাজে সে লিপ্ত হয়েছিল—তা স্বীকার করার মত কাজ নয়। তাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো। দণ্ডের কথা শুনে তার মনোবল একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। প্রাণভয়ে সে একটা স্তম্ভ আঁকড়ে ধরলো। কিন্তু তাতে কোনও ফল হলো না। তাকে মৃত্যুদণ্ড নিতেই হলো।

সুলতান আলি মির্জাকে গক্‌সরাইয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হ'লো। সেখানে তার চোখ দুটি জ্বলন্ত শলাকায় বিদ্ধ করা হবে। তাইমুর যে কয়েকটি প্রাসাদ তৈরী করেন তার মধ্যে গক্‌সরাই একটি। এটা সমরকন্দের দুর্গনগরের মধ্যেই অবস্থিত। এই প্রাসাদের বিশেষত্ব এই যে—তাইমুর বংশের কেউ রাজা হলে এই প্রাসাদেই তাঁর অভিষেক হয়। আর যে ব্যক্তি রাজ্যলাভে ব্যর্থ হয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় তাকেও এই প্রাসাদেই সেই দণ্ড নিতে হয়। সুতরাং সুলতান আলিকে এই প্রাসাদে পাঠানোর অর্থ কি—তা বুঝতে কারও দেরী হলো না অর্থাৎ তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সুলতান আলিকে গক্‌সরাইয়ে আনা হলো এবং তার চোখে শলাকা-বিদ্ধ করাও হলো। কিন্তু শলাকা-বিদ্ধকারীর নিপুণতার অভাবেই হোক কিংবা ইচ্ছাকৃতই হোক—তাঁর চোখের কোনও ক্ষতি হলো না। একথা অবশ্য তিনি প্রকাশ করলেন না। তিনি কোনও রকমে খাজা ইয়াহিয়ার বাড়ীতে পালিয়ে এলেন। সেখান থেকে গোপনে চলে গেলেন বোখারার তারখানদের কাছে। এই সময় থেকে মাননীয় খাজা ওবেদুল্লার দুই পুত্রের মধ্যে শত্রুতা সুরু হলো। তাঁর বড় ছেলে হলেন বড় ভাই বাইসন্‌ঘর মির্জার ধর্মগুরু এবং ছোট ছেলে হলেন ছোট ভাই সুলতান আলির ধর্মগুরু। কয়েক দিন পরই খাজা ইয়াহিয়া বোখারায় চলে এলেন।

বাইসন্‌ঘর মির্জা এক সৈন্যদল গঠন করে সুলতান আলি মির্জার সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে বোখারার দিকে অগ্রসর হলেন। এই সংবাদ আন্দেজানে আমার কাছে এসে পৌঁছলো শওয়াল মাসে। আমি তখনই সৈন্য নিয়ে সমরকন্দ জয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। সুলতান হোসেন মির্জা হিসার থেকে চলে আসবার পর সুলতান মাসুদ এবং খসরু শা আর কোনও বিপদের কারণ নাই দেখে সমরকন্দ আক্রমণের ইচ্ছা তাদের মনে জেগে উঠ্‌লো। সুলতান মাসুদ সমরকন্দ অধিকার করার জন্য অগ্রসর হলেন।

খসরু শা তাঁর ভাই ওয়ালিকে পাঠালেন সুলতান মাসুদের সঙ্গে। তিনি চার মাস সমরকন্দ তিন দিক থেকে আক্রান্ত হয়েছিল। এই সময় সুলতান আলির পক্ষ থেকে খাজা ইয়াহিয়ার আমার কাছে উপস্থিত হন। তাঁর প্রস্তাব ছিল আমার ও সুলতান আলির মধ্যে যেন সহযোগিতা স্থাপিত হয়। তিনি তাঁর প্রস্তাব এমন সুন্দরভাবে উত্থাপন করলেন যাতে আমার সুলতান আলির সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার আর কোনও বাধা থাকলো না। আমি তখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সমরকন্দের দিকে চৌদ্দ মাইল এগিয়ে যাই। সুলতান আলিও বিপরীত দিক থেকে তাঁর সৈন্য নিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সেই দিকে এগিয়ে আসেন। আমরা পরস্পর চার পাঁচ জন অনুচর নিয়ে মিলিত হই। কোহিক নদীর ধারে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। ঘোড়ার পিঠে বসেই আমাদের আলোচনা হয়। আলোচনা শেষ করার পর শীত ঋতু আসন্ন দেখে, আর সমরকন্দে খাদ্যশস্যের অভাব হবে বিবেচনা করে আমি আন্দেজানে ফিরি এবং সুলতান আলি বোখারায় চলে যান।

॥ ৫ ॥

১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

সুলতান আলির সঙ্গে আলাপ আলোচনায় স্থির হয় যে গ্রীষ্মকালে তিনি বোখারা থেকে এগিয়ে আসবেন, আর আমি যাব আন্দেজান থেকে—সমরকন্দ অবরোধ করবার জন্য। এই চুক্তি অনুসারে আমি রমজান মাসে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলাম—দুই তিনশ' সেনাকে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলাম। বাইসন্ঘর মির্জা আমাদের অভিযানের খবর পেয়েই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলেন। সেই রাত্রেই আমার সেনারা তাঁর সেনাবাহিনীর পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করে। শরবিদ্ধ করে অনেককে তারা হত্যা করে; অনেককে বন্দী করে এবং তাদের জিনিষপত্র লুঠ করে নেয়। দুইদিনের মধ্যে আমি সিরাজ দুর্গে পৌছলে, দুর্গের অধিনায়ক আমার হাতে দুর্গ সমর্পণ করে। পরদিন সকালে ঈদের নমাজ পড়ে সমরকন্দের দিকে অগ্রসর হয়ে যাই। সেইদিনই তিন চার শ' লোক আমার কাছে আসে এবং আমার কাজে যোগ দেয়। তারা বলে যে বাইসন্ঘর মির্জা যখনই পালিয়ে যাওরার জন্য প্রস্তুত হন, তখনই তাঁর পক্ষ তারা ত্যাগ করে এবং দেশের রাজা অর্থাৎ আমার অধীনে কাজ

করার জন্য এখানে চলে এসেছে। শেষে অবশ্য আমি জানতে পেরেছিলাম যে বাইসন্‌ঘর মির্জার কাছ থেকে চলে আসবার সময় তারা সিরাজ দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব নিয়েই এসেছিল। কিন্তু এখানে এসে দুর্গের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তা দেখে আমার সঙ্গে যোগ দেওয়া ভিন্ন তাদের আর গত্যন্তর ছিল না।

যখন আমি কারাবুলাকে বিশ্রামের জন্য আসি সেই সময় অনেক মোগলকে বন্দী করে আমার কাছে নিয়ে আসা হয়। তারা যে সব গ্রামের ভেতর দিয়ে আসছিল—সেই গ্রামবাসীদের ওপর অবশ্য অত্যাচার করেছিল। কাশিম বেগের হুকুমে তাদের মধ্যে দুই তিন জনকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়, যাতে ভয়ে আর কেউ এমন কাজ ভবিষ্যতে না করে। চার পাঁচ বছর পর আমার বিপদের সময় যখন আমি মাসিহাতে খাঁয়ের কাছে যাই তখন কাশিম বেগ তাঁর এই কাজের প্রতিক্রিয়ার ভয়ে আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকাই ভাল মনে করেন।

কারাবুলাক থেকে অগ্রসর হয়ে নদী পার হয়ে ইয়ামের কাছে বিশ্রাম নিই। সেই সময় আমার কয়েকজন প্রধান বেগ, বাইসন্‌ঘর মির্জার কিছু সৈন্যকে নগরের প্রমোদ ক্ষেত্রে আক্রমণ করে। এই খণ্ডযুদ্ধে সুলতান আমেদ তাম্‌বল গলায় বর্শা বিদ্ধ হয়ে আহত হন। কিন্তু তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যাননি। খাজা কিলানের বড় ভাই প্রধান কাজি খাজেবাদ মোল্লাও গলায় তীর বিদ্ধ হয়ে আহত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অশেষ গুণসম্পন্ন এবং উচ্চশিক্ষিত লোক ছিলেন। ভাষার ওপর তাঁর খুব দখল ছিল। শিকারী পাখী পোষা তাঁর ব্যসন ছিল। গীতবাদ্যেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। আমার পিতা তাঁকে সম্মান করে চলতেন। তাঁর ওপর শীলমোহর রক্ষার ভার ছিল। যখন আমরা ইয়াম নগরপ্রান্তে পৌঁছাই, তখন একদল বণিক এবং জনসাধারণ নগর থেকে বেরিয়ে শিবিরের বাজারে কেনা-বেচা সুরু করে। একদিন বিকেলের নমাজের পর একটা গণ্ডগোল সুরু হয় এবং ঐ সব মুসলমানদের জিনিষপত্র লুঠ হয়ে যায়। আমি আদেশ দিই যে এই লুঠের ফলে যার যার জিনিষ খোয়া গিয়েছে কাল সকালের মধ্যে তাদের তা ফিরিয়ে দিতে হবে। আমার সেনাদের শৃঙ্খলাবোধ এমন ছিল যে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লুঠের মাল জিনিষের মালিকদের ফেরত দেওয়া হয়—এমনকি একটা সুতোর টুকরো কিংবা একট ভাঙ্গা সূঁচও বাদ যায়নি।

সেখান থেকে এগিয়ে এসে ইউরেটখানে নামি। সমরকন্দের ছয় মাইল পূর্বে এই জায়গা। এখানে আমি ছিলাম চল্লিশ পঞ্চাশ দিন। এই সময়ে

নগর-ময়দানে আমার লোকেদের ও নগরবাসীদের মধ্যে অনেকবার লড়াই হয়। এই লড়াইয়ে একদিন ইব্রাহিম বেগচিকের মুখে তরবারির আঘাত লাগে। তারপর থেকে তার নাম হলো মুখ-কাটা ইব্রাহিম। আর একদিন খিয়াবানে নদীর সাঁকোর ওপর আবুল কাশিম খুব জমক দেখিয়ে লাঠি নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। আর একদিনের লড়াইয়ে মির শা লাঠি চালনার ব্যাপারে খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তরবারির আঘাতে ঘাড়ে এমন চোট্ খান যে তাঁর ঘাড়ের অর্ধেক ফাঁক হয়ে যায়! তবে তাঁর ভাগ্যের জোরে ঘাড়ের শিরাগুলো ছিন্ন হয়নি।

যে সময় আমরা ইউরেটখানে ছিলাম সেই সময় শহরের অধিবাসীরা চক্রান্ত করে একজন লোককে গোপনে আমাদের কাছে পাঠায়। সে বলে যদি আমরা রাত্রে প্রেমিকগুহার ধারে আসি তাহলে শহর আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই কথায় আমরা অশ্বারোহণ করে মোঘাক নদীর সাঁকোর উপর দিয়ে অগ্রসর হই এবং সেখান থেকে কয়েকজন বাছাই করা অশ্বারোহী সৈন্য আর পদাতিক সৈন্যকে নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠিয়ে দিই। আমার সৈন্যরা শহরবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বুঝবার আগেই চার পাঁচজন সৈন্যকে তারা ধরে নিয়ে গিয়ে সকলকেই হত্যা করে।

যতদিন আমরা এই জায়গায় ছিলাম সমরকন্দের নাগরিক ও ব্যবসায়ীরা শিবির প্রাঙ্গণে জমায়েত হতো। দেখে মনে হতো জায়গাটা একটা শহরের রূপ ধারণ করেছে। শহরের বাজারে যে সব জিনিস পাওয়া যায় তার সবই এই শিবিরক্ষেত্রে কেনা যেত। কিছুদিনের মধ্যেই জনসাধারণ তাদের সমস্ত দেশ, দুর্গ, পাহাড়, সমতলভূমি সবই আমাকে সমর্পণ করেছিল। কিন্তু সমরকন্দ শহরটির অধিকার তারা ছাড়েনি।

একদল সৈন্য উরগাট্ দুর্গ সুরক্ষিত করছে খবর পেয়ে আমি ইউরেট থেকে শিবির তুলে নিয়ে সেই দুর্গ জয় করবার জন্য বেরিয়ে পড়ি। সে দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব দেখে তারা খাজা কাজির মধ্যস্থতায় দুর্গ আমার হাতে সমর্পণ করে। তারা বশ্যতা স্বীকার করবার পর আবার আমি সমরকন্দ অধিকার জন্য সেই দিকে ফিরে যাই।

এই বছরেই সুলতান হোসেন ও বদিয়া-এজ-জেমানের মধ্যে যে বিরোধ এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল সেটা প্রকাশ্য সঙ্ঘর্ষের রূপ নিল।

সুলতান হোসেন একদিক দিয়ে আর বদিয়া-এজ-জেমান আর এক দিক

দিয়ে অগ্রসর হলেন। দুই পক্ষের সৈন্য বাল্‌খের উপত্যকায় মুখোমুখি হলো। প্রথম রমজানের দিন বুধবারে আবুল হাসান এবং সুলতান হোসেনের কয়েকজন বেগ একদল সৈন্য নিয়ে লুঠের মতলবে তড়িৎ গতিতে এগিয়ে গিয়ে বদিয়া-এজ-জেমানের সৈন্যদের বিধ্বস্ত করে দেয়। এটাকে ঠিক ন্যায়-যুদ্ধ বলা না গেলেও তারা কয়েকজন তরুণ অশ্বারোহী সৈন্যকে বন্দী করে নিয়ে আসে। সুলতান হোসেন তাদের প্রত্যেককে শিরশ্ছেদ করবার আদেশ দেন। এইটি তাঁর একমাত্র নৃশংসতার দৃষ্টান্ত নয়। প্রত্যেকবার যখনই তাঁর কোনও পুত্র বিদ্রোহী হয়েছে এবং পরে পরাস্ত হয়েছে, তিনি তাঁর বিদ্রোহী পুত্রের সাহায্যকারী অনুচরদের—যারা তাঁর হাতে ধরা পড়েছে তাদের—শিরশ্ছেদের আদেশ দিয়েছেন। কেন তিনি এমন আদেশ দিয়েছেন? ন্যায় কিন্তু তাঁরই দিকে। এই মির্জারা পাপ কাজে এবং ইন্দ্রিয় পরায়ণতায় এমন ডুবে থাকতো যে তাঁদের বাবা যিনি জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ রাজা ছিলেন—তাঁর আগমন সংবাদ পেয়েও তাঁকে সম্মান প্রদর্শন না করে এবং সর্বশক্তিমান আল্লার ভয়ে ভীত না হয়ে পবিত্র রমজান মাসের প্রথম শুভ দিন উপেক্ষা করেও তারা সুরাপান ও উচ্ছৃঙ্খল আমোদে বিভোর হয়েছিল। এটা বোঝা উচিত যে এরূপ আচরণ ধ্বংসের পথেই নিয়ে যায়। এটাও ঠিক যে যারা এমন নীচ প্রকৃতির—তারা প্রথম আঘাতেই ধরাশায়ী হয়।

বদিয়া-এজ-জেমান কয়েক বৎসর আস্তেরাবাদের শাসনকর্তা ছিলেন। এই সময় তাঁর তরুণ অশ্বারোহী সেনারা খুব জমকালো পোষাক পরতো। তাঁর অস্ত্রসম্ভার বিপুল ছিল। তাঁর সৈন্যরা পরতো স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত পোষাক। তাঁর আসবাবপত্র ছিল বহুমূল্যের এবং অশ্বও ছিল অগণিত। এ সবই এখন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। পার্বত্য পথ দিয়ে পলায়ন করতে করতে এক দুর্গম চড়াই পথে তিনি উপস্থিত হন এবং অতি কষ্টে সেই পথ অতিক্রম করেন। এই সময়ে তাঁর অনেক অনুচর মারা যায়।

এই পরাজয়ের পর বদিয়া-এজ-জেমান খুব বিপদে পড়েন। তাঁর ধনবল জনবলের আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। কয়েকজন বিশ্বস্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য—যারা শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিল—তাদের নিয়ে খসরু শার কাছে উপস্থিত হলেন। খসরু শা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর জন্য যা কিছু করার দরকার তা করলেন। তাঁর জাঁকজমকপ্রিয়তা এমন ছিল যে তাঁর সঙ্গে যে সব ঘোড়া, উট, তাঁবু

এবং নানারকমের অস্ত্রশস্ত্র এসেছিল সে সব দেখে সকলেই স্বীকার করলেন যে তাঁর সুসময়ে যেমন জাঁকজমক ছিল এই দুঃসময়েও তার ব্যতিক্রম হয়নি, শুধু যেগুলো সোনারূপোয় মোড়া ছিল সেগুলো আর দেখা যাচ্ছে না।

॥ ৬ ॥

১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী।

কুলবের সমতল ভূমিতে একটি উদ্যানের পশ্চাৎভাগে আমরা শিবির স্থাপন করলাম। এই সময় সমরকন্দের সৈন্য ও নাগরিকরা দলেদলে শহর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। আমাদের লোকজন বিপদের আশঙ্কা না করে অসতর্ক থাকায় আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই শত্রুপক্ষ সুলতান আলিকে ঘোড়া থেকে নামতে বাধ্য করে তাকে বন্দী করে শহরে নিয়ে গেল।

কয়েকদিন পর আমরা সেখান থেকে সরে এসে কোহিক পাহাড়ে শিবির স্থাপন করি। সেইদিনই সৈয়দ ইউসুফ বেগ সমরকন্দ থেকে চলে এসে আমার সঙ্গে শিবিরে দেখা করে এবং আমার অধীনে কাজ গ্রহণ করে। সমরকন্দবাসীরা আমাদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরে যেতে দেখে ভেবেছিল যে আমরা বুঝি পালিয়ে যাচ্ছি। তারা সসৈন্যে নগর থেকে বেরিয়ে মির্জার সেতু পর্যন্ত অগ্রসর হয়। আমি আমার সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্যকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অবিলম্বে শত্রুপক্ষের সৈন্যব্যূহের দুই পাশে আক্রমণ করতে আদেশ দিই। আল্লা মুখ তুলে চাইলেন। শত্রু পরাজিত হ'লো। অনেক শত্রুসৈন্য ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের অশ্ব থেকে নামিয়ে এনে বন্দী করা হলো। তাদের মধ্যে মহম্মদ মিস্‌কিন্‌ ও হাফেজ দিলদাই ছিল। হাফেজ দিলদাই তরবারির আঘাতে আহত হয়। তার হাতের মাঝের আঙ্গুল কাটা যায়। মহম্মদ কাশিম নাবিরাকেও বন্দী করা হয়। আরও অনেক প্রধান কর্মচারী ও বিশিষ্ট সেনাপতিদেরও বন্দী করে আনা হয়। নিম্নশ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে দেওয়ানা নামে একজন তাঁতিকে এবং আর একজনকে—যার ডাক নাম ছিল কিল্‌মাসুক বন্দী করা হয়। তারা নানা গণ্ডগোল পাকানো, দাঙ্গা বাধানো আর পাথর ছুঁড়ে মারার কাজে প্রধান পাণ্ডা ছিল। আমার পদাতিক সৈন্যদের প্রেমিক

গুহায় বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করার প্রতিশোধ হিসাবে তাদের শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়।

সমরকন্দবাসীদের এবার নিশ্চিত পরাজয় হলো। এই সময়ের পর তারা আর নগরের বাইরে এসে আক্রমণ করেনি। ব্যাপার এমন দাঁড়িয়েছিল যে আমার সৈন্যরা নগর পরিখার ধারে পর্যন্ত এগিয়ে গেল এবং নগর প্রাচীরের কাছ থেকেই অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ক্রীতদাসদের ধরে নিয়ে এল।

সূর্যের তেজ তখন কমে এসেছে। শীত ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠ্ছে। আমি প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করলাম। স্থির হলো— সমরকন্দ নগরবাসীরা যখন অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে এবং আল্লার দয়ায় যখন শীগগির এই নগর অধিকার করতে পারবো, তখন এই উন্মুক্ত স্থানে দারুণ শীতে অসুবিধা ভোগ না করে এখানকার শিবির তুলে নিয়ে নিকটবর্তী কোনও দুর্গে শীতকালীন আস্তানা গাড়া হোক। সেখান থেকে যদি পিছিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তা'হলে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার আগেই তা করা যেতে পারবে। আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য খাজা দিদার দুর্গই উপযুক্ত মনে হলো। শিবির তুলে নিয়ে খাজা দিদার দুর্গের সম্মুখে বিস্তৃত সমতলভূমিতে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বাইসন্ঘর মির্জা সাতমাস অবরুদ্ধ হয়ে থাকার পরও মনে করেছিল যে সে তার দুরবস্থা থেকে উদ্ধার পাবে। কিন্তু আর কোনও উপায় না দেখে হতাশ হয়ে দুই তিন শ ক্ষুধার্ত ও প্রায় নগ্ন হতভাগ্য সঙ্গীদের নিয়ে খসরু শার আশ্রয় লাভের জন্য দুর্গ ছেড়ে চলে গেল।

বাইসন্ঘর মির্জার সমরকন্দ থেকে পলায়নের সংবাদ আমার কাছে পৌছতে দেরী হলো না। আমি তৎক্ষণাৎ সমরকন্দ দখলের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। পথেই সমরকন্দের প্রধান প্রধান নাগরিক ও বেগমের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। তাদের পেছনে ছিল তরুণ অশ্বারোহী সৈন্য। তারা সকলেই আমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে আসছিল। নগরদুর্গের কাছে এসে বোস্তান সরাইয়ে আমরা অশ্ব থেকে অবতরণ করি। আল্লার দয়ায় রবি-উল-আউল মাসের শেষে সমরকন্দ নগর ও সমস্ত দেশ আমার সম্পূর্ণ দখলে আসে।

জন-অধ্যুষিত পৃথিবীতে যত নগর আছে সমরকন্দের মত এমন সুন্দর নগর আর কোনটিই নয়—থাকলেও খুব বেশী নাই। দুর্গের চার দিকে যে

প্রাচীর আছে তার দৈর্ঘ্য মেপে দেখবার জন্য হুকুম দিলাম। দেখা গেল এর পরিমাপ পাঁচ মাইল।

সমরকন্দ ও তার উপকণ্ঠে অনেক প্রাসাদ আর উদ্যান আছে, সেগুলো তাইমুরের সময় তৈরী। এখানে 'গক্ সরাই' নামে চারতলা এক বিরাট প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন তিনি। এ ছাড়া আরও অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আছে এখানে। এর মধ্যে একটি লোহা ফটকের কাছে রমণীয় মসজিদ। এটি দুর্গ প্রাচীরের মধ্যেই পাথর দিয়ে তৈরী। হিন্দুস্থান থেকে পাথর খোদায়ের কারিগর এনে এই মসজিদ তিনি তৈরী করান। এই মসজিদের অলিন্দের উপর ভাগে এমন বড় হরফে কোরাণের কয়েকটি বয়েৎ খোদাই করান যে দুই মাইল দূর থেকেও সেই লেখা স্পষ্ট পড়া যায়। এই মসজিদ বাড়ীটি খুব বড় এবং অত্যন্ত জমকালো। সমরকন্দের পূব দিকে দুইটি বাগান। একটির নাম 'সাচ্চা' আর একটির নাম 'মনোলোভা'। প্রথমটি থেকে যে রাস্তা বেরিয়ে এসেছে তার দুই ধারে দেবদারু গাছ। আর একটির মধ্যে আছে এক বিরাট প্রসাদ। হিন্দুস্থানে তাইমুরের যুদ্ধের দৃশ্যের কতকগুলি চিত্র আছে এই প্রাসাদে। যাকে বলা হয় করুণা নদী—তারই তীরে একটি পাহাড়। সেই পাহাড় ঘেঁসে আর একটি বাগান—যার নাম 'ক্ষুদে পৃথিবী'। আমি যখন দেখি তখন এ বাগান ধ্বংসের মুখে, দেখবার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। সমরকন্দের দক্ষিণে আর একটি বাগান—নাম 'চীনারবাগ'। সমরকন্দের কিছু নীচে দুইটি উদ্যান—একটির নাম 'উত্তর' আর একটির নাম 'স্বর্গ'। সমরকন্দের প্রস্তর দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেই দেখা যাবে 'কলেজ' ভবন। তাইমুরের পৌত্র মহম্মদ সুলতান মির্জা এই কলেজ স্থাপন করেন। তাইমুর এবং তাঁর অন্যান্য বংশধর যাঁরা সমরকন্দে রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের সমাধি এই কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যেই আছে।

সমরকন্দ দুর্গ প্রাচীরের মধ্যেই উলুগ বেগ নির্মাণ করেন দুইটি বড় অট্টালিকা—একটি মহাবিদ্যালয়, আর একটি কনভেন্ট—মৌলভিদের আশ্রয়ের জন্য। কনভেন্টের দরজা এমন বিশাল যে কোথায়ও আর এমন দেখা যায় না। মহাবিদ্যালয় ও কনভেন্টের পাশেই কতকগুলি সুন্দর স্নানের ঘর। নানা রকমের পাথরের ছক কাটা নক্সায় স্নানের ঘরের মেঝে মোড়া। সমরকন্দের মধ্যে এমন সুন্দর স্নানের জায়গা আর নাই।

কলেজ ভবনের দক্ষিণে একটি মসজিদ। এই মসজিদকে বলা হয় 'বাঁকা মসজিদ'। কারণ এই মসজিদ বাঁকানো তক্তা দিয়ে তৈরী এবং তাতে নানা কারুকার্য ও ফুলের নক্সা আছে। মসজিদের দেওয়াল ও ছাদ একই-ভাবে সাজানো।

আর একটি সুন্দর অট্টালিকা—মান মন্দির। কোহিক পাহাড়ের প্রান্তে এটি তৈরী। অট্টালিকাটি ত্রিতল। জ্যোতির্বিদ্যা অনুশীলনের জন্য এখানে যন্ত্র আছে। এই মান মন্দিরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উলুগ বেগ যে এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেবল্ তৈরী করেছিলেন তা এখন পর্যন্ত অনুসৃত হচ্ছে। এই টেবল প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ইল্খানি এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেবল্ সাধারণতঃ অনুসরণ করা হতো—যে টেবল হোলাকু তাঁর নিজের মান মন্দিরে তৈরী করেছিলেন।

কোহিক পাহাড়ের পাদদেশে পশ্চিম দিকে একটি বাগান—নাম 'সমতল'। বাগানের মাঝখানে একটি সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা—নাম 'চল্লিশ স্তম্ভ'। স্তম্ভগুলি সবই পাথরের। এই অট্টালিকার প্রতি অংশেই বিচিত্র গড়নের প্রস্তর স্তম্ভ—কতক বাঁকা, কতক ছুঁচ্লো, কতক নানান ঢঙের। ওপর তলার চারদিকে খোলা বারান্দা। পাথরে তৈরী স্তম্ভের উপর এই বারান্দা। মাঝখানে একটি বিরাট হল—সেটাও পাথরের, প্রাসাদের মেঝেগুলিও পাথর দিয়ে মোড়া।

কোহিক পাহাড়ের দিকে আর একটা ছোট বাগান। এই বাগানের মধ্যেও একটা উন্মুক্ত হলঘর। এই ঘরে ত্রিশ ফুট লম্বা, ষোল ফুট চওড়া, দুই ফুট উঁচু একটি সিংহাসন আছে। সিংহাসনটি একটি মাত্র পাথরের। এই বৃহৎ শিলাখণ্ড অনেক দূর দেশ থেকে আনা হয়েছিল। পাথরের সিংহাসনটি এক জায়গায় চিড়-খাওয়া। শোনা যায় যখন এটাকে আনা হয়—তখনই এই চিড়টা ছিল। এই বাগানের মধ্যে আর একটি প্রাসাদ—যার দেওয়াল চীনের পোর্শিলেন দিয়ে তৈরী। সেইজন্য এর নাম—'চীন ভবন।' শোনা যায় চীনদেশে লোক পাঠিয়ে পোর্শিলেন আনা হয়। সমরকন্দ দুর্গ প্রাকারের মধ্যে আর একটা পুরণো মসজিদ আছে—তার নাম 'প্রতিধ্বনি মসজিদ। এই নামকরণের হেতু এই যে মসজিদে পদক্ষেপ করলেই সেই পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এটা বিস্ময়কর—কিন্তু এর কারণ কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি।

এই বাগানে সুপরিকল্পিতভাবে সাজানো এমন পৃথক পৃথক ভূমিখণ্ড

আছে সেগুলি যেন একটার পর আর একটা স্থাপন করা হয়েছে। এক এক খণ্ডে এল্‌ম্‌, সাইপ্রেস এবং সাদা পপলার গাছ পৃথকভাবে রোপণ করা হয়েছে। বাগানটি ভারী সুন্দর। কিন্তু এর প্রধান ত্রুটি এই যে এর কাছে কোনও স্রোতস্বতীর জলধারা নাই— যাতে সহজে এই উদ্যানভূমি সরস থাকতে পারে।

সমরকন্দ অদ্ভুত সুন্দর নগর। এর একটি বিশেষত্ব হলো—প্রত্যেক জিনিষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাজার। তার ফলে এই হয়েছে—ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের সওদাগররা এক জায়গায় ভিড় করে না। এখানকার আইন কানুন, বিধি ব্যবস্থা উত্তম। সরাইখানাগুলিও চমৎকার, রাঁধুনিরাও রন্ধন বিদ্যায় নিপুণ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাগজ সমরকন্দেই তৈরী হয়। 'জুয়াজ' নামে বিখ্যাত কাগজ কানেগিলে তৈরী হয়। করুণা নদীর তীরে কানেগিল অবস্থিত। আর একটি প্রসিদ্ধ জিনিষ তৈরী হয় এখানে—লাল রংয়ের ভেলভেট্‌। পৃথিবীর নানা দেশে এই ভেলভেট্‌ রপ্তানি হয়।

সমরকন্দ অনেকগুলি প্রদেশে বিভক্ত। বোখারা একটি বড় প্রদেশ। এখানকার ফল প্রচুর এবং সুস্বাদু। বিশেষ করে ফুটির প্রাচুর্য এবং স্বাদের তুলনা নাই। ফারগানার অন্তর্গত আখ্‌সিতে অবশ্য একজাতীয় খুব মিষ্টি ফুটি পাওয়া যায়। কিন্তু বোখারায় নানা জাতের ফুটি ফলে—যার সবগুলি স্বাদে ও গন্ধে মনোরম। বোখারার আলুবোখারাও প্রসিদ্ধ। আর কোথাও এমন সুন্দর ফল পাওয়া যায় না। এখানকার লোক এই ফলের খোসা ছাড়িয়ে শুকিয়ে নেয় এবং বিক্রয়ের জন্য দেশে বিদেশে চালান দেয়। অন্য দেশে দুষ্প্রাপ্য এই ফলগুলির কাটতিও খুব বেশী। জোলাপের ওষুধ হিসাবেও এই ফল চমৎকার। এখানকার হাঁস মুরগী খুব ভাল জাতের। বোখারায় যেমন উত্তেজক ও বলবর্দ্ধক সুরা তৈরী হয়, আর কোনও জায়গায় এমনটি হয় না। যে সময় আমি সুরাপান উৎসবে মত্ত থাকতাম—তখন আমি বোখারার সুরাই পান করতাম।

এখানকার আবহাওয়া চমৎকার। প্রাকৃতিক দৃশ্য অনবদ্য। জলের উৎস প্রচুর, খাদ্যসামগ্রী সস্তা। যাঁরা মিশর বা সিরিয়া বেড়িয়ে এসেছেন তাঁরা স্বীকার করেন এখানকার সঙ্গে ওসব দেশের তুলনাই হয় না।

তাইমুর বেগ সমরকন্দের রাজ্যভার তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরকে দিয়ে যান। জাহাঙ্গীর দেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র উলুগ বেগকে—যাঁর হাত থেকে শাসনভার কেড়ে নেন তাঁর পুত্র আব্দুল লতিফ। অনিত্য সংসারের ক্ষণস্থায়ী আনন্দের

নেশায় মত্ত হয়ে আব্দুল লতিফ তাঁর জ্ঞানী ও বিচক্ষণ বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করেন। উলুগ বেগের মৃত্যুর কথা কবিতার কয়েকটি ছত্রে ধরা আছে।

"জ্ঞান-বিজ্ঞান বারিধি উলুগ বেগ—
মর্তভূমির তুমিই ছিলে প্রাণ।
আরাম তোমায় করলো শহিদ
মরণের মধু করিয়ে তোমায় পান॥"

সমরকন্দের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করে আমি চিরাচরিত প্রথা মত আমীর ওমরাওদের অনুগ্রহ করি। যে সব অনুগত বেগ্ আমার অনুসরণ করেছিল, তাদের পদ-মর্যাদা অনুযায়ী পুরস্কৃত করি। সুলতান তাম্বল্ পদস্থ ব্যক্তিদের চেয়ে বেশী অনুগ্রহ ও বহুমূল্য পুরস্কার আমার কাছ থেকে লাভ করে। দীর্ঘ সাত মাস কঠোর এবং ক্লান্তিকর অবরোধের পর সমরকন্দ অধিকার করি। দখলের পর আমার সৈন্যদের হাতে অনেক লুঠের মাল আসে। সমরকন্দ ছাড়া এই দেশের অন্যান্য অংশের লোকেরা আমার কিংবা সুলতান আলির সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সুতরাং তাদের লুঠের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়। যে জনপদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং পর্যুদস্ত হয়েছে সেখানকার অধিবাসীদের ওপর চাপ দিয়ে কি করে কর আদায় করা যেতে পারে? সৈন্যরা এই নগর একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। সমরকন্দ দখল করবার পর তার এমন দুরবস্থা চোখে পড়লো যে সেখানকার লোকদের শস্যের বীজ এবং অন্যান্য জিনিষ সাহায্য না করলে চাষের কাজ আরম্ভ হয় না। আর এ সাহায্য শস্য না কাটা পর্যন্ত চালাতে হবে। এই রকম যে দেশের দুরবস্থা, সেখানে কি করে কর ধার্য করে তা তাদের কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব হতে পারে? এই অবস্থায় আমার সৈন্যরাও খুব কষ্টের মধ্যে পড়লো। তখন আমারও আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে অর্থ দিয়ে তাদের শান্ত করতে পারি। সুতরাং তাদের নিজেদের বাড়ী ঘরের কথা মনে পড়লো এবং এক দুই জন করে ক্রমশঃ সরে পড়তে লাগলো। প্রথম দলত্যাগী ব্যক্তি—খান্ কুলি। সব মোগলই একে একে সরে পড়লো। সর্বশেষে আমাকে ত্যাগ করে পালালো—সুলতান তাম্বল্।

এই দলত্যাগের প্রবৃত্তি রোধ করার জন্য আমি খাজা কাজিকে উজুন হাসেনের কাছে পাঠাই। খাজা কাজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভালবাসা ছিল উজুন হাসানের। খাজা কাজিকে অনুরোধ করেছিলাম তিনি যেন উজুন হাসানকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দলত্যাগীদের কয়েকজনকে কঠিন

শাস্তি দেওয়ার এবং আর সকলকে আমার কাছে ফিরিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তখন কি জানতাম যে এই বিদ্রোহের মূল নেতা এবং এই দল ত্যাগের প্ররোচনা-দাতা সেই নেমক-হারাম উজুন হাসান নিজে। সুলতান তাম্‌বল্‌ চলে যাওয়ার পর সমস্ত দলত্যাগীরাই প্রকাশ্যে এবং সরাসরি শত্রুতা আরম্ভ করে দিল।

কয়েক বৎসর আমাকে সমরকন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান চালাতে হয়। এই সময় যদিও সুলতান মামুদ কোনও অর্থ বা জনবল দিয়ে আমাকে কোনও সাহায্যই করেন নি, কিন্তু যেই সমরকন্দ বিজয়ে আমি কৃতকার্য হলাম অম্‌নি তিনি আন্দেজান অধিকার করার ইচ্ছাটা প্রকাশ করলেন। এদিকে যখন আমার অধিকাংশ সেনা এবং সমস্ত মোগল আমাকে ত্যাগ করে আখ্‌সি ও আন্দেজানে ফিরে গেল, তখন উজুন হাসান ও তাম্‌বল্‌ এই ইচ্ছা প্রকাশ করলো যে এই দুইটি জায়গায় শাসনভার জাহাঙ্গীর মির্জার হাতে দেওয়া হোক। কিন্তু তাঁর হাতে ঐ রাজ্যের শাসনভার তুলে দেওয়া আমি সমীচীন মনে করিনি। এর কতকগুলো কারনও আছে। তার মধ্যে একটি এই যে—যদিও খাঁ সাহেবের কাছে আমি কোনও অঙ্গীকারাবদ্ধ নই, তবুও তিনি আন্দেজান দাবী করেছেন। এই দাবীর পরও যদি জাহাঙ্গীর মির্জার হাতে ঐ দেশ তুলে দিই তাহলে খাঁয়ের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আমাকে। আর একটা কারণ হচ্ছে—যে সময় অনুচররা আমাকে পরিত্যাগ করে নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়েছে—সে সময় তাদের পক্ষ থেকে কোনও অনুরোধ—ঠিক অনুরোধ নয়—আদেশের মত শোনায়। এই অনুরোধ যদি কিছুদিন আগে আসতো আমি আনন্দের সঙ্গে মেনে নিতাম। কিন্তু এখন তাদের আদেশের সুরকে কে সহ্য করবে? সমস্ত মোগল যারা আমার সঙ্গে এসেছিল এবং আন্দেজানের সমস্ত সৈনিক এমন কি কয়েকজন বেগও যারা আমার ঘনিষ্ঠ সহচর ছিল—তারা আন্দেজানে ফিরে গিয়েছে। হাজারখানের লোক—তার মধ্যে ছোট বড় কয়েকজন বেগও আছে—তারাই শুধু সমরকন্দে আমার কাছে রয়ে গেছে।

যখন তারা দেখলো যে তাদের কথা আমি শুনছি না তখন তারা হতাশ হয়ে আমার দলত্যাগী সমস্ত লোকদের নিয়ে জোট বাঁধলো। এই দলত্যাগীরা অপরাধের শাস্তি পাওয়ার ভয়ে যখন সন্ত্রস্ত হয়ে ছিল, তখন তাদের আমার বিরুদ্ধে জোট বেঁধে বিদ্রোহ করাটা যেন তারা আল্লার অনুগ্রহ বলেই ভেবেছিল। আখ্‌সি থেকে তারা আন্দেজানের বিরুদ্ধে

অভিযান চালনা করলো এবং প্রকাশ্যভাবে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুললো।

তুলুন খাজা আমার সৈন্যদলের মধ্যে সব চেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সাহসী যোদ্ধা ছিল। সে আমার পিতার খুব প্রিয়পাত্র ছিল। তাকে আমিও খুব সম্মান করতাম এবং তাকে বেগের পদে উন্নীত করেছিলাম। সে খুব বিশ্বাসী এবং অনুগ্রহ পাওয়ার উপযুক্ত লোক ছিল। তুলুন খাজা মোগলদেরও বিশ্বাসভাজন ছিল। সেইজন্য যখন মোগলরা দলত্যাগ করে চলে যায়, তখন তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমার ওপর তাদের ঈর্ষা ও ঘৃণা মন থেকে মুছে ফেলে যাতে তারা আমার দলে আবার ফিরে আসে—এই অনুরোধ করতে বিশ্বাসী তুলুন খাজাকে তাদের কাছে পাঠাই। তাকে এই কথা বলতে বলে দিই যে—আমার ক্রোধের ও প্রতিহিংসার মিথ্যা ভয় করে যেন তাদের জীবনে অশান্তি ডেকে না আনে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের দল তাদের ওপর এমনই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে কোনও অঙ্গীকার বা ভয় প্রদর্শনেও তাদের মন টললো না। উজুন হাসান ও সুলতান তামবল্ একদল পদাতিক সৈন্য পাঠিয়ে সহসা তুলুন খাজাকে বন্দী করলো এবং শেষে হত্যা করলো।

উজুন হাসান আর তামবল্ জাহাঙ্গীর মির্জাকে সঙ্গে নিয়ে আন্দেজান অবরোধ করার জন্য অগ্রসর হলো। যখন আমি যুদ্ধযাত্রায় বেরোই—তখন আলি দোস্ত তাঘাইয়ের ওপর আন্দেজানের এবং উজুন হাসানের ওপর আখ্‌সির শাসনভার দিয়ে আসি। খাজা কাজি এই সময় আন্দেজানে ফিরেছেন। সমরকন্দ থেকে আমার যে সব সৈন্য চলে আসে তাদের মধ্যে অনেক নিপুণ যোদ্ধা ছিল। আমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসার জন্য খাজা কাজি আন্দেজানে ফিরে এসেই দুর্গ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হলেন। এই সময় যে সমস্ত দলত্যাগী সৈন্য শহরে ছিল এবং যে সব সৈন্য তখন আমার কাছে ছিল তাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে তাঁর নিজের আঠারো হাজার ভেড়া বিতরণ করেন। আমি আমার মা ও খাজা কাজির কাছ থেকে চিঠিতে অবরোধের সংবাদ পাই। তাঁরা লিখেছেন যে দুর্গ এমন ভীষণভাবে অবরুদ্ধ হয়েছে যে যদি আমি তাড়াতাড়ি দুর্গ উদ্ধারের জন্য অগ্রসর না হই, তাহলে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। তাঁরা আরও লিখেছেন—আমি আন্দেজানের সৈন্য নিয়েই সমরকন্দ জয় করেছি। সুতরাং আন্দেজানের প্রভুত্ব যদি আমি বজায় রাখতে পারি তাহলে আল্লার অনুগ্রহে আন্দেজানের সৈন্য সামন্ত নিয়েই পুনরায় সরমকন্দ অধিকার করা আমার পক্ষে

কঠিন হবে না। এই দুই খানি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পর পর আমার হাতে এসে পড়ে। এই সময় আমি গুরুতর পীড়া থেকে সবে মাত্র আরোগ্যলাভ করেছি। আমার তখন এমন অবস্থা নাই—যাতে আরোগ্যোত্তর সেবা শুশ্রূষা যথারীতি পাই। এই দুঃসময়ে এমন একটা নিদারুণ সংবাদ পেয়ে ও ভাবনায় ব্যাধি এমনভাবে আমাকে পুনঃ আক্রমণ করে যে চারদিন আমার বাকরোধ হয়। এই সময় জলে ভেজানো তুলো দিয়ে আমার জিভ মাঝে মাঝে মুছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও শুশ্রূষাই হয় নি। আমার কাছে যারা ছিল—উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী—অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য—তারা সকলেই আমার বাঁচবার আশা আর নাই দেখে এক এক করে সরে পড়েছিল।

এই নিদারুণ সময়ে উজুন হাসানের একজন ভৃত্য দূত হিসাবে কতকগুলি রাজদ্রোহসূচক ঘৃণ্য প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে আসে। আমার লোকরা যেখানে আমি শয্যাশায়ী ছিলাম, সেখানে তাকে ভুল করে নিয়ে আসে এবং আমার অবস্থা দেখবার পর তাকে ফিরে যেতে দেয়। চার পাঁচ দিনের মধ্যে আমি একটু সুস্থ হই, কিন্তু তখনও আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। আর কয়েকদিন পর আবার মায়ের চিঠি পাই। তিনি তাঁদের সাহায্য করার জন্য এমন অনুনয় করে আমাকে ফিরে যেতে লেখেন যে আমার আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করতে ইচ্ছা হলো না। রজব মাসে সমরকন্দ ত্যাগ করে আমি আন্দেজানের দিকে অগ্রসর হই। এই সময়ে মাত্র একশ দিন আমি সমরকন্দে রাজত্ব করি। পরের শনিবারে আমি খোজেন্দে পৌঁছাই। সেই দিনই সংবাদ পাই যে সাতদিন আগে যে দিন আমি সমরকন্দ ত্যাগ করি সেই দিনই আলি দোস্ত তাঘাই শত্রুর হাতে আন্দেজান দুর্গ সমর্পণ করে।

প্রকৃত ব্যাপার দাঁড়িয়েছিল এই। উজুন হাসানের যে ভৃত্য আমার অসুখের সময় এসেছিল এবং আমার অবস্থা দেখে ফিরে গিয়েছিল—তা দুর্গ অবরোধকারী আমার শত্রুপক্ষীয় লোকেরা—দোস্ত আলি তাঘাইয়ের শ্রুতিগোচর করে, এমনভাবে বলতে বাধ্য করে যে—রাজা ভয়ানক অসুস্থ, তার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তার সেবা শুশ্রূষা করারও লোকের অভাব—শুধু কি একটা তরল পদার্থ তুলোয় ভিজিয়ে জিভ মুছিয়ে দেওয়া ভিন্ন আর কোনও চিকিৎসা বা সেবা শুশ্রূষা হচ্ছে না। দোস্ত আলি তাঘাই তখন 'খাকন' গেটে দাঁড়িয়েছিল। এই সংবাদ শুনে সে বিভ্রান্ত হয়ে শত্রুপক্ষের

সঙ্গে অবরোধ তুলে নিয়ে কি ভাবে দুর্গ সমর্পণ করা যায় তারই শর্তগুলি ঠিক করার জন্য আলাপ আলোচনা সুরু করে। দুর্গের ভিতর খাদ্যেরও অভাব ছিল না। যোদ্ধারও অভাব ছিল না। সুতরাং এই হীন ব্যক্তির আচরণ বিশ্বাসঘাতকতা ও ভীরুতার পরাকাষ্ঠা হয়েছিল। সে তার নীচতা ঢাকবার জন্যই আমার শারীরিক অবস্থার অছিলা কাজে লাগিয়েছিল।

আন্দেজানের পতনের পরই শত্রুপক্ষ শুনতে পায় যে আমি খোজেন্দে পৌঁছিয়েছি। এই সংবাদ পেয়েই তারা খাজা কাজিকে বন্দী করে এবং দুর্গ ফটকের সামনে অতি নির্লজ্জভাবে তাকে ফাঁসি দেয়। খাজা কাজি দেবতুল্য লোক ছিলেন—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এ কথার আর এর চেয়ে কি ভাল প্রমাণ হতে পারে যে যারা তাঁকে হত্যা করেছিল তাদের স্মৃতি বা চিহ্ন কিছুদিনের মধ্যেই লোপ পেয়ে গিয়েছে। অল্প কিছু দিন পরেই তারা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। খাজা কাজি অদ্ভুত সাহসী ব্যক্তি ছিলেন—এও তাঁর সাধুতা এবং আল্লার প্রতি বিশ্বাসের একটা প্রমাণ। মানুষ যতই সাহসী হোক না কেন, কোনও না কোনও বিষয়ে তার মনে আতঙ্ক বা দুর্বলতা থাকে। কিন্তু খাজা কাজির এককণাও ভয় বা দুর্বলতা ছিল না।

খাজার মৃত্যুর পর শত্রুপক্ষের লোকেরা তাঁর আত্মীয় স্বজন, ভৃত্য, স্বজাতি এবং শিষ্যদের যারা তাঁর অনুগত ছিল তাদের বন্দী করে এবং তাদের ধনসম্পত্তি লুঠ করে। তারা আমার মা, ঠাকুমা, এবং যে সব লোক আমার সঙ্গে ছিল তাদের মধ্যে কতকগুলি পরিবারবর্গকে আমার কাছে খোজেন্দে পাঠিয়ে দেয়। আন্দেজানের জন্য আমি সমরকন্দ হারালাম। একটা হারালাম, অন্যটিকেও রক্ষা করতে পারলাম না।

আমি বিমর্ষতা এবং বিরক্তির কবলে পড়েছি। কারণ, যেদিন আমি রাজা হয়ে বসি সেদিন থেকে কখনও আমার নিজের দেশ এবং আমার অনুগত স্বদেশবাসীদের সঙ্গ থেকে এই ভাবে বঞ্চিত হইনি। জ্ঞানের উন্মেষ থেকে এতদিন পর্যন্ত এমন বিষাদ আর কষ্টের অভিজ্ঞতা এর পূর্বে আমার আর হয়নি।

যে সব বেগ, সৈনাধ্যক্ষ এবং সেনারা আমার সঙ্গে ছিল এবং যাদের স্ত্রী ও পরিবারবর্গ তখনও আন্দেজানেই ছিল তারা যখন দেখতে পেল যে আন্দেজান উদ্ধারের আর কোনও আশাই নাই—তখন ছোট বড় প্রায় সাত আট শ' জন আমাকে ছেড়ে চলে গেল। শ' দুইয়ের বেশী কিন্তু

তিন শ'র কম উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীর লোক আমার সঙ্গে দুঃখ কষ্ট ও নির্বাসন বরণ করে নিল। কর্মচারীদের মধ্যে আমার কাছে রয়ে গেল কোষাধ্যক্ষ, রাজপতাকাবাহী এবং অশ্বশালার রক্ষক।

হতাশার চরম সীমায় তখন পৌঁছেছি। অনেকক্ষণ আমি অশ্রুবর্ষণ করলাম। তারপর আন্দেজানের পথ থেকে খোজেন্দে ফিরে এলাম। সেখানে আমার মা, ঠাকুমা এবং যে সব অনুচর তখনও আমার সঙ্গ ত্যাগ করেনি—তাদের স্ত্রী ও পরিবারবর্গ খোজেন্দে পৌঁছে গিয়েছে।

কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা যখন রাজ্য জয় করে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, তখন আমি কি দুই একটা পরাজয় বরণ করে হতাশ হয়ে অলসভাবে বসে থাকতে পারি? এও কি সম্ভব?

এই সময় হিসারে বিদ্রোহ আরম্ভ হলো। খসরু শা যখন বাইসন্ঘর মির্জা এবং মিরণ শা মির্জাকে হাতের মধ্যে পেল তখন তার কয়েকজন দুষ্টবুদ্ধি উপদেষ্টা পরামর্শ দেয় যে এই দুই রাজপুত্রকে হত্যা করে তার নিজের নামেই মসজিদে এমান পড়া হোক। খসরু শা এতে অবশ্য রাজি হলো না। কিন্তু এই নশ্বর এবং ধর্মবিশ্বাসহীন জগতে যেখানে কোনও কালেও কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না এবং কখনও করবেও না, সেখানে এই অকৃতজ্ঞ লোকটি যে রাজপুত্র সুলতান মামুদকে বন্দী করে তার চোখ দুটি শলাকা বিদ্ধ করে অন্ধ করে দেবে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? অথচ এই খসরু শাই এই রাজপুত্রকে ছোটবেলা থেকেই লালন পালন করেছে এবং সেই তার শিক্ষক ছিল। মামুদের কয়েকজন আত্মীয়, স্বজাতি এবং নানা সঙ্গী তাকে সমরকন্দে সুলতান আলির কাছে পৌঁছে দেবার জন্য 'কেশে' এসে পৌঁছায়। এখানে এসে তারা জানতে পারে যে তাদের আক্রমণ করার একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সেখানে অপেক্ষা না করে তারা কাবায় পালায় এবং আমু নদী পেরিয়ে এসে সুলতান হোসেনের আশ্রয় গ্রহণ করে। শেষ বিচারের দিন না আসা পর্যন্ত প্রতিটি দিন এই কলঙ্কিত বিশ্বাস-হন্তা ষড়যন্ত্রকারীর মাথার উপর লক্ষকোটি অভিশাপ বর্ষিত হোক। প্রত্যেক লোক যে খসরু শার এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনতে পাবে তাকে অভিসম্পাত দিক। কারণ, যে লোক তার অকৃতজ্ঞতার কথা জেনেও কোনও অভিশাপ না দেবে—সেও অভিসম্পাত লাভের যোগ্য।

॥ ৭ ॥

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

সমরকন্দ ও আন্দেজান পুনরুদ্ধারের জন্য বারবার অভিযান চালিয়েও ব্যর্থ হয়ে আবার খোজেন্দে ফিরে আসি। খোজেন্দ অতি ক্ষুদ্র স্থান; এখানে দুই শ সৈন্যের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা কঠিন। যে লোক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের অভিলাষী, সে কি এমন একটা বিশেষত্বহীন জায়গায় সন্তুষ্ট চিত্তে চিরকাল বাস করতে পারে?

এইখানে থাকার সময় খাজা মকারাম আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনিও আমার মত রাজ্য থেকে নির্বাসিত একজন ভবঘুরে। আমার বর্তমান অবস্থা এবং পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেলাম। আমার পক্ষে কি এখানে চিরকাল থাকা ঠিক হবে, না অন্য জায়গায় চলে যাব? কি আমার করা উচিত এবং কোনটাই বা করা উচিত নয়? আমার অবস্থা দেখে তিনি চোখের জল ফেলতে লাগলেন। আমার জন্য খোদার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে তিনি প্রস্থান করলেন। আমিও অভিভূত হয়ে পড়লাম।

সেইদিনই বিকেলের নমাজের পর উপত্যকার প্রান্তে একজন অশ্বারোহীকে দেখা গেল। পরিচয় নিয়ে জানা গেল—সে আলি দোস্ত তাঘাইয়ের ভৃত্য। তার প্রভুর কাছ থেকে সে এক বার্তা নিয়ে এসেছে। তার মর্ম হলো এই যে—সে নিঃসন্দেহে ভীষণ অপরাধ করেছে। কিন্তু তার এই বিশ্বাস আছে যে আমি তাকে ক্ষমা করবো। যদি আমি সসৈন্যে তার কাছে চলে আসি তাহলে মারঘিনান প্রদেশ আমার হাতে সমর্পণ করে চিরকাল সে আমার অনুগত হয়ে এমন কাজ করে যাবে—যাতে তার অতীত ভুলভ্রান্তির কথা আমার মন থেকে মুছে যাবে এবং সেও তার দুষ্কার্যের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবে। এই সংবাদ পাবার পরই আর দেরী না করে বেরিয়ে পড়লাম মারঘিনানের দিকে। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। মারঘিনানের দূরত্ব প্রায় একশ মাইল। সেই রাত এবং পরদিন দুপুরের নমাজের সময় পর্যন্ত কোনও খানেই বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করিনি—একটানা চলে এসেছি। দুপুরের নমাজের সময় একটি গ্রামে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিই। সেখানে ঘোড়াগুলোর কিছুটা শ্রান্তি দূর হলে তাদের

খাদ্য ও পানীয় দেওয়ার পর আবার রওনা হই গভীর রাত্রে। ঘোড়ার পিঠে পথ চলতে থাকি পরদিন ভোর পর্যন্ত। তারপর ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। পরদিন ভোর হতে না হতেই মারঘিনানের চার মাইলের মধ্যে এসে পৌঁছাই। এইখানে আসার পর উইস বেগ এবং আরও কয়েকজন নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে আমার কাছে নিবেদন করলেন যে আলি দোস্ত তাঘাইয়ের মত লোক যে নানা গুরুতর অপরাধে অপরাধী, তার একটি মাত্র কথায় বিশ্বাস করে, দূতের মারফত কোনও রকম কথাবার্তা না চালিয়ে, কোনও চুক্তি সম্পাদন না করে তার হাতের মুঠোর মধ্যে চলে যাওয়া কি আমাদের পক্ষে উচিত হবে? সত্যিই তাঁদের পক্ষে এই ধারণা করা মোটেই অনুচিত নয়। সুতরাং কিছুক্ষণ সেইখানে অপেক্ষা করে আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করলাম। সর্বসম্মতিক্রমে এই কথা ঠিক হলো যে আমাদের আশঙ্কা অমূলক না হলেও আমরা এই বিষয়ে চিন্তা করতে অনেক দেরী করে ফেলেছি। তিনদিন তিন রাত্রি কোনও রকম বিশ্রাম না করে ছুটে এসেছি একশ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে। আমার লোকদের আর ঘোড়াগুলোর দেহে এমন শক্তি নাই যাতে এত দূরের পথে আবার ফিরে যাই। যদিও বা ফেরার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু এমন জায়গা চোখে পড়েনা যেখানে নিরাপদে থাকা যেতে পারে। সুতরাং যখন এতদূর চলে আসা হয়েছে তখন আমাদের পক্ষে অগ্রসর হওয়াই ভাল। আল্লার যা ইচ্ছা তাই হোক। সেই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে আমরা অগ্রসর হলাম।

প্রভাতের নমাজের সময় আমরা মারঘিনানের দুর্গ ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হই। ফটক বন্ধ ছিল। আলি দোস্ত তাঘাই ফটকের উপর দাঁড়িয়ে কতকগুলি শর্ত ঠিক করার অভিপ্রায় জানালো। তার শর্তগুলি মেনে নেওয়ার এবং তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশ্বাস দেওয়ার পর সে দুর্গ-ফটক খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলো এবং আমাকে যথারীতি সম্বর্ধনা করে দুর্গের মধ্যে একটি প্রাসাদে সসম্মানে নিয়ে গেল। আমার সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ অনুচরদের সংখ্যা তখন ছিল দুই শ চল্লিশ জন।

দেখলাম—উজুন হাসান এই দেশের জনসাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে এবং অত্যাচারে তাদের জর্জরিত করেছে। সমস্ত দেশবাসী আমাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। মারঘিনানে আসার দুই তিন দিন পরেই আমি কাশিম বেগকে একশ সৈন্য

সঙ্গে দিয়ে আন্দেজানের দক্ষিণ দিকে পাঠালাম। তাকে নির্দেশ দিলাম যে ঐ স্থানের পার্বত্য এবং সমতলভূমির জনসাধারণকে বুঝিয়ে স্থঝিয়ে বলতে—যেন তারা বিনা দ্বিধায় আমার বশ্যতা স্বীকার করে। অনুরোধ যদি তারা উপেক্ষা করে, তাহলে বলপ্রয়োগ করতেও যেন দ্বিধা না করা হয়। আমি আরও এক শ সৈন্য আখ্‌সির দিকে পাঠালাম এই নির্দেশ দিয়ে—যেন তারা খোজেন্দ নদী অতিক্রম করে আখ্‌সির দিকে যায় এবং দুর্গগুলি অধিকারের জন্য যে কোনও উপায় অবলম্বন করে। আর পাহাড়ীদের মনোরঞ্জন করে যেন আমাদের দলে আনবার ব্যবস্থা করে।

কয়েকদিন পর উজুন হাসান ও তামবল্ আমার বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য অগ্রসর হয়। কাশিম বেগ এবং অন্যান্য কর্মচারীকে দুই দিকের কার্যভার দিয়ে পাঠিয়েছি। অল্প কয়েকজনই আমার কাছে ছিল। তাদেরই কোনও রকমে অস্ত্রসজ্জিত করে আমরা এগিয়ে গেলাম—যাতে তারা নগরের উপকণ্ঠে না পৌঁছাতে পারে। শত্রুরা কিছুই করতে পারলো না, দুই দুইবার তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারা দুর্গের ধারে কাছেও আসতে সক্ষম হলো না।

কাশিম বেগ আন্দেজানের দক্ষিণে পার্বত্য প্রদেশের দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানকার জনসাধারণকে সম্পূর্ণ বশে আনে। শত্রুপক্ষের সৈন্যরাও একে একে দলত্যাগ করে আমার সঙ্গে যোগ দেয়।

হাসান দেগেচি আখ্‌সির একজন মাতব্বর লোক। সে তার নিজের দলবল এবং স্থানীয় গুণ্ডাদের সংগ্রহ করে শুধু মাত্র লাঠির সাহায্যে দুর্গরক্ষী সৈন্যদের আক্রমণ করে তাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করে। তারা ভীত হয়ে দুর্গমধ্যে আশ্রয় নেয়। সেই সময় হাসান দেগেচি আর তার সঙ্গীরা আমার কর্মচারীদের আমন্ত্রণ করে সুরক্ষিত আখ্‌সি শহর প্রবেশের সুযোগ করে দেয়।

এই সংবাদ শুনে উজুন হাসান ভীত হয়ে তার বাছাই করা লোকজন এবং তার বিশ্বাসী অনুচরদের আখ্‌সি দুর্গ রক্ষার জন্য পাঠায়। খুব ভোরে নদীর তীরে এসে পৌঁছায় তারা। যখন এই সংবাদ আমার সৈন্যদের আর মোগলদের জানানো হয়, তখন একদল সৈন্যকে ঘোড়ার সমস্ত সাজ সরঞ্জাম খুলে নিয়ে নদীতে নামবার আদেশ দেওয়া হয়। অপর পক্ষ যারা দুর্গ রক্ষা করতে এসেছিল তারা কি করবে ঠিক করতে না পেরে নৌকাগুলো টেনে খানিকটা উজানে না নিয়ে যেখানটায় তারা

এসে পৌঁছেছিল সেখানেই নৌকায় চড়ে বসে। ভাটার টানে তাদের নৌকা দুর্গ ছাড়িয়ে অনেকটা দূর চলে যায়। তারা ঠিক দুর্গের কাছে পৌছাতে পারেনা। আমার সৈন্য আর মোগলরা ঘোড়া থেকে সাজ সরঞ্জাম খুলে প্রস্তুত হয়েই ছিল—তারা নানা দিক থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। শত্রুপক্ষের লোক যারা নৌকায় ছিল তারা ভীত হয়ে এ আক্রমণ সহ্য করতে পারলো না। কালুর্খাজ বক্সি মোগল বেগের এক ছেলেকে তার কাছে যাওয়ার অনুরোধ জানায়। সেই ছেলেটি বক্সি কি বলতে চায় শুনবার জন্য নির্ভয়ে তার কাছে যায়। বক্সি ছেলেটির হাত ধরে তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করে। এই রকম বিশ্বাসঘাতকতা কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে? নিমেষের মধ্যে সব ব্যাপার চুকে গেল। এই নিষ্ঠুর কাজের প্রতিশোধ স্বরূপ নৌকায় যারা ছিল তাদের অনেককেই হত্যা করা হ'লো। আমাদের লোকেরা যারা জলে নেমেছিল তারা শত্রুপক্ষের যারা নৌকায় ছিল তাদের ডাঙ্গায় টেনে নামিয়ে—তাদের প্রায় সবাইকেই হত্যা করলো। উজুন হাসানের বিশ্বস্ত ভৃত্য যারা নৌকায় ছিল তাদের মধ্যে মাত্র একজন রক্ষা পেল—কারণ সে কবুল করেছিল যে সে একজন ক্রীতদাস মাত্র। আর একজনও বেঁচে গিয়েছিল—তার নাম সৈয়দ আলি। সে এখনও আমার কাছেই উঁচুপদে বহাল আছে। সত্তর-আশি জনের মধ্যে পাঁচ ছয় জনের বেশী এ যাত্রায় রক্ষা পায়নি।

আন্দেজান আমারই রাজ্য—এই ঘোষণার পর বিদ্রোহীরা শান্ত হতে বাধ্য হলো। মহান্ আল্লার দয়ায় ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জেল্কদ্ মাসে আমার পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করি—যা থেকে প্রায় দুই বৎসর আমি বঞ্চিত ছিলাম।

উজুন হাসান আন্দেজানে প্রবেশ করতে ব্যর্থকাম হয়ে আখ্সির দিকে ফিরে গেল। সংবাদ পেলাম সে আখ্সি দুর্গে প্রবেশ করেছে। সেই ছিল বিদ্রোহের নেতা। সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করে চার-পাঁচ দিন পরই আখ্সির দিকে অভিযান চালাই। আমরা সেখানে পৌছানো মাত্র আর কোনও উপায়ান্তর না দেখে সে দুর্গ সমর্পণের প্রস্তাব করে এবং তার নিরাপত্তার প্রার্থনা জানিয়ে দুর্গের অধিকার ছেড়ে দেয়।

উজুন হাসানকে আশ্বাস দিয়েছিলাম যে তার জীবনের অথবা সম্পত্তির কোনও ক্ষতি করবো না। সুতরাং তাকে আখ্সি পরিত্যাগ করে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলাম। সামান্য কয়েকজন সৈন্য নিয়ে সে হিসারের দিকে

চলে যায়। তার দলের বেশীর ভাগ সৈন্য ও অনুচর তার দল পরিত্যাগ করে। এরাই আগেকার গোলযোগ ও বিদ্রোহের সময় আমার অনুগামীদের ওপর নৃশংস অত্যাচার ও তাদের ধন সম্পত্তি লুঠতরাজ করেছিল। আমার আমীরদের মধ্যে কয়েকজন আমার কাছে সমবেতভাবে প্রার্থনা জানায় যে এই দলটিই যত নষ্টামির মূল এবং নানা ঝঞ্ঝাট সৃষ্টির কারণ। এরাই আমাদের সর্বস্বান্ত করেছে। এরাই আমার বিশ্বস্ত অনুচরদের স্বর্বস্ব লুঠ করে নিয়েছে। এরা তাদের প্রধানদের প্রতি এমন কি আনুগত্য দেখিয়েছে যে তাদের বিশ্বাস করতে হবে? কি অধর্ম হবে যদি এখন এই বিশ্বাসঘাতকদের বন্দী করে তাদের সর্বস্ব লুঠ করার আদেশ দেওয়া হয়? বিশেষতঃ তারা যখন আমাদেরই ঘোড়া চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদেরই পোশাক পরিচ্ছদ পরে জাঁক দেখাচ্ছে, আর আমাদেরই ভেড়া আমাদেরই চোখের সামনে জবাই করে দিব্যি আহারের ব্যাপার চালিয়ে যাচ্ছে—এমন ধৈর্য কার আছে যারা এই সব দেখেও সহ্য করে যাবে? যদি তুমি করুণা করে এই সব দুর্বৃত্তদের জিনিষপত্র কেড়ে নেওয়ার আদেশ না দাও অথবা সাধারণভাবে লুঠতরাজের অনুমতি দিতে যদি তোমার কোনও দ্বিধা থাকে—তাহলে অন্ততঃ যারা তোমার বিপদে আপদে সর্বক্ষণ তোমার সঙ্গী হয়ে আছে, তাদের মুখ চেয়ে এই অনুমতিটুকু দাও যে তারা যেন তাদের নিজস্ব সম্পত্তি যা এরা লুঠ করেছে এবং যা এখনও তারাই ভোগ করছে, সেইগুলো যেন তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারে। যদি তারা এই শর্তটুকু পালন করেই রেহাই পায় তা'হলেও তাদের ভাগ্যের জোর বলে মানতে হবে।

তাদের প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত আমি মেনে নিলাম। আদেশ দেওয়া হলো যে আমার অনুচররা—যারা আমার বিপদে বরাবর আমার সহায় ছিল এবং যুদ্ধাভিযানে আমাকে সাহায্য করেছিল—তারা তাদের নিজেদের লুণ্ঠিত জিনিষপত্র সনাক্ত করতে পারলে সেগুলো পুনরুদ্ধার করতে পারবে। এই আদেশ মোটের উপর ন্যায়সঙ্গত বলেই মনে হয়েছিল এবং অনেক ভেবে চিন্তে এই আদেশ জারী করা হয়েছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীর মির্জার মত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী যখন আমার এত নিকটে আছে, তখন অস্ত্রশস্ত্রধারী অতগুলো লোককে উত্যক্ত করা ঠিক হলো না। যুদ্ধে বা রাজকার্যে এমন অনেকগুলো বিষয় আছে, যেগুলো আপাত দৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক মনে হলেও, সে সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে অসংখ্য

রকমের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সেগুলো যাচাই করে নেওয়া উচিত। আমার ঐ আদেশ জারি করার ব্যাপারটা দূরদৃষ্টির অভাবেরই পরিচয় দিয়েছিল। তার ফলে কি প্রচণ্ড আলোড়ন ও বিদ্রোহই না ঘটে গেল! এই অবিবেচনা প্রসূত আদেশের ফলস্বরূপ প্রকৃতপক্ষে আমাকে দ্বিতীয়বার আন্দেজানের রাজ সিংহাসন হারাতে হয়।

মোগলেরা আতঙ্কিত হয়ে বিদ্রোহ করলো। আমার মায়ের কাছে দেড় হাজার কি দু হাজার মোগল ছিল, আর প্রায় সমসংখ্যক মোগলও হিসার থেকে এসেছিল মনে হয়। এই মোগলের দল বরাবরই নানা-রকমের অনিষ্ট সৃষ্টির জন্য দায়ী। এ পর্যন্ত পাঁচ পাঁচবার তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আমার সঙ্গে তাদের মেজাজের কোনও সমতা না থাকায় আমার বিরুদ্ধবাদী তারা হতে পারে বটে, কিন্তু তাদের দলপতি খাঁদের সঙ্গে বরাবর শত্রুতা সাধন করার জন্য তারা সত্যই অপরাধী।

এই বিদ্রোহের সংবাদ আমার কাছে নিয়ে আসেন সুলতান চিনাক্। এই সংবাদ আমাকে জানিয়ে সে আমার খুবই উপকার করে। এই কাজে যদিও সে আমাকে সহায়তা করেছিল কিন্তু শেষটায় সে আমার বিরুদ্ধে এমন শয়তানি করেছিল যাতে ঐ একটি সৎকাজ কেন—ঐ রকম শত কাজের মাহাত্ম্যও মুছে যেত। ভবিষ্যতে অপকর্ম করার প্রবৃত্তির কারণও এই যে, সেও ছিল জাতে মোগল।

বিদ্রোহের সংবাদ আমার কাছে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই আমি আমীরদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তারা মত প্রকাশ করলো যে এটা খুব একটা গুরুতর ব্যাপার নয়। এ রকম ক্ষুদ্র ব্যাপারে স্বয়ং রাজার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার কোনও প্রয়োজনই নাই। কাশিম বেগ ও আরও কয়েকজন দলপতিকে কিছু সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠালেই যথেষ্ট হবে। সিদ্ধান্ত সেই রকমই হলো। তারা মনে করেছিল যে এটা সামান্য ব্যাপার, কিন্তু মর্মান্তিকভাবে তাদের এই ভুল ভেঙ্গে গেল।

পরদিন ভোরে দুই পক্ষের সৈন্য মুখোমুখি দাঁড়ালো। যুদ্ধ আরম্ভ হলো। কাশিম বেগ স্বয়ং সুলতান মহম্মদ আরঘুনকে সম্মুখে দেখতে পেয়ে তরবারির দুই তিনটি আঘাত করে—কিন্তু তাকে প্রাণে মারেনি। আমার কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য বীরের মত আক্রমণ করেছিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পরাস্ত হয়। কাশিম বেগ আর তিন চারজন বেগ

ও কর্মচারীসহ পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। অন্য সব আমীর ও কর্মচারীরা শত্রুর হাতে ধরা পড়ে। এই যুদ্ধে দুইজন অশ্বারোহী সেনা বীরোচিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চালিয়েছিল। আমার পক্ষে সামাদ এবং শত্রুপক্ষে হিসারের একজন মোগল—নাম শা সওয়ার। তারা সামনা-সামনি যুদ্ধ করে। শা সওয়ার তরবারি দিয়ে এমন জোরে সামাদের মাথায় আঘাত করে যে শিরস্ত্রাণ ভেদ করে সেই তরবারি তার মাথার খুলির মধ্যে অনেকটা প্রবেশ করে। এই রকম গুরুতর আঘাত পেয়েও সামাদ তার তরবারি দিয়ে শা সওয়ারের মাথায় এমন প্রচণ্ড আঘাত হানে যে তার মাথার খুলির অনেকটা অংশ ছিন্ন হয়ে যায়। শা সওয়ারের মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল না। তার ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি বেঁধে দেওয়া হয়। সে প্রাণে বেঁচে যায়। কিন্তু সামাদের ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করার কেউ না থাকায় সে তিন চার দিনের মধ্যেই মারা যায়।

এই পরাজয় আসে অত্যন্ত অসময়ে—যে সময়ে আমি ছোটোখাটো যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপর্যয়ের পর সবেমাত্র আমার রাজ্য পুনরধিকার করেছি। তাম্বল কৃতকার্য হওয়ার পর আইসের উঁচু টিলার মুখোমুখি সমতল ক্ষেত্রে আন্দেজানের চার মাইলের মধ্যে এসে পৌঁছায় এবং সেখানেই শিবির স্থাপন করে। যাহোক, তার অগ্রগতি রুদ্ধ হয় এবং সে পিছিয়ে যায়। তার অগ্রগতির সময়ই আমার যে দুইজন আমীর তার হাতে ধরা পড়ে তাদের হত্যা করে। মাসখানেক নগর প্রান্তে অপেক্ষা ক'রে কিছুই না করতে পেরে উসের দিকে ফিরে যায়।

॥ ৮ ॥

১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

এই সময়ে আমার কয়েকজন কর্মচারীকে খুব তাড়াতাড়ি পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য লোক সংগ্রহ করতে আমার রাজ্যের নানাস্থানে পাঠাই। অন্যদের ব্যবহারের জন্য মই, কোদাল, কুড়াল এইরকম নানা জিনিস সংগ্রহ করার জন্যও আদেশ দিই। তারপর ডাইনে, বাঁয়ে, মধ্যে এবং সম্মুখ ভাগে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে ব্যূহ সজ্জিত করে উসের দিকে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য অগ্রসর হই।

মাহ্ দুর্গ খুবই সুরক্ষিত। উত্তরে যেদিকে নদী সেই দিকের দুর্গের অংশ এমন উঁচু যে নদী থেকে তীর নিক্ষেপ করলে কোনও রকমে দুর্গের দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। দুর্গের মধ্যে জল সরবরাহের জন্য একটি নালা কাটা হয়েছে নদী থেকে দুর্গ পর্যন্ত। দুর্গের তলা থেকে নদী পর্যন্ত এই নালা-পথের দুই পাশ প্রাচীরে ঘেরা। নদী কাছে থাকায় দুর্গরক্ষীরা নদীর তলা থেকে কামানের গোলার মত বড় বড় নুড়ি পাথর কুড়িয়ে এনে দুর্গে জমা করেছিল। মাহ্ দুর্গ থেকে যে রকম অবিরাম বড় বড় পাথর ছোঁড়া হয়েছিল আমার অন্য কোনও অভিযানের সময় কোনও দুর্গ থেকে সেরকম ব্যাপার হতে আমি আর দেখিনি।

আবদল কাদুস দুর্গপ্রাচীরের নীচে পৌঁছতেই উপর থেকে ছোঁড়া এক পাথরের আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে নীচে মাথা ওপরে পা করে সেই উঁচু থেকে গড়াতে গড়াতে কোনও জায়গায় না থেমে নদীতে এসে পড়লেন। ভাগ্যগুণে তিনি বিশেষ কোনও আঘাত পাননি। কোনও রকমে জল থেকে উঠে তিনি ঘোড়ায় চড়ে তাঁবুতে ফিরে এলেন।

দুই দিকে প্রাচীরে ঘেরা সুঁড়ি পথে পাথরের নুড়ির আঘাতে ইয়ার আলি গুরুতর আহত হয়। পরে তার মাথার ক্ষত পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ করা হয়। আমাদের অনেক সেনা শিলাখণ্ডে আহত হয়েছিল। প্রাতর্ভোজনের আগেই অভিযান চালিয়ে আমরা জলের উৎস ধারা অধিকার করতে সক্ষম হই। সন্ধ্যা পর্যন্ত এই অভিযান চলে। কিন্তু শত্রুপক্ষের জল সরবরাহের ব্যবস্থা আমাদের আক্রমণে বানচাল হয়ে যাওয়ায় দুর্গরক্ষীগণ দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব মনে করে সন্ধির প্রস্তাব করে এবং অবশেষে আমাদের হাতে দুর্গ সমর্পণ করে।

তাম্বলের ছোট ভাই খলিল ছিল ও পক্ষের সৈন্যদের নায়ক। তাকে এবং তার সহচর সত্তর আশি কিংবা প্রায় একশ কর্মঠ যুবক সৈন্যকে বন্দী করা হলো এবং তাদের কড়া নজরে রাখবার জন্য আন্দেজানে পাঠানো হলো। আমার আমীর, কর্মচারী ও সৈন্যরা—যারা শত্রুর হাতে পড়েছিল, আমাদের এই বিজয় তাদের পক্ষে সৌভাগ্যস্বরূপ হয়েছিল।

ত্রিশ কি চল্লিশ দিন আমরা প্রায় চুপ করেই ছিলাম। সরাসরি কোনও যুদ্ধ বা আক্রমণ হয়নি। মাঝে মাঝে আমাদের ও শত্রুপক্ষের লুঠতরাজকারীদের মধ্যে ছোটখাটো সংঘর্ষ চলেছিল। এই সময় আমি লক্ষ্য রেখেছিলাম রাত্রে সতর্ক পাহারার ব্যাপারে। সৈন্য শিবিরের চারপাশে গড়খাই কাটারও ব্যবস্থা

করা হয়েছিল। যেখানে ট্রেঞ্চ কাটার সম্ভাবনা ছিল না সেখানে গাছের ডালপালা সাজিয়ে রাখা হলো। আমার সৈন্যদের যথারীতি অস্ত্রসজ্জিত করে ট্রেঞ্চের ধারে ধারে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে কুচকাওয়াজ করার জন্য আদেশ দিয়েছিলাম। এত সতর্কতা সত্বেও তিন চার রাত্রির পর এক এক রাত্রিতে শিবিরে বিপদসূচক ঘন্টা বেজে উঠ্‌তো এবং সাজ সাজ রব পড়ে যেত।

এই বছর বাইসন্‌ঘর মির্জাকে আমন্ত্রণ জানালেন খসরু শা এই ছল করে যে—তাঁরা দুইজন একযোগে বাল্‌খ আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে যাবেন। খসরু শা তাঁকে নিয়ে আসে কুন্দেজে। সেখান থেকে তাঁরা বাল্‌খ জয় করার জন্য সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যান। উবজে পৌঁছিয়ে সেই হীন অবিশ্বাসী শয়তান্ রাজ্যের অধিকার হস্তগত করার জন্য এক নিষ্ঠুর চক্রান্ত করলো। হায়, কি করে রাজলক্ষ্মী এই অপদার্থ ঘৃণ্য জীবের উপর সদয় হলেন—যার না আছে বংশমর্যাদা, না আছে জন্মের গৌরব, না আছে প্রতিভা, খ্যাতি, জ্ঞানবুদ্ধি, না আছে সাহস, বিচারবুদ্ধি বা ভালমন্দ জ্ঞান? এই সর্পের চেয়েও খল খসরু শা বাইসন্‌ঘর মির্জা আর তার আমীরদের বন্দী করে ধনুকের ছিলা গলায় জড়িয়ে মির্জাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করলো। একজন খ্যাতিসম্পন্ন মিষ্ট স্বভাবের উচ্চবংশের সর্বগুণান্বিত রাজাকে এইভাবে খুন করা হ'লো মহরমের দশ দিনের দিন। তাঁর কয়েকজন আমীর এবং বিশ্বস্ত কর্মচারীও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলো না।

শীতকালীন শিবিরে সৈন্যদের রাখার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন দেখা দিল। যে সব গ্রামে শিবির স্থাপন করা হলো তার চারপাশেই সুন্দর শিকারের জায়গা। ইলামিশ নদীর ধারে জঙ্গলে অসংখ্য পাহাড়ি ছাগল, হরিণ আর বুনো শুয়োর। ছোট ছোট জঙ্গল আর ঝোপঝাড় চারিদিকেই ছড়িয়ে আছে। সেখানে আছে বনমুরগী আর খরগোস্। এখানকার মত দ্রুতগতি খেঁকশিয়াল আমি আর কোথাও দেখিনি। যতদিন আমি শীতকালীন শিবিরে ছিলাম, দুই তিন দিন পর পরই আমি শিকারে বের হতাম। বড় বড় জঙ্গল তাড়িয়ে পাহাড়ি ছাগল আর হরিণ শিকার করতাম। ছোট ছোট ঝোপঝাড় থেকে বুনো মুরগী শিকার করতাম বন্দুক কিংবা তীর ধনুক দিয়ে। এখানকার বনমুরগী খুব মোটাসোটা। যতদিন আমরা এখানে ছিলাম প্রচুর পরিমাণে বনমুরগীর মাংস খেয়েছি। শীতের শিবিরে চল্লিশ পঞ্চাশ দিন ছিলাম আমরা। আমার কয়েকজন অনুচরকে এই সময়ে ছুটি দিতে হলো এবং আমিও আন্দেজানে ফিরে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করলাম।

রাত্রিবেলা শীতটা খুব বেশী পড়তো। এমন হলো যে আমার অনুচরদের মধ্যে অনেকের হাত-পায়ে তুষারক্ষত দেখা গেল। কয়েকজনের কান শুক্‌নো আপেলের মত কুঁকড়িয়ে শুকিয়ে যাওয়ার মত হলো।

তাম্বল আমার অগ্রগতির সংবাদ পাওয়া মাত্র তার বড় ভাইকে সাহায্য করার জন্য দ্রুতগতিতে সসৈন্যে বেরিয়ে এলো। বিকেল এবং সন্ধ্যার নমাজের মাঝামাঝি সময়ে নৌকেন্দের দিক ধূলোয় আঁধার হয়ে আসছে, এই অবস্থা দেখে বোঝা গেল যে তাম্বলের সৈন্য এগিয়ে আসছে। তার বড় ভাইয়ের অকারণে পশ্চাদপসরণের এবং আমার অগ্রগতির সংবাদে হতবুদ্ধি ও বিব্রত হয়ে সে থমকে দাঁড়ালো। আমি বল্‌লাম এ সেই দয়াময় খোদার কাজ—যিনি এখানে নিয়ে এসেছেন শুধু ওদের ঘোড়াগুলোর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ার জন্য। আমরা এগিয়ে যাব। আল্লার দয়ায় শত্রুপক্ষের যারা আমাদের হাতে পড়বে তারা আর নিষ্কৃতি পাবে না।

লাখারি এবং আরও কয়েকজন কিন্তু নিবেদন করলো—হুজুর, দিনের আলো নিভে আসছে, রাত হতে আর বেশী দেরী নেই। যদি আমরা এখনই আক্রমণ না করি সেইটেই ভাল হবে। আজ রাত্রে যদি ছেড়েও দিই, তাহলেও আর সরে পড়বার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। এবং তারপর যেখানে ওদের দেখা পাব সেখানে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো।

এই উপদেশ অনুসারেই কাজ হলো—তখনই তাদের আক্রমণ করা হলো না। যখন সৌভাগ্যবশতঃ শত্রু হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছিল তখনই তাদের সামান্য ক্ষতিও না করে তাদের সরে পড়বার সুযোগ করে দিলাম আমরা।

কথায় আছে :—

(ফারসী) 'যখন হাতের কাছে সুযোগ আসে
তখনি তা ধরবে।
সে সুযোগ যদি হেলায় হারাও
সারা জীবন ভুগবে।'

(তুর্কি) 'অসময়ে যে অলস কাজ সুরু করে
সে কাজ নিষ্ফল হয় তার।
কর্মী যে জন, ঝাঁপ দিয়ে সুযোগ সে ধরে
পূর্ণ তার জীবন-সম্ভার।'

কয়েকটি সর্তে সন্ধি-চুক্তি করা হলো। আখ্‌সির দিকের দেশগুলি জাহাঙ্গীর মির্জার দখলে থাকবে, আর আন্দেজানের দিকের দেশগুলি থাকবে আমার অধিকারে। আমাদের এলাকাগুলির বিধি-ব্যবস্থা শেষ করে আমি আর জাহাঙ্গীর মির্জা সম্মিলিত হয়ে একযোগে সমরকন্দ আক্রমণ করবো।

সুলতান আমেদের কন্যা আইষা সুলতান বেগমের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা আমার বাবা ও কাকার জীবিতাবস্থাতেই পাকাপাকি ঠিক হয়েছিল। খোজেন্দে পৌঁছিয়েই শাবান মাসে তাকে বিয়ে করি। দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিকে তার প্রতি আমার ভালবাসা খুব গভীর হলেও লজ্জায় তার কাছে সব সময়ে যেতে পারিনি—দশ পনরো কিংবা বিশ দিনের মধ্যে এক একবার যেতাম। পরে অবশ্য আমার ভালবাসায় মন্দা পড়ে এলো, আর আমার লজ্জাও বেড়ে গেলো। ফলে মা রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে আমাকে তিরস্কার করে তার কাছে জোর করে পাঠাতে লাগলেন। আমিও তখন অপরাধীর মত স্ত্রীর কাছে ত্রিশ কি চল্লিশ দিন পর এক একবার যেতাম।

এই অবসর সময়ে ক্যাম্প বাজারের একটি ছেলের সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা হয়ে যায়। তার প্রতি আমার একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করি। তার নাম বাবুরি। আমার নামের সঙ্গে তার নামের অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল।

'গভীর প্রেমে পড়ে গেলাম আমি
মুগ্ধ হলাম, পাগল হলাম,
মনের কথা জানেন অন্তর্যামী।'

এর আগে আমি কারও প্রতি এমন উগ্র ভালবাসা বা আকর্ষণ অনুভব করিনি। বলতে কি ভালবাসা কিংবা উগ্র কামনার অভিজ্ঞতা আমার এর আগে কোন দিনই হয়নি এবং কারও কাছ থেকে শুনিওনি। এই অবস্থায় পড়ে ফারসীতে কয়েকটি কবিতা লিখি তার মধ্যে একটি এই—

'কোন প্রেমিক বল আমার মত মুগ্ধ,
প্রেমানলে এমন ভাবে দগ্ধ।
আমার মত অসম্মানের পশরা কেবা বয়!
কে দেখেছে এমন পাষাণ হিয়া
কেন এমন ঘৃণা? কেন নাইকো মায়া?
করো দয়া, নইলে আমার প্রাণ যে রাখা দায়।'

কখনও কখনও এমন হয়েছে যে বাবুরি আমার কাছে এসেছে, কিন্তু আমি লজ্জায় সোজা-সুজি তার মুখের দিকে চাইতে পারিনি। তাহলে কেমন করে তাকে আমার কামনা আর প্রেমের কথা মুখ ফুটে বলে মনের গুরুভার হাল্‌কা করতে পারি? এমনি বিপর্যয়কর মনের মত্ত অবস্থা আমার তখন যে—সে যখন আমার কাছে আসতো তখন তাকে ধন্যবাদ দিতে পারিনি—আর যখন সে চলে যেত তখনও কোন অভিযোগের কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। আমার এই প্রেমবিহ্বল অবস্থায় একদিন কয়েকজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে আমি এক সরু গলিপথের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মুখোমুখি বাবুরির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অতর্কিত সাক্ষাৎ আমার মনের ওপর এমন ঘা দিল যে, আমার অস্তিত্বকে যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিল। আমি চোখ তুলে তার মুখের দিকে চাইবো অথবা একটা কথা তাকে বলবো এমন অবস্থা আমার ছিল না। মনে পড়লো মহম্মদ শেখের কবিতাটি—

'যখন আমি তোমায় দেখি প্রিয়,
লাজে তখন পড়ি কাতর হয়ে।
সঙ্গীরা যে মুচকি হাসি হাসে, আমার দিকে চেয়ে,
ঘুরে দাঁড়াই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে।'

এই কবিতা আমার মানসিক অবস্থার সঙ্গে সুন্দর খাপ খেয়ে যায়। আমার কামনার উগ্রতায় এবং যৌবনের পাগলামিতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতাম খালি মাথায়, খালি গায়, রাস্তায়, অলিতে-গলিতে, ফুল আর ফল বাগানে। বন্ধু-বান্ধব বা অপরিচিতের দিকে কোনও নজরই দিতাম না। আমার নিজের সম্মান বা অন্যের সম্মানের দিকেও আমার কোনও লক্ষ্য ছিল না। তুর্কিতে এই কবিতাটি লিখি:

কামনায় জরজর
হিয়া কাঁপে থরথর
পাগল হলাম নাকি? জানিনে।
বুঝেছি কি কখনই
প্রেমিকের দশা এই,
যে মজেছে সুন্দর আননে।

কখনও কখনও পাগলের মত ঘুরে বেড়াতাম পাহাড়ে, সমতলভূমিতে, কখনও বা রাস্তায় রাস্তায় অলিতে-গলিতে, কোনও বাড়ী বা উদ্যানের সন্ধানে

যেখানে আমার প্রিয়কে দেখতে পাব। আমার এমন অস্থির অবস্থা হলো যে বসতেও পারি না, উঠ্‌তেও পারি না, দাঁড়াতেও পারি না, হাঁটতেও পারি না।

(তুর্কি) 'চলে যাওয়ার শক্তি নাই
থাকতেও না পারি।
কি দশায় ফেলেছ প্রিয়
লাজে আমি মরি।'

॥ ৯ ॥

১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

উজবেক্‌রা সমরকন্দ দখল করবার পরই আমরা কেস্‌ থেকে হিসারের দিকে রওনা হই।

ভালমন্দ মিশিয়ে আমার লোক ছিল—দুই শ' চল্লিশ জন। আমার অনুচর আমীর ও কর্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ শেষ করে এই সিদ্ধান্ত করা হলো যে—সেবানি খাঁ যখন এই সেদিন সমরকন্দ দখল করেছে তখন এত অল্প সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই সমরকন্দের অধিবাসীরা তার প্রতি এবং সে নিজেও সমরকন্দবাসীদের প্রতি পরস্পর অনুরাগী হয়ে ওঠেনি। যদি কিছু করতে হয় এই তার উপযুক্ত সময়। যদি আমরা এই সময় কোনও রকমে সহসা দুর্গের ভিতর যেতে পারি—তাহ'লে দুর্গ অধিবাসীরা নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষ অবলম্বন করবে। তাও যদি না হয় তাহলে তারা অন্ততঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে—নিশ্চয়ই উজবেক্‌দের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করবে না। মোট কথা কোনও রকমে একবার ঐ নগরে প্রবেশ করতে পারলে আল্লার যা ইচ্ছা তাই হবে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েই আমরা ঘোড়ার সওয়ার হলাম এবং রাতের অনেকটা সময়ই দ্রুত এগিয়ে এলাম। মাঝ রাত্রে পৌঁছাই ইউরেট খাঁয়ে। শত্রুসৈন্য সজাগ হয়ে আছে জেনে আমরা এগোতে ভরসা পেলাম না, পিছিয়ে এলাম ইউরেট খাঁ থেকে। ভোরে কোহিক নদী পার হয়ে ইয়ারাইলাক্‌ পুনঃ দখল করলাম।

একদিন আমার কয়েকজন কর্মচারী ও আমীরদের সঙ্গে আস্‌কেনডেক্‌

দুর্গে কথাবার্তা বলছিলাম। কথা চলছিল নানা বিষয়ে। আমি বলে ফেলি —আচ্ছা একটা শুভদিনের কথা আন্দাজ করা যাক। কবে আল্লা আমাদের এমন সুদিন দেবেন—যেদিন আমরা সমরকন্দ দখল করতে পারবো।

কেউ কেউ বললো—বসন্ত কালে। তখন চলছিল—হেমন্ত কাল। কেউ বললো—এক মাস, কেউ বললো চল্লিশ দিনের মধ্যে, আবার কেউ বললো কুড়ি দিনের মধ্যে। গোকুলতাস্ বললো—কুড়িদিনের মধ্যেই নিয়ে নেবো সমরকন্দ। সর্বশক্তিমান আল্লা তার কথাই শুনেছিলেন—কারণ আমরা এক পক্ষের মধ্যেই সমরকন্দ অধিকার করেছিলাম।

এই সময় আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি। দেখলাম—মহামতি খাজা আবদাল্লা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেলাম। তিনি ভেতরে এসে বসলেন। তাঁর জন্য একখানা টেবিল পাতা আছে। কিন্তু টেবিলের আস্তরণ খুব পরিচ্ছন্নভাবে রাখা হয়নি। সেইজন্য এই নিষ্ঠাবান ধার্মিক লোকটি যেন একটু বিরক্ত হয়েছেন। মোল্লা বাবা এই ব্যাপারে বুঝতে পেরে আমাকে একটা ইশারা করলেন। আমিও ইঙ্গিতে জানালাম যে এটা আমার দোষ নয়—যে টেবিল সাজিয়েছে তার দোষ। আমাদের মধ্যে ইশারায় যে কথা হলো খাজা সাহেব তা বুঝলেন এবং আমার কৈফিয়তে তিনি সন্তুষ্ট হলেন। তিনি উঠলে আমি সমাদরের সঙ্গে তাঁকে বাইরে নিয়ে এলাম। বাড়ীর হলঘরে মনে হলো তিনি তাঁর বাঁ বা ডান হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন উঁচুতে তুললেন যে আমার একটা পা মাটি থেকে উঠে এলো। সেই সময় তিনি তুর্কি ভাষায় আমাকে বললেন—'তোমার ধর্মগুরু তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন।' এই স্বপ্ন দেখার কয়েকদিন পরই সমরকন্দ দখল করি।

সমরকন্দ আকস্মিকভাবে দখল করবার জন্য যাত্রা করেও সেখানকার দুর্গরক্ষীদের সতর্ক দেখে ফিরে আসতে বাধ্য হই। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লার উপর বিশ্বাস রেখে আবার সেইভাবেই দুপুরের নমাজের পর বেরিয়ে পড়লাম সমরকন্দের দিকে। আবদাল মকারাম আমার সঙ্গেই ছিল। মাঝ রাত্তিরে মোখাক সেতুর কাছে পৌঁছলাম। সেইখান থেকে কয়েকজন বাছাই করা লোক পাঠালাম দুর্গের দিকে। তাদের উপদেশ দিলাম—মই সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে। তারা যেন প্রেমিক গুহার উল্টোদিকের দুর্গপ্রাচীর মইয়ের সাহায্যে টপকে দুর্গের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুর্গমধ্যে ঢুকেই তারা একটুও দেরী না করে ফিরোজ গেটে যারা

পাহারায় আছে তাদের আক্রমণ ক'রে সেটা দখল করে নেয় এবং আমাকে যেন লোক পাঠিয়ে সংবাদ দেয়।

আমার উপদেশ মত তারা এগিয়ে গেল। নিঃশব্দে তারা প্রেমিক গুহার বিপরীত দিকের দেওয়াল টপকে ভিতরের দিকে প্রবেশ করলো। তারপর ফিরোজ গেটের দিকে ধাওয়া করলো। সেখানে তারা ফাজিল তারখান নামে তুর্কিস্থানের এক বণিককে দেখতে পায়। সে তুর্কিস্থানে সেবানি খাঁর অধীনে কাজ করেছিল এবং তার পদবৃদ্ধিও হয়েছিল। আমার অনুচররা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ; তরবারির আঘাতে তাকে এবং সৈনিকদের ভূমিশায়ী করে কুড়াল দিয়ে ফটকের তালা ভেঙ্গে দরজা খুলে দিল।

সেই সময়েই আমি ফটকের কাছে পৌঁছে গেছি। দরজা খোলা পেয়েই ভিতরে ঢুকে পড়লাম। নগরবাসীরা তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল। দোকানদাররা কিন্তু দোকান থেকে উঁকি মেরে দেখছিল কি ব্যাপার ঘটছে। তারা বাইরে এসে আল্লার উদ্দেশে প্রার্থনা শুরু করে দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই আর সব অধিবাসীরা জানতে পারলো এই ঘটনার কথা। তারা গভীর আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লো। তাদের এবং আমার অনুচরগণের মধ্যে সাদর সম্ভাষণ বিনিময় চলতে লাগলো। তারা প্রত্যেক রাস্তায় আর গলিতে উজবেক্দের দেখতে পেলেই লাঠি আর পাথর নিয়ে ধাওয়া ক'রে তাদের পাগলা কুকুরের মত হত্যা করতে লাগলো। এইভাবে চার পাঁচ শ' উজবেক্কে তারা বধ করলো। নগরের শাসক ব্যাপার সুবিধার নয় দেখে সেবানি খাঁর কাছে পালিয়ে গেল।

ফটকে প্রবেশ করেই আমি কালবিলম্ব না করে কলেজ ভবনের দিকে চলে যাই। সেখানে পৌঁছিয়েই ঐ ভবনের খিলান-করা হলঘরে আমি বসবার জায়গা করে নিই। ভোর পর্যন্ত যুদ্ধ-কোলাহল শোনা গেল চারদিকে। কয়েকজন নাগরিক ও দোকানদার কি ঘটেছে জানতে পেরে দলে দলে তাদের হাতের কাছে যে সব খাদ্যদ্রব্য পেলো তাই নিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য চলে এলো এবং আমার জয়ে আল্লার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো।

সকালে খবর পেলাম যে উজবেক্রা লৌহ ফটক দখল করে আছে আর সেখানেই তাদের দলের লোকজনদের জড়ো করেছে। আমি এই খবর পেয়েই পনরো কুড়ি জন লোক নিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেই দিকে ছুটে

গেলাম। কিন্তু নগরের মারমুখী জনতা, যারা উজবেক্‌দের রাস্তায় গলিতে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তারাই আমার সেখানে পৌঁছানোর আগেই লৌহ ফটক থেকে তাদের তাড়িয়েছে।

কি ঘটছে জানতে পেরে সেবানি খাঁ তাড়াতাড়ি এক শ' কি দেড় শ' অশ্বারোহী সেনা নিয়ে লৌহ ফটকের সামনে চলে আসে। তার পক্ষে এ একটা মস্ত সুযোগ—কারণ আমার জনবল মুষ্টিমেয়। কিন্তু সেবানি খাঁ বুঝতে পারলো এখানকার অবস্থা—জনসাধারণের মনের গতি। ব্যাপার সুবিধার নয় দেখে সে আর অপেক্ষা না করে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল।

আমি শহর ছেড়ে উদ্যান-প্রাসাদে গিয়ে উঠলাম। সম্ভ্রান্ত ও নগরের নানা বিভাগের কর্মচারীরা আমার কাছে এসে তাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য জানালো। প্রায় দেড় শ' বছর আমাদের বংশের লোকরা সমরকন্দের রাজা ছিলেন। এক বিদেশী দস্যু—কেউ জানে না কোথা থেকে সে এসেছিল—এই রাজ্য অধিকার করে নেয়, আর আমাদের বংশের হস্তচ্যুত হয়। পরম শক্তিমান আল্লা আমাদের হৃতরাজ্য আবার আমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

এই রাজ্যজয়ের সন তারিখকে স্মরণে রাখার জন্য কয়েকজন কবি আনন্দ করে কবিতা লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটির কথা এখনও মনে আছে:

'মন বল দেখি স্মরণ করে
সে কোন সনে
জিতল রণে
বাবর বাহাদুর ?'

আন্দেজান থেকে আমার আসবার পরই মা, ঠাকুমা এবং পরিবারের আর সকলে রওনা হন। পথে অনেক অসুবিধা এবং দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে অতি কষ্টে তাঁরা উরাতিপায় পৌঁছিলেন। সেখান থেকে তাঁদের সমরকন্দে আনবার ব্যবস্থা করি। এই সময়ে আমার প্রথমা স্ত্রী আইষা সুলতান বেগমের গর্ভে এক কন্যা সন্তান জন্মে। তার নাম দেওয়া হয় জেবউন্নিসা অর্থাৎ রমণীরত্ন। এইটিই আমার প্রথম সন্তান। আমার বয়স তখন উনিশ। ত্রিশ চল্লিশ দিন বয়সেই তাকে আল্লা কাছে টেনে নেন।

সমরকন্দ অধিকার করার পরই একের পর এক বার্তাবহ কিংবা দূত

পাঠাই দূরের ও নিকটের সকল সুলতান, খাঁ, আমীর ও সর্দারের কাছে। অনুরোধ জানাই—তাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি যেন আমি পাই। আমার পত্রবাহকরা চিঠি নিয়ে অনবরত যাতায়াত করতে লাগলো। নিকটবর্তী কয়েকজন সুলতান, আমীর সব জেনেশুনেও আমার প্রস্তাব অসৌজন্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। আর কয়েকজন যারা পূর্বে আমার পরিবারের প্রতি কোনও অন্যায় বা অবজ্ঞা বা অপমান করার দোষে দোষী, তারা ভয়ে কোন সাড়াই দিল না। অল্প কয়েকজন আমাকে সাহায্য করতে রাজি হলেও সময়মত তারা এমন কিছু সাহায্য করেনি যাতে আমার কোনও উপকার হয়। তাদের কথা পরে বলছি।

শওয়াল মাসে সেবানি খাঁয়ের সঙ্গে লড়াই করার জন্য সসৈন্যে বেরিয়ে পড়ি নগর থেকে। 'নব-উদ্যানে' সৈন্যদের প্রধান ঘাঁটি করে সেখানে আরও সৈন্য সংগ্রহ ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পাঁচ-ছয় দিন অপেক্ষা করলাম। তারপর সেখান থেকে যাত্রা করে নির্বিঘ্নে এগিয়ে যাই—সির-ই-পুল পর্যন্ত। আরও কিছুদূর এগিয়ে শিবির স্থাপন করি। আমাদের শিবির সুরক্ষিত করার জন্য ট্রেঞ্চ কাটা ও বেড়া দিয়ে ঘেরার ব্যবস্থা করা হয়। বিপরীত দিক থেকে সেবানি খাঁ এগিয়ে আসতে থাকে এবং কিছুদূরে শিবির স্থাপন করে। তার শিবির থেকে আমার শিবিরের দূরত্ব ছিল চার মাইল।

এইভাবেই আমরা চার-পাঁচদিন ছিলাম। মাঝে মাঝে আমার পক্ষের ছোটখাটো সৈন্যদল শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সংঘর্ষের সৃষ্টি করছিল। একদিন ওদের একটা বড় দল এগিয়ে আসে, সেদিন সংঘর্ষটা বেশ জোরালো হয়, কিন্তু কোন পক্ষই সুবিধে করতে পারেনি। আমার সৈন্যদের মধ্যে পতাকাবাহী একজন সৈন্য অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে। সে পালিয়ে গিয়ে ট্রেঞ্চে আশ্রয় নেয়। কেউ কেউ বলতে লাগলো—পতাকাবাহী সৈন্যটি হচ্ছে সৈয়দ কারা। তা হওয়া সম্ভব, কারণ সৈয়দ কারা বক্তৃতার বেলায় খুব সাহসী, তরবারি হাতে নিলেই সে কাপুরুষ হয়ে ওঠে।

একরাত্রে সেবানি খাঁ আমাদের চমকিয়ে দেয় শিবির আক্রমণের চেষ্টা করে! কিন্তু আমাদের ট্রেঞ্চ দিয়ে ঘেরা শিবির এমন সুরক্ষিত ছিল যে তারা কিছুই করতে পারলো না। ট্রেঞ্চের ধারে এসে যুদ্ধ-হুঙ্কার করে কয়েকটি তীর ছুঁড়ে তারা সরে পড়লো।

আগামী যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য এইবার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করলাম। কামবার আলি আমাকে সাহায্য করলেন। বাকি তারখান

প্রায় দুই হাজার সৈন্য নিয়ে 'কেস্-এ' পৌঁছিয়েছেন—পরদিন তাঁর আমার কাছে আসার কথা। মীর সাহেবের পুত্রকে হাজার দেড় হাজার সৈন্য নিয়ে আমাকে সাহায্য করার জন্য আমার মাতুল খাঁ সাহেব পাঠিয়েছেন। তারা আমার শিবির থেকে মাইল ষোলো দূরে দাবুলে এসে গিয়েছে—পরদিন সকালে তাদের এখানে পৌঁছনোর কথা। এই রকম যখন পরিস্থিতি, তখন আমি হঠকারিতার বলে যুদ্ধে নেমে পড়লাম।

'অশান্ত মনের বেগে
আগু পিছু নাহি ভেবে,
ত্বরিতে যে অসি ধরে হাতে।
হঠকারি সেই জন
অবশেষে ভাঙ্গা মন,
সে হাত দংশিবে নিজ দাঁতে।

আমার তাড়াহুড়া করে যুদ্ধে নামার আগ্রহের হেতু ছিল এই যে, সেইদিন দুই বিরোধী সেনার মাঝে আকাশে অষ্টনক্ষত্রের উদয় হবে। যদি এই দিনটির সদ্ব্যবহার না করি এবং ঐ দিনটি চলে যায় তাহলে এ সুযোগ পেতে আরও তেরো চোদ্দ দিন কেটে যাবে—আর এই সময়টা শত্রুপক্ষের সুবিধাজনক হবে। এইরকম মনোভাব নিয়ে ঘটনার বিচার করা নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ। সেইজন্য আমার তাড়াতাড়ি যুদ্ধে নামাব সিদ্ধান্ত করার দৃঢ় যুক্তি ছিল না।

সকাল বেলায় সৈন্যদের অস্ত্রসজ্জিত করা হলো। অশ্বদের জিন-বল্গা চাপিয়ে তৈরী করে নেওয়া হলো। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম শত্রুর সম্মুখীন হতে—ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে সৈন্যব্যূহ সাজিয়ে নিয়ে। শত্রু-সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য আমরা এগিয়ে গেলাম। তারাও আমাদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। বিরোধী দুই দল পরস্পর সম্মুখীন হলে শত্রুপক্ষের ডান সারির সৈন্য আমার বাঁদিকের সৈন্যদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এসে আমাদের পিছন দিকটা ঘিরে ফেলে। আমি তাদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়াই। আমার এই রকম স্থান পরিবর্তন করার ফলে আমার সম্মুখের বাছাই-করা অভিজ্ঞ সৈন্যদল ডান দিকে পড়ে যায় এবং তাদের মধ্যে কেউই আমার সঙ্গে আসতে পারে না। যাহোক, এ সত্ত্বেও আমাদের সৈন্যের প্রবল চাপে শত্রুসৈন্যের সম্মুখ ভাগ

বিপর্যস্ত হয়ে পিছিয়ে যায়। এমন কি সেবানি খাঁয়ের কয়েকজন অভিজ্ঞ সৈন্যাধ্যক্ষ তার কাছে গিয়ে বলে যে এখনই পিছিয়ে না গেলে সমস্তই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সে তাতে সম্মত না হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। শত্রুপক্ষের ডান সারির সেনারা আমার বাঁ সারির সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে পশ্চাৎ দিকে আমাকে আক্রমণ করে। আমার স্থান পরিবর্তনের ফলে আমার সম্মুখ ভাগের সেনারা ডান দিকে পড়ায় আমাদের সম্মুখ ভাগ অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল। শত্রুপক্ষ সুযোগ বুঝে পিছনে ও সম্মুখে আক্রমণ চালিয়ে অজস্র শর বর্ষণ আরম্ভ করলো। যে সব মোগল সৈন্য আমার সাহায্যের জন্য এসেছিল তারা যুদ্ধে কোনও উদ্যম না দেখিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে আমারই লোকদের লুণ্ঠন করতে শুরু করলো। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রেই যে তারা এমন করেছে তা নয়—এই রকমের শয়তানিই মোগলদের চিরাচরিত নীতি। তারা যদি কোনও যুদ্ধে জয়ী হয়—তাহলে সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে। আর যদি তারা পরাজিত হয় তা হলেও মিত্রপক্ষের লোকদের জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে যা পারে নিয়ে পালিয়ে যায়।

মাত্র বার কি পনেরো জন সৈন্য আমার পাশে ছিল। কোহিক নদী আমাদের অতি নিকটে। আমার সৈন্যদলের দক্ষিণ সারির এক প্রান্ত প্রায় নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমরা তাড়াতাড়ি নদীর দিকে ছুটে গেলাম। তীরে পৌঁছিয়েই ঘোড়া আর সৈন্যদের সব সাজসরঞ্জাম নিয়ে আমরা নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নদী পার হতে দেখা গেল যে অর্দ্ধেকটায় জল খুব গভীর নয়, কিন্তু মাঝামাঝি আসতেই আর থৈ পাওয়া গেল না। অনবরত শর নিক্ষেপের মধ্যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও সওয়ার নিয়ে ঘোড়াগুলিকে সাঁতরিয়ে পারে নিয়ে আসা হলো। তীরে পৌঁছিয়ে ঘোড়ার ভারী সাজসরঞ্জাম কেটে বের করে ফেলে দেওয়া হলো। উত্তর তীরে পৌঁছিয়েই আমরা শত্রুসৈন্য থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। এই সময় বজ্জাত মোগলরা সওয়ারদের ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে তাদের জিনিসপত্র লুঠ করলো। ইব্রাহিম তারখান এবং আরও কয়েকজন সুদক্ষ সৈনিককে এই-ভাবে ঘোড়া থেকে নামিয়ে তাদের জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে মোগলরা তাদের হত্যা করে।

'জাতে মোগল, মোগল জাত ?
দেবদূত এরা ? কখন নয়।
মোগল জাত—বদ্‌জাত।

সোনার আখরে যদি লেখা থাকে
মোগল নাম।
গৌরব সেটা? কখনও নয়।
মোগল নাম—দুর্ণাম।'
'সাবধান! মোগলের ক্ষেত থেকে
ভুলেও তুলোনা, শস্যবীজ এক কণা।
সে বীজ এমন,
যেখানে করিবে রোপণ
বিষবৃক্ষে হবে পরিণত। একথা ভুলো না।'

কোহিক নদীর উত্তর পার দিয়ে আমরা কিছুদূর এগিয়ে আবার নদী পার হয়ে এপারে চলে আসি। বিকেল ও সন্ধ্যার নমাজের মাঝামাঝি সময়ে 'সেখজাদের' ফটকে পৌছাই, তারপর নগরে প্রবেশ করি।

বড় পদের অনেক সুদক্ষ সৈন্য এবং নানা শ্রেণীর বহুলোক এই যুদ্ধে নিহত হয়।

এই বিপদে যারা আমাকে সৎপরামর্শ দিতে পারে—তেমন তেমন সেনাপতি এবং আমার বিশিষ্ট অনুগতদের আহ্বান করলাম। আলোচনায় স্থির হলো যে এই দুর্গ যতদূর সম্ভব সুরক্ষিত করতে হবে এবং এটা রক্ষার জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করতে হবে। আমি ও কাশিম বেগ আমার বিশ্বস্ত অনুগামীদের নিয়ে রিজার্ভ দল গঠন করি। আমার জন্য নগরের মাঝখানে শিবির স্থাপন করে সেখানে প্রধান আস্তানা করা হলো। সেনাদলের অনেককে বিভিন্ন ফটকে পাহারা দেওয়া, দুর্গপ্রাচীর রক্ষা প্রভৃতি নানা কাজে নিযুক্ত ভাগে ভাগে করা হলো।

দুই তিন দিন বাদে সেবানি খাঁ অগ্রসর হয়ে নগর থেকে কিছু দূরে আস্তানা গাড়লো। এই সময় সমরকন্দ নগরের ও অন্যান্য জেলার কতকগুলো অপদার্থ গুণ্ডাশ্রেণীর লোক একত্রিত হয়ে—আল্লা মহান—এই আওয়াজ তুলে কলেজ ভবনের ফটকে এসে হাজির হলো। সেখান থেকে হৈ হুল্লোড় করে যুদ্ধযাত্রা করলো। সেবানি খাঁ সেই সময় রণসাজে সজ্জিত হয়ে আক্রমণের জন্য বেরোচ্ছিল। ওদের রণহুঙ্কার শুনে আর এগোতে সাহস করলো না। এইভাবেই কয়েক দিন কেটে গেল। অজ্ঞ জনতা কোন দিনই নিক্ষিপ্ত শর বা তরবারির আঘাত যে কি ব্যাপার তা

জানতো না। তারা কোনও দিন সম্মুখ যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়নি, যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা যে কি ভয়াবহ—তারও কোন অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। সেবানি খাঁর নিশ্চেষ্টতা দেখে তাদের সাহস বেড়ে গেল। তারা দুঃসাহস-ভরে তাদের জায়গা ছেড়ে অনেকদূর এগিয়ে গেল। অভিজ্ঞ বয়স্ক লোকেরা তাদের এগিয়ে আক্রমণ করার কাজটা নির্বুদ্ধিতা হবে বলে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু তারা সে উপদেশে কর্ণপাত না করে তাদের গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিল।

একদিন সেবানি খাঁ লৌহ ফটকের কাছাকাছি এসে আক্রমণ চালায়। গুণ্ডা জনতা এর মধ্যে বেশ সাহসী হয়ে উঠেছিল। তারা খুব বীরত্ব দেখিয়ে তাদের রীতি অনুসারে নগর থেকে অনেকটা দূর এগিয়ে গেল। আমি তাদের পিছন পিছন একদল অশ্বারোহী সেনা পাঠাই এই ভেবে যে—যদি ওদের পিছিয়ে আসতে হয় তাহ'লে ফেরার পথে অশ্বারোহী সৈন্যরা তাদের ঘিরে নিয়ে আসতে পারবে। উজবেকরা সকলে ঘোড়া থেকে নেমে হাতাহাতি লড়াই করে আমার পক্ষের জনতাকে লৌহ ফটক পর্যন্ত খেদিয়ে আনলে তারা ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়লো। মাটিতে দাঁড়িয়ে যারা যুদ্ধ করছিল তারা সরে পড়াতে জায়গাটা পরিষ্কার হতেই শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী সৈন্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে এগিয়ে এল। কুচ্ বেগ্ এই দেখে তরবারি নিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উজবেকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নগরবাসীরা তার অদ্ভুত বিক্রম দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। আক্রমণ-কারীরা তখন শর নিক্ষেপ করে যুদ্ধ করবার কথা ভুলে পিছন ফিরে পালাবার রাস্তা খুঁজছে। আমি ফটকের ওপর দাঁড়িয়ে শর নিক্ষেপ করে চলেছি। আমার সঙ্গীরাও অনবরত তীর ছুঁড়ছে। ওপর থেকে তীর বর্ষণের প্রাবল্যে শত্রুপক্ষ আর মসজিদ পর্যন্ত এগোতে পারলো না, তারা পিছিয়ে গেল।

অবরোধের সময় প্রতি রাত্রে কখনও কাশিম বেগ কখনও বা অন্যান্য বেগ ও সৈন্যাধ্যক্ষরা দুর্গপ্রাচীরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণের কাজ করতো। ফিরোজ গেট থেকে সেখজাদে গেট পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যেত। অন্য জায়গায় যেতে হলে অবশ্য পায়ে হাঁটা ছাড়া উপায় ছিল না। দুর্গের চারদিকে পর্যবেক্ষণ আরম্ভ হতো সন্ধ্যায়, আর শেষ হতো ভোরে।

সেবানি খাঁ একদিন লৌহ ফটক আর সেখজাদে ফটকের মাঝামাঝি জায়গায় আক্রমণ চালালো। আমি আমার রিজার্ভ সৈন্য নিয়ে আক্রান্ত স্থানের দিকে এগিয়ে গেলাম—সবুজ ফটক এবং সুঁচওয়ালা ফটকের দিকে

নজর না রেখে। সেই দিন সেখজাদে ফটকের ওপর থেকে আমি অভ্রান্ত-ভাবে একটা সাদা ঘোড়াকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করি। দেহে তীর ছোঁয়া মাত্র ঘোড়াটি প্রাণশূন্য দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিমধ্যে শত্রুসৈন্য প্রবলভাবে উষ্ট্রগ্রীবার দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে দুর্গপ্রাকারের কাছে কিছু জমি দখল করতে সক্ষম হয়। আমি যেখানে ছিলাম সেই দিককার শত্রুসৈন্য বিতাড়নের কাজে তখন আমি ব্যস্ত। বিপদ যে অন্যদিক থেকে আসতে পারে তা আমার ধারণার অতী‍ৎ ছিল। সেই দিক থেকে তখন শত্রুরা দেওয়াল টপকানোর ব্যবস্থা করে ফেলেছে পঁচিশ-ছাব্বিশ খানা মই দিয়ে। মইগুলি এমন চওড়া যে এক সারিতে দুই তিনজন চড়ে উঠে আসতে পারে। সেবানি খাঁ সাত আটশ' বাছাই করা সেনা ও মই নগর-প্রাচীরের ওধারে 'কামার' ও 'সুঁচওয়ালা' ফটকের মাঝামাঝি জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল, আর নিজে কয়েকজন সৈন্য নিয়ে অন্য জায়গায় আক্রমণ করবার ভান করছিল। এইজন্য বিপদ যে কোন্ দিক দিয়ে আসছে তার সঠিক ধারণা করতে পারিনি। শত্রুপক্ষের যে সৈন্যদল লুকিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, তারা যখন দেখ্‌লো যে প্রাচীরের অপর পাশে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেই—তখন তারা গুপ্ত জায়গা থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে দুই ফটকের মাঝা-মাঝি দুর্গ-দেওয়াল টপকানোর জন্য মই লাগিয়ে ফেললো। সুঁচওয়ালা ফটক পাহারার ভার ছিল কারা বিরলাসের ওপর এবং সবুজ ফটক পাহারার ভার ছিল সিরাম তাঘাই ও তার ভাইদের ওপর। যুদ্ধ অন্যদিকে হচ্ছে দেখে তারা বুঝতে পারেনি যে বিপদ এই দিক থেকে আসতে পারে। তারা তখন নিজ নিজ কাজে হয় বাড়িতে অথবা বাজারে ঘুরছে। আমীররা যে কয়েকজন চারিদিকে দৃষ্টি রেখেছিল—তাদের সঙ্গে মাত্র কয়েকজন লোক ছিল। যাহোক, কুচ্‌বেগ এবং আর একজন বীর অশ্বারোহী শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা সেদিন অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়েছিল। শত্রুপক্ষের কয়েকজন প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে এসেছিল আর কয়েকজন দেওয়াল টপকানোর উদ্যোগ করছিল। সেই সময় চারজন অনুচর বীরের মত খোলা তরবারি নিয়ে তাদের আক্রমণ করে. প্রাচীরের ওপারে তাড়িয়ে দেয় এবং তাদের পিছু হঠতে বাধ্য করে। সবচেয়ে বীরের কাজ করেছিল—কুচ্‌বেগ। তার এই বীরত্বের দৃষ্টান্ত চিরকাল স্মরণযোগ্য। এই অবরোধের সময় দুইবার সে অত্যন্ত সাহসিক কাজ করে। কারা বিরলাস সুঁচওয়ালা ফটকে প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় শত্রু আক্রমণ ভালভাবে প্রতিহত করে। খাজা গোকুলতাস ও

কুল নাজের কয়েকজন অনুচর নিয়ে শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধ করে 'ধোবি' ফটকের কাছে। তারা পিছন দিক থেকে শত্রুসৈন্যকে প্রবলভাবে আক্রমণ করে। এইভাবে শত্রু আক্রমণ নিষ্ফল হয়।

আর একবার কাশিম বেগ ছোট একদল সৈন্য নিয়ে 'সুঁচওয়ালা' ফটক দিয়ে বেরিয়ে এসে উজবেক্‌দের পরাস্ত করে। তাদের কয়েকজনকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে শিরশ্ছেদ করে। তারপর তাদের মাথা নিয়ে ফিরে আসে।

শস্য পাকার সময় হয়েছে—কিন্তু নতুন ফসল ঘরে তোলার উপায় নেই। অবরোধ চলছিল অনেকদিন ধরে। দুর্গ-নগরবাসীরা অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়লো। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে গরীব আর নীচুজাতের লোকেরা কুকুর আর গাধার মাংস খেতে বাধ্য হলো। ঘোড়ার খাদ্যের অভাব হওয়ায় তাদের গাছের পাতা খাওয়ানো হচ্ছিল। পরীক্ষা করে দেখা গেল তুঁত গাছের পাতা তাদের খাদ্যের পক্ষে ভাল। কেউ কেউ গাছের বাক্‌লা জলে ভিজিয়ে ঘোড়াকে খাওয়াতে আরম্ভ করলো। তিন চার মাস সেবানি খাঁ দুর্গের কাছে আসেনি; দুর্গ থেকে কিছু দূরে চার দিক্‌ ঘিরে রেখেছিল এবং মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্তন করছিল।

এক গভীর রাতে যখন সকলেই বিশ্রাম করতে গিয়েছে, সেবানি খাঁ রণ-দামামা বাজিয়ে রণহুঙ্কার তুলে 'ফিরোজ' গেটের দিকে এগিয়ে এলো। কলেজ ভবনে ছিলাম তখন আমি। খুবই আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম সেদিন। এরপর প্রায় রাত্রেই তারা দামামা বাজিয়ে ঐ রকম হুঙ্কার ছাড়তে লাগলো। আমার চারিদিকে সামন্তরাজ এবং সর্দারদের কাছে দূত পাঠিয়ে আমাকে সাহায্য করবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম, কিন্তু কারও কাছ থেকেই কোন সাড়া পাওয়া গেল না। যখন আমি ক্ষমতার উচ্চশিখরে উঠেছিলাম তখন চেয়েও অনেক সময় কারও কাছ থেকে সময় মত কোনও সাহায্য পাইনি। অথবা তা না পেলেও তখন আমার কোনও অস্বস্তি বা ক্ষতি হয়নি। সুতরাং যখন আমি বিপদের চরম সীমায় এসে পৌঁছেছি, তখন যে কারও সাহায্য পাব না সেটা তো জানা কথা। সুতরাং অবরুদ্ধ অবস্থায় যখন চরম দুর্দশায় পড়েছি তখন আমার এই অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কেউ আশার আলো জ্বালাবে এমন মনে করাও ভুল। প্রাচীন মহাজনরা বলেছেন—দুর্গ রক্ষা করতে হলে চাই মাথা, দুই হাত আর দুই পা। মাথা হচ্ছে—সেনাপতি, দুই

হাত হচ্ছে দুই দল মিত্র বাহিনী, যারা দুইদিক দিয়ে এগিয়ে আসবে, আর দুই পা হচ্ছে দুর্গের মধ্যে জল আর পর্যাপ্ত রসদের ব্যবস্থা।

তাম্বলকে আন্দেজান থেকে অগ্রসর হতে দেখে আমেদ বেগ আর তার কয়েকজন অনুচর সুলতান মামুদ খাঁকে তার গতিরোধ করার জন্য অনুরোধ করে। দুইদলের অবশ্য লেক্‌লেকন্ সীমায় দেখা হলো—কিন্তু কোন দলই আক্রমণ শুরু করলো না। সুলতান মামুদ খাঁ মোটেই যোদ্ধা ছিলেন না। যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি একেবারেই. অজ্ঞ ছিলেন। যখন তাম্বলের সামনে তিনি দাঁড়ালেন—তাঁর ব্যবহার দেখে মনে হ'লো তিনি কথায় ও কাজে কাপুরুষ। আমেদ বেগ ছিল রূঢ়ভাষী কিন্তু তার মনিবের কাজে বিশ্বস্ত এবং সাহসী। সে রূঢ়ভাবে খাঁকে বলেছিল—তাম্বল এমন কি জাঁদরেল লোক যাকে দেখে আপনি ভয়ে আতঙ্কে একেবারে মুষড়ে পড়লেন? যদি আপনার তাকে চোখে দেখতে ভয় করে তাহ'লে চোখ দুটো বেঁধে ফেলুন। তারপর আসুন তার সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়ি।

॥ ১০ ॥

১৫০১ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

অবরোধ কয়েকদিন ধরে চলছে। রসদ এবং অন্যান্য দরকারী জিনিসও বাইরে থেকে আর আসছে না। কোনও জায়গা থেকে সাহায্য পাওয়ারও আর বিন্দুমাত্র আশা নেই। এই অবস্থায় আমার সেনারা আর নগরবাসীরা মনোবল হারিয়ে ফেলে দুই-এক জন করে ক্রমশঃ আমার দল ছেড়ে চলে গেল। সেবানি খাঁ নগরবাসীদের দুর্দশার কথা জানতে পেরেছিল। সে সুযোগ বুঝে প্রেমিক গুহার কাছে এগিয়ে এসে শিবির স্থাপন করলো। এই বিপদের সময় দশ-পনেরো জন অনুচর সঙ্গে নিয়ে উজুন হাসান নগরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। জাহাঙ্গীর মির্জার বিদ্রোহের সময় যার ফলে আমাকে পূর্বে সমরকন্দ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল, এই উজুন হাসানই ছিল সে বিদ্রোহের প্রধান চক্রান্তকারী। তারপরও সে বরাবর বিদ্রোহ ও রাজদ্রোহিতার কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

খাদ্যাভাব এবং নানা দুর্দশায় কাবু হয়ে পড়েছে আমার সৈন্য আর নগরবাসীরা। যে সব লোক আমার সঙ্গে বরাবর ছিল এবং যারা আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিল তারাও দুর্গপ্রাচীর টপকিয়ে পালাতে শুরু করলো। কোনও দিক থেকে কোনও সাহায্য পাওয়ার আশা নেই দেখে আমিও হতাশ হয়ে পড়লাম। এমন কোনও দিকই চোখে পড়লো না— যে দিক থেকে আশার ক্ষীণ আলোও দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের রসদ এবং দরকারী জিনিস প্রথম থেকেই পর্যাপ্ত ছিল না। এখন তা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেল, আর নগরে রসদ আনারও উপায় নেই। এই অবস্থায় সেবানি খাঁ কতকগুলো শর্ত করে পাঠালো। যদি কোনও সাহায্য পাওয়ার আশা থাকতো অথবা যদি সামান্য কিছুও খাদ্যসামগ্রী মজুদ থাকতো তাহ'লে কখনও আমি তার কথায় কর্ণপাত করতাম না। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আমি দুর্গ সমর্পণে স্বীকৃত হই এবং গভীর রাতে আমার মা খানুমের সঙ্গে দুর্গ ছেড়ে চলে আসি। আর দুইজন মহিলাও আমাদের সঙ্গে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। কিন্তু আমার বড় বোনকে ওরা আটকায় এবং সে সেবানি খাঁয়ের হাতে পড়ে। রাতের অন্ধকারে আমরা অনেকবার পথ হারিয়ে ফেলি এবং অনেক কষ্ট ভোগ করে ভোর নাগাদ দিদার অতিক্রম করি। সকালবেলায় নমাজের সময় 'কার বোঘ' পাহাড়ে পৌঁছে যাই। পথে আমি কামবার আলি আর কাশিম বেগের সঙ্গে ঘোড়-দৌড়ের পাল্লা দিই। আমার ঘোড়াই অবশ্য আগে আগে ছুটছিল। কতদূরে এগিয়ে এসেছি দেখার জন্য যেমন পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়েছি, অমনি ঘোড়ার জিন যেটা আল্‌গা বাধা ছিল সেটা ঘুরে গেল, আর আমিও মাথা নীচু করে মাটিতে পড়ে গেলাম। আমি আবার মাটি থেকে লাফিয়ে উঠে ঘোড়ায় চেপে বসলাম, কিন্তু পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি যেন জ্ঞান-হারা হয়েছিলাম। এই জগতের সমস্ত কিছুই যেন ধোঁয়াটে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল, ইন্দ্রিয়ের সমস্ত শক্তিই যেন লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

সান্ধ্য নমাজের পর আমরা একটা গ্রামে পৌঁছাই। সেখানে একটা ঘোড়া জবাই করে তার মাংস খণ্ড খণ্ড করে কেটে সেই মাংস খাই। সেখানে ঘোড়াদের বিশ্রামের জন্য কিছুক্ষণ আমরা অপেক্ষা করি। তারপর আবার রওনা হয়ে পরদিন ভোরে 'দিজাক্‌' নামে এক গ্রামে পৌঁছে যাই। এখানে আমরা পেলুম সুন্দর চর্বিওয়ালা মাংস, ভাল সেঁকা গমের রুটি, মিষ্টি ফুটি আর প্রচুর রসালো আঙ্গুর। সুতরাং দুর্ভিক্ষের চরম সীমা থেকে

পৌঁছে গেলাম প্রাচুর্যে, দুর্বিপাক আর বিপদের সীমানা থেকে পৌঁছে গেলাম শান্তি আর আরামের রাজ্যে।

(তুর্কি) 'দুঃখ কষ্ট অনাহার ফেলে দূরে
এলাম চলে এক শান্তির দেশে।
লাভ করলাম নতুন জীবন,
পৌঁছে গেলাম সুন্দর পরিবেশে।'

(ফারসী) 'মন থেকে মৃত্যুভয় মুছে গেলো
ক্ষুধার নির্মম জ্বালা দূর হ'লো,
(জীবনে) সুষমা পেলাম ফিরি অবশেষে।'

আমার সমগ্র জীবনে এমন আনন্দ আর কোনও দিন পাইনি। এমন শান্তি ও প্রাচুর্যের উপলব্ধিও আর কোনও সময়েই আমার হয়নি। চার-পাঁচবার দুঃখকষ্টের পর আরাম এবং অভাব থেকে প্রাচুর্যে উত্তীর্ণ হয়ে অসীম আনন্দ ভোগ করেছি। কিন্তু এই প্রথমবার আমি শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে যে নিরাপত্তাবোধ এবং ক্ষুধার পীড়া থেকে পরিত্রাণ-লাভ করে যে প্রাচুর্যের স্বাদ পাই তার তুলনা হয় না। দুই-তিন দিন 'দিজাকে' বিশ্রাম এবং আনন্দ ভোগ করে 'দেখাটের' দিকে অগ্রসর হই।

'দেখাট' এক উঁচু পর্বতের নীচে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা জাতিতে 'আর্য' হলেও তাদের বহু ভেড়া ও ঘোড়া আছে তুর্কিদের মতই। দেখাটে চল্লিশ হাজারের মত ভেড়া আছে। আমরা চাষীদের বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। আমি এখানকার একজন গ্রামের মোড়লের বাড়ীতে ছিলাম। বাড়ীর মালিকের বয়স সত্তর-আশি বছর। তাঁর মা তখনও বেঁচে ছিল—তার বয়স তখন ১১১ বছর। এই বৃদ্ধা মহিলার একজন আত্মীয় যখন তৈমুরের সৈন্য হিন্দুস্থান আক্রমণ করে তখন সেও তাদের সঙ্গে ছিল। এই ঘটনার কথা সেই বৃদ্ধার তখনও স্মৃতিতে ছিল এবং সে প্রায়ই সেই সব কথা আমাদের বলতো। যতদিন আমি দেখাটে ছিলাম নিকটের পাহাড়ে পাহাড়ে খালি পায়ে ঘুরে বেড়াতাম। পাহাড়ে খালি পায়ে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস করে দেখা গেল যে আমাদের পায়ের পাতা এমন শক্ত হয়ে উঠেছে যে পাথরকে আর পাথর মনে করতাম না। বিকেল এবং সন্ধ্যার নমাজের মধ্যে একদিন পাহাড়ী পথে চলতে চলতে দেখলাম যে একটি লোক পাহাড়ী সরু পথে একটা গরু নিয়ে যাচ্ছে। তার কাছে আমি পথের

নিশানা জানতে চাইলাম। সে বললো—আমার গরুর দিকে নজর রাখো। যতক্ষণ না এই রাস্তার মাথায় পৌঁছায় ততক্ষণ এই গরুর দিক ছাড়া অন্য দিকে দৃষ্টি দিও না, তা হলেই তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে। খাজা আসাদুল্লা লোকটির রসিকতা উপভোগ করে টিপ্পনী কেটে বললো—আমাদের মত জ্ঞানী লোকের কি অবস্থা হবে যদি এই গরুটি পথ ভুল করে।

শীতকালে আমার অনেক সেনা এখানে দলবেঁধে লুঠতরাজের সুযোগ নেই দেখে আন্দেজানে ফিরে যাওয়ার জন্য আমার কাছে অনুমতি চাইলো। কাশিম বেগ আমাকে উপদেশ দিল যে যখন এরা ফিরে যেতে চাইছে তখন এদের সঙ্গে জাহাঙ্গীর মির্জাকে আমার কোনও একটা পোশাকের জিনিস উপহার হিসাবে পাঠালে ভাল হয়। আমি একটা উদ্বিড়ালের চামড়ার টুপি পাঠালাম। কাশিম বেগ তারপর আবার বললো—তাম্বলকেও কোনও একটা উপহার পাঠালে কি বিশেষ কোনও ক্ষতি হবে? যদিও তার এই উপদেশে আমি মনে মনে সায় দিইনি, তবুও তার উপর্যুপরি অনুরোধে তাম্বলকে সমরকন্দে তৈরী একটা বড় তরবারি পাঠালাম। ঠিক এই তরবারিই পরে কেমন করে আমারই মাথায় এসে পড়েছিল সে কথা পরের বছরের ঘটনার মধ্যে উল্লেখ করবো।

কয়েক দিন পরে আমার ঠাকুমা—যিনি সমরকন্দ ছেড়ে আমার সঙ্গে আসতে পারেননি—তিনি এই সময় পরিবার-পরিজন এবং ভারী আসবাব-পত্র এবং কয়েক জন ক্ষুধায় পীড়িত ক্ষীণকায় অনুচর নিয়ে আমার কাছে এসে পৌঁছলেন।

শীত ঋতুতে খোজেন্দের নদীর জল জমাট বরফ হয়ে যায়। সেই সময় সেবানি খাঁ সেই নদী অতিক্রম করে খোজেন্দে পৌঁছায় এবং এই দেশ বিধ্বস্ত করে। আমি এই সংবাদ পেয়ে আমার সৈন্যসংখ্যা নগণ্য হলেও আক্রমণের জন্য খোজেন্দের দিকে অগ্রসর হই। দারুণ শীত। ঠাণ্ডা হাওয়ার তাণ্ডব অবিরাম চলেছে। শীতের তীব্রতা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। দুই-তিন দিনের মধ্যে অসহ্য শীতের দরুণ আমার কয়েকজন অনুচর প্রাণ হারালো। এই সময় দেহের পবিত্রতার জন্য ধর্মের অনুশাসনে আমার অবগাহন করার প্রয়োজন হলো। একটা ছোট নদীতে স্নানের জন্য নেমে গেলাম। নদীর তীরের কাছাকাছি জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। মাঝখানে শুধু জল চোখে পড়ছে, কারণ সেখানে স্রোত বইছে। সেই জলে আমি নেমে গেলাম

এবং ষোল বার ডুব দিলাম। কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল আমার সর্বদেহে সূঁচ ফোটাতে লাগলো। পরদিন সকালে খোজেন্দের নদীর জমাট বাঁধা বরফের ওপর দিয়ে পার হয়ে এলাম। সেবানি খাঁ তার আগেই সে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে।

লুণ্ঠনকারী উজবেকরা সরে পড়েছে এই বিবরণ পেয়ে আমি এই সংবাদ লোক মারফৎ খাঁকে জানিয়ে দিই। মোল্লা শাইদারের ছেলে মোমিন সমরকন্দে পরিচয় হয়েছিল—এই সূত্রে গোকুলতাস এবং আরও কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করে। আমি যখন বেস্‌কন্দ থেকে চলে আসি—তখন এই দল এখানেই থেকে যায়। একটা খাড়া পাহাড়ের ওপর ভোজের আয়োজন করা হয়। পরদিন সকালে সংবাদ পাই যে মত্ত অবস্থায় গোকুলতাস খাড়া পাহাড় থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে। আমি হক্‌ নাজিরের সঙ্গে কয়েকজন সৈন্য দিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করতে পাঠাই—যেখান থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। বেস্‌কন্দে কবর দিয়ে তারা আমার কাছে ফিরে আসে। উৎসবের জায়গা থেকে কিছু দূরে তারা গোকুলতাসের মৃতদেহ দেখতে পায় একটা খাড়াইয়ের তলে। অনেকেই সন্দেহ করে যে মোমিন গোকুলতাসের ওপর তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই তাকে এই-ভাবে হত্যা করেছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কি তা অবশ্য কেউ জানে না। তার মৃত্যুতে আমি শোকে অভিভূত হয়ে পড়ি। জীবনে খুব অল্প লোকের অভাবেই আমি এমন বিহ্বল হয়েছি। প্রায় দশদিন আমি অবিরাম অশ্রু-বর্ষণ করি। কয়েকদিন পরেই আমি দেখাটে ফিরে আসি।

দেখাট জায়গাটা সমতলভূমি। সেখান থেকে চলে এলাম মাসিখার পার্বত্য প্রদেশে—যেখানে ঝরণার জল পাওয়া যায়। ঝরণার ধারে আমার একটি কবিতা প্রস্তরে খোদাই করে রাখার ব্যবস্থা করি।

> 'মহান্‌ জেমসিদ, এক ঝরণার ধারে
> রেখেছেন বাণী তাঁর পাথরে খোদাই করে।'
> "এই ঝরণার ধারে, আমাদের মত
> লয়েছে বিশ্রাম, লোক অগণিত।
> তারপর নিমিষে মুছে গেছে
> সেই স্মৃতি পৃথিবীর বুক থেকে।
> যদি বা করিতে পারি এ জগৎ জয়

ব্যক্তিত্ব ও বাহুবলে,
তবুও সে গৌরব পারিব না করিতে বহন
নিজ সাথে।
জীবনের পরপারে যখনই যাব চলে।”

এই পার্বত্য প্রদেশে কবিতা বা অন্য কোনও অনুলিপি পাথরে খোদাই করে রাখার রেওয়াজ আছে।

এই সময়ে কবি মোল্লা হাজারি আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমি এই কবিতাটি তখন রচনা করি।

‘শিল্পী তোমার ছবি আঁকুক
যতই নিপুণ হাতে,
(সেই) ছবির চেয়ে তুমি যে মহীয়ান্।
লোকে তোমায় আত্মা বলুক
যতই গরব করে,
(সেই) আত্মা থেকে তুমি যে গরীয়ান।’

কবিতা লেখার চল্‌তি রীতি অনুযায়ী আমি একটি কবিতা লিখি। ছন্দ নির্ভুল হলো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। কবিতার রীতি ও গাঁথুনির নিয়ম সম্বন্ধে আমার কোনও পড়াশোনা ছিল না। খাঁ অবশ্য কবিতার রীতিনীতিতে ওয়াকিবহাল বলে অহঙ্কার করতেন। তিনি কবিতা লিখতেও পারতেন, যদিও তাঁর কবিতার ছন্দভঙ্গী ও বিষয়বস্তু খুবই কাঁচা রকমের ছিল। আমার কবিতাটি তাঁকে দেখিয়ে এর ছন্দ সম্বন্ধে আমার সন্দেহের কথা বলি। কিন্তু তিনি আমার সন্দেহ দূর করার মত কোনও জোরালো সদুত্তর দিতে পারেননি। বাস্তবিক পক্ষে কবিতার রীতিনীতি বিচার করবার মত তাঁর কোনও গভীর জ্ঞান ছিল না। আমার চারপদী কবিতাটি হচ্ছে এই :—

(তুর্কি) ‘যে জন বিপাকে পড়ে, স্মরণ কি করে তারে কেউ ?
নির্বাসিত জনের মনে ওঠে কি সুখের ঢেউ ?
আনন্দ গিয়েছে চলে মন থেকে, আমি পরবাসী।
নাই শান্তি নাই সুখ, যত আমি হই না সাহসী।’

আমি অবশ্য পরে জানতে পেরেছিলাম কাব্য রচনায় কবির যে স্বাধীনতা আছে তাতে তুর্কি ভাষায় 'তে' এবং 'ডাল্' ও 'গায়েন্', 'ক্বাফ্' ও 'কাফ্' ছন্দ মেলাতে প্রায়ই একটার বদলে আর একটা ব্যবহার করা চলে।

পরদিন সকালে আমার সেনারা একটি শিকারের দল গঠন করে কাছাকাছি শিকার করতে আরম্ভ করে, তারপর এগিয়ে গিয়ে 'বুরাকে' গিয়ে থামে। আমার প্রথম লেখা গীতি-কবিতাটি এইখানে শেষ করি।

কবিতাটি এই :—

'নিজ আত্মা ছাড়া
পাই নাই, কোনও কালে
হিতৈষী বিশ্বাসী বন্ধু
এই ভূমণ্ডলে।

অন্তরের বাণী ছাড়া,
আর কোনও বাণী
পাই নাই, শুনি নাই,
যে বাণী দেখাবে পথ,
ঘুচাবে মনের গ্লানি।
নিজের হৃদয় ছাড়া
আর কোনও বন্ধু নাই মোর
এই ধরাতলে।'

আমার কবিতাটি বার পংক্তির। এরপর আমি যতগুলি গীতি-কবিতা রচনা করেছি—সবগুলি এই রকম বার পংক্তির।

এখান থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে খোজেন্দের নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছাই। নদীর অপর পারে পৌঁছিয়ে একদিন একটি উৎসব উপলক্ষে ভোজের ব্যবস্থা করি। তাতে আমার সমস্ত কর্মচারী আর তরুণ সেনারা আনন্দে যোগ দেয়। সেইদিনই আমার কোমরবন্ধের সোনার আঁকড়াটি চুরি যায়।

॥ ১১ ॥

১৫০২ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

এই বছর তাসকন্দে থাকার সময় আমি অসহনীয় দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ি। দেশ বলে আমার কিছু নেই, আর সে আশাও রাখি না। অভাবের তাড়নায় আমার ভৃত্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল তারাও দারিদ্র্যের জন্য আমাকে অনুসরণ করতে পারেনি। যখন আমি মাতুলের দরবারে আসি, তখন মাত্র দুই-এক জন ভৃত্য আমার কাজের জন্য ছিল। তবে এক বিষয়ে আমার সৌভাগ্য বলতে হবে যে আমার এই অবস্থা কোনও অপরিচিত লোকের নজরে পড়েনি—শুধু আমার নিজের আত্মীয়দের কাছেই ধরা পড়েছিল। মাতুলকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি খালি পায়ে, খালি মাথায় শা' বেগমকে শ্রদ্ধা জানাতে গেলাম—ঠিক তেমনি স্বাধীনভাবে যেমন স্বাধীনতা লোকে নিজের বাড়ীতে ভোগ করে থাকে।

শেষ পর্যন্ত আমার এই অনিশ্চিত জীবনযাত্রায় আমি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ি। গৃহহীন, ভবঘুরে অবস্থার যন্ত্রণা যেন আর সহ্য করতে পারছি না। বেঁচে থাকাটাও যেন দুঃসহ বলে মনে হচ্ছে। ভাবলাম, এই বিড়ম্বিত জীবনযাপন করার চেয়ে দূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোনও নিভৃত জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করি যেখানে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না, আমার পরিচয়ও জানতে পারবে না। জনসমাজে আমার এই দুঃখ-দুর্দশা এবং হীনতা দেখিয়ে বেড়ানোর চেয়ে যতদূর আমার পা চলে পালিয়ে যাওয়াই ভাল। মনে করলাম চীনে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে নতুন করে ভাগ্যের সন্ধান করি। শৈশবকাল থেকেই চীনে যাবার স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি—কেননা আমি ছিলাম রাজা এবং আত্মীয়স্বজন ও প্রজাসাধারণের প্রতি কর্তব্য উপেক্ষা করে দূরে যাওয়া চলে না। এখন রাজার মুকুট মাথা থেকে খসে পড়েছে, আমার মাও তাঁর মা ও ছোট ভাইয়ের কাছে আশ্রয় পেয়েছেন। সুতরাং এখন আর আমার দূরে সরে যাওয়ার বাধা কোথায়? আমার সব দায়িত্ব শেষ হয়েছে। আবুল মকারামের মারফৎ আমি এই কথাটা প্রচার করতে চেয়েছিলাম যে সেবানি খাঁর মত দুর্দ্ধর্ষ লোক যখন একবার শত্রুতা আরম্ভ করেছে তখন তুর্কি হোক—কি মোগলই

হোক সকলেরই ভয়ের কারণ আছে। সুতরাং যাযাবর তাতারদের সম্পূর্ণ-ভাবে বশীভূত করার আগেই তার কার্যকলাপের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার যাতে সে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে। কারণ কথায় আছে—

'থাকিতে সময় নেভাও আগুন,
বিলম্ব ঘটিলে, হবে নিদারুণ,
জগৎ জ্বলিবে দাউ দাউ করে
যদি না সময়ে নেভাতে পার।
শত্রুধনুতে শর সংযোজন
করিতে দিওনা, হবে অঘটন।
চকিতে তুলিয়া তীর ধনু করে
আগেই যদি না আঘাত কর।'

এ ছাড়া প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বছব খাঁ তাঁব ভাইকে অর্থাৎ আমার ছোট-মামাকে দেখেননি এবং আমিও তাঁকে কোনও দিন দেখিনি। সুতরাং আমি ভাবছি যে এইবাব ছোটমামাব কাছে চলে যাই এবং মধ্যস্থ হয়ে যাতে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে পুনবায় দেখা-সাক্ষাৎ হয় তার ব্যবস্থা কবি।

এই কথাগুলো প্রচাব কবাব আমাব উদ্দেশ্য হলো যে এই দল করে আমি আমার আত্মীয়দের কাছ থেকে দূরে সরে যাব। আমি স্থির সিদ্ধান্ত করি যে এখান থেকে সবে পড়ে মোগলিস্থানে চলে যাব এবং নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করবো। আমাব মতলবের কথা ঘুণাক্ষরেও কাবও কাছে প্রকাশ করিনি, কারণ এটা প্রকাশ করবার মত কথা নয়। আমার ইচ্ছাটা মাকে জানালে তিনি এতে কিছুতেই মত দেবেন না। তা ছাড়া, যে সব সঙ্গীরা এখনও আমার অনুগত রয়েছে ও আমার ভবঘুরে জীবনে দুঃখকষ্টের অংশভাগী হয়েছে, তারা এখনও মনে মনে ভিন্ন রকমের আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আছে। সুতরাং আমার মনের কথা তাদের কাছেও প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। আবুল মকারাম অবশ্য শা' বেগম ও আমার মামার কাছে আমার শেখানো কথাটা জানিয়ে দিল এবং তাঁদের অনুমতিও পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁদের পরে মাথায় এলো যে আমাকে যথারীতি আদর-আপ্যায়ন করা হয়নি বলেই বোধ হয় আমি দূরে সরে যেতে চাচ্ছি। তাঁদের এই সন্দেহের জন্যই তাঁরা আমাকে দূরে চলে যাওয়ার অনুমতি দিতে বিলম্ব

করলেন। এই সময় আমার ছোটমামার কাছ থেকে একজন লোক এসে জানালো যে তিনি নিজেই এখানে আসছেন। আমার দূরে চলে যাওয়ার অভিসন্ধিটা এইভাবে একদম ভেস্তে গেল। ছোটমামার কাছ থেকে আর একজন লোক প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসেই জানালো যে তিনি প্রায় এসে পড়েছেন। শা' বেগম এবং আমরা আর সকলে ছোটমামার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়লাম।

আমরা 'ইয়েমা' পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। ছোট খাঁ কখন ঠিক পৌঁছবেন জানতে না পেরে আমি ঘোড়ায় চড়ে অনির্দিষ্টভাবে দেশটা দেখবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ মুখোমুখি একেবারে ছোটমামার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। ঘোড়া থেকে নামতেই তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। কিন্তু মনে মনে তিনি অস্বস্তি ভোগ করছিলেন—তাঁর ইচ্ছা ছিল যে এক নির্দিষ্ট জায়গায় অবতরণ করে নিজ আসনে বসে আমাকে খুব জমকের সঙ্গে সম্বর্দ্ধনা জানাবেন। কিন্তু আমি হঠাৎ তাঁব সম্মুখে এসে পড়ায় তাঁর সে সুযোগ মিলল না। লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসলাম; তারপর তাঁকে আলিঙ্গন করলাম। তিনি উত্তেজিত এবং অভিভূত হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁর দুই পুত্র সুলতানদের ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে বসতে এবং আমাকে আলিঙ্গন করতে আদেশ করলেন। দুই সুলতানকে আলিঙ্গন কবে আবার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আমরা শা' বেগমের সঙ্গে দেখা করবার জন্য এগিয়ে গেলাম। কিছু পরেই ছোট খাঁর সঙ্গে শা' বেগমের সাক্ষাৎ হলো। খাঁ তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানালেন। তারপর তাঁরা পুরনো গল্প নিয়ে মাঝ রাত্রি পর্যন্ত মেতে রইলেন।

পরদিন ছোটমামা মোগলদের রীতি অনুযায়ী মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরার উপযোগী পোশাক ও সাজসরঞ্জামে সজ্জিত একটি ঘোড়া আমাকে উপহার দিলেন। পোশাকের মধ্যে ছিল সোনার সুতো[illegible] নক্সা করা একটা মোগল টুপি। চায়না সাটিনের একটা লম্বা আলখাল্লা—তাতে সুঁচে তোলা নানা ফু[illegible]ের নক্সা, একটা পুরনো রীতিতে তৈরী বুক-পিঠ ঢাকার চীনা বর্ম, একটা শান দেওয়ার পাথর, একটা টাকা রাখার থলি, সেই থলির একপাশে ঝুলছে কয়েকটা জিনিস, যেমন মেয়েরা গলায় পরে এমন অল্পদামের মণি, সুগন্ধি মাটি রাখবার ছোট্ট কৌটা। থলির অন্য পাশেও এমনি তিন চার রকমের জিনিস ঝোলানো আছে।

এখান থেকে আমরা তাসকন্দের দিকে ফিরে চললাম। আমার বড়-মামা তাসকন্দ থেকে বেরিয়ে ষোল মাইল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন। একটা সামিয়ানা খাটিয়ে তারই নীচে তিনি বসেছিলেন। ছোট খাঁ সোজা-সুজি তাঁর সম্মুখে এসে বড় খাঁর বাঁদিকে ঘুরে গেলেন এবং চক্রাকারে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে তাঁর সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামলেন এবং তাঁকে সেলাম জানিয়ে নতজানু হলেন। তারপর এগিয়ে এসে তাঁকে অলিঙ্গন করলেন। ছোট ভাই আসার সঙ্গে সঙ্গে বড় ভাই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে দুই ভাই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। আলিঙ্গনের পর ছোট ভাই আবার নয় বার নতজানু হলেন। রীতি অনুযায়ী বড় খাঁকে উপঢৌকন দেওয়ার সময়ও তিনি বারংবার নতজানু হচ্ছিলেন। উপহার দেওয়ার পর তিনি নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। ছোট খাঁর লোকজনও মোগল পোশাকে সজ্জিত ছিল। মাথায় তাদের মোগল টুপি। চায়না সাটিনের আলখাল্লা গায়ে—তাতে ফুলের নক্সা, কাঁধে ঝুলছে তূণীর। ঘোড়ার জিন সবুজ রঙের মোটা চামড়ার এবং ঘোড়া-গুলিও মোগল প্রথায় সজ্জিত।

ছোট খাঁ অল্পসংখ্যক লোক সঙ্গে এনেছিলেন। তারা সংখ্যায় এক হাজারের বেশী কিন্তু দু'হাজারের কম। তিনি বলিষ্ঠ এবং সাহসী পুরুষ, তরবারি চালনায় নিপুণ এবং সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তরবারির উপরেই তাঁর আস্থা ছিল বেশী। তিনি বলতেন দণ্ড, বর্শা, কুঠারের ওপর একবারই মাত্র নির্ভর করা যায়। প্রথম আঘাত ব্যর্থ হলে আর কোনও উপায় থাকে না। তাঁর বিশ্বাসী তীক্ষ্ণ তরবারি কখনও তিনি দূরে রাখতেন না, হয় সেটা থাকতো তাঁর কোমরে বাধা—না হয় তাঁর হাতে। তিনি শিক্ষালাভ করে-ছিলেন ভিন্ন দেশে এবং গৃহ থেকে দূরেই অনেকদিন কাটিয়েছিলেন। সেই-জন্য তিনি ব্যবহারে ছিলেন একটু রুক্ষ এবং কথাবার্তায় কর্কশ। যখন আমি ছোটমামার সঙ্গে ফিরে আসি তখন আমার সর্বাঙ্গ পূর্ববর্ণিত মোগল সাজে সজ্জিত। আবুল মকারাম আমাকে চিনতে পারেনি। জিজ্ঞেস করেছিল —এই সুলতানটি কে? যতক্ষণ আমি কোনও কথা বলিনি সে আমাকে চিনতেই পারেনি।

তাসকন্দে ফিরেই দুই খাঁ সুলতান আমেদ তাম্বলের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন। ছোট খাঁ আর আমি আগেই চলে যাই। পার্বত্য পথ অতিক্রম করবার পর সৈন্যসংখ্যা গণনা করে দেখা গেল—

অশ্বারোহী সেনা প্রায় ত্রিশ হাজারের মত হবে। কাছাকাছি দেশ থেকে খবর এসে পৌঁছলো যে তাম্বলও তার সৈন্য নিয়ে আখ্সির দিকে অগ্রসর হয়েছে। ছোট খাঁ পরামর্শ করে স্থির করলেন যে আমাকে একদল সৈন্য দিয়ে পাঠাবেন—যাতে আমি খোজেন্দের নদী পার হয়ে উসের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাম্বলের সৈন্যব্যূহর পেছন দিকে আক্রমণ করতে পারি। কারনান্ থেকে আমি খাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে খোজেন্দের নদী ভেলায় পার হয়ে যাই এবং দ্রুত উসের দিকে এগোতে থাকি। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উস্ দুর্গের কাছে পৌঁছে যাই। দুর্গরক্ষীরা তখন অসতর্ক অবস্থায় ছিল, আমাদের আগমনের সংবাদও তারা পায়নি। আর কোনও উপায় না দেখে তারা দুর্গ আমাদের হাতে সমর্পণ করে। সেখানকার অধিবাসীরা আমার খুবই অনুরক্ত ছিল এবং আমি কবে ফিরে আসব এই অপেক্ষা করছিল। কিছুটা তাম্বলের ভয়ে এবং কিছুটা আমি অনেক দূরে ছিলাম বলে তাদের নিঃস্বার্থ হয়েই থাকতে হয়েছিল। আমার উসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে আন্দেজানের পূর্ব ও দক্ষিণ থেকে এই পার্বত্য ও উপত্যকাবাসীরা দলে দলে আমার কাছে এসে উপস্থিত হতে লাগলো। উজকেন্দবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেখানকার সুদৃঢ় দুর্গটি আমার হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করলো। সীমান্তবর্তী উজকেন্দই এককালে ফারগানার রাজধানী ছিল। তারা একজন লোক পাঠিয়ে তাদের আনুগত্য জানালো। কয়েকদিন পর মারঘিনানের অধিবাসীরা সেখানকার গভর্নরকে আক্রমণ করে তাকে তাড়িয়ে আমার দলে যোগ দিল। খোজেন্দ নদীর তীরস্থ আন্দেজানের অংশবর্তী সমস্ত দেশের অধিবাসীরা কেবল আন্দেজান ছাড়া সব সুরক্ষিত স্থানের অধিকার আমার হাতে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলো। এই সময় যদিও অতগুলি সুরক্ষিত দুর্গ আমার অধিকারে চলে এল এবং সমস্ত দেশ জুড়ে তাম্বলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহজনিত গোলমাল শুরু হয়ে গেল—কিন্তু তাম্বল এতে একটুও বিচলিত না হয়ে তার সমস্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে আখ্সি ও কারনানের মাঝামাঝি জায়গায় ট্রেঞ্চ খুঁড়ে জায়গাটি সুরক্ষিত করে খাঁদের সৈন্যের মুখোমুখি হয়ে শিবির স্থাপন করে। দুই পক্ষের মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষ হলো বটে, কিন্তু তাতে কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হলো না।

আন্দেজানের চতুষ্পার্শবর্তী দুর্গ সহ অধিকাংশ জাতি ও উপজাতীয় লোক আমার বশ্যতা স্বীকার করলো। আন্দেজানের অধিবাসীরাও আমার পক্ষে চলে আসার জন্য খুবই উৎসুক ছিল কিন্তু তারা কোনও সুবিধা করে

উঠতে পারছিল না। আমি মনে করলাম এক রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে আন্দেজানের সীমানায় গিয়ে পৌঁছাই। সেখান থেকে একজন বিশ্বস্ত লোককে আন্দেজানের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে শলাপরামর্শ করার জন্য পাঠিয়ে দেব। যদি তারা আমার অভিপ্রায় মত কাজ করতে রাজি হয় তাহলে তাদের সাহায্যে যে কোনও উপায়ে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করবার ব্যবস্থা করে নিতে পারব। এই মতলব ঠিক করে একদিন সন্ধ্যায় উস্ থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং মাঝরাত্রের কাছাকাছি আন্দেজানের দুই মাইলের মধ্যে এসে পড়লাম। সেখান থেকে কামবার আলি বেগ্ ও আরও কয়েকজন বেগকে এগিয়ে যেতে বলি। তাদের উপদেশ দিই, তারা যেন গোপনে কয়েকজনকে খাজা এবং মাতব্বর লোকদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে পরামর্শ করবার জন্য পাঠিয়ে দেয়। তাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় আমি অনুচরদের নিয়ে সেই জায়গাতেই অশ্বপৃষ্ঠে অপেক্ষা করতে থাকি।

রাত্রি তখন প্রায় তিন প্রহর। আমাদের মধ্যে কতক তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঢুলছে, কেউ কেউ গভীর ঘুমে মগ্ন। এমন সময় হঠাৎ রণবাদ্য বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রণহুঙ্কারে স্থানটা সরগরম হয়ে উঠলো। আমার লোকেরা ঘুমের ঘোরে অভিভূত হয়েছিল। তারা বুঝতে পারলো না শত্রুপক্ষের কতজন লোক তাদের আক্রমণ করতে এসেছে। তারা ভয়ে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য এদিক-ওদিক ছুটে পালাতে লাগলো। দলবদ্ধ হয়ে পালাবার কথাও তাদের মনে হলো না। নিজের নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তারা তখন অত্যন্ত ব্যস্ত। আমার এমন সময় হলো না যে তাদের আবার একসাথে জুটিয়ে নিতে পারি। উপায়ান্তর না দেখে আমি শত্রুর দিকে তিনজন অনুচর নিয়ে অগ্রসর হলাম। এই চারজন ছাড়া আর সকলেই পালিয়ে গিয়েছে। আমরা একটু অগ্রসর হতেই শত্রুপক্ষ রণহুঙ্কার তুলে একঝাঁক শর নিক্ষেপ করে আমাদের আক্রমণ করলো। সাদা মুখ ঘোড়ায় চড়া একজন সেনা আমার কাছে এসে গেল। আমি একটি তীর ছুঁড়লাম। সেটা ঘোড়াকে বিঁধলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটি মরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। শত্রুপক্ষ একটু থমকে গেল। আমার তিনজন সহচর আমাকে বল্লো—এই রাতের অন্ধকারে শত্রুপক্ষের যে কতজন লোক আমাদের আক্রমণ করতে এসেছে বোঝা কঠিন। আমাদের দলের সমস্ত সেনাই পালিয়ে গিয়েছে। আমরা এখানে সংখ্যায় নগণ্য—মাত্র চারজন

লোক আছি। এই অল্প লোক নিয়ে আমরা শত্রুপক্ষের এমন কি ক্ষতির আশা করতে পারি? বরং আমাদের পলায়নপর সেনাদের পিছু নিয়ে তাদের একত্রিত করে এখানে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করাই ভাল।

দ্রুত অশ্বচালনা করে আমরা পলায়নপর সেনাদের ধরে ফেল্‌লাম। তাদের কয়েকজনকে চাবুক দিয়েও দস্তুরমত পেটা হলো। কিন্তু তাদের ফিরিয়ে আনার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। আবার আমরা চারজন ফিরলাম। আমাদের অনুসরণকারীদের ওপর একঝাঁক শরও নিক্ষেপ করলাম। শত্রুরা একটুখানি থামলো। কিন্তু যখন তারা দেখতে পেলো যে আমরা মাত্র চারজন তীর চালাচ্ছি, তখন তারা আমাদের যে সব সেনা পালাচ্ছে তাদের অনুসরণ করে তাদের ওপর অস্ত্র হানবার জন্য সেইদিকে ধাওয়া করলো। যখন দেখা গেল যে আমার সেনারা কিছুতেই যুদ্ধ করবে না, তখন তাদের রক্ষা করবার জন্য শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তিন-চারবার তীর চালিয়ে তাদের অগ্রগতিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করি। শত্রুসৈন্যরা এইভাবে আমাদের অনুসরণ করে পাঁচ-ছয় মাইল চলে আসে। আমি বল্‌লাম শত্রুসেনা বেশী দেখা যাচ্ছে না। এসো, আমরা একজোট হয়ে ওদের আক্রমণ করি। কিন্তু যখন আমরা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের আক্রমণ করার জন্য অশ্বের গতি বাড়িয়ে দিলাম, ফিরে চেয়ে দেখি আমার সৈন্যরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ছত্রভঙ্গ সৈন্যরা একে একে নানাদিক থেকে এসে হাজির হলো বটে, কিন্তু আমার সুদক্ষ সৈন্যদের মধ্যে এমনও অনেক ছিল যে তাদের ভয়ের ভাব তখনও দূর হয়নি। তারা সোজাসুজি উসে চলে গেল।

॥ ১২ ॥

রাতের নমাজের সময় আমরা খাকান্ নদী পার হয়ে তাঁবু গাড়লাম। ভোর হওয়ার আগে আমার সেনারা আরামে ঘুমোচ্ছে কামবার আলি সেই সময় ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে আসতে চীৎকার করছে—'দুশমনরা এসে পড়েছে, ওঠ, ওঠ।' কিন্তু সে এই কথা বলার পর এক মুহূর্তও না থেমে পালিয়ে গেল। আমার কোর্তা গায়ে দিয়ে শোয়া বরাবরই অভ্যাস। তাড়াতাড়ি তরবারি ও তীরপূর্ণ তূণীর নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। আমার পতাকাবাহী সৈনিক ঘোড়ার লেজের সঙ্গে পতাকাদণ্ড বাঁধবার সময় না

পেয়ে সেটা হাতে নিয়েই ঘোড়ায় চাপলো। শত্রু যে দিক দিয়ে আসছে আমরা সেই দিকেই ধাওয়া করলাম। যখন আমি ঘোড়ায় উঠি তখন আমার সঙ্গে মাত্র দশ-পনরো জন সৈনিক ছিল। কিছুদূর এগিয়েই আমরা শত্রুসৈন্যের দেখা পেলাম। আমরা তীর নিক্ষেপ করতে করতে অগ্রগামী শত্রুসৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলাম। তারপর আরও এগিয়ে গিয়ে শত্রুর প্রধান সৈন্যদলের সামনে এসে পড়লাম। শ' খানেক সৈন্য নিয়ে সুলতান আমেদ তাম্বল অপেক্ষা করছিল। তাম্বল চীৎকার করে তার সামনের সৈন্যদের বল্ছে—মার্, মার্ ওদের। কিন্তু তার লোকদের তখন দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। ভাব্ছে—পালাবো নাকি ? চল্ পালিয়েই যাই। কিন্তু তারা দাঁড়িয়েই ছিল। এই সময় দেখলাম—আমার সঙ্গে মাত্র তিনজন সৈনিক। যে তীরটা আমার ধনুকে লাগানো ছিল—সেটা তাম্বলের শিরস্ত্রাণ লক্ষ্য করে ছুঁড়লাম। তারপর তূণীর থেকে আর একটি তীর বের করলাম। সবুজ রঙের ফলা করে তীরটা আমার মামা খাঁ সাহেব আমাকে দিয়েছিলেন। এটাকে ছুঁড়তে দ্বিধা করে আবার তূণীরে রেখে দিলাম। আমার এই দ্বিধার জন্য যে সময় নষ্ট হলো তাতে ইচ্ছে করলে দুই দুইটা তীর নিক্ষেপ করতে পারতাম। আর একটা তীর ধনুকে জুড়ে অগ্রসর হলাম। তিনজন সঙ্গী আমার কিছু পিছনে ছিল। দুইজন লোক আমার দিকে এগিয়ে আসছে দেখা গেল—প্রথম জন তাম্বল। আমাদের মাঝে উঁচু রাস্তা। এক পাশ দিয়ে তাম্বল আসছে ঘোড়ায় চড়ে, আর আমি এক পাশ দিয়ে। রাস্তার ওপর আমরা এমনভাবে মুখোমুখি হলাম যে আমার ডান হাত ছিল শত্রুর দিকে—আর তাম্বলের ডান হাত ছিল আমার দিকে আক্রমণের ভঙ্গীতে। তাম্বল পুরোপুরি যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত ছিল। আর আমার সম্বল শুধু তলোয়ার আর তীর-ধনুক। যে তীরটি ধনুকে লাগানো ছিল--ছিলা আকর্ণ টেনে সেই তীরটা ছুঁড়লাম। আর ঠিক একই সময়ে আমার জানুতে গভীরভাবে বিদ্ধ হলো একটা তীর—যে তীরকে বলা হয় 'সিবা' তীর। আমার মাথায় ছিল ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ। তাম্বল ছুটে এসে আমার শিরস্ত্রাণের ওপর এমন তরবারির আঘাত করলো যে আমার জ্ঞান লোপ হওয়ার মত হলো। সে আঘাত আমার শিরস্ত্রাণের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি ;—কিন্তু আমার মাথায় গুরুতর ধাক্কা লাগে।

তরবারিতে শান্ দিয়ে ধারালো করে রাখতে অবহেলা করেছি। সেটাতে মরচে ধরে গিয়েছে। তাছাড়া, ওটা কোষ থেকে টেনে বের

করতেও দেরী করে ফেলেছি। অগণিত শত্রুর মধ্যে আমি একা সঙ্গীহীন। সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকারও কোনও অর্থ হয় না। ঘোড়ার বল্‌গা ঘুরিয়ে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আর এক তরবারির আঘাত পড়লো আমার তূণীরে বোঝাই তীরগুলির ওপর। সাত-আট পা পিছিয়ে যেতেই আমার তিনজন পদাতিক সেনা আমার কাছে এসে গেছে দেখতে পাই। তাম্বল তখন তরবারি হাতে নিয়ে দোস্ত নাসিরকে আক্রমণ করলো। যাহোক, তারা কিছুদূর আমাদের অনুসরণ করেছিল।

আরিখ্‌-খাকান-সা একটা বড় নদী। জলও খুব গভীর। যেখান-সেখান দিয়ে পার হওয়া যায় না। কিন্তু আল্লা আমাদের ঠিক পথেই চালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কারণ, যেখানে আমরা উপস্থিত হলাম সেখানে জল অগভীর, পার হওয়ার উপায় আছে। নদী পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দোস্ত নাসিরের ঘোড়া অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত দুর্বলতায় পড়ে গেল। দোস্ত নাসিরের জন্য আর একটা ঘোড়া জোগাড় করতে আমাদের সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তার পর পাহাড়ের মধ্যে নানা পথ দিয়ে আমরা উসের দিকে অগ্রসর হই। যখন আমরা পাহাড় অতিক্রম করে আসি তখন মজিদ তাঘাই আমাদের দেখা পেয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সে ডান হাঁটুর নীচে তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। তীরটি অবশ্য হাঁটুকে এফোঁড় ওফোঁড় করতে পারেনি। কিন্তু সে অনেক কষ্টে উসে পৌঁছতে পারে। শত্রু আমার অনেক ভাল ভাল লোককে হত্যা করেছে। এই সময়ে অনেক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যও শত্রুর হাতে প্রাণ দিয়েছে।

তাম্বলের পিছু পিছু অনুসরণ করে দুই খাঁ আন্দেজানের কাছাকাছি এসে ঘাঁটি পাতেন। আমি এগিয়ে আসতে ছোটমামাকে দেখতে পাই। প্রথম সাক্ষাতের সময় অতর্কিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং সরাসরি তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম বলে তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামবার সময় পান-নি। আমাদের সাক্ষাৎ সেবার সামাজিক রীতি অনুযায়ী হওয়া সম্ভব হয়নি। এইবার আমি কাছাকাছি যেতেই তিনি তাঁর তাঁবুর সীমানার বাইরে তাড়াতাড়ি চলে এলেন। উরুতে শরবিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণায় লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমাকে আসতে দেখে তিনি দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন—সাবাস্‌, বীরের মত কাজ করেছো। আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তিনি তাঁর তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গেলেন। তাঁর তাঁবু ছিল ছোট। তিনি মানুষ হয়েছিলেন সুদূর পল্লীতে; সেখানে শৃঙ্খলা ছিল না। এখানে

তাঁর বসবার জায়গাও মোটেই পরিচ্ছন্ন নয়—দেখে মনে হয় যেন লুটেরাদের আস্তানা। তরমুজ, আঙ্গুর এবং আস্তাবলের জিনিষপত্র সব তাঁর তাঁবুর চারপাশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে।

ছোটমামার কাছ থেকে চলে এলাম নিজের তাঁবুতে। তিনি তাঁর শস্ত্র-চিকিৎসককে আমার ক্ষত পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। অস্ত্রোপচার বিদ্যায় তিনি অত্যন্ত কুশলী। কারও মাথার ঘিলুও যদি বেরিয়ে আসে তিনি ওষুধ দিয়ে তাকে নিরাময় করতে পারেন। রক্তবাহী শিরা ছিঁড়ে গেলে তিনি তাও খুব সুন্দরভাবে তাড়াতাড়ি সারাতে পারতেন। কোনও কোনও ক্ষতে এক রকমের প্রলেপ লাগিয়ে দিতেন, কোনও কোনও আহত ব্যক্তিকে শুধু খাওয়ার ওষুধ দিতেন। আমার উরুর ক্ষতে তিনি কোনও শুক্‌নো ফলের ছাল লাগিয়ে দিলেন, যা তিনি আগেই তৈরী করে রেখেছিলেন। আমার ক্ষতে তিনি কোনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধলেন না। একবার মাত্র সরু শিকড়ের মত কি একটা জিনিষ খেতে দিয়ে বল্‌লেন—একবার একজন লোকের পায়ের হাড় এমনভাবে ভাঙ্গে যে এক হাত পরিমাণ হাড় একেবারে চূর্ণ হয়ে যায়। আমি সেই জায়গায় উপরের চামড়া কেটে ফেলে সেই চূর্ণ হাড় সবটাই বের করে ফেলি, তারপর সেইখানে এক রকম গুঁড়ো জিনিষ পুরে দিই। সেই গুঁড়ো ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে এবং শেষটায় হাড়ে পরিণত হয়। তার পা সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন পর একটা বিশেষ ঘটনা ঘটলো। এক রাত্রে তাম্‌বল প্রায় দুশো জন বাছাই করা সৈন্যের একটা দল কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে অতর্কিতে 'পাপ' দুর্গ অধিকার করার জন্য পাঠায়। এই দুর্গ পাহারা দেওয়ার কোনও রকম সতর্কতা না নিয়েই সৈয়দ কাসিম ঘুমোতে চলে গিয়েছিল। শত্রুপক্ষ দুর্গের কাছে উপস্থিত হয়ে মই লাগিয়ে দুর্গপ্রাচীরে ওঠে এবং ফটক অধিকার করে। তারপর পরিখার ওপর ঝোলানো সেতু নামিয়ে দিয়ে সৈয়দ কাসিম কি ব্যাপার ঘটছে জানবার আগেই সত্তর আশি জন লোক পরিখা পার হয়ে আসে। আধা-জাগ্রত হয়ে সে যেমনভাবে ছিল সেইভাবেই কেবলমাত্র একটা কোর্তা গায়ে দিয়ে পাঁচ ছ জন লোক সঙ্গে নিয়ে এসে কাসিম তীর ছুঁড়তে থাকে। উপর্যুপরি শরাঘাতে শত্রুপক্ষের লোকদের নিপীড়িত করে তাদের দুর্গের বাইরে বের করে দেয় এবং কয়েকজনের মাথা কেটে নিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। একজন সেনাপতির পক্ষে দুর্গ এমন অরক্ষিত অবস্থায় রেখে ঘুমোতে যাওয়া অন্যায় হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অতগুলি শত্রুসৈন্যকে হাতাহাতি লড়াইয়ে বিপর্যস্ত করে তাড়িয়ে দেওয়াও একটা অসমসাহসিক কার্য বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

এই সময় খাঁয়েরা দুই ভাই আন্দেজান দুর্গ অবরোধ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

শেখ বেজিদ তখন ছিল আখ্‌সিতে, সে যেন আমার স্বার্থ রক্ষার জন্য কতই না ব্যস্ত—এই ভাব দেখিয়ে আমাকে আখ্‌সিতে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে একজন দূতকে গোপনে আমার কাছে পাঠায়। এই আমন্ত্রণের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল আমাকে কোনও ছলে খাঁদের সঙ্গ থেকে বিচ্যুত করা। কারণ তার ধারণা হয়েছিল যে যদি আমি তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করি—তাহলে এদেশে কেউ আর তাঁদের সাহায্যকারী থাকবে না এবং তাঁরাও এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবেন। এই মতলব সে ঠিক করেছিল তার বড় ভাই তাম্‌বলের সঙ্গে পরামর্শ করে। খাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে আমি তাদের সঙ্গে যোগ দেব এটা আমার পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। আমার মাতুল খাঁদের এই আমন্ত্রণের কথা জানালাম। তাঁরা আমাকে যে কোন উপায়ে আখ্‌সিতে যাওয়ারই উপদেশ দিলেন এবং যেমন করে হোক শেখ বেজিদকে বন্দী করার কথা বল্‌লেন। কিন্তু কোনও রকম ছলনার আশ্রয় নিয়ে কাজ করা আমার স্বভাবের বিরোধী। আমাকে যেতে হলে সন্ধির ব্যবস্থা করতে হয়। সেক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গ করে নিজেকে হীন প্রতিপন্ন করতে পারি না। কিন্তু আমি একবার আখ্‌সিতে পৌঁছানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যদি কোনও উপায়ে শেখ বেজিদকে তার ভাই তাম্‌বলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে সুযোগ এলে সম্মানের সঙ্গেই সে সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এইজন্য আমি একজন লোককে আখ্‌সিতে পাঠাই। সে বেজিদের সঙ্গে একটা সন্ধিচুক্তি করলে বেজিদ আমাকে আখ্‌সিতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করে। আমিও আখ্‌সির দিকে রওনা হই। শেখ বেজিদ আমার সঙ্গে দেখা করে। আমার ভাই নাসির মির্জাকেও সে সঙ্গে নিয়ে আসে। আমাকে দুর্গের মধ্যে নিয়ে এসে সে চলে যায়। প্রস্তর দুর্গে আমার বাবার প্রাসাদে আমার থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি সেইখানেই চলে আসি।

একদিন সকালে জাহাঙ্গীর মির্জা তাম্‌বলের কাছ থেকে পালিয়ে আমার কাছে চলে আসেন এবং আমার দলে যোগ দেন। প্রাসাদের দক্ষিণ দিকের অলিন্দে বসে আমরা আলোচনা করতে থাকি। জাহাঙ্গীর মির্জা আমার কানে কানে বল্‌লেন—শেখ বেজিদকে এখনই বন্দী করা দরকার।

আমি উত্তর দিই—তাড়াতাড়ি কিছু করা উচিত হবে না। বেজিদকে বন্দী করার সময় চলে গিয়েছে। আপোষে কোনও মীমাংসা করা যায় কিনা তারই এখন চেষ্টা করা উচিত। এইটাই উচিত হবে—কারণ ওর দলে অনেক লোক আর আমাদের সামান্য কয়েকজন। তাছাড়া, ওদের শক্তিশালী সেনাবাহিনী দুর্গ অধিকার করে আছে, আর আমরা সামান্য কয়েকজন সেনা নিয়ে বহির্দুর্গ-প্রাসাদ শুধু অধিকার করে আছি।

আমি জানিনা তিনি আমার কথায় ভুল অর্থ করলেন—না জেনেশুনেই গোঁয়ার্তুমি দেখালেন। সে যাই হোক, শেখ বেজিদকে তিনি বন্দী করলেন। ও পক্ষের যে সব লোক কাছাকাছি ছিল তারা চারিদিক ঘিরে ফেলে বেজিদকে মুহূর্তের মধ্যে ছিনিয়ে নিয়ে গেল—সন্ধিচুক্তি খতম হলো। সুতরাং আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলাম।

আমি নগরের এক অংশের ভার জাহাঙ্গীর মির্জার উপর দিলাম। মির্জার লোকবল খুব কম ছিল দেখে আমরা কয়েকজন লোক তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমি প্রথমে নগরের এই অংশ পর্যবেক্ষণ করে শৃঙ্খলা আনি এবং কোন্ ঘাঁটিতে কাকে থাকতে হবে তা ঠিক করে দিই। তারপর নগরের অন্য অংশে চলে আসি।

নগরের মাঝখানে খোলা ময়দান। সেখানে আমার কয়েকজন সেনাকে মোতায়েন রেখে এগিয়ে আসি। আমার সৈন্যরা শত্রুপক্ষের অগণিত সুসজ্জিত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাদের ঘাঁটি ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়। শত্রুসৈন্যরা তাদের একটা সরু গলির মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। আমি সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হই এবং ঘোড়ার পিঠে বসে তাদের দ্রুত আক্রমণ করি। শত্রুপক্ষ সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেনি; পালাতে শুরু করে। সরু গলি থেকে তাদের তাড়িয়ে তরবারি হাতে লড়াই করতে করতে ময়দানের দিকে নিয়ে আসি। এই সময় আমার ঘোড়ার পায়ে তীর বিদ্ধ হয়। ঘোড়া আহত হয়ে লাফিয়ে উঠে আমাকে শত্রুর মাঝখানে ফেলে দেয়। আমি তৎক্ষণাৎ ভূমিতল থেকে উঠে একটি তীর নিক্ষেপ করি। খলিল নামে আমার এক সহচর তার নিজের শীর্ণকায় ঘোড়া থেকে নেমে সেই ঘোড়া আমাকে চড়তে দেয়।

ময়দানের ঘাঁটিতে কয়েকজন সৈন্য রেখে আর একটা রাস্তার দিকে এগিয়ে যাই। মহম্মদ ওয়াইস আমার ঘোড়ার দুর্দশা দেখে তার নিজের ঘোড়াটি আমাকে দেয়। আমি সেই ঘোড়ার চড়ে বসি। এই সময় আহত

কামবার আলি জাহাঙ্গীর মির্জার কাছ থেকে ফিরে এসে আমাকে জানায় যে মির্জা কিছুক্ষণ আগে অগণিত শত্রুসৈন্য দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়ে উপায়ান্তর না দেখে নগর ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

ইব্রাহিম বেগকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি করা যায় এখন ?

সেও আহত হয়েছিল। কি জানি কি কারণে, ক্ষতস্থানের বেদনার জন্যই হোক, অথবা আতঙ্কে তার বুকের স্পন্দন বন্ধ হওয়ার উপক্রমের জন্যই হোক, সে কোনও স্পষ্ট উত্তর দিল না। এই সময় আমার মাথায় একটা বুদ্ধি জোগালো। সেতুর ওপর দিয়ে পার হয়ে ওপারে গিয়ে সেই সেতু ভেঙে ফেলে আমরা অনায়াসেই আন্দেজানের দিকে অগ্রসর হতে পারি। এই বিপর্যয়কর অবস্থায় বাবা সারজিদ্ খুব বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। সে বল্লো আমরা যে ফটক নিকটে পাব সেইখানেই আক্রমণ চালিয়ে বাইরে বেরোবার পথ করে নেব। এই পরামর্শমত আমরা ফটকের দিকে এগিয়ে চললাম। শেখ বেজিদ বর্ম-আচ্ছাদিত হয়ে সেই সময় তিন চার জন অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে ফটক দিয়ে ঢুকে নগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ তূণীর থেকে একটি শর বের করে তার মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়লাম। শরটি তার ঘাড় ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। সে ফটকে প্রবেশ করে দক্ষিণ দিকে ঘুরে অত্যন্ত শঙ্কিতভাবে একটা ছোট রাস্তার ভেতর দিয়ে পালিয়ে গেল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। কুলি গোকুলতাস্ তার ডাণ্ডা দিয়ে একজন পদাতিক সৈন্যকে ধরাশায়ী করে। আর একজন লোককে পাশ কাটিয়ে যেতেই দেখা গেল সেই লোকটি ইব্রাহিম বেগকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে উদ্যত হয়েছে। তখনই ইব্রাহিম খুব জোরে 'হায়' 'হায়' করে চেঁচিয়ে উঠতেই লোকটা হকচকিয়ে গেল। তার পর সেই লোকটি খুব কাছ থেকে আমার দিকে একটি শর নিক্ষেপ করলো। আমার গায়ে ছিল 'কালমুক বর্ম'। শরাঘাতে আমার বর্মের দুইটি স্তর বিদ্ধ হয় এবং ভেঙে যায়। তীর নিক্ষেপকারীকে পালিয়ে যেতে দেখে তার দিকে আমি একটা তীর ছুঁড়ি। এই সময় একজন পদাতিক সৈন্য দুর্গপ্রাচীর ঘেঁষে পালাচ্ছিল। আমার তীরটি তার মাথায় টুপিতে লেগে ছিট্‌কে এসে তীর সমেত দুর্গের দেওয়ালে বিঁধে যায়। সেটা দেওয়ালে সেই অবস্থাতেই ঝুলতে থাকে। সৈন্যটি তার মাথার পাগড়িটি হাতে নিয়ে দৌড়িয়ে পালিয়ে যায়। একজন অশ্বারোহী আমারই পাশ দিয়ে যে গলির মধ্যে শেখ বেজিদ

পালিয়েছে সেই দিকে ছুটে যায়। তার মাথায় আমি এমন জোরে তরবারির আঘাত করি যে সে সামনের দিকে ঝুঁকে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, কিন্তু পাশের দেওয়ালে ভর দিয়ে সে ঝোঁকটা সামলিয়ে নিয়ে কোনও রকমে পালিয়ে যায়। শত্রুপক্ষের যে কয়জন অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য ফটকের কাছাকাছি ছিল তাদের সকলকে তাড়িয়ে দিয়ে আমরা ফটকটি দখল করি।

আমাদের জয়ী হওয়ার কোন রকম সম্ভাবনাই ছিল না। দুর্গমধ্যে শত্রুপক্ষের সশস্ত্র সৈন্যবল দুই তিন হাজার—আমার দুর্গের এক প্রান্তে আছে মাত্র এক শ' কিংবা বড় জোর দু' শ' সৈন্য। তা ছাড়া, আগুনের ওপর দুধ চড়ালে দুধ ফুটতে যতটুকু সময় লাগে তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে জাহাঙ্গীর মির্জা শত্রুপক্ষের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়েছে—আর তার সঙ্গে আছে আমার অর্দ্ধেক সৈন্য। এ সব সত্ত্বেও আমার দারুণ অনভিজ্ঞতার দরুণ আমি নিজে দুর্গ ফটকে অপেক্ষা করে একজনকে জাহাঙ্গীর মির্জার কাছে পাঠালাম এই অনুরোধ করে যে—যদি তিনি কাছাকাছি থাকেন, তা হলে যেন তাঁর সঙ্গের লোক নিয়ে আমাকে সাহায্য করতে আসেন—যাতে আর একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ইব্রাহিম বেগের ঘোড়া সত্যই দুর্বল ছিল অথবা সে নিজেই আহত হওয়ায় মন-মরা হয়েছিল কিনা জানিনে—কিন্তু সে আমাকে বল্‌লো যে তার ঘোড়াটা একেবারে অপদার্থ। এই কথা শোনামাত্র সুলেমান নামে আমার একজন ভৃত্য কারও কাছ থেকে কোনও ইঙ্গিত না পেয়েই তার ঘোড়াটি ইব্রাহিমকে দিয়ে দিল। লোকটির চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ লক্ষ্য করলাম। যতক্ষণ আমরা ফটকে অপেক্ষা করেছিলাম কোয়েলের রাজস্ব-আদায়কারী কুচুক আলি খুব বীরের মত কাজ দেখিয়েছিলেন।

যে লোককে আমি মির্জার কাছে পাঠিয়েছিলাম তার প্রত্যাবর্তনের জন্য ফটকেই আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। সে ফিরে এসে আমাকে জানায় যে জাহাঙ্গীর মির্জা কিছুক্ষণ আগেই স্থান ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছে। আর অপেক্ষা করার সময় ছিল না। আমরাও তাড়াতাড়ি ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। মোট কথা, আমার অতক্ষণ অপেক্ষা করাই অত্যন্ত অনুচিত হয়েছিল। আমার সঙ্গে মাত্র দশ জন লোক ছিল। যে মুহূর্তে আমরা রওনা হলাম আমাদের পিছন পিছন শত্রুপক্ষের অনেক সৈন্য আমাদের পিছু ধাওয়া করলো। আমরা যখন টানা সেতু পেরিয়েছি, তখন

তারা নগরের দিকের অংশে এসে পৌছিয়েছে। বন্দে আলি চীৎকার করে ইব্রাহিম বেগকে বলছে—তোর অহঙ্কার বড় বেশী, বড় বড় কথা বলা তোর খুব অভ্যাস। একবার থাম দেখি, তরোয়াল নিয়ে হাতাহাতি যুদ্ধ কর আমার সঙ্গে। দেখা যাক—কে হারে কে জেতে।

ইব্রাহিম বেগ আমার কাছেই ছিল, সে জবাবে বল্লো—আয় চলে আয় তা হ'লে। কে আর বাধা দিচ্ছে?

ওরা নির্বোধ, উন্মাদ। বাহাদুরি দেখিয়ে পরস্পরের দাবী মেটানোর উপযুক্ত সময়ই এটা বটে! তরবারির খেলা-নৈপুণ্য দেখানোর অবসর কোথায়। এক মুহূর্তও নষ্ট করবার মত সময় নেই। তীরবেগে আমরা ছুটে চল্লাম, আর পেছন পেছন এগিয়ে আসতে লাগলো শত্রুসৈন্য। এগিয়ে আসতে আসতে তারা একের পর এক আমাদের সৈন্যদের ঘোড়া থেকে নামিয়ে ফেলতে থাকে।

ইব্রাহিম বেগ সাহায্যের জন্য চীৎকার করে উঠলো। পিছন ফিরে দেখি, শেখ বেজিদের একজন ক্রীতদাসের সঙ্গে তার লড়াই হচ্ছে। আমি পিছিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়ার মুখ ফিরালাম। জান্ কুলি আমার কাছেই ছিল। সে বলে উঠলো—এ কি ফিরে দাঁড়ানোর সময়? তারপর আমার ঘোড়ার বল্গা ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে বল্লো। আমরা স্যাং-এ পৌছানোর আগেই শত্রুপক্ষ আমার সৈন্যদের অনেককেই ঘোড়া থেকে নামিয়ে ফেলেছে। স্যাং অতিক্রম করবার পর আর পেছনে শত্রুসৈন্য দেখা যাচ্ছিল না। স্যাংএর নদীর দিকে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। আমাদের দলে তখন আমরা মাত্র আট জন। কোনও রকমের একটা ভাঙ্গা-চোরা পাথুরে রাস্তা নদীর দিকে গিয়েছে। এ রাস্তায় লোক চলাচল নেই। এই নির্জন পথ ধরে নদীর কাছে পৌছলাম। তারপর নদীকে ডান দিকে রেখে আবার একটা সরু পথ ধরলাম। বিকেল বেলার নমাজের সময় আমরা পাহাড়ি রাস্তা ছেড়ে সমতলভূমির কাছে এসে পড়লাম। দূরে সমতলভূমির ওপর তখন রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আমার সঙ্গীদের আড়ালে রেখে আমি পায়ে হেঁটে একটা উঁচু জায়গায় উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম! হঠাৎ চোখে পড়ে গেল আমাদের পিছনের এক পাহাড়ের ওপর একদল অশ্বারোহী উঠে আসছে। তারা কতজন এই দলে আছে আমরা বুঝতে পারিনি, কিন্তু আর অপেক্ষা করা উচিত হবে না ভেবে আমরা ঘোড়ায় চড়ে ছুটে পালাতে লাগলাম। যে অশ্বারোহী সৈন্যের

দল আমাদের অনুসরণ করছিল তারা বিশ-পঁচিশ জনের বেশী হবে না মনে হয়; কিন্তু আমরা ছিলাম মাত্র আট জন—তা আগেই বলেছি। যখন তারা আমাদের পেছনে ধাওয়া করে, তখন যদি তারা সংখ্যায় কত জানতে পারা যেত, তাহলে তাদের ভালভাবেই শিক্ষা দেওয়া যেত। কিন্তু আমরা মনে করেছিলাম তাদের পেছন পেছন আরও সৈন্য আসছে আমাদের দলকে ধরবার জন্য। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা দ্রুত ছুটে পালাতে লাগলাম। ব্যাপার হচ্ছে এই যে—যারা পালানোর মত পরাজিত মনোভাবের কবলে পড়েছে, তারা সংখ্যায় অধিক হলেও অল্প-সংখ্যক পশ্চাৎ ধাবনকারীর মুখোমুখি হতে সাহস করে না।

জান্ কুলি বল্‌লে, আমরা এই পথে গেলে শত্রুপক্ষ আমাদের সকলকেই ধরে ফেলবে। তার চেয়ে আপনি এবং কুলি গোকুলতাস্ দুটি ভাল ঘোড়া বেছে নিয়ে এক সঙ্গে জোর কদমে অন্যপথ দিয়ে চলে যান। তাহলে হয়তো আপনারা পালিয়ে যেতে পারবেন।

পরামর্শটা মন্দ ছিল না। কারণ, আমরা যখন শত্রুপক্ষের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে লড়াই করতে পারছি না, তখন মুক্তির সম্ভাবনাটা যাতে বেশী হয় সেই পন্থাই গ্রহণ করা ভাল। কিন্তু এতে আমার মন সায় দিল না। শত্রুর মধ্যে আমার অনুগামীদের ফেলে রেখে আমি চলে যেতে সম্মত হলাম না। অবশেষে আমাদের দল বিচ্ছিন্ন হয়ে আগুপিছু চলতে লাগলো। আমি যে ঘোড়ার পিঠে ছিলাম—সেটা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছিল, তার ছুটে চলবার শক্তি ছিল না। জান্ কুলি তার ঘোড়া থেকে নেমে আমাকে সেই ঘোড়ায় চড়তে বল্‌লো। আমি তার ঘোড়ায় চড়লাম—আর সে চড়লো আমার ঘোড়ায়। এই সময়ে সাহিম নাসির আর আব্দুল কাদ্দুস, যারা পিছিয়ে পড়েছিল, তাদের শত্রুপক্ষ ঘোড়া থেকে নামিয়ে ফেল্‌লো। জান্ কুলিও পিছিয়ে পড়লো। কিন্তু তাকে রক্ষা বা সাহায্যের চেষ্টা করার কোনও উপায়ই ছিল না। সুতরাং আমরা কয়েকজন খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে লাগলাম। কিন্তু ঘোড়াগুলোর দম যেন ফুরিয়ে আসছিল। তারা আর ছুটতে পারছিল না। দোস্ত বেগের ঘোড়া পিছিয়ে পড়লো, আমার ঘোড়াটার অবস্থাও সেই রকম। কামবার আলি ঘোড়া থেকে নেমে তার ঘোড়া আমাকে চড়তে দিল। সে আমার ঘোড়ায় চড়লো এবং অবিলম্বে পিছিয়ে গেল। খোঁড়া খাজা হুসেনি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেল। কুলি গোকুলতাসের সঙ্গে শুধু আমি রইলাম। আমাদের ঘোড়াও

দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাদের ছুটে চলার ক্ষমতা ছিল না। আমরা ধীর কদমে চলতে লাগলাম। কুলি গোকুলতাসের ঘোড়ার গতি একেবারে কমে গেল। তাকে বল্‌লাম—তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব? এসো, মৃত্যু কিংবা জীবন যেটাই হোক এক সাথেই বরণ করে নিই। আমি যেতে যেতে কুলির দিকে মাঝে মাঝে ফিরে দেখছিলাম। অবশেষে কুলি বল্‌লো—আমার ঘোড়া সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে, তার নড়বার ক্ষমতা নেই। আমার সঙ্গে আপনার ভাগ্য জড়িয়ে ফেল্‌লে আপনার পক্ষে পালানো অসম্ভব হবে। একটু এগিয়ে যদি যান, হয়তো এখনও আপনার নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর উপায় হতে পারে।

আমি অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে পড়লাম। কুলি পিছিয়ে পড়লো। আমি তখন একেবারে নিঃসঙ্গ। শত্রুপক্ষের দুইজন লোককে দেখা গেল। একজনের নাম—সিরামি, আর একজন—বন্দে আলি। তারা ক্রমেই আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। আমার ঘোড়ার গতিও একেবারে কমে গেল। দুই মাইল দূরে একটা পাহাড়। পথে পাথরের স্তুপ ছড়ানো আছে। চিন্তা করতে লাগলাম—পাথরের ওপর চলতে চলতে যদি ঘোড়ার পা পিছলিয়ে যায় তাহলে কি হবে? পাহাড়টা তো এখনও অনেক দূরে। আমার তূণীরে তখনও গোটা কুড়ি তীর ছিল। ঘোড়া থেকে নেমে পাথরের স্তুপের পাশে দাঁড়িয়ে দেখলে কেমন হয়? যতক্ষণ তীর আছে ততক্ষণ তো যুদ্ধ করা যেতে পারে? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল যে হয়তো আমি পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবো। যদি তা পারি, তা হলে কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের ওপর চড়তেও পারি। তীর চালনায় আমার নিপুণতা সম্বন্ধে আমার খুবই আস্থা ছিল। এই কথা ভাবতে ভাবতে আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম। আমার ঘোড়ার গতি খুবই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। অনুসরণকারী দুইজন আমার এমন কাছে এসে পড়েছিল যে তারা তীরের আওতার মধ্যে পড়ে। আমি কিন্তু তীর খরচ করবো না এই সঙ্কল্প স্থির করেই তীর নিক্ষেপ করিনি। অনুসরণকারীরাও কিছুটা শঙ্কিত হয়ে খুব কাছে না এসে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখেই আমার অনুসরণ করছিল।

সূর্যাস্তের সময় আমি পাহাড়ের কাছে পৌঁছাই। তখন তারা চীৎকার করে বল্‌লো—আপনি কোথায় যাওয়ার মতলব করে এমনভাবে ছুটছেন? জাহাঙ্গীর মির্জা ধরা পড়েছে, আর আপনার ভাই নাসির মির্জাও বন্দী।

তাদের কথা শুনে আমি ভীত হয়ে পড়লাম। যদি আমরা তিনজনই এইভাবে ধরা পড়ি তাহলে সব দিক দিয়েই আতঙ্কিত হওয়ার কথা। যখন আরও কিছুদূর এগিয়েছি, আবার তারা আমাকে ডাক্‌লো। এবার তাদের স্বর আগেকার চেয়ে কিছুটা মোলায়েম মনে হলো। ঘোড়া থেকে নেমে তারা আমাকে সম্বোধন করে কি সব বলতে লাগলো। তাদের কথায় কর্ণপাত না করে আমি এগিয়ে চল্‌লাম। পাহাড়ের মধ্যে একটা সুঁড়ি পথ পেয়ে সেই দিকেই এগিয়ে গেলাম। এইভাবে এগোতে এগোতে রাত্রির নমাজের সময় একটা বাড়ীর আয়তনের মত পাথরের কাছে পৌঁছে যাই। পাথরটার পেছনে একটা খাড়াই দেখতে পাই। এই খাড়াইয়ে ওঠা ঘোড়ার পক্ষে সম্ভব নয়।

অনুসরণকারীরা ঘোড়া থেকে নেমে আরও মোলায়েম ও ভদ্রভাবে আমাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলো—এইভাবে চল্‌লে কি উদ্দেশ্য সাধন হবে? একে রাত্রি, তাতে সম্মুখে কোনও পথ নেই। এখন কোথায় আপনার পক্ষে যাওয়া সম্ভব?... তারা শপথ করে বল্‌লে, সুলতান আমেদের ইচ্ছা যে আপনিই সিংহাসনে বসুন।

আমি উত্তরে বল্‌লাম - এ সব কথায় আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। আমার পক্ষে সুলতান আমেদের সঙ্গে যোগ দেওয়া অসম্ভব। যদি তোমরা আমার কোনও উপকার করারই সদিচ্ছা পোষণ করে থাক, তাহলে এমন একটা কাজ আমার জন্য এখন করতে পার যে কাজের সুযোগ সহসা আসে না। এমন একটা পথ আমাকে দেখিয়ে দাও—যে রাস্তা ধরে গেলে আমি খাঁদের সঙ্গে পুনর্বায় মিলিত হতে পারি। এই উপকারটুকু করলে তোমরা যা কল্পনায়ও আনতে পার না এমন পুরস্কার তোমরা আমার কাছ থেকে পাবে। যদি তোমরা এ কাজ করতে অস্বীকার কর তাহলে তোমরা যে পথে এসেছ সেই পথেই ফিরে যাও এবং ভাগ্যের উপর নির্ভর করেই আমাকে থাকতে দাও। এটুকু করলেও আমার কম উপকার করা হবে না।

তারা বল্‌লো—আমাদের এখানে না এলেই ভাল হতো। আল্লার দোহাই, যখন এসেই পড়েছি তখন আপনাকে এই দুরবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে কি কখনও চলে যেতে পারি? যখন আপনি আমাদের সঙ্গে যেতে অসম্মত—তখন আপনারই খেদমত করার জন্য আপনি যেখানে আমরাও সেখানেই আপনার সঙ্গে যাতে যেতে পারি সেই আদেশ দিন।

আমি উত্তরে বল্লাম—তাহলে কোরাণের নামে শপথ কর যে তোমাদের প্রস্তাব আন্তরিক। তারা সেই শপথ করলো।

আমি তখন তাদের ওপর কিছুটা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। বল্লাম, এই উপত্যকার কাছ দিয়ে একটা রাস্তা আছে। তোমরা কি সেই রাস্তা দিয়েই চলতে চাও?

যদিও তারা শপথ করেছে তবু তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি। সেইজন্য তাদের আগে আগে যেতে বলে আমি পেছন পেছন যাচ্ছিলাম। এক মাইল কি দু মাইল যাওয়ার পর আমরা একটা ছোট নদী পেলাম। বল্লাম—উপত্যকার ধারের যে রাস্তার কথা বলছিলাম এটা তো সে রাস্তা বলে মনে হচ্ছে না।

তারা কেমন একটা দ্বিধার ভাব দেখিয়ে বল্লো—রাস্তাটা আরও কিছু আগে পাওয়া যাবে। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে আমরা সেই উপত্যকার রাস্তার উপরেই রয়েছি। কিন্তু আমার মনে হলো, ওরা সত্য গোপন করে আমাকে ঠকাচ্ছে।

মাঝরাত্রে আমরা একটা নদীর কাছে এসে পড়লাম। তারা বল্লো—আমরা হয়ত ভুল করে ঠিক পথ ধরতে পারিনি। উপত্যকার রাস্তাটা আমরা পেছনে ফেলে এসেছি।

বল্লাম—তাহলে এখন উপায়?

তারা বল্লো—ঘিবার রাস্তাটা কিছু আগেই পাওয়া যাবে। সেই রাস্তা ধরে গেলে আপনি ফারকটে যেতে পারবেন। আমরা পথ চলতে লাগলাম এবং রাত্রি তিন প্রহরের শেষে কারনানের নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। 'ঘিবা' থেকে এই নদীটা এসেছে। বাবা সিরামি বল্লো—এখানেই থামা যাক। আমি 'ঘিবার' রাস্তাটা একবার দেখে আসি।

সে একটু পরেই ফিরে এসে বল্লো—এ রাস্তা দিয়ে এখন অনেক লোক চলাচল করছে। সুতরাং এ পথে আমাদের যাওয়া অসম্ভব।

এই সংবাদে আমি আশঙ্কিত হয়ে উঠলাম। এখন আমি শত্রুর এলাকার মধ্যে আছি। আমি যেখানে যেতে চাই—সে জায়গা এখনও বহু দূরে। বল্লাম—তাহলে এমন একটা জায়গার খোঁজ কর যেখানে আমরা দিনটা লুকিয়ে থাকতে পারি।

ওরা বল্লো—কাছেই একটা পাহাড় আছে—সেখানে আমরা গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবো।

বন্দে আলি কারনানের দারোগা। সে বল্‌লো—আমাদের ঘোড়াদেরও আর চলবার শক্তি থাকবে না—যদিনা কিছু খাবার সংগ্রহ করা যায়। আমি কারনানে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে কিছু খাওয়ার জিনিষ সংগ্রহের চেষ্টা দেখি।

কারনানের রাস্তা ধরে আমরা চলতে লাগলাম। কারনান থেকে দু মাইল দূরে আমরা থামলাম; বন্দে আলি চলে গেল। অনেকক্ষণ সে ফিরলো না। ভোর হয়ে গেল—তবু তার কোনও পাত্তা নেই। আমি অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। সকাল হয়ে গিয়েছে। বন্দে আলি তিনখানা রুটি হাতে নিয়ে ফিরলো। ঘোড়ার খাদ্য কিছুই আনেনি। আমরা এই কখানি রুটি নিয়ে কালক্ষেপণ না করে চলতে লাগলাম। যে পাহাড়ে আমরা লুকিয়ে থাকবো ঠিক করেছিলাম সেই পাহাড়ের কাছে পৌঁছলাম। ঘোড়াগুলিকে নীচে পাথর ছড়ানো জলাভূমিতে রেখে আমরা পাহাড়ের ওপর উঠে গেলাম এবং সেখান থেকে চারদিকে নজর রাখছিলাম।

দুপুর হয়ে এসেছে। দেখলাম—শিকারী বাজপাখী-পালক আমেদ কোস্‌চি চারজন ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে ঘিবার দিক থেকে আখ্‌সির দিকে যাচ্ছে। একবার ভাবলাম ঐ লোকটাকে ডেকে মিষ্টি কথায় ভবিষ্যতে তার ভাগ্য পরিবর্তনের আশ্বাস দিয়ে তাদের ঘোড়াগুলি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। কারণ, আমাদের ঘোড়াগুলো দিনরাত অনবরত পরিশ্রম করে এবং এক কণাও শস্য না পেয়ে দুর্বল চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার মনের দ্বিধা ঘুচলো না। ঠিক করতে পারলাম না যে ওদের ওপর আস্থা স্থাপন করা চলে কিনা। আমি ও আমার সঙ্গীরা স্থির করলাম যে লোকগুলো সম্ভবতঃ রাত্রে কারনানেই থেকে যাবে, তাহলে ওদের ঘোড়া গোপনে সরিয়ে নিয়ে আমরা কোনও নিরাপদ স্থানে চলে যাব।

দুপুর বেলা চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখে নিচ্ছিলাম। দূরে একটা ঘোড়ার ওপর কি যেন চক্‌চক্ করছে দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেও বুঝতে পারছিলাম না যে জিনিষটা কি। পরে দেখলাম—ঘোড়ার ওপর মহম্মদ বাকির। সে আখ্‌সিতে আমার সঙ্গেই ছিল। যখন আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি এবং আমার সঙ্গীরা ছুটে পালাতে থাকে সেই সময় মহম্মদ বাকির চলে আসছিল। সম্ভবতঃ গোপনতা অবলম্বন করে এই দিকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্দে আলি ও বাবা সিরামি বল্‌লো—আমাদের ঘোড়া দু দিন ধরে একটা দানাও খেতে পায়নি। পাহাড় থেকে

নেমে ঘোড়াগুলোকে মাঠে চরানোর ব্যবস্থা করা ভাল, যদি কিছু ঘাস ওরা খেতে পায়। আমরা নীচে নেমে এলাম এবং ঘোড়াদের ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলাম। বিকেলের নমাজের সময়ের কাছাকাছি দেখা গেল যে একজন লোক আমরা যে পাহাড়ে লুকিয়েছিলাম সেইখান দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। তাকে দেখেই চিনলাম যে সে 'ঘিবার' মোড়ল কাদির বার্দি। সঙ্গীদের বললাম, কাদির বার্দিকে ডাকা যাক্।

সে আমাদের কাছে এলো। ভালভাবে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে কতকগুলি প্রশ্ন করলাম। খুব মোলায়েমভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার ক'রে ভবিষ্যৎ তার খুব ভাল এই আশ্বাস দিয়ে, যাতে সে আমার দিকে আকৃষ্ট হয় সাধ্যমত সেই চেষ্টা করে তাকে কিছু দড়ি, হুক, একটা কুড়াল এই রকম নদী পার হওয়ার কতকগুলো উপকরণ, ঘোড়ার জন্য কিছু খাদ্য, আমাদের জন্যও কিছু খাবার এবং সম্ভব হলে একটা ঘোড়াও যোগাড় করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। তাকে বলে দিলাম যে রাতের নমাজের সময় যেন সে এই জায়গাতেই দেখা করে।

সন্ধ্যা-নমাজ শেষ হবার পর একজন অশ্বারোহীকে দেখা গেল কারনান থেকে ঘিবার দিকে যাচ্ছে। আমরা হাঁক দিলাম—কে যায়? সে সাড়া দিল। যাকে দুপুর বেলায় আমরা লক্ষ্য করেছিলাম—এ সেই মহম্মদ বাকির। তার দিনের লুকোনো স্থান থেকে এখন কোনও নিরাপদ স্থানের দিকে চলেছে। তার স্বর এমন বদলে গিয়েছে যে সে আমাদের কাছে কয়েক বছর থাকলেও তার গলার স্বরে তাকে চেনা গেল না। যদি তাতে চেনা যেত, আর তাকে আমার সঙ্গে রাখতে পারতাম, তা'হলে আমার পক্ষে ভাল হতো। এই লোকটা আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল দেখে খুব অস্বস্তি বোধ করলাম। 'ঘিবার' কাদির বার্দির ওপর যে সব কাজের ভার দিয়ে এখানে অপেক্ষা করছিলাম এবং তাকে যে সময়ে ফিরে আসবার কথা বলেছিলাম সে সময় পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করবারও সাহস হলো না।

বন্দে আলি বল্লো—কারনানের সীমান্তে অনেকগুলো পোড়ো বাগান আছে। সেখানে আমরা যদি যাই, তা'হলে কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না। সেই দিকেই যাওয়া যাক। সেখান থেকে কাউকে পাঠিয়ে কাদির বার্দিকে আমাদের কাছে নিয়ে এলেই চল্‌বে।

সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা ঘোড়ায় চড়লাম এবং কারনানের প্রান্ত সীমার দিকে এগিয়ে চললাম।

তখন শীতকাল এবং অত্যন্ত ঠাণ্ডা—ওরা আমার জন্য একটা পুরনো ভেড়ার চামড়ার চাদর নিয়ে এলো। চাদরের ভিতরের দিকটা পশম, আর বাইরের দিকটা মোটা কাপড়ে মোড়া। সেটা গায়ে দিলাম। আমার জন্য তারা আরও জোগাড় করে নিয়ে এলো—এক পোয়া সিদ্ধ করা গরম গরম জোয়ারের ময়দা। সেটা খেয়ে মনে হলো যেন শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

বন্দে আলিকে জিজ্ঞাসা করলাম—কাউকে কি কাদির বার্দিকে ডেকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? সে জবাব দিল—হ্যাঁ পাঠিয়েছি।

কিন্তু এই দু জন দুষ্টবুদ্ধি নীচ শয়তান কাদির বার্দির সঙ্গে সত্যই দেখা করেছিল এবং তাকে তাম্বলকে খবর দেওয়ার জন্য আখ্‌সিতে পাঠিয়েছিল।

পাথরের দেওয়ালে ঘেরা একটা বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে আগুন জ্বালিয়ে আমি চোখ বুজলাম এবং তখুনি ঘুমিয়ে পড়লাম।

এই ধূর্ত লোক দুটি আমার কাছে যেন খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছে—এই রকম ভান করতে লাগলো। তারা বললো—কাদির বার্দি না ফেরা পর্যন্ত আমাদের এ এলাকাটা ছেড়ে যাওয়া চলবে না। এ বাড়ীটা অবশ্য মাঝামাঝি জায়গায়। সীমান্তের এক পাশে একটা জায়গা আছে, সেখানে যদি আমরা যেতে পারি তাহলে আর কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না।

মাঝরাতে আমরা ঘোড়ার পিঠে উঠলাম এবং সীমান্তের এক পাশে একটা বাগান লক্ষ্য করে এগিয়ে চল্‌লাম। সেই বাগানবাড়ীর অলিন্দে উঠে বাবা সিরামি চার দিকে লক্ষ্য করতে লাগলো। প্রায় দুপুর বেলায় সে নেমে এসে বল্‌লো—ইউসুফ দারোগা এই দিকে আসছে।

আমি খুবই শঙ্কিত হয়ে বল্‌লাম—জেনে এসো, সে কি আমার এখানে আসার কথা জানতে পেরে আমার সন্ধানে এসেছে?

বাবা সিরামি বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর ফিরে এসে জানালো—ইউসুফ দারোগা বলছে আখ্‌সির ফটকের কাছে এক জন পদাতিকের সঙ্গে তার দেখা হয়। তার কাছ থেকে সে শুনতে পায় যে দেশের রাজা কারনানের এই দিকটায় আছেন। এই সংবাদটা আর কারও কাছে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সেজন্য সে লোকটাকে নজর-বন্দী করে রেখেছে। কোষাধ্যক্ষ ওয়ালি যে তার হাতে ধরা পড়েছিল তাকেও বন্দী করেছে। তারপর সে তাড়াতাড়ি ছুটে এখানে চলে এসেছে। কোনও বেগদের সে একথা জানায়নি।

বাবা সিরামিকে জিজ্ঞাসা করলাম—এসব কথা শুনে তোমার কি মনে হয়।

সে উত্তর দিল—সকলেই আপনার ভৃত্য। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে সকলেই আপনার সঙ্গে যোগ দিতে চায়। আপনি আবার রাজ-সিংহাসনে বসুন।

এত যুদ্ধবিগ্রহ আর দ্বন্দ্বের পর—আমি বল্লাম—কোন বিশ্বাস নিয়ে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে আবার যেতে পারি ?

আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম ; ইউসুফ হঠাৎ আমার সামনে উপস্থিত হয়ে নতজানু হয়ে বল্লো—আপনার কাছ থেকে কিছুই গোপন করতে চাইনে। এ ব্যাপারে সুলতান আমেদ কিছুই জানে না। সুলতান বেজিদ সংবাদ পেয়েছেন—আপনি কোথায় আছেন। তিনিই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

তার কথা শুনে আমি ভয়ে উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে পড়লাম। মৃত্যু খুব কাছে এসে পড়েছে এটা জানতে পারার মত যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি মানুষের জীবনে আর কিছুতেই হয় না।

আমি চীৎকার করে বল্লাম—সত্য করে বল, তোমার উদ্দেশ্য কি। প্রকৃতই যদি আমার যা ইচ্ছা তার বিপরীতই ঘটে থাকে, তা হলে এইটুকু সময় দিও যাতে আমার শেষ প্রার্থনা আল্লাকে জানাতে পারি।

ইউসুফ বারংবার শপথ করতে লাগলো, কিন্তু তার কথায় আমি আস্থা স্থাপন করতে পারলাম না। আমি সেখান থেকে উঠে বাগানের এক কোণে চলে এলাম। নিজের মনেই চিন্তা করতে লাগলাম। মনে মনে বল্লাম—একজন মানুষ একশ কেন, যদি হাজার বছরও বাঁচে, তবুও অবশেষে তাকে—

(এইখানেই ১৫০২ সালের ডিসেম্বরে আত্মকথার সূত্র ছিন্ন হয়েছে এবং ১৫০৪ সালের জুনে পুনরায় আরম্ভ হয়েছে। মধ্যবর্তী অংশগুলি আর আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।)

বাবরের বিপদসঙ্কুল সঙ্গিহীন অবস্থা থেকে তাঁর শুভানুধ্যায়িগণই তাঁকে নিশ্চয় উদ্ধার করেছিলেন। তিনি যে ফারগানায় ছিলেন সে কথা আখ্‌সির অনেকেরই জানার সম্ভাবনা ছিল। বাকি তাঁর সঙ্গিগণ যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তারা হয়তো তাদের ঘোড়া-গুলোকে কিছু বিশ্রাম দিয়ে তাদের সবল করে তুলে তাঁরই সন্ধান

করে ফিরছিল। জাহাঙ্গীর মির্জা বাবরের প্রায় অর্ধেক সৈন্য নিয়ে হয়তো আখ্‌সির কাছাকাছি কোথাও ছিলেন। তাঁর মাতুল খাঁরাও হয়তো তাঁদের সৈন্যদের নিয়ে কারনানের সড়ক দিয়ে এগুচ্ছিলেন। যদি ইউসুফ বাবরকে বন্দী করে আখ্‌সির রাস্তা দিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ঐ ভাবে বাবরের হিতৈষীদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া সম্ভব এবং তারাই বাবরকে ভীষণ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে। বাবরের আত্মচরিতের কতকগুলি পাতা হারিয়ে যাওয়ায় এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা না গেলেও এটুকু বোঝা যায় যে তিনি বিপদমুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর মামা খাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খাঁ ভ্রাতৃদ্বয় অবশ্য পরে সেবানি খাঁর হাতে বন্দী হয়েছিলেন—তাঁদের পরাজয়ের পর বাবর পালিয়েছিলেন মোগলিস্থানের দিকে। মোগলিস্থান বলতে কোন্ দিক বুঝায় তা অবশ্য ঠিক জানা যায় না, তবে অনুমান করা যায় সেটা তাসকন্দ। কিন্তু সেবানির আদেশে তাসকন্দের দিকের রাস্তা অবরুদ্ধ ছিল। হুকুম জারি করা হয়েছিল যে বাবর ও আবুল মকারামকে বন্দী করতে হবে। উপায়ান্তর না দেখে বাবর দুর্গম রাস্তা ধরে সাখ্ এবং হিসারের পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়েছিলেন। এই পার্বত্য প্রদেশে তিনি অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে প্রায় বৎসর খানেক ছিলেন। শুধু যে তিনি গৃহহীন, রাজ্যহীন, ভবঘুরের জীবন যাপন করেছিলেন তাই নয়, প্রকৃতপক্ষে তিনি চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন। পার্বত্য জাতিদের আনুগত্য ও সহৃদয়তাই তাঁকে ও তাঁর কয়েকজন অনুচরকে এ সময় রক্ষা করেছিল। বাবরের মা এই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁর অনুচরদের পরিবারবর্গও তাদের সঙ্গে ছিল।

তারপর বাবর তাঁর ভাগ্যহত, বুভুক্ষু, ছিন্নবাস অনুচরদের নিয়ে এদেশ ছাড়লেন শেষবারের মত ১৫০৪ সালে জুন মাসের মাঝামাঝি। অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল যাত্রা। ফারগানা প্রদেশে দক্ষিণ প্রান্তের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করার অভিযান শুরু হলো। এই অভিযানের শেষ পরিণতি হিন্দুস্থানে তাইমুর বংশের সাম্রাজ্য স্থাপন। রাজ্যচ্যুত বাবরের এই দুঃসাহসিক যাত্রাই তাইমুরের বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে হিন্দুস্থানে। বাবরের অসমসাহসিকতা, উচ্চাভিলাষ, প্রাণচাঞ্চল্যের ফলেই ভারত সাম্রাজ্যের মুকুট পরিধান করতে পেরেছেন—তাঁর বংশধর হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান, ঔরংজেব।

বাবরের বয়স তখনও বাইশ পূর্ণ হয়নি। বয়স্ক লোকদের তাঁকে নিয়ে অবিরাম ষড়যন্ত্র, তাঁর ব্যর্থতা, তাঁর নিঃসঙ্গতা, অবিরাম বিপদের ঝড়ঝঞ্ঝা তাঁর মনোবল হ্রাস করতে পারেনি, বরং তাঁর উচ্চাভিলাষকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।

তাঁর প্রথম ইচ্ছা ছিল যে তিনি খোরাসানে যাবেন সুলতান হোসেন মির্জার কাছে। সে অভিপ্রায় ত্যাগ করে কাবুলের দিকে যাত্রা করলেন তিনি এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে তাইমুরের বংশধর হিসাবে কাবুলের সিংহাসন দাবী করে আরস্নুন্দের হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিতে পারবেন। তাঁর খুল্লতাত উলুগ বেগ মির্জা কাবুলির মৃত্যুর পর মাত্র বছর তিনেক আগে কাবুল আরস্নুন্দের হাতে চলে গিয়েছিল।

যখন বাবর তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিযানের ইতিহাস আবার লিখতে শুরু করেন তখন সেবানি খাঁ সমরকন্দ, বোখারা ও ফারগানা জয় করেছে। সুলতান হোসেন তখন খোরাসানে এবং খসরু শা হিসার ও বাদাকশানের শাসক। জুননান্ বেগ কান্দাহার, সিস্তান এবং হাজারাসদের দেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।

॥ ১৩ ॥

১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

মহরম মাসে ফারগানার প্রান্ত থেকে যাত্রা করি খোরাসানে পৌঁছানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। ইলাকের গ্রীষ্মকালীন আবাস কুটিরে কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। ইলাক হিসার প্রদেশের অন্তর্গত একটি জেলা। গরমকালে পশুচারণের একটি উপযুক্ত স্থান।

এখানে আমি তেইশ বছরে পা দিলাম। প্রথম দাড়ি কামানোর জন্য ক্ষুর ব্যবহার আরম্ভ করি এইখানেই। আমার অনুচররা যারা তখনও আমার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের সংখ্যা পদস্থ আর সাধারণ মিলিয়ে দু'শ'র কিছু বেশী, কিন্তু তিন শ'র কম ছিল। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগকেই চর্কিশ মোটা চামড়ার জুতো পায়ে পদব্রজেই চলতে হতো। তাদের হাতে হাতিয়ারের মধ্যে ছিল লাঠি, আর লম্বা কোর্তা তাদের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলতো। আমাদের দুরবস্থা তখন এমন যে দুটোর বেশী তাঁবু ছিল না। আমার মায়ের জন্য খাটানো হতো আমার তাঁবুটি। আমার

অনুচররা পথে বিশ্রামের সময় আমার জন্য খাটিয়ে দিত আড়া-আড়ি দণ্ডের ওপর একটা পশমি বস্ত্রের ঢাকনি। সেই সঙ্কীর্ণ পট্টাবাসেই আমাকে থাকতে হতো।

আমি খোরাসানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেও আমার বর্তমান অবস্থাতেও খসরু শার অধিকারভুক্ত রাজ্যে তার অনুগতদের ভাবান্তর ঘটাতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস হয়েছিল। এই সময় এমন একটি দিন যায়নি— যেদিন কোনও না কোনও লোক আমার দলে যোগ দিয়ে এই দেশের এবং ভবঘুরে জাতের মনোভাবের কথা জানিয়ে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষায় ইন্ধন না জুগিয়েছে।

সিরিম তাঘাই-এর ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল—যার মত বিশ্বাস আমি আর কাউকেও করিনি। সেই বিশ্বাসী লোকটি কিন্তু আমার খোরাসান যাত্রার মতলবকে ভাল চোখে না দেখার দরুণ আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করার চিন্তা করছিল। সে তার পরিবারবর্গকে আগেই দেশে পাঠিয়ে দিয়ে ভারমুক্ত হয়ে একাই আমার সঙ্গে ছিল—এই মনে করে যে যখন ইচ্ছা সে নির্বিঘ্নে আমাকে ত্যাগ করে চলে যেতে পারবে। সে স্বভাবে কাপুরুষ ছিল এবং সে কয়েকবারই আমার সঙ্গে এই রকমের খেলাই খেলেছে।

এই সময় বাকি বেগ্ বারংবার অত্যন্ত আগ্রহভরে তার এই মনের কথা বলেছিল যে, একই রাজ্যের দুই রাজা এবং একই সেনাবাহিনীতে দুই জন সেনাপতির স্থান কিছুতেই থাকা উচিত নয়—কারণ তা শুধু বিশৃঙ্খলা এবং ধ্বংসেরই সৃষ্টি করে। এই রকম দ্বৈত ব্যবস্থায় বিপ্লব, বিদ্রোহ এবং ফলে সর্বনাশ অনিবার্য। কারণ কবি বলেছেন—

'দশজন দরবেশ
পুলকের নাহি শেষ,
একখানা কম্বল
যদি পান বসিবার।
দুইজন অধিরাজ
হিংসায় জরজর
যদি পায় রাজ্যের
ভাগা-ভাগি অধিকার।
একজন সাধুলোক
রুটি পেলে একখানি,

আনন্দে বিলোবেন
দুখিজনে আধখানি।
যদি কোনও সম্রাট
কোনও দেশ বশে আনে,
তবু তার লোভী মন,
ধেয়ে চলে অন্যখানে।

যখন একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে অল্পকালের মধ্যেই খসরু শার প্রধান প্রধান কর্মচারী ও ভৃত্যগণ রাজার অর্থাৎ আমার সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের আনুগত্য জানাবে—তখন বাকি বেগের জোরালো অভিমত এই যে জাহাঙ্গীর মির্জাকে এখনই সরিয়ে দেওয়া ভাল। কিন্তু আমি তার যুক্তিতে সায় দিতে পারিনি।

এই সময় সংবাদ এল যে সেবানি খাঁ আন্দেজান দখল করেছে। এই কথা শুনে খসরু শা কোনও সাহায্য পাওয়ার ভরসা না থাকায় তার সমস্ত সেনা ও লোকজন নিয়ে কাবুলের পথে যাত্রা শুরু করে। সে কুন্দুজ ছেড়ে আসার পরক্ষণে তারই কয়েকজন পুরাতন বিশ্বস্ত কর্মচারী কুন্দুজ দুর্গ অধিকার করে নিয়ে সেবানি খাঁর হাতে সমর্পণ করে। আমি লোহিত নদীর ধারে পৌঁছলে মোগল জাতের তিন-চার হাজার পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা—যারা এতদিন খসরু শার অধীন ছিল তাদের সমস্ত পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে আমার দলে যোগ দিল। এইখানে বাকি বেগকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমি কামবার আলি মোগলকে পদচ্যুত করতে বাধ্য হলাম। এর কথা আগেও অনেকবার উল্লেখ করেছি। সে অত্যন্ত অপরিণামদর্শী ও রূঢ়ভাষী ছিল। তার আচার-ব্যবহার বাকি বেগ সহ্য করতে পারতো না।

খসরু শা যখন শুনতে পেলো যে মোগলরা আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে তখন সে তার অসহায়তার কথা উপলব্ধি করলো। আর কোনও উপায়ান্তর না দেখে সে দূত হিসাবে তার জামাতাকে আমার কাছে পাঠায়। তার প্রস্তাব ছিল যে যদি আমি তার সঙ্গে কয়েকটা চুক্তিতে আবদ্ধ হই, তা'হলে সে আমার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেবে এবং সে নিজে এসে আমার কথা স্বীকার করবে।

বাকি চেখানিয়ানি--যদিও আমার কাছে তার অনুরক্তির অভাব নেই এবং তার মতামতেরও বেশ মূল্য আছে, তবুও তার ভাইয়ের দিকে স্বাভাবিক কোমলতা থাকায়, মীমাংসায় আমার প্রস্তাবটা সমর্থন করলো, তবে সর্ত এই

যে খসরু শার জীবনরক্ষার ও তার নিজস্ব বিষয়-সম্পত্তি তারই অধিকারে থাকবে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এই সব সর্তেই একটা সন্ধি হয়ে গেল।

তারপর আমার শিবির তুলে কাবুলের দিকে যাত্রা করি এবং 'খাজে জিদ'এ এসে থামি। এই জায়গায় খসরু শার অস্ত্রাগারে যে সব অস্ত্রশস্ত্র এবং বর্ম অবশিষ্ট ছিল তা আমার সৈন্যদের বন্টন করে দিই। প্রায় সাত-আট শ' বর্ম এবং ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম পাওয়া যায়। এগুলি খসরু শা ফেলে চলে যায়। আরও অনেক রকমের জিনিষ অবশ্য ছিল, কিন্তু সেগুলো কোনও কাজের ছিল না।

এ পর্যন্ত কোন দিনই আকাশে ক্যানোপাস্ নক্ষত্র (বশিষ্ঠ) আমার চোখে পড়েনি। সেদিন একটি পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম দক্ষিণ আকাশের নীচের দিকে একটি তারা জ্বল্‌জ্বল করছে। আমি বল্‌লাম—এটা কখনই 'ক্যানোপাস্' নয়। আর সবাই বল্‌লে—ওটা নিশ্চয় 'ক্যানোপাস্'। বাকি এই কবিতাটি আবৃত্তি করলো।

'হে বশিষ্ঠ নক্ষত্র!
কতদূরে উদয় তোমার
কোথায় তোমার স্থান ?
তোমার দৃষ্টি পড়ে যার ওপরে
সে যে অশেষ ভাগ্যবান।

যখন আমরা পাহাড়ের তলায় নেমে এলাম তখন সূর্য উঠছে। সেখান থেকে যাত্রা করে শ্বেত-প্রাসাদের সম্মুখে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে বিশ্রাম নিলাম। খসরু শার অনুচররা বরাবর বর্বরতার অভিযানে লিপ্ত থাকতে প্রলোভিত হয়ে এসেছে। কোনও শৃঙ্খলা বা নীতিবোধ তাদের ছিল না। এখন তারা আমার সঙ্গী হয়েও এই দেশের লোকদের উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করলো। অবশেষে আলি দারবানের দলের একজন সৈন্য যখন জোর-জুলুম করে এক পাত্র তেল এই দেশের একজন বাসিন্দার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলো, তখন আমি সেই সৈন্যকে ধরে এনে বেত্রাঘাত করার আদেশ দিলাম। এই শাস্তির ফলে তাকে প্রাণ দিতে হলো। এই আদর্শ শাস্তির পর জুলুমবাজি বন্ধ হলো।

এই স্থান ত্যাগ করে আমাদের দ্বিতীয় বারের যাত্রা শুরু হলো। আমরা 'চালাকে'র পশুচারণ ক্ষেতে এসে থামলাম। এখানে আলাপ-আলোচনা

করে স্থির হলো যে কাবুল অবরোধ করার জন্য এইবার এগিয়ে যেতে হবে। আবার আমরা চলা শুরু করলাম।

একদিন আমার সৈন্যব্যূহের প্রধান দল, দক্ষিণ ও বাম বাহু—সকলকে ভালভাবে অস্ত্রসজ্জিত করে এবং অশ্বদের বর্ম আবৃত করে কাবুল নগরের প্রান্তে পৌঁছিয়ে অস্ত্রশস্ত্রের আড়ম্বর দেখিয়ে নগরবাসীদের অল্পসল্প সায়েস্তা করতে আদেশ দিলাম। আমার সৈন্যরা অপমানকর ভঙ্গি করে জোর কদমে চামার ফটকের কাছে এগিয়ে যায়। যে কয়জন নগরবাসী বেরিয়ে এসেছিল—তারা প্রতিরোধ করার কোনও আশা নেই দেখে স্থান ত্যাগ করে নগরের ভিতর পালিয়ে গেল। কাবুল শহরের কয়েকজন অধিবাসী দুর্গের ওপর থেকে যে ঢালু পথে নেমে এসেছে সেই বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে কি ব্যাপার ঘটছে দেখবার জন্য সমবেত হয়েছিল। তারা পালাতে শুরু করলে এমন ধুলোর ঝড় উঠলো যে তাদের মধ্যে অনেকেই বাঁধ থেকে নীচে পড়ে গেল। ফটক এবং সেতুর মাঝামাঝি উঁচু জমিতে এবং রাস্তায় জায়গায় জায়গায় গর্ত করে তার মধ্যে স্ঁচলো বাঁশ পুঁতে ওরা ঘাস দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। সুলতান কুলি চানক এবং আরও কয়েকজন অশ্বারোহী যখন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল তখন তারা এই গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। আমার দলের দক্ষিণ দিকের দুই-এক জন অশ্বারোহী সৈন্য কুচ বাগের দিক থেকে যে দুর্গরক্ষীর দল এগিয়ে এসেছিল তাদের সঙ্গে তরবারির ঘাত-প্রতিঘাত শুরু করে। কিন্তু যুদ্ধ করার কোনও নির্দেশ না থাকায় তারা ফিরে আসে।

শহরের লোক দস্তুরমত ভীত ও মনমরা হয়ে পড়েছে। মোকিম কয়েকজন আমীর মারফৎ অধীনতা স্বীকার এবং কাবুল দুর্গ সমর্পণ করার সম্মতি জানালো। তাকে আমার সম্মুখে আনা হলো। সে আমার আনুগত্য স্বীকার করলো। যতদূর সম্ভব তার মানসিক দুশ্চিন্তা দূর করার চেষ্টা করে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালাম। স্থির হলো যে সে পরদিন তার সমস্ত সেনা, অনুচর এবং জিনিষপত্র নিয়ে দুর্গের বাইরে চলে আসবে এবং দুর্গ আমার হাতে সমর্পণ করবে।

পরদিন সকালে মির্জা আর বেগদের মধ্যে যারা ফটক পর্যন্ত গিয়েছিল তারা জনসাধারণের হল্লা এবং হুল্লোড় দেখে আমার কাছে একজন লোক পাঠিয়ে জানায় যে আমি উপস্থিত না হলে এই উত্তেজনার দমন হবে না। আমি অশ্বারোহণে সেই জায়গায় উপস্থিত হলাম এবং গণ্ডগোল থামিয়ে দিলাম। কিন্তু তা করতে তিন-চার জন দাঙ্গাকারীকে শরবিদ্ধ করে হত্যা

এবং দুই-এক জনকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাটতে আদেশ দিতে হয়েছিল। মোকিম তার দলবল নিয়ে নিরাপদে টিবায় পৌঁছে গেল।

রবিয়ল্ মাসের শেষের দিকে আল্লার দয়ায় আমি কাবুল ও গজ্‌নি দখল করলাম। সেই সঙ্গে ঐ দুই দেশের অধীন প্রদেশগুলোও বিনা যুদ্ধে আমার অধীনে এসে গেল।

কাবুল দেশটা পৃথিবীর জন-অধ্যুষিত স্থানগুলির মধ্যস্থলে অবস্থিত। এর চার দিকেই পাহাড়ে ঘেরা। শীতকালে এর সবগুলি রাস্তাই, শুধু একটি ছাড়া, অবরুদ্ধ হয়ে যায়। কাফের দস্যুরা পর্বত থেকে নেমে এসে রাস্তায় হানা দেয়। কাবুল দেশটা পাথুরে। বিদেশী কিংবা শত্রুর পক্ষে এদেশ দুর্গম। এর উষ্ণ ও শীতপ্রধান অঞ্চলগুলি পাশাপাশি। এক দিনেই তুমি এমন জায়গায় যেতে পার যেখানে তুষারপাত হয় না। আবার সেখান থেকে দুঘণ্টার পথ চললেই এমন যায়গায় পৌঁছে যাবে যেখানে অবিরাম তুষারপাত হচ্ছে। কাবুলের উত্তর পশ্চিমে চলকের বিস্তৃত তৃণক্ষেত্র। সেখানে গ্রীষ্মকালে মশার উৎপাত এমন যে ঘোড়াগুলোর বিরক্তির আর সীমা থাকে না।

কাবুল শস্যসম্পদসমৃদ্ধ নয়। একটা শস্যবীজ বুনে যদি চার-পাঁচটা শস্য পাওয়া যায় তা হলে খুব ভাল ফলন হয়েছে বলা যেতে পারে। এখানকার ফল—আঙ্গুর, ডালিম, বাদাম, খুবানী, আপেল, আখরোট, পীচ। আমি চেরীগাছ আনিয়ে এখানে বুনে দিলাম। এই গাছে চমৎকার ফল ধরে। গাছটিও বেশ বাড়তে থাকে। আমিই এখানে আখের চাষ প্রথম আরম্ভ করি।

'কাবুল দুর্গে সুরা চালাও।
পিও নিজে আর পেয়ালা বিলাও।
যে যত পার লোট তো মজা।
একাধারে এটা পাহাড়, নগর,
মরুভূমি আর বিশাল সাগর,
কাবুল জায়গা নয় তো সোজা।'

'কিল্‌কেনে' নামে একটা নির্জন গুপ্ত জায়গা আছে। এইখানে আমাদের অনেক বেলেল্লাপনা চলেছিল।

'কিল্‌কেনেতে যখন ছিলাম মোরা।
কি সুখেরই দিন ছিল যে
মুক্ত বাঁধন হারা।
সুনাম কিছু ছিল না তখন।
সংযম বাঁধ ভাঙ্গলো যখন,
ছিলাম মোরা স্বাধীন বেপরোয়া।'

এখানকার বাজার ব্যবসায়ীদের পক্ষে চমৎকার আর লাভজনক। যদি ব্যবসায়ীরা জিনিষপত্র নিয়ে চীন কিংবা তুর্কী দেশে যায় তাহলে কাবুলের বাজারে তারা যে মুনাফা করবে সেই রকম মুনাফা ঐ সব দেশে কিছুতেই করতে পারবে না।

হিন্দুস্থান থেকে ব্যবসায়ীর দল নিয়ে আসে বছরে কুড়ি হাজার কাপড়। ক্রীতদাস, শ্বেতবস্ত্র, আখ, ওষুধ এবং মশলাও হিন্দুস্থান থেকে আমদানি হয়। সওদাগররা শতকরা তিন-চার শ' টাকা লাভ করলেও সন্তুষ্ট হয় না।

এগারো বারো রকমের ভাষা কাবুলে চল্‌তি—যেমন, আরবি, ফারসী, তুর্কী, মোগলি, হিন্দী, আফগানী, পাশাই, পরাচী, গেবেরি, বেরেকি ও লামঘানি।

পাহাড়ের পথে নীচে নেমে এলে তুমি এক অন্য জগতে পৌঁছে গেছ। এখানকার বড় বড় গাছ, শস্য, পশু, সবই অন্য ধরণের। এদিকের জনসাধারণের ব্যবহার রীতিনীতিও আলাদা।

কাফেরিস্থানের পার্বত্যপ্রদেশে নোয়ারের পিতা সাধু লোমোচের সমাধি আছে। পর্বতগুলির প্রান্তভাগ নানা ধরণের টিউলিপ গাছে ভর্তি। আমি আমার লোকদের কত রকমের টিউলিপের গাছ আছে গুণে দেখতে বলেছিলাম। তারা নানারকমের তেত্রিশটা গাছ এনে হাজির করে। এখানে খুব বড় বড় সুন্দর ঝাঁকড়া মাথা গাছ আছে।

আমি নদীর ধারে ধারে উদ্যান রচনা করি। একটা পাহাড়ের ধারে আমি ফোয়ারা তৈরী করার আদেশ দিই। এখানে পীতবর্ণের আর খুবান ফুলের গাছ অপর্যাপ্ত। যখন সেই গাছে লাল রংয়ের ছিটে দেওয়া পীতবর্ণের ফুল ফোটে তখন এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য হয় যে তা দেখে আমার মনে হতো যে পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর স্থানের কথা কল্পনাতেও আনা যায় না।

শুনতে পেলাম—গজনিতে এমন একটি সমাধি মন্দির আছে যেখানে নাকি

যখনই কোরাণের কোনও বাণী পড়া হয় তখন কবরটা অমনি নড়তে থাকে। আমি সেখানে গেলাম এবং ব্যাপারটাও দেখলাম। সত্যই মনে হলো যে কবরটা চলার গতি পেয়েছে। কিন্তু শেষে বুঝতে পারলাম যে সবটাই কবরখানার অনুচরদের ধাপ্পাবাজি। তারা কবরের ওপর এমনভাবে একটা মঞ্চ তৈরী করেছে যে তার ওপর কোনও লোক চড়লেই সেটা নড়তে থাকে। দর্শকরা কিন্তু মনে করে যেন কবরটাই নড়ছে। নৌকা চড়ে যেতে হলে যেমন মনে হয় যেন নৌকাটি স্থির হয়ে আছে আর দুই পাশের তীর দুটি চলেছে—ব্যাপারটি ঠিক এই রকম। কবরখানার যে সব লোক ঐ মঞ্চের উপর ছিল তাদের নেমে আসতে বল্‌লাম। তারপর তারা যতই কোরাণের স্বস্তি বচন আওড়াক না কেন, আর কোনও নড়নচড়ন চোখে পড়েনি। আমি মঞ্চ সরিয়ে ফেলে কবরের ওপর একটা গম্বুজ তৈরী করার আদেশ দিলাম। কবরখানার লোকদের বলে দিলাম যেন ভবিষ্যতে এমন লোক ঠকানো বুজরুকি দেখানোর সাহস তাদের না হয়।

কাবুলের রাজস্ব বন্দোবস্তীর জমির খাজনা আর অবন্দোবস্তীর জমিতে যে সব লোক বাস করে তাদের মাথা পিছু কর মিলিয়ে তিনকোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা।

দক্ষিণ দিকের পাহাড়গুলো খুব নীচু। তাতে ঘাস জন্মায় না বলে শ্যামলতার অভাব। জলও নেই, একটা গাছও সেখানে জন্মায় না। একটা কুশ্রী, মূল্যহীন পাহাড়ী দেশ। অপর দিকে বড় পর্বতগুলি মানুষের বাসের যোগ্য। কথায় বলে—সঙ্কীর্ণ জায়গাই হীনচেতা মানুষদের কাছে মস্ত বড়। আমার মনে হয় গোটা পৃথিবীতে এই নীচু পাহাড় অঞ্চলের মত কদর্য স্থান খুঁজে পাওয়া যাবে না

কাবুলে শীত খুবই প্রবল। শীতকালে অবিরাম তুষারপাত হয়। কিন্তু এখানে জ্বালানি কাঠ প্রচুর মেলে এবং কাছাকাছিই পাওয়া যায়। এখানকার লোকেরা এক দিনের মধ্যেই কাঠ সংগ্রহ করে ফিরে আসতে পারে। ম্যাস্টিক, ওক, তোতো বাদাম এবং কারকেন্দ গাছ সাধারণতঃ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে সব চেয়ে ভাল হচ্ছে ম্যাস্টিক। এই কাঠ খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলে এবং একটা সুন্দর গন্ধও পাওয়া যায়। এই কাঠের আগুনের তাপ অনেকক্ষণ থাকে, আর কাঁচা থাকলেও জ্বালানোর কোনও অসুবিধা হয় না। ওকও চমৎকার জ্বালানি কাঠ, কিন্তু আগুনের আভাটা অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ। তবু এ কাঠের উত্তাপ খুব বেশী,

আর আলোও মন্দ হয় না। এই কাঠের অঙ্গার অনেকক্ষণ জ্বলে এবং তা থেকে সুন্দর গন্ধও বের হয়। এই গাছের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যদি এর সবুজ শাখায় ও পাতায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে একটা খরখর শব্দ করে এর তলা থেকে ওপর পর্যন্ত দপ করে জ্বলে ওঠে আর সমস্ত গাছটা তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়। এই গাছ জ্বলে ওঠার দৃশ্যটি খুবই মনোরম। তেতো বাদামের গাছ এখানে অজস্র। এই গাছই সাধারণতঃ জ্বালানি হিসাবে বেশী চলতি। কিন্তু এর আগুন বেশীক্ষণ থাকে না। কারকেন্দ এক রকম কণ্টকময় ঝুপসি লতাগুল্ম। কাঁচা অথবা শুকনো অবস্থায় সমান জ্বলে। গজনিবাসীদের এইটাই একমাত্র জ্বালানি।

আমার কাবুল অধিকার করার পর এই দেশটা, যে সব আমীর বা বেগ্ আমার সঙ্গে সম্প্রতি যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যেই ভাগ করে দিলাম। গজনি আর তার অধীন প্রদেশগুলি জাহাঙ্গীর মির্জাকে দিই। এই একবার মাত্র নয়—যখন আমি এইরকম ব্যবস্থা করেছি। যখনই পরম কারুণিক সর্বশক্তিমান আল্লা আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করে আমাকে সমৃদ্ধি দান করেছেন তখনই যে সব বেগ্ ও সৈন্যরা যারা আগে আমার অপরিচিত ছিল এবং পরে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদেরই—আমার সতত অনুগামী বাবরপন্থী অনুচরদের এবং আন্দেজানবাসীদের চেয়েও বেশী—অনুগ্রহ বিতরণ করেছি। এ সত্ত্বেও আমার দুর্ভাগ্য এই যে আমি বাবরপন্থী ও আন্দেজানবাসী ছাড়া আর কাউকে অনুগ্রহ করিনি—এই অপবাদ আমার কপালে বরাবর জুটেছে। একটি চলতি কবিতা আছে—

‘শত্রুতে কি না বলে,
স্বপনে কি না চলে,
তাই না কি ?
নগর দুয়ার বন্ধ কর
ইচ্ছামত।
শত্রুর মুখ বন্ধ করা
সাধ্যাতীত।
ঠিক না কি ?

কাবুল, গজনি ও তার অধীন প্রদেশগুলি থেকে ত্রিশ হাজার বস্তা খাদ্যশস্য আদায় করার কথা স্থির হলো। আমি তখনও কাবুলের রাজস্ব

ঠিক কত, আর সঙ্গতিও বা কতখানি সে সম্বন্ধে পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন করতে পারিনি। সুতরাং আমাদের সঙ্কলিত শস্য আদায়ের পরিমাণ খুবই বেশী হয়েছিল এবং অত্যধিক চাপে দেশে দুর্দশা দেখা দিয়েছিল।

এই সময় আমি একটা নতুন লিপি উদ্ভাবন করি—যার নাম দিই বাবর লিপি।

হাজারাসবাসীদের করস্বরূপ অনেকগুলি ঘোড়া ও ভেড়া দেওয়ার জন্য আদেশ দিই। সেগুলি আদায় করার জন্য লোকও পাঠাই। কয়েকদিনের মধ্যেই জানতে পারি যে তারা দিতে অস্বীকার করেছে এবং বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। গজনির রাস্তাগুলির ওপর তাদের লুঠতরাজের অভিযোগ কিছুদিন আগেই শুনেছি। এই কারণে আমি তাদের ওপর হঠাৎ চড়াও হব এই ভেবে সৈন্য নিয়ে রওনা হই। মিদানের পথে অগ্রসর হয়ে আমরা পার্বত্য পথ রাত্রেই অতিক্রম করে সকালের নমাজের সময় হাজারাসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। তাদের মনের সুখে পিটিয়ে সায়েস্তা করতে সক্ষম হই। সেখান থেকে ফিরবার সময় জাহাঙ্গীর মির্জা বিদায় নিয়ে গজনির দিকে গেলেন, আর আমি কাবুলে ফিরে এলাম।

হিন্দুস্থান আক্রমণের অভিলাষ

পরামর্শসভায় স্থির হয় যে হিন্দুস্থান সহসা আক্রমণ করতে হবে। শাবান মাসে—যখন সূর্য মীন রাশিতে—আমি কাবুল থেকে হিন্দুস্থানের দিকে যাত্রা করি। ছয়বার নিয়মিত সৈন্য চালনা করে আদিনাপুরে পৌঁছে যাই। এর আগে আমি কখনও গ্রীষ্মপ্রধান দেশ দেখিনি—হিন্দুস্থানের কোন দেশও জানি না। এই সব জায়গায় পৌঁছিয়ে মনে হলো যেন নতুন জগৎ দেখছি। এখানকার তৃণ আলাদা, গাছ আলাদা, বন্য জন্তরাও অন্য রকমের, পাখীগুলির পালকও বিচিত্র ধরণের, আর যাযাবর জাতিগুলির রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারও ভিন্ন রকমের। আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি; এমন বিস্ময় বোধ করার কারণও যথেষ্ট ছিল।

আরও কিছুদূর এগিয়ে খাইবার অতিক্রম করি। তারপর কোহাটের দিকে রওনা হই। দুপুর নাগাদ কোহাটে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুটপাট শুরু করে দেওয়া হয়। অনেক ষাঁড় আর মহিস আমাদের হাতে এসে পড়ে। অনেক আফগানও আমাদের হাতে বন্দী হয়। তবে সকল বন্দীকেই আমি খুঁজে বের করি এবং পরে তাদের মুক্তি দান করি। তাদের বাড়ীতে প্রচুর খাদ্য-

শস্য মজুত আছে দেখা গেল। আমার লুঠেরার দলগুলি সিন্ধু নদ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে তার তীরে রাত কাটায়। পরদিন তারা ফিরে এসে আবার আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু আমার সৈন্যরা এমন কিছু ধন-সম্পত্তি পেল না—যার কথা বাকি বেগ্ বার বার এতদিন আমাদের শুনিয়েছে।

দুইদিন দুই রাত্রি কোহাটে অপেক্ষা করে এবং লুটেরার দলগুলিকে একত্রিত করে আমরা পরামর্শ করতে লাগলাম আমাদের যাত্রাপথ এখন কোন্ দিকে হবে। ঠিক হলো—আমরা 'বান্নু' আক্রমণ করে সেখানকার আফ-গানদের পর্যুদস্ত করে ফিরে আসবো। কামারি আমাদের পথপ্রদর্শক হলো—কারণ সে আফগানিস্থানের সকল জায়গার সঙ্গে পরিচিত ছিল। সে বল্‌লো—কিছুদূর এগিয়েই রাস্তার ডান পাশে একটা পাহাড় দেখা যাবে। যদি আফগানরা উঁচু পর্বত থেকে নেমে এসে এই ছোট পাহাড়ে জমায়েৎ হয়, তাহ'লে তাদের আমরা চারদিক থেকে ঘেরাও করে বন্দী করতে পারব—কারণ উঁচু পর্বত থেকে ছোট পাহাড়টা বিচ্ছিন্ন।

সর্বশক্তিমান আল্লা আমাদের ইচ্ছা পূরণ করলেন। আফগানরা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য পর্বত ছেড়ে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ে জমায়েৎ হলো। আমার এক সৈন্যদলকে পর্বত এবং ছোট পাহাড়ের মধ্যে যে ভূমিখণ্ড আছে সেইটা দখল করতে আগেভাগেই পাঠিয়ে দিলাম। অবশিষ্ট সৈন্যদলকে পাহাড়ে আক্রমণ চালিয়ে এগিয়ে গিয়ে আফগানদের ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলাম।

আমার সৈন্যরা এগিয়ে যেতেই আফগানরা প্রমাদ গণলো। তারা যে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারবে না এটা বেশ বুঝতে পারলে। তড়িৎগতিতে সৈন্যরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের এক শ' কি দেড় শ' জনকে ধরাশায়ী করে ফেল্‌লো। এদের মধ্যে কয়েকজনকে জীবন্তই আমার কাছে ধরে নিয়ে এল, কিন্তু বেশীর ভাগই তাদের কাটা মুণ্ড আমার সামনে হাজির করা হলো। যুদ্ধে পরাস্ত হলে আফগানরা তাদের বিজয়ী শত্রুর সামনে দাঁতে তৃণ নিয়ে এসে দাঁড়ায়। বোধ হয় তারা বলতে চায় যে আমি তোমার আশ্রিত ষাঁড়। আফগানদের এই রীতি আমি প্রথম দেখলাম। আফগানরা যখন দেখলো যে আর সঙ্ঘর্ষ চালানো সম্ভব হবে না—তখন তারা দাঁতে ঘাস নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। যে সব আফগানকে জীবন্ত ধরে আনা হয় তাদের শিরশ্ছেদ করার আদেশ দিলাম। আমাদের পরবর্তী বিশ্রামের জায়গায় ঐ সব ছিন্ন মুণ্ড দিয়ে একটা চূড়া করা হলো।

পরদিন সকালে এগিয়ে গিয়ে হাঙ্গুতে শিবির ফেলা হলো। সেদিককার আফগানরা একটা পাহাড়কে সুরক্ষিত করে একটা 'সাঙ্গরে' রূপান্তরিত করে ফেলেছে। আমি কাবুলে এসেই প্রথমে এই 'সাঙ্গর' কথাটা শুনি। একটা বিচ্ছিন্ন পাহাড়কে কোনও আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য যদি সুরক্ষিত করা হয়—সেটিকেই সাঙ্গর বলে। আমার সৈন্যরা এই 'সাঙ্গরের' কাছে আসবা-মাত্র আক্রমণ চালায়। সাঙ্গরটিকে বিধ্বস্ত করে তা অধিকার করবার পর তারা দু শ' অবাধ্য আফগানকে ধরে এনে তাদের শিরশ্ছেদ করে। এখানেও নরমুণ্ডের আর একটি চূড়া তৈরী করা হয়।

বান্নু প্রদেশে অবতরণ করে সংবাদ পাওয়া গেল যে সমতলবাসী উপজাতিরা উত্তর দিকে পাহাড়গুলিতে সাঙ্গর গড়ে তুলেছে। জাহাঙ্গীর মির্জার অধীনে একদল সৈন্য সেই দিকে পাঠাই। যে 'সাঙ্গরে'র বিরুদ্ধে তিনি অভিযান চালান সেটা 'কিভি' উপজাতীয়দের। মুহূর্তের মধ্যে সেটি অধিকার করা হলো। তারপর শুরু হলো হত্যাকাণ্ড। অনেকগুলি কাটা মুণ্ড আমার শিবিরে নিয়ে এলো। সৈন্যগণ এই অভিযানে নানা রকমের অনেক বস্ত্র লুঠ করে নেয়। বান্নুতে মাথার খুলি স্তূপ করে সাজিয়ে রাখা হয়। 'সাঙ্গর' অধিকার করার পর, এখানকার একজন দলনেতা দাঁতে তৃণ নিয়ে আমার সামনে হাজির হয়ে আমার বশ্যতা স্বীকার করে। তাকে মার্জনা করলাম। যে সব লোককে জীবন্ত বন্দী করে আনা হয়েছিল তাদেরও তার সঙ্গে ফিরিয়ে দিলাম।

কোহাট বিধ্বস্ত করবার পরে স্থির হয়েছিল যে বান্নুরে আফগানদের লুটপাট করে আমরা কাবুলে ফিরে যাব। বান্নু বিধ্বস্ত হবার পর কিন্তু এ দিকের পথঘাট সম্বন্ধে যারা ওয়াকিবহাল তারা বল্লো যে 'দেস্ত' এখান থেকে বেশী দূর নয়, সেখানকার অধিবাসীরাও বেশ ধনী এবং ওদিকের রাস্তাও না কি ভাল। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো যে এখান থেকে না ফিরে 'দেস্ত' প্রদেশ লুণ্ঠন করে ঐ দিককার রাস্তা ধরেই কাবুলে ফিরে যাওয়া হবে।

সেই রাত্রেই 'ইসাখেলে'র আফগানরা অতর্কিত আক্রমণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমি বিশেষ সতর্ক থাকায় তাদের মতলব সিদ্ধ হলো না। আমার সমস্ত সৈন্য যুদ্ধসজ্জায় তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছিল ডাইনে ও বাঁয়ে—সামনে ও পিছনে ব্যূহবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত ছিল তারা। শিবির থেকে অল্প দূরে পদাতিক সৈন্যরাও চারদিকে নজর রাখছিল। এইভাবেই সারারাত কেটে গেল। প্রতি রাতেই এইভাবে সৈন্য সাজিয়ে রাখা হতো এবং আমার

তিন চার জন বিশ্বাসী সেনাপতি মশাল নিয়ে সৈন্য-শিবিরগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসতো। আমিও এক একবার নিজে ঘুরে দেখে আসতাম। যে সব সৈন্য তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতো না, তাদের নাক বিঁধিয়ে দেওয়া হতো এবং সেই অবস্থায় শিবিরে শিবিরে ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হ'তো।

গোমাল নদীর তীরে ঈদের নমাজ পড়া হলো। এ বছর নওরোজের উৎসব ইদল্‌ফেতরের কাছাকাছি পড়েছিল। এই উৎসবের মাঝে মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধান ছিল। এই উপলক্ষে আমি ফারসী ভাষায় এই কবিতা রচনা করি।

(শুনি) দ্বিতীয়ার চাঁদ আর
প্রিয়ার আনন
যে দেখে এক সাথে
অতি ভাগ্যবান।
(কিন্তু) আমার প্রিয়ার মুখ
আর জোড়া ভুরু
দেখে কেন কাঁপে বুক
হই ম্রিয়মান ?

হে বাবর।
তোমার প্রিয়ার মুখ
আর নয়া চাঁদে
আছে কি প্রভেদ ?
প্রিয়া দরশনে
মনে কি হয় তব
নওরোজ উৎসব কথা ?
এ কথা কি জাগে তব মনে
শত নওরোজের আনন্দেরও বাড়া
ঘটে গেল একদিনে
প্রিয়া দরশনে ?

গোমাল নদীর তীর ছেড়ে আমরা দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলাম এবং পর্বতের ধারে ধারে চলতে লাগলাম। আমরা দুই এক মাইল অগ্রসর

হতেই পর্বত সংলগ্ন উঁচু টিলার ওপর মৃত্যুভয়হীন একদল আফগানকে দেখতে পেলাম। আমরা তৎক্ষণাৎ দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের আক্রমণ করতে এগিয়ে গেলাম। ওদের বেশীর ভাগই পালিয়ে গেল। অল্প কয়েকজন পর্বত সংলগ্ন কয়েকটি টিলার উপর থেকে নির্বোধের মত বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলো। একজন আফগান একটা বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের ওপর প্রতিরোধের জন্য দাঁড়িয়েছিল। তার কারণ হচ্ছে এই যে পাহাড়টার তিন দিকেই এমন খাড়াই যে পালানোর আর পথ ছিল না। যেদিকে পথ সেই দিকেই আমরা এসে পড়েছি। সুলতান আলি সেই পথ দিয়ে উপরে উঠে গেল এবং আফগানটিকে পরাস্ত করে তাকে ধরে নিয়ে এল। তার এই বীরত্ব—যেটা আমার সম্মুখেই সে দেখিয়েছিল—সেটা তার ভবিষ্যতে উন্নতি ও আমার অনুগ্রহ লাভের কারণ হয়েছিল। আর একটা পাহাড়ের ঢালুতে কুতলুক আর একজন আফগানের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করে। ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় তারা দুইজনই পঁচিশ ফুট নীচে ঘুরপাক খেয়ে পড়ে যায়। শেষে যাহোক, কুতলুক সেই আফগানের শিরশ্ছেদ করে আমার কাছে নিয়ে আসে। কোপেক বেগ একটা খাড়া টিলার ওপর আর একজন আফগানের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করার সময় দুই যোদ্ধাই টিলার ঢালু গা বেয়ে ওপর থেকে নীচে গড়িয়ে আসে। আফগানের মাথাটা কিন্তু তার মধ্যেই কাটা গিয়েছে। এই সময় অনেক আফগানই আমার হাতে বন্দী হয় কিন্তু আমি সকলকেই মুক্তি দিই।

'দেস্ত' থেকে ফিরে আবার আমরা সিন্ধু নদের তীরের দিকে এগিয়ে গেলাম। এই দিককার সমস্ত লোক প্রাণভয়ে অপর পারে চলে গিয়েছে। নদীর দুই তীরের মাঝে একটা চড়া। সেই চড়া ডিঙ্গিয়ে নদীর ওপারে পৌঁছিয়ে কয়েকজন লোক আমার লোকদের দিকে অপমানসূচক অঙ্গভঙ্গী করে তরবারি আস্ফালন করতে থাকে। তাদের ভাবখানা এই যে চড়াটার এদিককার নদী যখন এত বেশী চওড়া, তখন আমাদের লোক বিনা নৌকায় কিছুতেই ওপারে যেতে পারবে না। এই চড়াটার আমার দলের যে কয়েকজন লোক এসেছিল—তার মধ্যে কুল বেসিদ একজন। সে একাই একটা নিরাভরণ ঘোড়ায় চড়ে জলে নেমে গেল। তারপর ঘোড়া সমেত ভেসে চল্‌লো অপর পারে—শত্রুর দিকে। চড়াটার চেয়ে ওপারের নদীর বিস্তার দ্বিগুণ। ঘোড়ার ওপর কিছুদূর ভেসে যাওয়ার পর যখন সে নদীর পাড়ের ওপর দাঁড়ানো শত্রুর তীরের পাল্লার

মধ্যে প্রায় পৌঁছেছে—তখন তার ঘোড়ার পা জলের তলার মাটি স্পর্শ করলো। জল কিন্তু তখনও ঘোড়ার পিঠ পর্যন্ত—আগুনে দুধ ফুটতে যতটুকু সময় লাগে ততক্ষণ সে অপেক্ষা করে যখন দেখলো যে তার সাহায্যকারী পেছনে কেউ নেই, তখন মন স্থির করে নদীর তীরে দাঁড়ানো শত্রুর দিকে ছুটে চল্‌লো। শত্রুপক্ষ দুই তিনটা তীর ছুঁড়লো বটে, কিন্তু সাহস করে সেখানে অপেক্ষা করার কথা তাদের মনে হলো না। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

একা সরঞ্জামহীন ঘোড়ার পিঠে কিছুমাত্র সাহায্যের প্রত্যাশা না করে সিন্ধু নদের মত বিশাল নদী সাঁতরিয়ে শত্রুদলকে হটে যেতে বাধ্য করা ও তাদের ঘাঁটি অধিকার করা একটা বিশেষ দুরূহ বীরত্বপূর্ণ কাজ। শত্রুরা পালিয়ে যেতে আমার সৈন্যরা ক্রমে ক্রমে নদী পেরিয়ে এলো। শত্রুর ফেলে যাওয়া বস্ত্র, পশু এবং আরও অনেক রকমের জিনিষ তারা লুঠ করলো। পূর্বে আমি অনেকবার বীরত্বের জন্য শেখ বেসিদকে অনুগ্রহ দেখিয়েছি এবং তাকে রসুই করার কাজ থেকে খাদ্য পরীক্ষকের কাজে উন্নীত করেছি। তার এখনকার এই অসমসাহসিক বীরত্বের কাজ দেখে আমি এমন মুগ্ধ হলাম যে সময় মত তাকে যথাযথ পুরস্কৃত করার সঙ্কল্প তখনই করে ফেলি এবং সেই সঙ্কল্প অনুসারে তাকে যে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করি—সেকথা পরে উল্লেখ করছি। সত্যি বলতে কি—সে প্রভূত অনুগ্রহ এবং সম্মানলাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

সিন্ধু নদের ভাটির দিকে তীর বরাবর দু' বার সৈন্য চালিয়ে এগিয়ে যাই। সৈন্যরা দলবদ্ধ হয়ে লুঠতরাজের দিকে ঝোঁক দেওয়ায় ঘোড়াগুলি কাহিল হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা কোনও উল্লেখযোগ্য লুঠের মাল আনতে পারেনি—লুঠের মালের বেশীর ভাগই বলদ। সিন্ধু নদের তীর ধরে যাওয়ার সময় এটা অবশ্য লক্ষ্য করা গেল যে—একটা নগণ্য সেনাও তিন চার শ' বলদ এবং গরু সংগ্রহ করে ফেলেছে।

সিন্ধু নদের ধারে তিনবার সৈন্যচালনার পর আমরা সে পথ ছেড়ে ডেরাগাজি খাঁ-এর কাছে পীর কানুর সমাধি মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাই। সমাধির কয়েকজন কর্মচারীকে আমার কয়েকজন সৈন্য আহত করায় তাদের একজনকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার আদেশ দিই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করা হয়। হিন্দুস্থানে এই সমাধির সম্মান অত্যন্ত বেশী।

এখান থেকে আবার মার্চ শুরু করে যেখানে থামি সেখান থেকে একদল

সৈন্যকে—যাদের ঘোড়ার তখনও চলার শক্তি ছিল তাদের—কাছাকাছি জায়গায় আফগানদের আক্রমণ করে লুঠতরাজ করবার জন্য জাহাঙ্গীর মির্জাকে দলপতি করে পাঠিয়ে দিই। এই সময়ে সৈন্যদলের ঘোড়াগুলোর অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে উঠেছিল যে দিনে দুই তিন শ' ঘোড়াকে পেছনে ফেলে রেখে আসতে হয়। তিনবার সেনা চালনা করে জাহাঙ্গীর মির্জা একদল পাঠানকে লুঠ করে কয়েকটি ভেড়া নিয়ে আসেন।

আবার দুই একটা মার্চের পর আমরা 'আব—ইস্‌তাদে' পৌঁছাই—সেখানে আমাদের চোখের সামনে একটা অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে উঠলো। জল আর জল। অপর দিকের তীরভূমি চোখে পড়ে না। মনে হলো—জল যেন আকাশে মিলেছে। আরও দূরের পাহাড় পর্বত মনে হলো যেন উল্টে গিয়েছে—যেমন মরীচিকার ওপারের পাহাড় পর্বত দেখলে মনে হয়। কাছের পাহাড়গুলো দেখে মনে হলো যেন আকাশ আর মাটির মাঝখানে ঝুলছে। 'আব—ইস্‌তাদে'র এক মাইলের মধ্যে যখন এসে পৌঁছাই তখন আর একটা দৃশ্য চোখে পড়লো। সময় সময় মনে হচ্ছিল যেন আকাশ আর জলের মাঝখানে একটা লাল রংয়ের আস্তরণ ভেসে উঠ্‌ছে আবার ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। যখন আমরা কাছাকাছি এলাম এই দৃশ্য দেখতে পেলাম। কাছে এসে আবিষ্কার করা গেল যে এ আর কিছুই নয়—বুনো ফ্লেমিংগো পাখীর একটা বিরাট ঝাঁক। এক এক ঝাঁক বিশ হাজারের কম নয়—সংখ্যায় তার গণনা হয় না। এদের ওড়বার সময়—যখন তাদের লাল ডানা বিস্তার করে, তখন দেখা যায় লাল—আবার ডানা সঙ্কুচিত করলে আর লাল রং দেখা যায় না। শুধু ফ্লেমিংগোই নয়, নানা জাতের অসংখ্য পাখী এই জলাধারের তীরে বাস করে। তীরের কিনারে এইসব অসংখ্য পাখী ডিম পাড়ে।

'সির্দের' জলাশয় অতিক্রম করে আমরা গজনি পৌঁছাই। জাহাঙ্গীর মির্জা আমাদের সেখানে আপ্যায়িত করে নানা খাদ্যদ্রব্য উপহার দেন। আমরা দুই একদিন সম্মানিত অতিথি হিসাবে সেখানে কাটাই। জেলহজ্জ মাসে আমরা কাবুলে পৌঁছে যাই।

খসরু শা আজের থেকে পালিয়ে খোরাসানের দিকে এগোতে থাকে।

খাম্‌জে সুলতান আমু নদীর তীরে তীরে সেরাই পর্যন্ত এগিয়ে সেখান থেকে তার ছেলেদের ও বেগ্‌মের অধিনায়কত্বে কুন্দোজ সৈন্য পাঠায়। তারা সেখানে পৌঁছিয়েই যুদ্ধ শুরু করে দেয়। খসরু শা সে যুদ্ধে পরাজিত

হয়। তার ঘৃণ্য দেহ নিয়ে সে পালাতেও পারে না। তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে বন্দী করা হয়। তাকে কুন্দোজে আনবার পর তার শিরশ্ছেদ করা হয়। যে মুহূর্তে আমি এই সংবাদ শুনি, আগুনে জল পড়লে যেমন হয় তেমনি আমার মনের সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

॥ ১৪ ॥

১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

মহরম মাসে আমার মা নিগার খানুম জ্বরে আক্রান্ত হন। শরীর থেকে কিছু রক্ত বের করে দিয়েও কোনও উপকার হলো না। খোরাসানের একজন হাকিম তাঁর চিকিৎসা করেন। পথ্য হিসাবে তরমুজের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাঁর জীবন-প্রদীপ নিভে আসছিল। ছয়দিন অসুখে ভুগবার পর তিনি আল্লার দরবারে চলে গেলেন।

এই সময়ে এমন ভূমিকম্প হল যে দুর্গের অনেক অংশ, পাহাড়ের চূড়া, পল্লীর ও শহরের অনেক বাড়ী প্রবল ঝাঁকুনিতে ভেঙ্গে পড়ে। অনেক লোক ঘরবাড়ী চাপা পড়ে মারা যায়। 'পেমখান' গ্রামের সমস্ত ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে যায়। সত্তর আশিটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ঘর চাপা পড়ে মরে যায়। একটা পাথর ছুঁড়লে যতটা যায় চওড়ায় সেই রকম, আর তীর ছুঁড়লে যতটা যায় লম্বায় ততটা ঘন পরিমাণ জায়গা ভূগর্ভে বিলীন হয়ে একটা জলের ফোয়ারা মাটি ফুঁড়ে ওঠে এবং তার ফলে জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। ত্রিশ মাইল ব্যাপী জায়গা এমন জীর্ণ ও ভাঙ্গাচোরা হয়ে যায় যে কোনও জায়গা আগের সমতল অবস্থার চেয়ে এক হাত উঁচু, আবার কোনও জায়গা এক হাত পরিমাণ নীচু হয়ে যায়। কোনও কোনও জায়গায় মাটি এমন ফাঁক হয়ে যায় যে সেই ফাঁকে যে কোনও মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে। ভূমিকম্পের সময়টায় পর্বতশীর্ষ থেকে ধুলোর মেঘ উঠতে দেখা যায়।

বাদ্য-বাদক নূরউল্লা তখন আমার সামনে বসে সারেঙ্গে ঝঙ্কার তুলছিল। আর একটা বাদ্যযন্ত্র তার পাশেই ছিল। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি আরম্ভ হতেই সে দুটি যন্ত্র দু' হাতে তুলে নেয়। কিন্তু তার নিজের দেহ আয়ত্তে রাখা কঠিন হওয়ায় তার দু' হাতে ধরা দুটি বাদ্যযন্ত্রে ঠোকাঠুকি লাগতে থাকে।

জাহাঙ্গীর মির্জা প্রাসাদের ওপর-তলার বারান্দায় ছিলেন। ভূমিকম্প আরম্ভ হতেই তিনি বারান্দা থেকে লাফিয়ে নীচে পড়েন। তাঁর কোনও আঘাত লাগেনি। তাঁর একজন খানসামারও ঐ অবস্থা হয়। ওপরকার অলিন্দ ভেঙে তার ওপর এসে পড়ে। কিন্তু আল্লা তাকে রক্ষা করেন। সে একটুও আঘাত পায়নি।

সেই একই দিনে তেত্রিশবার ভূকম্পন হয়। তারপর একমাস ধরে দিন রাতে দুই তিনবার করে কম্পন হতে থাকে।

বেগ আর সৈন্যদের দুর্গ এবং অন্য সুরক্ষিত জায়গার ভাঙ্গাচোরাগুলো মেরামত করবার আদেশ দেওয়া হয়। অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর প্রায় একমাসের মধ্যে সমস্ত ভাঙ্গা অংশগুলো মেরামত করে ফেলা হয়।

আমু নদীর তীরে বাকি আমার দলে যোগ দেওয়ার পর থেকে তার মত সম্মান ও কর্তৃত্ব আমি আর কাউকেই দিইনি। কাবুলের রাজস্বের একটা অংশ ষ্ট্যাম্প-ট্যাক্স থেকে ওঠে। এই করের টাকাটা আমি তাকেই দিই এবং তাকে কাবুলের দারোগা নিযুক্ত করি। এই রকম নানা অনুগ্রহ পেয়েও সে কোনও দিনই সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ ছিল না, বরং আমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার প্রস্তাব সুবিধে পেলেই করেছে। আমি তার ছলনা বুঝতে পেরেও আমাকে ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছি এবং তাকে আমার কাছে থাকতেই অনুরোধ করেছি।

দুই একদিন পর পরই সে তাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতে থাকে। তার ছলনা আর তাকে ছেড়ে দেওয়ার অনবরত আবদার শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করলো। তার এই আচরণে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে আমি আমার ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। সে আমাকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে—তার সঙ্গে আমার এই চুক্তি আছে যে সে নয়টা অপরাধ আমার কাছে করলে তবে তার কৈফিয়ৎ তলব করতে পারবো। আমি তার কাছে এগারো দফা অপরাধের তালিকা পাঠিয়ে দিলাম। সে এই অপরাধগুলোর সত্যতা একের পর একটা করে স্বীকার করতে বাধ্য হলো। সে আমার শরণাপন্ন হলো। তারপর আমার কাছ থেকে ছুটি পেয়ে তার পরিবারবর্গ এবং মালপত্র নিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে রওনা হলো।

এই সময় দরিয়া খাঁর দল ডাকাতি এবং লুণ্ঠনে দেশটাকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। বাকি ঐ দিকে আসছে খবর পেয়ে এই দস্যুদল রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। বাকি সদলবলে আসতেই তারা তাকে আর তার সঙ্গী

লোকজনকে বন্দী করে। বাকিকে তারা মেরে ফেলে এবং দরিয়া খাঁ তার স্ত্রীকে দখল করে। বাকিকে তারই প্রার্থনামত পদচ্যুত করেছিলাম বটে, কিন্তু তার কোনও ক্ষতি করিনি। কিন্তু সে তার নিজের পাপে নিজেই জড়িয়ে পড়ে। সেই পাপের ফলে তাকে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হলো।

'যে তোমার ক্ষতি করে, তাকে
ভাগ্যের হাতে ছেড়ে যদি দাও,
ভাগ্য তোমার অনুগত হয়ে
প্রতিশোধ নেবে জানিও নিশ্চয়।'

আমার কাবুলে পৌঁছানোর সময় থেকেই তুর্কোমান হাজারাসরা অসংখ্যবার অপমানসূচক কাজ ও লুণ্ঠনের অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হয়েছে। তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার সঙ্কল্প করি। একদিন প্রভাতে সৈন্য চালনা করে যেখানে হাজারাসরা শীতকালীন ঘাঁটি করেছে সেই দিকে এগোতে লাগলাম। প্রথম প্রহরের শেষাশেষি সময় আমার অগ্রগামী দলের একজন ফিরে এসে জানালো যে হাজারাসরা একটা ছোট নদী যেখানে হেঁটে পার হওয়া যায় সেখানে গাছের ডালপালা পুঁতে জায়গাটা সুরক্ষিত করে রেখেছে এবং আমাদের সৈন্যদের অগ্রগতি রুদ্ধ করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই কথা শুনে আমরা চলার গতি বাড়িয়ে দিই। কিছুদূর অগ্রসর হয়েই যেখানে হাজারাসরা বাধার সৃষ্টি করে তুমুল সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছে তার কাছাকাছি পৌঁছে যাই।

সেই শীতকালে প্রচুর তুষারপাত হয়েছিল। এইজন্য চলতি সাধারণ পথ ছাড়া অন্য পথে যাওয়া বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। যেখানে হেঁটে নদী পার হওয়া চলে—তার পাড় দুটোই বরফে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। অথচ এই পথ ছাড়া অন্য পথে নদী পার হওয়ার উপায় ছিল না। হাজারাসরা অপর পারের ঘাট গাছের ডাল দিয়ে এমন সুরক্ষিত করে রেখেছিল যাতে তা অতিক্রম করা সম্ভব না হয়। তাদের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যরা নদীগর্ভে এবং নদীর তীরে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তীর নিক্ষেপ করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। আমরা খুব তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে পড়ার জন্য আমাদের অনেকেরই বর্ম পরে আসার সময় হয়ে ওঠেনি। দুই একটা তীর সাঁ সাঁ করে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল কিন্তু আমাদের গায়ে লাগেনি।

আমেদ ইউসুফ বেগ খুব ভয় পেয়ে বলে ওঠে—'আপনার বর্ম না পরে চলে আসা ঠিক হয়নি, আপনাকে ফিরতে হবে। দুই তিনটা তীর আপনার মাথা ঘেঁসে চলে গেল আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

আমি উত্তর দিলাম—'সাহস কর। অনেক সময়েই আমার মাথা ঘেঁসে অজস্র তীর চলে গেছে।'

এই সময় আমাদের দক্ষিণ পাশে কাশিম বেগ আর তার দলবল একটা জায়গা আবিষ্কার করে ফেলেছে—যেখানে এই সরু নদীটা পার হওয়া যেতে পারে। সেইখান দিয়েই আমরা নদীর অপর পারে পৌঁছে যাই। দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে হাজারাসদের আক্রমণ করতেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের দলের যারা ওদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল তারা ওদের পেছনে ধাওয়া করে তাদের অনেককে ঘোড়া থেকে নামিয়ে কচুকাটা করে।

সুলতান কুলি তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করেছিল, কিন্তু বরফে মাটি এমন গভীরভাবে ঢাকা পড়েছিল যে রাস্তা ছেড়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। আমিও অনুসরণকারীদের সঙ্গেই এগিয়ে যাই। হাজারাসদের শীতকালের আবাসের কাছাকাছি পৌঁছিয়ে তাদের ঘোড়া আর ভেড়ার পালের ওপর হানা দিই। আমার নিজের হিস্যায় চার পাঁচশো ভেড়া আর বিশ পঁচিশটা ঘোড়া পেয়ে যাই। সুলতান কুলি এবং আরও দুই তিন জন যারা কাছা-কাছি ছিল তারাও লুঠের মালের ভাগ পায়।

আমি লুঠেরার দলের সঙ্গে দু'দুবার গিয়েছি। এই হলো প্রথমবার। আর একবারও যাই এই হাজারাসদের বিরুদ্ধেই—যখন খোরাসান থেকে ফিরবার পথে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ঘোড়া আর ভেড়া লুঠ করা হয়।

হাজারাসদের স্ত্রী এবং শিশুসন্তানরা বরফে ঢাকা পাহাড়ে পালিয়ে যায় এবং সেখানেই অপেক্ষা করে। তাদের অনুসরণ করা আমাদের সম্ভব হয় না। দিনেরও অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমরা হাজারাসদের কুটীরের দিকে যাই এবং সেখানেই বিশ্রাম করি।

বরফ পুরু হয়ে জমেছে। রাস্তা থেকে দূরে এই জায়গায় বরফে ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। রাত্রিতে ক্যাম্পের চারিদিক পর্যবেক্ষণ করবার জন্য যে বাহিনীকে নিযুক্ত করা হয় তারা এই বরফের দরুণ সকাল না হওয়া পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠেই বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

পরদিন সকালে আবার আমরা চলা শুরু করি এবং রাত্রে হাজারাসদের

পরিত্যক্ত কুটীরেই কাটাই। সেখান থেকে আবার এগিয়ে আমরা জাঙ্গোলকে গিয়ে থামি। ইরেক তাঘাই এবং আরও কয়েকজন কিছু পেছনে থাকায় তাদের নির্দেশ দিই যে তারা যেন সেই সব হাজারাসদের আক্রমণ করে বন্দী করে—যারা শেখ দরবেশকে তীর বিদ্ধ করেছে। এই দুর্বৃত্তরা রক্তপাতের বিভীষিকায় হতবুদ্ধি হয়ে তখনও একটি গুহার মধ্যে লুকিয়েছিল। আমার লোকেরা সেই গুহার কাছে হাজির হয়ে গুহার মুখে আগুন জেলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করে। তারপর সত্তর আশি জন হাজারাসকে বন্দী করে তাদের মধ্যে অনেককেই তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে হত্যা করে।

এই সময়, রমজান মাসের তেরো তারিখে আমি এমন কটি-বাতে আক্রান্ত হই যে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমার নড়বার ক্ষমতা ছিল না। এ-পাশ ও-পাশ করতে হলে কোনও লোকের সাহায্য ছাড়া উপায় ছিল না। বাতের যন্ত্রণায় আমার চলার কোনও উপায় না থাকায় আমার লোকজনরা বহন করার জন্য একটা ডুলি তৈরী করে বারান নদীর তীর থেকে কাবুল নগরে নিয়ে আসে। এখানে এসে আমি বোস্তান সরাইতে উঠি। শীতকালের অনেকটা সময় আমি এইখানেই বাস করি। আমার অসুখ তখনও চলছে—কিন্তু আর এক উপদ্রব আরম্ভ হলো। আমার ডান গালে ফোড়া হলো। ফোড়ায় অস্ত্রোপচার করে আবার জোলাপও খেতে হলো।

জাহাঙ্গীর মির্জা আমাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এখানে এসেছিলেন। ইউসুফ আর বেলোল যেদিন থেকে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়—সেইদিন থেকেই তাঁকে বিদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য প্ররোচনা দেয়। এবার তাঁকে দেখে মনে হলো—তিনি যেন আগের মানুষ নন। কয়েকদিন পরেই তিনি বর্ম পরিধান করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁর আবাস থেকে তাড়াতাড়ি গজনির দিকে রওনা হয়ে গেলেন। আল্লা জানেন—আমার কাছ থেকে অথবা আমার পরিজনের কাছ থেকে কথায় বা কাজে এমন কোনও রকম অসন্তোষজনক ব্যবহার পাননি—যার জন্য তাঁর এই রকম উগ্র পন্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। অবশেষে আমি শুনেছিলাম কি কারণে তিনি এইরকম অসদ্ভ ব্যবহার করেছিলেন। কারণটা হচ্ছে—যেদিন জাহাঙ্গীর মির্জা গজনি থেকে এখানে আসেন সেইদিন কাশিম বেগ ও আরও কয়েকজন বেগ তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে যায়। সেই সময় মির্জা একটা তিতির পাখী ধরবার জন্য একটা শিকারী বাজকে তার দিকে ছুঁড়ে দেন। বাজপাখীটা তিতিরকে তার থাবার মধ্যে পুরতে যাওয়ার সময় ওটা বাজের

থাবা এড়িয়ে সজোরে মাটিতে এসে পড়ে। তখন একটা চীৎকার হয়—'বাজ কি ওটাকে ধরতে পেরেছে?' কাশিম বেগ তখন বলে—'যখন বাজটা শত্রুকে নাগালের মধ্যে পেয়ে এই দুরবস্থায় ফেলেছে, তখন কি আর ছেড়ে দেবে? কখনই ছাড়বে না।'

এই কথার ভঙ্গী মির্জার মনে খট্‌কা লাগিয়ে দেয় এবং সে তার কদর্থ করে। মির্জার পলায়নের এটি একটি কারণ। তারও দুই একটা ব্যাপারের কথাও এই পলায়নের হেতু বলে বলা হয়—কিন্তু সেগুলো আগেকার ব্যাপারটির চেয়েও বাজে ও অর্থহীন।

এই সময় সুলতান হোসেন মির্জা সেবানি খাঁর অগ্রগতি রোধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তাঁর সকল পুত্রকে তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ দেন। তিনি সৈয়দ আফজলকে আমার কাছে পাঠান আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমার মনে হলো যে খোরাসান যাওয়াই আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে নানাকারণে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে—একজন পরাক্রমশালী রাজা যিনি তাইমুরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছেন এবং যখন তিনি তাঁর ছেলেদের এবং চারিধারের আমীরদের আহ্বান করে পরাক্রান্ত শত্রু সেবানি খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে স্থির সঙ্কল্প করেছেন—তখন অন্যে যদি পায়ে হেঁটে যায় তাহলে মাথা দিয়ে হেঁটে হলেও আমার উচিত তাদের সঙ্গে যাওয়া; যদি আর সকলে লাঠি হাতে করে যায় তা'হলে আমার উচিত হবে পাথর নিয়ে যাওয়া। আর একটা বিবেচনার বিষয় ছিল—জাহাঙ্গীর মির্জা যখন শত্রুতার মনোভাব দেখিয়েছেন তখন তাঁর মন থেকে সে ভাব দূর করতে হবে, অথবা তার আক্রমণোদ্যোগকে প্রতিহত করতে হবে।

এই বছরের শেষের দিকে যখন সুলতান হোসেন সেবানি খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে শায়েস্তা করবার জন্য বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করে ফেলেছেন সেই সময়েই আল্লা তাঁকে কাছে টেনে নিলেন।

সুলতান হোসেনের চোখ দুটি পটল-চেরা না হলেও টানাটানা ছিল। তাঁর দেহের গঠন মজবুত এবং বলিষ্ঠ। তাঁর শরীরের উপরের অংশ অপেক্ষা কোমর থেকে নীচু পর্যন্ত অনুপাতে কৃশ ছিল। যদিও তাঁর বয়স অনেক হয়েছিল এবং দাড়িও সব পেকে গিয়েছিল—কিন্তু তাঁর পোশাকে রংএর বাহার ছিল। তিনি লাল ও সবুজ রংএর পশমি পোশাক পরতেন। সাধারণতঃ তিনি কালো ভেড়ার চামড়ার টুপি পরতেন। কখনও

কখনও উৎসবের সময় তিনি ভাঁজের জমকালো বড় পাগড়ী পরতেন। পাগড়ীর ওপরে একটা পাখীর পালক অনবরত নড়তে থাকতো। এই-ভাবেই তিনি নমাজ পড়তে যেতেন।

তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত, হাসিখুশি মানুষ। তাঁর মেজাজ মাঝে মাঝে রুক্ষ হয়ে উঠতো, আর এই মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে বাক্যবাণও ছুটতো। অনেক সময়েই তাঁর ধর্মের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ পেত। তাঁর কোনও এক পুত্র কোনও লোককে হত্যা করলে তিনি এইরূপ আদেশ দেন যে সেই আততায়ী। পুত্রকে রক্তের বদলে রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তিনি তাঁকে ঘাতকের হাতে সমর্পণ করে বলে দেন যে বিচারাসনের সামনে তাকে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

তিনি তরবারি দিয়ে লড়াই করতে পছন্দ করতেন। তবে মাঝে মাঝে হাতে হাতে লড়াইয়েও তিনি তাঁর শক্তি দেখিয়েছেন। তরবারির ব্যবহার-কৌশল তাইমুর বংশের আর কেউই তাঁর মত দেখাতে পারেনি।

কবিতা লেখার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। কবি হিসাবে তাঁর নাম ছিল—হুসেনি। তাঁর অনেক কবিতাকেই মন্দের ভাল বলা চলে। মোটের উপর তাঁর সব কবিতাই একই ধরনের মাঝারি গোছের অর্থাৎ খুব ভাল নয় আবার খারাপও নয়। যদিও তিনি মহিমময় রাজা ছিলেন, বয়সের দিক দিয়েও বটে আবার রাজ্যের বিস্তৃতির দিক দিয়েও বটে—কিন্তু তিনি শিশুর মত লড়াইয়ে-ভেড়া পুষতে ভালবাসতেন। পায়রা ওড়াতে আর মুরগীর লড়াই দেখতে তিনি খুব আনন্দ পেতেন।

মৃত্যুর সময় তিনি চোদ্দটি পুত্র আর এগারোটি কন্যা সন্তান রেখে যান। তাঁর পুত্র মহম্মদ হোসেন প্রচলিত ধর্মমত-বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি সাহসী বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি নিপুণ তীরন্দাজ ছিলেন। লক্ষ্য তাঁর অভ্রান্ত ছিল। তাঁর দুই জ্যাযুক্ত ধনুকের দুই ধার এক করতে হলে প্রায় সাড়ে তিন মণের ভার চাপাতে হতো। তাঁর প্রথমা স্ত্রী অত্যন্ত বদমেজাজী ছিলেন। তাঁর জ্বালাতনে তিনি অত্যন্ত উত্যক্ত হয়ে উঠতেন। পোষা বাজপাখী তাঁর অত্যন্ত ভালবাসার জিনিস ছিল। যদি কখনও তিনি শুনতেন যে তাঁর কোনও বাজপাখী মরেছে—কিংবা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তাঁর কোনও পুত্রকে ডেকে এনে বলতেন যে যদি তিনি তার মৃত্যু কিংবা ঘাড় ভাঙ্গার সংবাদ শুনতেন, তা'হলেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হতেন না—যেমন্ হয়েছেন তাঁর বাজপাখীর মৃত্যুতে অথবা হারিয়ে যাওয়ায়।

সুলতান হোসেনের আর এক আমীরের কাব্যিক নাম ছিল 'সহেলি'। তিনি এক ধরনের পদ্য লিখতেন—যার কথাগুলো ও ভাবার্থ ভয়ঙ্কর, যেন একটি অন্যের সঙ্গে পাল্লা রেখে চলেছে। তাঁর একটি কবিতা এই রকম—

'রাতের দুঃখের পারাবারে
নিঃশ্বাসের যে ঝড় ওঠে বুক থেকে
তাহার দাপটে সমগ্র আকাশ
স্থান চ্যুত হয়ে, পড়ে খসে।
আমার চোখের জলে
যে ড্রাগন জন্ম নেয়,
পৃথিবীর ভিত্তিমূল
তারা উপাড়িয়া ফেলে।'

এটা অনেকেই জানেন যে একবার এই কবিতাটি মৌলানা আব্দুলের কাছে আবৃত্তি করলে মোল্লা বলেছিলেন—তুমি কি কবিতা আবৃত্তি করছো—না লোককে ভয় দেখাচ্ছ?

সুলতান হোসেনের যুগটা নিশ্চয়ই খুব সুন্দর ছিল। কারণ, এই যুগে বিখ্যাত লোকের অভাব ছিল না। তার মধ্যে একজন ছিলেন মৌলানা আব্দুল। তাঁর সুন্দর কবিতাগুলির কথা কে না জানে। মোল্লার গুণাবলী এমনি মহান যে আমার মত লোকের সেগুলির বর্ণনা দেওয়া এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আমার এই নগণ্য লেখার মধ্যে তাঁর নামের এবং শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করতে আমি খুবই উৎসুক।

মোল্লা ওসমানও একজন বিশাল জ্ঞানের অধিকারী। তিনিই একবার বলেছিলেন যে মানুষ যেটা শোনে তা আবার কি করে ভুলে যেতে পারে? তাঁর স্মরণশক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি বারংবার উপবাস করায় 'সাধু' আখ্যা পেয়েছিলেন। দাবা খেলা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি দাবা খেলায় এমন উৎসাহী ছিলেন যে যদি দুই জন লোক দাবা খেলা জানে বলে তিনি টের পেতেন, তা'হলে তাদের একজনের সঙ্গে তিনি তৎক্ষণাৎ খেলতে বসে যেতেন এবং আর একজনের জামার এক ধার হাত দিয়ে ধরে রাখতেন —যাতে সে চলে না যেতে পারে। তিনি ফারসী ভাষায় একখানা গ্রন্থ লিখেছিলেন যা খুবই সুন্দর। কিন্তু তাঁর একটা দোষ ছিল যে কোনও দৃষ্টান্ত

দিতে গেলে তাঁর নিজের কবিতারই উল্লেখ করে বলেছেন যে এই দৃষ্টান্ত আমার অমুক বইয়ের মধ্যে পাওয়া যাবে।

চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বেজাদ। চিত্রাঙ্কনে তিনি অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। কিন্তু তিনি শ্মশ্রুহীন কচিমুখ ভাল আঁকতে পারতেন না, গলাটা অত্যন্ত লম্বা করে ফেলতেন। দাড়িওয়ালা মুখ আঁকতে কিন্তু তিনি ওস্তাদ ছিলেন।

গীতবাদ্যকারদের মধ্যে হোসেন উদি খুব ভাল বেহালা বাজাতে পারতেন। তিনি এক একবার এক একটি তারের ওপর সুরের ঝঙ্কার তুলতেন। যখন তিনি বাজাতে আরম্ভ করতেন তখন নানা রকমের অঙ্গভঙ্গী দেখানো তাঁর একটা বিশেষ দোষ ছিল। একবার সেবানি খাঁ তাঁর বাজনা শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। নানা রকমের ভঙ্গী করে কিন্তু তিনি খুবই খারাপ বাজনা বাজালেন, কারণ তাঁর নিজের যন্ত্রটি তিনি সঙ্গে আনেননি। যেটা বাজালেন সেটা অত্যন্ত বাজে ছিল। সেবানি খাঁ বিরক্ত হয়ে হুকুম দেয় যে তাঁর ঘাড়ে গোটা কয়েক ঘুঁষি মেরে বিদায় করা হোক। সোবানি খাঁ বোধ হয় তার জীবনে এই একটি সৎকাজই করেছিল।

আর একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন—'হেরি'র অধিবাসী বিনাই। প্রথম দিকে সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোনও জ্ঞান ছিল না। আলি শের বেগ প্রায়ই তাঁর অজ্ঞতার জন্য টিটকারি দিতেন। কিন্তু এক বছর শীতকালটা 'মাভে'তে কাটিয়ে এবং সঙ্গীত চর্চ্চা করে তিনি এমন উন্নতি করলেন যে গরম কালের আগেই তিনি কয়েকটা সঙ্গীত রচনা করে ফেলেন। আলি শের বেগের তিনি সক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর রসিকতা এবং মুখের ওপর যথোচিত জবাব দেওয়া সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। তার মধ্যে একটির কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে। একদিন দাবা খেলার সময় আলি শের বেগ তাঁর পা ছড়িয়ে দেওয়ার সময় বিনাইয়ের পেছন দিকে তাঁর পা লেগে যায়। অমনি তিনি ঠাট্টার সুরে বলে ওঠেন—পা ছড়াতে গেলেই কবির পেছনে লেগে যায়, 'হেরি'তে দেখছি এটা একটা ভারি নোংরা ব্যাপার।

বিনাই তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—পাটা কবির পিঠেই লেগে থাক, ওটাকে আর কবির পেছনের ছোঁয়াচ থেকে সরিয়ে নিও না যেন।

যাই হোক, নানা বিদ্রূপে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে বিনাই 'হেরি' ছেড়ে সমরকন্দে চলে আসেন।

আলি শের বেগ অনেক প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের উৎসাহদাতা ছিলেন।

যে কেউ কোনও নতুন শিল্পকলা বা নতুন কোনও জিনিস আবিষ্কার করতো সেগুলির মূল্য বাড়ানোর জন্য কিংবা প্রচারের সুবিধার জন্য তার নাম দিতো—'আলি শেরি'। আলি শেরকে নকল করার ঝোঁক তখন এমন প্রবল হয়েছিল যে একবার তাঁর কানে ব্যথার জন্য একটা রুমালে মাথা ও কান বেঁধে রাখায়—সেইভাবে রুমাল বাঁধার চলন হয়ে গেল—যাকে বলা হতো—আলি শেরি ফ্যাশান। বিনাই 'হেরি' ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময় তাঁর ঘোড়ার পিঠে বসবার জন্য একরকম নতুন ধরনের গদি তৈরী করান—আর ঠাট্টা করে সেই গদীর নাম রাখলেন—আলি শেরি।

॥ ১৫ ॥

১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

মহরম মাসে উজবেগদের আক্রমণ প্রতিহত করতে খোরাসানের দিকে রওনা হই। জাহাঙ্গীর মির্জা গজনি থেকে পালাবার পর আমি বিবেচনা করে ঠিক করি যে আমার পক্ষে আইমাকদের বিদ্রোহ দমন এবং যারা মনে অসন্তোষ পুষে রেখেছে তাদেরও শান্ত করা দরকার—যাতে তারাও বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে। তাছাড়া, আমার দলের লোকদেরও যাতে অসন্তোষের ছোঁয়াচ না লাগে সেজন্য তাদের পৃথক করে কাজে লাগানো উচিত। এইজন্য বিপুল সেনা আর হাল্কা ধরণের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই আমার পক্ষে ভাল হবে মনে করলাম।

এই সময় দূতরাও আমাকে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানাতে এলো। কিছু পরেই বেরেন্দাক বিরলাসও এসে পড়লো। মির্জাদের সঙ্গে দেখা করতে আর আমার বাধা কোথায়। আমি সেই উদ্দেশ্যে দুই শ' মাইল অতিক্রম করে এলাম। মহম্মদ বেগের সঙ্গে আমি এগোতে লাগলাম। এই সময় মির্জারাও মারখাব পর্যন্ত এগিয়ে শিবির স্থাপন করেছে। জেমিদা-উল-আখির মাসের আট তারিখ সোমবার মির্জাদের সঙ্গে আমার দেখা হলো। আবুল মহসিন মির্জা আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এক মাইল এগিয়ে এলেন। যখন আমরা পরস্পর মুখোমুখি হলাম তখন আমি ঘোড়া থেকে নামলাম এক পাশ দিয়ে—আর তিনিও নামলেন অন্য পাশ দিয়ে। আমরা পরস্পর এগিয়ে এসে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম। তারপর আবার আমরা ঘোড়ায় চড়লাম।

কিছুদূর যেতেই প্রায় শিবিরের কাছাকাছি মুজাফ্‌ফর মির্জা ও ইবন হোসেন মির্জার সঙ্গে দেখা হলো। আবুল মহসিন্ মির্জার চেয়ে তাঁরা বয়সে ছোট। সুতরাং আমাকে অভ্যর্থনা করতে তিনি যতটা এগিয়ে গিয়েছিলেন তার চেয়েও আগে গিয়ে এদের আমাকে অভ্যর্থনা জানানো উচিত ছিল। খুব সম্ভবতঃ তাদের এই বিলম্বের কারণ হচ্ছে গতরাত্রে অতিরিক্ত সুরাপান— ঠিক অহঙ্কারের জন্য নয়। গতরাত্রে আমোদ-প্রমোদজনিত অবসাদ দূর না হওয়ার জন্যই এ বিলম্ব—আমাকে ইচ্ছাকৃত অপমান করার জন্য নয়। মুজাফ্‌ফর মির্জা আমাকে অভ্যর্থনা জানালে আমরা ঘোড়ার পিঠে বসেই পরস্পরকে আলিঙ্গন করলাম। তারপর একইভাবে ইবন হোসেন মির্জাকে আলিঙ্গন করে আমরা দরবার তাঁবুর কাছে পৌঁছিয়ে ঘোড়া থেকে নামলাম। স্থির হলো যে আমি দরবার কক্ষে পৌঁছিয়েই মাথা নুইয়ে সেলাম জানাব এবং সঙ্গে সঙ্গে বদিয়া-এজ-জেমান উঁচু প্ল্যাটফরমের উপর আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তার কিনারে এসে দাঁড়াবেন এবং সেখানে আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হব।

দরবার কক্ষে প্রবেশ করেই কুর্ণিশ করে বদিয়া-এজ-জেমানের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। তিনিও দাঁড়িয়ে উঠে ধীরে ধীরে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসতে থাকেন। কাশিম বেগের আমার সম্মানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আমার ব্যাপারটা সে সর্বদাই নিজের ব্যাপার বলেই মনে করতো। সে আমাকে তাড়াতাড়ি এগুতে দেখে আমার কটিবন্ধ ধরে টান দেয়। আমি তৎক্ষণাৎ তার মনের ভাষা বুঝে ফেলি। তখন ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে বদিয়া-এজ-জেমানের সঙ্গে ঠিক নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হয়ে আলিঙ্গন করলাম।

এই বড় দরবারী তাঁবুতে চার জায়গায় গালিচা বিছানো ছিল। এটা সুরাপান উৎসব ছিল না বটে, তবুও মাংসের সঙ্গে মদও দেওয়া হয়। খাদ্যের পাশেই সোনা ও রূপার পাত্রে সুরা রাখা হয়। আমার পূর্বপুরুষরা এবং পরিবারের লোকজন নিষ্ঠার সঙ্গে চেঙ্গিস খাঁয়ের নিয়ম-কানুন মেনে আসছে। তাঁদের সভা-সমিতিতে, বিচারালয়ে, তাঁদের উৎসব এবং অভ্যর্থনাদির ব্যাপারে, তাঁদের বসা বা উঠে দাঁড়ানোর আদব কায়দায় কোনও দিন চেঙ্গিস প্রবর্তিত নীতি থেকে বিচ্যুত হননি। চেঙ্গিস খাঁর রীতি-নীতি অবশ্য এমন কোনও দৈবনির্দেশের মত ছিল না যে সেগুলো না মানলে অপরাধ বলে গণ্য হবে। তবুও প্রত্যেক মানুষ যারা সৎ আচরণ

বিধিতে আস্থাবান, তিনি তাঁর প্রবর্তিত আচার আচরণ বিধিগুলি মেনে আসছেন—যদিও পিতা কোনও খারাপ কাজ করে থাকলে পুত্রের সেটা নিশ্চয়ই সংশোধন করে নেওয়া উচিত।

আহারের পর আমরা ঘোড়ায় চড়ে শিবিরে ফিরে আসি। আমার সৈন্যদের শিবির থেকে মির্জাদের সৈন্য শিবিরের দূরত্ব ছিল দু' মাইল।

দ্বিতীয়বার যখন আমি বদিয়া-এজ-জেমানের কাছে আসি তখন আর তিনি আমাকে প্রথম বারের মত সম্মান দেখালেন না। আমি তখন জুলনুন্ বেগকে ডেকে এনে বলে দিলাম যে, সে মির্জাকে যেন এই কথা জানিয়ে দেয় যে আমি বয়সে ছোট হলেও আমার জন্ম উচ্চবংশে। আমি দু' দু'বার আমার পৈত্রিক রাজ্য সমরকন্দ জয় করেছিলাম। যখন আমি এই মহান বংশের সন্তান হয়ে বংশের গৌরব রক্ষার জন্য বিদেশী শত্রুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তির মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছি, তখন আমাকে যথাযোগ্য সম্মান না দেখানো কি উচিত হচ্ছে? আমার এই কথাগুলো তাঁকে জানালে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং তাঁর আচরণ পরিবর্তন করে আমার প্রতি যথোচিত সম্মান, সম্ভ্রম ও সদিচ্ছার ভাব দেখাতে লাগলেন।

আর একবার যখন আমি বদিয়া-এজ-জেমানের সঙ্গে দুপুরের নমাজের সময় দেখা করতে যাই, তখন সেখানে সুরাপান চলছিল। আমি তখন মদ স্পর্শ করতাম না। আপ্যায়নটা খুব সুন্দর হয়েছিল। ট্রের ওপর নানা-রকমের ভাল ভাল খাদ্য সাজানো ছিল। মুরগী ও হাঁসের মাংসের কাবাব—সঙ্গে আরও সুখাদ্য জিনিস্। বদিয়া-এজ-জেমানের দেওয়া এই ভোজ-উৎসব খুব জাঁকালো রকমের হয়েছিল। সকলেই স্বাধীন, সহজ ও দ্বিধাহীন-ভাবে এই উৎসবে মেতে উঠেছিল। যখন আমি মারখাবের নদীতীরে ছিলাম—তখনও দু' তিনবার পানোৎসবে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু ওরা যখন জানলে যে আমি মদ খাই না—তখন আর ওরা আমাকে মদ খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেনি। আমি একবার মুজাফ্ফর মির্জার পার্টিতেও উপস্থিত ছিলাম। মদের নেশা যেই ধরেছে, মীর বাদের অমনি নাচতে শুরু করে দিল। তবে সে নাচলো খুব ভাল। নাচের পদ্ধতিটাও তারই আবিষ্কার।

মির্জারা সামাজিক ব্যাপারে সংস্কৃতিবান, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাতেও তারা নিপুণ। তাঁদের কথাবার্তা, আলাপ আপ্যায়নেও মাধুর্য ও প্রতিভা

প্রকাশ পায়। কিন্তু যুদ্ধোদ্যমে কিংবা যুদ্ধ অভিযানে তাঁদের কোনও জ্ঞান নেই। যুদ্ধ চালাতে হলে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, তার কোনও অভিজ্ঞতা তাঁদের দেখা যায় না। সৈনিক জীবন যাপনে যে সাহসিকতার প্রয়োজন সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা তাঁদের নেই।

যখন আমরা মারখাবে—সংবাদ এলো যে হক্ নজর তার শ'চার-পাঁচ সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছে এবং চিচিক্টু প্রদেশে লুণ্ঠন শুরু করেছে। কয়েকজন মির্জা মিলিত হয়ে শলা-পরামর্শ করলেন বটে, কিন্তু এই লুণ্ঠনকারী-দের বাধা দিতে একটা ছোট দলও খাড়া করতে পারলেন না। মারখাব থেকে চিচিক্টুর দূরত্ব চল্লিশ মাইল। আমি অনুমতি চাইলাম যাতে আমি এই অভিযান চালাতে পারি। কিন্তু তাঁদের মর্যাদায় আঘাত লাগতে পারে ভেবে তাঁরা আমাকে নড়বার অনুমতি দিলেন না।

কয়েকদিন পর মুজাফ্ফর মির্জার নিমন্ত্রণ পেলাম —তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য। তিনি শ্বেত উদ্যানে ছিলেন। প্রাসাদটি এই বাগানের মাঝখানে। বাড়ীটি ছোট দোতলা—কিন্তু খুব সুন্দর। ওপর তলাটা খুব নিপুণতার সঙ্গে তৈরী করা হয়েছে। চার কোণায় চারটি কক্ষ এবং মাঝখানে প্রশস্ত হলঘর। চার কক্ষের সংলগ্ন বড় বারান্দা। হলের প্রত্যেকটি অংশে নানা চিত্র আঁকা আছে। এই প্রাসাদ অবশ্য বাবর মির্জা তৈরী করেছিলেন, কিন্তু চিত্রগুলি আঁকা হয়েছিল সুলতান আবু সৈয়দ মির্জার নির্দেশ মত। এগুলি তাঁরই যুদ্ধ-সম্পর্কিত চিত্র।

উত্তর দিকের বারান্দায় দুইটি গালিচা মুখোমুখি পাতা। একটিতে মুজাফ্ফর মির্জা আর আমি বসলাম, আর একটিতে সুলতান মামুদ মির্জা আর জাহাঙ্গীর মির্জা। মুজাফ্ফর মির্জার বাড়ীতে আমি অতিথি, সুতরাং তিনি আমাকে খুব সম্মান দেখালেন। আমার স্বাস্থ্যপানের উদ্দেশ্যে একটি পাত্র পূর্ণ করে সুরা পান করলেন। পরিবেশকরা অপেক্ষা করছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে এক এক পাত্র খাঁটি সুরা প্রত্যেককে পরিবেশন করতে লাগলো। তাঁরাও ঢক ঢক করে পান করতে লাগলেন। দেখে মনে হচ্ছিল—যেন প্রাণদায়িনী শীতল জল পান করছেন—উগ্র মদিরা নয়। দলটি ক্রমশঃ গরম হয়ে উঠলো। মদ তাদের মাথায় চড়ে বসলো। আমাকেও সুরা পানে প্রবৃত্ত করার চিন্তাটাও তাদের মাথায় খেলতে লাগলো—যাতে আমি তাদের দলে ভিড়তে পারি।

আমি এত দিন পর্যন্ত সুরা পান দোষে দোষী নই। পান দোষ না

থাকায় মদে কি রকম নেশা হয় তারও কোনও ধারণা আমার ছিল না। এখন আমার মনে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার উদয় হলো যে একবার পান করে মজাটা কি হয় দেখাই যাক না। গলা দিয়ে সুরা নামতে থাকলে কি রকম ব্যাপারটা হয় দেখবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হলো।

বাল্যকালে সুরার কথা মনেই হতো না। এর আনন্দই বা কি—আর বেদনাটাই বা কতটা—কিছুই জানতাম না। আমার বাবা অনেক সময় সুরা পান করতে বলতেন। আমি অক্ষমতা জানিযে চলে আসতাম। বাবার মৃত্যুর পর খাজা কাজির উপদেশ ও তত্বাবধানে থাকার জন্য আমি সৎ এবং নির্মলচরিত্র ছিলাম। আমি কোনও নিষিদ্ধ খাদ্য খাইনি। তাই কি করে আমি মদ পান করতে পারি? পরে যখন যুবজনোচিত কল্পনায় এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় আমার সুরা পানের ইচ্ছা হতো—তখন আমার কাছে এমন কেউই থাকতো না—যাকে আমার ইচ্ছা পুরণ করানোর কথা বলতে পারি। এমন কোনও লোকও ছিল না যার মনে এমন কোনও সন্দেহ উঠতে পারে যে আমি সুরাপানের আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করছি। সুতরাং ইচ্ছা হলেও তা মুখ ফুটে বলার ক্ষমতা না থাকায় কেউ সন্দেহ করতে পারতো না যে আমার মনে সুরাপানের অসংযত ইচ্ছাটা গুপ্ত হয়ে আছে।

এখন আমার মাথায় এলো—এঁরা যখন এত করে অনুরোধ করছেন, আর তাছাড়া 'হেরি'র মত সুসভ্য নগরে যখন আমি এসেছি যেখানে আনন্দ উপভোগ করার কোনও উপাদানেরই অভাব নেই, সব রকমের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাই যেখানে মজুদ, আর এই সব ভোগ-বিলাসের আহ্বান যখন স্বতঃই এসে পড়েছে—তখন এ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা কি ঠিক হবে? যদি এখন আমি এঁদের অনুরোধ রক্ষা না করি তাহলে এমন মুহূর্ত আর কখনই আসবে না। এই সব চিন্তা করে আমি সুরা পান করাই মনস্থ করলাম। কিন্তু তখন আমার এই কথাটা মনে হলো যে বড় ভাই বদিয়া-এজ-জেমান মির্জার হাত থেকে যখন সুরা গ্রহণ করতে প্রথমে অসম্মত হয়েছি—তখন ছোট ভাইদের হাত থেকে সেটা নিলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। আমার এই দ্বিধা ও অসুবিধার কথা জানালাম। আমার যুক্তি এঁরা মেনে নিলেন। এর পর সুরাপানের জন্য এই অনুষ্ঠানে আর কেউ পীড়াপীড়ি করলেন না। স্থির হলো যে যখন আবার বদিয়া-এজ-জেমান মির্জার বাড়ীতে দেখা হবে তখন মির্জাদের অনুরোধে আমি সুরা পান করবো।

এই অনুষ্ঠানে গায়কদের মধ্যে হাফিজ হাজি ছিলেন। তিনি খুব ভাল

গান করলেন। 'হেরি'র গায়করা মৃদু, নরম সুরে এবং স্থির প্রশান্তভাবে গান করে থাকেন। জাহাঙ্গীর মির্জার সঙ্গে মির জান নামে একজন গায়ক ছিল। সে উচ্চগ্রামে কর্কশ বেসুরো সুরে গান করতো। জাহাঙ্গীর মির্জা মাত্রা ছাড়িয়ে ফেলেছিলেন; এজন্য প্রস্তাব করলেন যে মির জানের গান হোক। সে গান আরম্ভ করলো তার অভ্যাস মত মারাত্মক উঁচু গলায় কর্কশ বেসুরো সুরে। খোরাসানের বাসিন্দারা তাদের শিষ্টাচারের নীতিকে অত্যন্ত মূল্য দেয়। অনেকে অবশ্য মুখ ঘুরিয়ে নিল, কেউ বা ভ্রূ কোঁচকালো, কিন্তু মির্জার খাতিরে কেউ তাকে গান থামাতে বললো না।

সন্ধ্যার নমাজের পর আমরা মুজাফ্ফর মির্জার তৈরী তাঁর নতুন শীত-কালীন প্রাসাদে এলাম। আমরা সেখানে এলে ইউসুফ আলি গোকুলতাস অতিরিক্ত সুরাপানে মত্ত হয়ে নাচ শুরু করে দিল। সে সঙ্গীতজ্ঞ, তাল মান জানা লোক। সুতরাং সে নাচলো ভালই। এই প্রাসাদে এসে দলটি খুবই স্ফূর্তিবাজ ও অমায়িক হয়ে উঠলো। মুজাফ্ফর মির্জা আমাকে একটি তরবারি, কোমরবন্ধ, বর্ম এবং একটি সাদা ঘোড়া উপহার দিলেন।

জানক একটি তুর্কি সঙ্গীত গাইলো। উৎসবে যখন সবাই সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তখন তাদের কতকগুলো হীন কুশ্রী তামাসা করতে দেখা গেল। উৎসব অনেক রাত পর্যন্ত গড়িয়ে চললো। যখন শেষ হলো তখন রাত্রি শেষের আর বেশী বাকি নেই। আমি সে রাত্রিটা এই প্রাসাদেই কাটাই।

কাশিম বেগ যখন শুনলো যে আমাকে মদ খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়েছে তখন সে এবং জুল্নুন মির্জাদের ওপর দোষারোপ করে খুব ভৎর্সনা করলো। ব্যাপার দেখে তাঁরা আর আমাকে মদ খাওয়া সম্বন্ধে অনুরোধ করবেন না স্থির করলেন।

বদিয়া-এজ-জেমান মির্জা মুজাফ্ফর মির্জার উৎসবের কথা শোনার পর আবার একটা ভোজের ব্যবস্থা করে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। আমার অনেক তরুণ আমীর ও সেনাধ্যক্ষও বাদ গেল না। আমার সভাসদ্রা আমার সম্মানের জন্য সুরাপান করতো না। যদি বা কখনও মাসে কিংবা চল্লিশ দিনে এক একবার তাদের ইচ্ছা হতো, তখন তারা কোনও ঘরের দরজা বন্ধ করে—পাছে আমি টের পাই সেইজন্য—ভয়ে ভয়ে মদ্যপান করতো। এমনি ধরণের লোকদেরই নিমন্ত্রণ হয়েছিল এই আসরে। যখনই তারা মনে করছিল যে আমার দৃষ্টি অন্যদিকে তখনই তাদের সুরাপাত্র

হাত দিয়ে আড়াল করে এক এক চুমুক দিচ্ছিল অত্যন্ত সচকিতভাবে। সত্যি, এরকম সাবধানতার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, কোনও উৎসবে সাধারণ চল্‌তি নীতি অনুসরণ করতে, আমি তাদের অনুমতি দিয়েই রেখেছি। তাছাড়া, বর্তমান উৎসবটা তো আমার বাবা কিংবা দাদা দিচ্ছেন এই রকমই আমি মনে করেছি।

ওরা উৎসব স্থানে কচি শাখাযুক্ত উইলো গাছ নিয়ে এল। জানি না স্বাভাবিকভাবে এ গাছগুলো ঐ রকম ধরণের, না কৃত্রিম শাখা তৈরী করে গাছের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। গাছের ছোট ছোট শাখা ধনুকের জ্যার মত মনে হচ্ছিল। গাছগুলো কিন্তু খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ভোজ চলার সময় একটা আস্ত হাঁসের রোষ্ট আমার সামনে রাখা হয়। কিন্তু কিভাবে ওটা কাটতে এবং টুকরো করতে হয় জানা না থাকায় ওটা সামনেই পড়ে রইলো। বদিয়া-এজ-জেমান বললেন যে আমি হাঁসের রোষ্ট পছন্দ করি কি না। তাঁকে খোলাখুলিই বললাম—ওটা কিভাবে কাটতে হয় আমি জানি না। মির্জা তৎক্ষণাৎ ভাজা মাংসটা কেটে টুকরো টুকরো করে আমার সামনে রাখলেন। এই রকম ভদ্রতায় বদিয়া-এজ-জেমান অতুলনীয় ছিলেন। উৎসব শেষে তিনি আমাকে রত্নখচিত ছোরা, স্বর্ণখচিত রুমাল এবং একটি ঘোড়া উপহার দেন। আমি 'হেরি'তে কুড়িদিন ছিলাম। সেই সময় আমি ঘোড়ায় চড়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। যে সব দ্রষ্টব্য স্থান আগে আমার দেখা হয়নি সেগুলো এবার দেখেছি। এই সব দেখার ব্যাপারে ইউসুফ আলি গোকুলতাস আমার গাইডের মত ছিল। সে আগে থেকেই আমার গন্তব্য স্থানের কাছে এমন নিশানা রাখতো যা দেখে সেখানেই আমি থামতাম। এই কুড়ি দিনে আমি সুলতান হোসেন মির্জার মঠ ছাড়া সম্ভবতঃ আর সব দ্রষ্টব্য স্থানই দেখেছি। দেখেছি—ধবল মাঠ, আলি শরের উদ্যান, কাগজ তৈরীর কারখানা, রাজ সিংহাসন, গা'র সেতু, ধবল মাঠের ধারে ছায়াশীতল মনোরম পথ, সাফের প্রাসাদ, নবাইয়ের সিংহাসন, বারকিরের সিংহাসন, শেখ উমের ও শেখ জৈনুদ্দিনের সিংহাসন, আবদুল রহমানের সমাধিক্ষেত্র, মাছ ভরা পুকুর, মির্জাদের শিক্ষাভবন ও কবরস্থান, সাহবেগমের শিক্ষাভবন ও তাঁর তৈরী জমকালো মসজিদ। আরও দেখেছি—কাক বাগান, নতুন বাগান, জোবিদার বাগান, সুলতান

আবু সৈয়দের তৈরী শ্বেত প্রাসাদ, সৈনিকের আসন, মালানের' সেতু, খাজার অলিন্দ, আর শ্বেত উদ্যান, প্রমোদ আবাস, সম্ভোগ প্রাসাদ, কমল প্রাসাদ, দ্বাদশ গম্বুজ, বিরাট জলাধার, আর তার চার ধারে চারটি ইমারত, নগর-প্রাচীরের পাঁচটি ফটক—রাজা ফটক, ইরাক ফটক, ফিরোজাবাদ ফটক, খুস ফটক আর কিপচাক ফটক। দেখেছি—রাজার বাজার, সাধারণের বড় বাজার, সেখ উল ইসলামের শিক্ষা ভবন, রাজাদের বৃহৎ মসজিদ, নগর উদ্যান, আন্‌জিল নদীর তীরে তৈরী বদিয়া-এজ-জেমানের বিদ্যায়তন। আরও দেখেছি-আলি শের বেগের আবাস বাটী—যাকে লোকে বলে—আরাম প্রাসাদ, তাঁর কবরখানা এবং বড় মসজিদ—যাকে বলে পবিত্র মসজিদ, তাঁর শিক্ষা ভবন ও মঠ—যাকে বলে সাধু মঠ, তাঁর স্নানাগার এবং দাতব্য চিকিৎসালয়—যাকে লোকে বলে স্বাস্থ্যকর ও মালিন্য রোধক। সমস্তই আমি এই অল্প সময়ের মধ্যে দেখেছি।

শীত ঋতু এসে পড়েছে। যে পর্বত শ্রেণী আমার রাজ্যকে আমার কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেখানে তুষারপাত আরম্ভ হয়েছে। কাবুলের এখন কি অবস্থা জানবার জন্য আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছি। শেষে, প্রয়োজনের তাড়নায় অথচ আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তার ব্যাখ্যা করতে না পেরে আমি শীত-আবাসে যাচ্ছি—এই ছলনা করে বেরিয়ে পড়লাম।

যখন আমরা 'হেরি' ছেড়ে চলে আসি তখন থেকেই ক্রমাগত তুষারপাত হচ্ছিল। দু' তিন দিন পর দেখা গেল রাস্তায় পুরু হয়ে বরফ জমে আছে। ঘোড়ার জিনের রেকাব পর্যন্ত বরফ উঠেছে। এমন কি অনেক জায়গায় ঘোড়ার পা বরফ ভেদ করে মাটি পর্যন্ত পৌঁছচ্ছিল না। সুলতান পাশাই নামে আমাদের একজন গাইড ছিল। বার্দ্ধক্যের জন্যই হোক, বা তার হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্বলতার জন্যই হোক, বা অস্বাভাবিক তুষারপাতের জন্যই হোক তার কেমন যেন সব গুলিয়ে গিয়েছিল। পথের নিশানা একবার হারিয়ে ফেলার পর সে আর কিছুতেই ঠিক করতে পারলো না যে কোন্‌দিকে পথ! সে আর তার ছেলেরা তাদের যশ রক্ষা করার জন্য ঘোড়া থেকে নেমে বরফ সরিয়ে একটা রাস্তা বের করলো। সেই পথে আমরা এগিয়ে চললাম। পরদিন এত বরফ পড়লো যে আর রাস্তার কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না যদিও এর জন্য অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করা গেল। বাধ্য হয়ে

আমাদের থামতে হলো। আর কোনও উপায় না দেখে আমরা যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরে একটা জায়গায় থামলাম যেখানে প্রচুর জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায়। ষাট সত্তর জন বাছাই করা লোককে যে রাস্তায় আমরা ফিরলাম সেই রাস্তা ধরে আরও এগিয়ে গিয়ে কোনও উঁচু জমি দেখা যায় কিনা এবং সেখানে হাজারাসরা বা অন্য কোনও লোকেরা শীতকালীন আবাস নির্মাণ করে বাস করছে কিনা দেখবার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। তা ছাড়া, পথের নিশানা দিতে পারে এমন লোক পাওয়া যায় কিনা তাও দেখবার জন্য বলে দিলাম।

আমরা এই জায়গায় তিন চার দিন অপেক্ষা করলাম লোকগুলোর ফিরে আসার পথ চেয়ে। তারা অবশ্য ফিরে এলো কিন্তু তারা কোনও গাইডের সন্ধান পায়নি। তারপর আল্লার ওপর ভরসা করে আমরা যে রাস্তা দিয়ে ফিরে এসে এখানে নেমেছিলাম সেই রাস্তা দিয়েই আবার এগোতে লাগলাম—পাশাইকে আগে আগে যেতে বলে। এর পরে কয়েক দিন আমাদের অনেক দুঃখ কষ্ট ও নানা অসুবিধা সহ্য করতে হয়েছিল। বাস্তবিক এরকম দুঃখ কষ্ট আমার জীবনে অল্পই ভোগ করেছি। এই সময়ে আমি এই কবিতাটি রচনা করি—

'কোন্ ভাগ্য বিড়ম্বনা,
অদৃষ্টের পরিহাস
করে নাই আমাকে দহন ?
কোনও দুঃখ আছে নাকি বাকি
যার মুখোমুখি
হয় নাই আমার জীবন ?'

প্রায় সপ্তাহ খানেক গভীর বরফ মাড়িয়ে আমরা দু' তিন মাইলের বেশী অগ্রসর হতে পারিনি। আমরা দশ পনেরো জন, কাশিম বেগ, তার দু' ছেলে আর দু' তিন জন ভৃত্য ঘোড়া থেকে নেমে বরফ গুঁড়ো করে পথ পরিষ্কারের কাজে লেগে গেলাম। প্রথমে যে এই কাজে লাগলো সে কয়েক পা এগিয়ে হাঁফিয়ে পড়তেই দাঁড়িয়ে গেল এবং আর একজন তার জায়গায় গিয়ে কাজ শুরু করলো। দশ পনরো বিশ জন এইভাবে বরফ চূর্ণ করে পথ পরিষ্কার করার পর এক একটা ঘোড়াকে সওয়ার ছাড়াই সেই পথটুকু এগিয়ে নিয়ে

আসা হলো। প্রথম ঘোড়াটি দশ পনেরো পা এগিয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তাকে তখন এক পাশে রেখে আবার আর একটাকে আনা হলো। আমরা দশ বিশ জন বরফ গুঁড়িয়ে রাস্তা করে আমাদের সমস্ত ঘোড়াকেই নিয়ে এলাম। আমাদের অবশিষ্ট সেনা, ভাল ভাল লোকজন এমন কি 'বেগ' উপাধি-ধারীরাও ঘোড়ার পিঠে বসেই চূর্ণ বরফের ওপর দিয়ে মাথা হেঁট করে এগিয়ে এলো। এরকম ব্যাপার দেখেও কর্তৃত্ব জাহির করে তাদের কষ্ট দেওযার মানে হয় না। যাদের তেজ আছে ও প্রতিযোগিতায় নামতে ইচ্ছা আছে তাদের অবশ্য এসব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়াই উচিত। আমরা বরফ চূর্ণ করা রাস্তা ধরে চলতে চলতে 'আনজুকান' নামে একটা জায়গায় পৌঁছই। তারপর আবার তিন চারদিন ধরে জিরিন গিরি-সঙ্কটের নীচে একটা গুহার কাছে এসে গেলাম।

সেদিন ঝড়ের মতো হাওয়া বইছিল। এত বেশী বরফ পড়ছিল যে মনে হলো আমরা সবাই এক সঙ্গে মারা যাব। আমরা গুহার মুখে থেমে গেলাম। বরফ এমন পুরু হয়ে পড়েছিল আর রাস্তাটা এত সরু ছিল যে একজন ছাড়া যাওয়া চলে না। ঘোড়াগুলোও চূর্ণ বরফের ওপর দিয়ে অতি কষ্টে এগিয়ে চলল।

শীতকালের দিনগুলো খুবই ছোট। প্রথম দল সৈন্য দিনের আলো থাকতে থাকতেই গুহায় এসে পৌঁছায়। রাত্রি হয়ে গেলে অন্যান্য সৈন্য আর এসে পৌঁছাতে পারেনি। তারা যে যেখানে পৌঁছেছিল সেখানেই ঘোড়া থেকে নেমে অপেক্ষা করছিল। কেউ কেউ বা রাত্রিতে ঘোড়ার পিঠেই বসেছিল।

গুহাটি ছোট। আমি একটা কোদাল দিয়ে গুহার মুখের কাছের বরফ সরিয়ে নমাজের জন্য যেটুকু গালিচার আসন লাগে ততটুকু ছোট জায়গা বিশ্রামের জন্য পরিষ্কার করি। বরফে আমার বুক পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল তবুও পা মাটিতে ঠেকেনি। যাই হোক এই গর্তটা আমাকে বাতাসের হাত থেকে কিছুটা রক্ষা করেছিল। বরফের দেওয়াল ঘেরা একটু-খানি জায়গায় আমি বসেছিলাম। কেউ কেউ আমাকে বলেছিল গুহার ভেতরে যেতে। কিন্তু আমি তা করিনি। আমার মনে হয়েছিল যখন আমার লোকজন বাইরে তুষারপাত সহ্য করে বরফের মধ্যে কাটাবে তখন আমি গুহার মধ্যে গরম আবহাওয়ার আরামে ঘুমোবো—তা কখনও হতে পারে না। যারা আমার সঙ্গী তাদের চরম দুঃখ ও বিপদের মধ্যে ফেলে,

তাঁদের দুঃখ কষ্টের অংশভাগী না হয়ে নিজের সুখের চিন্তা করার মত দায়িত্বজ্ঞানহীন মনোভাব আমি কখনও দেখাতে পারি না। এটা ঠিক তারা যে দুঃখ কষ্ট এবং অসুবিধাগুলো আমার জন্য ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে সেই দুঃখ কষ্ট অসুবিধার ভাগও আমাকে গ্রহণ করতে হবে। ফারসীতে একটি কথা আছে—বন্ধু বান্ধবদের সান্নিধ্যে মরণও একটা উৎসবের মত। আমি সেই তুষারপাতের মধ্যে সেই ছোট গর্তটির মত জায়গায় বসে রইলাম রাত্রির নমাজের সময় পর্যন্ত। আমি পা জড়ো করে বসেছিলাম। তখন এমন জোরে বরফ পড়তে লাগলো যে আমার মাথায়, ঠোঁটে, কানে চার ইঞ্চি পরিমাণ বরফ জমে গেল। সেই রাতেই ঠাণ্ডা লেগে আমার কান ব্যথা করতে লাগলো। রাত্রের নমাজের পর একদল লোক গুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলো যে গুহাটি বেশ প্রশস্ত; ভিতরে এত জায়গা রয়েছে যে আমাদের দলের সকলেই গুহার মধ্যে অনায়াসে থাকতে পারে। এই কথা শুনে আমি উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ও মুখের ওপর জমা বরফ ঝেড়ে ফেলে গুহার মধ্যে চলে এলাম। যারা কাছাকাছি ছিল তাদের সকলকেই গুহার মধ্যে চলে আসতে বললাম। পঞ্চাশ ষাট জন লোকের থাকার মত জায়গা গুহার মধ্যে পাওয়া গেল। আমাদের সঙ্গে যে সব খাবার—যেমন ঝলসানো মাংস এবং আর যা কিছু ছিল—সেগুলো বের করা হলো। এইভাবে আমরা তুষারপাত ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে রেহাই পেয়ে নিরাপদ, গরম এবং আরামদায়ক আস্তানায় নবজীবন লাভ করলাম।

পরদিন সকালে তুষারপাত ও ঝড় থেমে গেল। আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। আবার সেই আগেকার মত বরফ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পথ করে চলা শুরু হলো। গিরি-সঙ্কটের তলায় আসার আগেই দিন শেষ হয়ে এলো। আমরা পাহাড়ের মধ্যে এক সমতলক্ষেত্রে এসে থেমে গেলাম।

সেদিন রাত্রে অসহ্য ঠাণ্ডায় আমাদের খুবই কষ্ট পেতে হলো। অনেকের হাত পা শীতের প্রকোপে অকেজো হয়ে গেল। কোপেকের পা, সুন্দুকের হাত দুটো ও আখির পা ঠাণ্ডায় একেবারে জখম হয়ে গেল। পরদিন ভোরে আমরা ঢালু পথ দিয়ে নামতে লাগলাম। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে ঠিক রাস্তা দিয়ে আমরা চলছি না—তবুও আল্লার ওপর আস্থা রেখে এগিয়ে চললাম। ধীরে ধীরে এই দুরূহ পথ ধরে নীচে নামতে শুরু করলাম। সন্ধ্যার নমাজের সময় আমরা সেই উপত্যকা পার হয়ে এলাম। অতি বৃদ্ধলোকও স্মরণ করতে পারল না যে এই রকম বরফ ভেঙ্গে কেউ কোনও

কালে এই গিরি-সঙ্কট দিয়ে নেমে এসেছে কি না। এই ঋতুতে কেউ যে এ পথ অতিক্রম করতে পারে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। যদিও আমরা এই কয়দিন অসহ্য কষ্ট সহ্য করেছি—তবু একথা বলতে হবে যে উঁচু হয়ে বরফ জমে থাকার জন্যই আমরা এই পথে যাত্রা শেষ করতে পেরেছি। যদি এইভাবে বরফ না জমে থাকতো তা, হলে কি করে আমরা খাড়াই পথ এবং পাহাড়ী নদীগুলি অতিক্রম করতাম? বরফ জমে থাকার জন্যই আমরা তার ওপর দিয়ে চলে আসতে পেরেছি। বরফের প্রাচুর্য না থাকলে আমাদের ঘোড়া আর উট গভীর আবর্তে পড়েই ডুবে যেত।

'ভাল মন্দ দুইটাই
ভগবান-আশীর্বাদ।
এটা যদি বুঝে থাক
ঘটিবে না পরমাদ।'

রাতের নমাজের সময় আমরা ইয়াকি-আউলিংএ পৌঁছাই। এখানকার অধিবাসীরা যখন শুনলো যে আমরা পাহাড় থেকে নেমে এসেছি তখন আমাদের তারা তাদের উষ্ণ কুটীরে নিয়ে এলো। আমাদের জন্য চর্বিওয়ালা ভেড়া, ঘোড়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে ঘাস আর দানা, আর আগুন জ্বালানোর জন্য শুকনো ঘুঁটে নিয়ে এল। বরফের রাজ্য অতিক্রম করে এই গরম আস্তানায় আসা, অনাহারের কষ্ট দূর হয়ে এমন চর্বিওয়ালা মাংস এবং ভাল রুটি খেতে পাওয়া যে কি আনন্দের বস্তু—তা, আমাদের মত দুর্ভোগ যারা ভুগেছে তারাই বুঝতে পারে।

একদিন ইয়াকি-আউলিংএ অবস্থান করে আমার সঙ্গীদের মনোবল ও দেহের শক্তি ফিরিয়ে আনি। তারপর আবার রওনা হয়ে আট মাইল অতিক্রম করে থামি। পরদিন সকালেই রমজান উৎসব। আমরা যে রাস্তায় যাচ্ছিলাম তুর্কোমান হাজারাসদের শীতকালের আস্তানা সেই পথের ধারেই ছিল। তারা তাদের পরিবার-পরিজন এবং মালপত্র নিয়ে ঐ দিকেই বাস করছিল। আমাদের আসার কথা একটুও জানতে পারেনি। পরদিন সকালে আমরা এগিয়ে যেতেই তাদের কুটীর ও ভেড়ার খোঁয়াড়গুলোর মধ্যে এসে পড়ি। দু' তিন জায়গায় লুঠতরাজও করা হলো। হাজারাসরা ভয় পেয়ে তাদের কুটীর ও সম্পত্তি ফেলে রেখে তাদের ছেলে-মেয়ে নিয়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর আমাদের অগ্রবর্তী দলের কাছ থেকে সংবাদ এলো যে হাজারাসদের কয়েকজন আমাদের যাওয়ার পথের ওপর জমায়েত হয়ে একটা সঙ্কীর্ণ গিরিপথের মুখে দাঁড়িয়ে আমার লোকজনদের থামিয়ে তীর দিয়ে আক্রমণ করে তাদের এগোবার পথ বন্ধ করেছে। এই সংবাদ পেয়েই আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলাম। এসে দেখি যে জায়গাটা কোনও গিরিপথ নয়। তবে হাজারাসরা একটা ঢালু পাহাড়ের গায়ে তাদের আসবাব-পত্র জমা করে রেখে আমার লোকদের লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ছে।

(তুর্কিতে) শত্রুর পাল দেখা গেল দূরে
জমাট কালো মেঘের মত
আমার সেনা দাঁড়িয়ে গেল
আতঙ্কে হয়ে অভিভূত।
বল্লাম তাদের—'কিসের ভয় ?
সাহস করে রুখে দাঁড়াও,
ভীরুতার সময় এটাতো নয়।
আমি চাই—তারা সাহস ভরে
ঝাঁপিয়ে পড়ুক শত্রুর ঘাড়ে।
লোকজনদের এগিয়ে দিয়ে,
রইলাম আমি সব পিছনে।
কিন্তু যতই আমি তাড়া লাগাই,
আমার আদেশ তোলে না কানে।
আমার গায়ে ছিল না বর্ম।
অশ্বপৃষ্ঠও বর্ম শূন্য,
অস্ত্র সম্ভার অতি নগণ্য,
সম্বল শুধু ধনুক তীর।
যখনই আমি দাঁড়িয়ে যাই
অনুচররাও ঠিক করে তাই।
নিশ্চল ঠিক পাথরের মত
যেন শত্রুর হাতে, হয়েছে হত।
ভৃত্যের বল কিবা প্রয়োজন
যদি না বিপদে সহায় হয়।

প্রভু যদি বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে
এগুনো কি তার উচিত নয় ?
চুপ করে থাকা এ কোন্ নীতি
মনিব যেখানে হাবুডুবু খায়।
বিশ্বাসী নোকর সেই তো হবে।
কাজে কর্মে যে ফাঁকি না দেবে।

* * * *

অবশেষে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে
শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলাম,
সামনে শত্রু তাড়িয়ে দিয়ে,
পাহাড়ের পরে উঠে যে এলাম।
আমার লোকেরা ব্যাপার দেখে
সাহসে তখন বাঁধিয়ে বুক,
ধেয়ে চলে আসে আমার পেছনে
ভয় নাই তাদের এত্‌তোটুক।
শত্রুর তীর তুচ্ছ করে
পাহাড়ের গায়ে উঠতে থাকি।
ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বাধা দিতে চায়
বাধা মানার লোক আমরা নাকি ?
ঘোড়া থেকে নেমে কখনও বা চড়ে
সাহসী যোদ্ধা চলে আসে উঠে।
তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে হয়রান হয়ে
শত্রুরা তখন পালায় ছুটে।
দুর্জয় মোদের সাহস দেখে
তারা কি কখনও দাঁড়াতে পারে ?

* * * *

পাহাড় শীর্ষ জয় করে নিয়ে,
হরিণের মত লাফ-ঝাঁপ দিয়ে,
তুচ্ছ করে গুহা, চড়াই, উৎরাই
হাজারাসদের পিছু পিছু ধাই।

গলা কেটে ফেলে পশুদের মত,
লুঠ করে তাদের মালপত্র যত।
ভাগ করে দিই লুঠের মাল।
হাজারাস যেন ভেড়ার পাল।
যারা চলে গেছে অনেক দূরে
তাদের পেছনে ধেয়ে চলে যাই,
বন্দী করে সব স্ত্রী ও পুরুষ
ছোট ছেলে মেয়েও বাদ যায় নাই।

এই কবিতার সারমর্ম হচ্ছে এই:—আমার অগ্রবর্তী সেনাদের হাজারাসরা রাস্তার মাঝে নামিয়ে দিলে তারা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই অবস্থায় আমি একা এগিয়ে আসি। যারা পালাচ্ছিল তাদের হাঁক দিয়ে বলি—দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি তাদের মনের বল ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে? শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার তাদের কোনও চেষ্টাই নেই। তারা নানা জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। যদিও আমার শিরস্ত্রাণ, গায়ে বর্ম কিংবা কোনও অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, কেবলমাত্র তীর ধনুক সম্বল, তবুও সাহস ভরে ওদের ডাক দিয়ে বললাম—'ভৃত্য রাখার দরকার এই-জন্যই যে তারা কাজের উপযোগী হবে এবং প্রয়োজনের সময় প্রভুর প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ দেবে। প্রভু শত্রুর দিকে এগিয়ে যাবে, আর ভৃত্যরা তাই দাঁড়িয়ে দেখবে—এইজন্য কেউ ভৃত্য রাখে না।' এই কথা বলেই আমি দ্রুত ঘোড়া ছুটোই। যখন আমার লোকেরা দেখলো যে, আমি শত্রুর দিকে ছুটছি তখন তারাও আমাকে অনুসরণ করলো। যে পাহাড়ের ওপর হাজারাসরা জড়ো হয়েছে তার কাছে পৌঁছিয়ে আমার সৈন্যরা পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলো। ওপর থেকে অনবরত শরবৃষ্টি উপেক্ষা করে তারা ঘোড়ার পিঠে কিংবা পায়ে হেঁটে উপরে উঠতে লাগলো। শত্রুরা যখন দেখলো যে আমার লোকজন বেপরোয়া, তখন আর তারা মাটি আঁকড়ে থাকতে ভরসা পেল না; পালাতে শুরু করলো। আমার লোকেরা পাহাড়ের ওপর তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে বন্ধ পশুর মত শিকার করতে লাগলো। শত্রুপক্ষের মাল-পত্র যা চোখে পড়ল সে সব লুঠ করলো এবং তাদের আর তাদের স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের বন্দী করে নিয়ে এল। কতকগুলো ভেড়া আটক করে সেগুলো ইয়ারেকের হেফাজতে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম।

এই পার্বত্য প্রদেশের উঁচু নীচু সব জায়গা অতিক্রম করে হাজারাসদের ঘোড়া আর ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে লেঙ্গারে চলে এলাম এবং সেখানেই শিবির স্থাপন করলাম। চোদ্দ পনেরো জন কুখ্যাত বিদ্রোহী নেতা ও ডাকাতের সর্দার আমাদের হাতে বন্দী হলো। আমার ইচ্ছা ছিল যে তাদের শরীরে নানা কষ্ট দিয়ে হত্যা করে এমন একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা—যাতে এই রকম শাস্তি দেখে অন্য সব বিদ্রোহী আর দস্যুরা ভয়ে সাবধান হয়ে যায়। কিন্তু কাশিম বেগের অন্তরে এমন অহেতুক করুণার উদয় হলো যে সে তাদের মুক্তি দান করলো।

'মন্দজনের ভাল করা
(আর) ভাল লোকের মন্দ করা
একই ভাষা।
নোনা মাটিতে শস্য বোনা,
শীষ হবে না একটি কণা।
বৃথাই আশা।'

এই রকম করুণাই আর সকল বন্দীর প্রতি দেখানো হলো। তারা সকলেই মুক্তি পেল।

তুর্কোমান হাজারাসদের শায়েস্তা করার জন্য যে সময়ে আমরা ব্যস্ত ছিলাম, সেই সময় খবর পেলাম যে মহম্মদ হোসেন আর বিরলাস—যে সব মোগলকে আমরা কাবুলে রেখে এসেছিলাম—তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য দলে টেনে নিয়ে খাঁ মির্জাকে কাবুলের রাজা বলে ঘোষণা করে কাবুল অবরোধ করেছে। অবশ্য কাবুল দুর্গের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ওদের দলে না গিয়ে দুর্গ সুরক্ষিত করে সেটা রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছে।

লেঙ্গার-তাইমুর-বেগ থেকে আমি কাবুলের সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাওদের চিঠি লিখে জানাই যে আমি এখানে এসে পৌঁছেছি। সেই চিঠি কাশিম বেগের একজন ভৃত্য মহম্মদ আন্দেজানির হাত দিয়ে পাঠাই। তাদের গোপনে জানিয়ে দিলাম যে ঘুরবেন্দ গিরি-সঙ্কট দিয়ে নেমে এসে আচমকা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমার পৌঁছানোর সঙ্কেত-স্বরূপ মিনার পাহাড় অতিক্রম করে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালাব, আর তাই দেখে ওরা যেন দুর্গের ওপরে উন্মুক্ত মণ্ডপে যেখানে খাজাঞ্চিখানার কাজ হয়—সেখানে একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বালায়—যা দেখে আমরা স্থির নিশ্চয় হতে পারি যে তারা আমাদের উপস্থিতির কথা জানতে পেরেছে। যখন আমরা বাইরে থেকে

শত্রুদের আক্রমণ করবো, তারা যেন তখন দুর্গের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—যাতে দুর্গ অবরোধকারীরা দুই দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে পর্যুদস্ত হয়। এই রকম উপদেশই আমি মহম্মদ আন্দেজানি মারফৎ তাদের কাছে পাঠাই।

পরদিন সকালে লেঙ্গার ত্যাগ করে উস্টার-সেহারের বিপরীত দিকে থামি। দুপুরের আগেই আবার ঘোড়ায় চড়ে রাত্রি নাগাদ গিরি-সঙ্কট পার হয়ে সির-ই-পুলে আসি। সেখানে ঘোড়াদের স্নান করিয়ে, দানা জল খাইয়ে তাদের চাঙ্গা করে নিয়ে দুপুরের নমাজের সময় আবার বেরিয়ে পড়ি। তুতকাওয়েল পর্যন্ত পথে কোনও বরফ ছিল না। সেই জায়গা অতিক্রম করে যতই এগোতে লাগলাম ততই বরফ গভীর হচ্ছে দেখা গেল। শীত এমন তীব্র বোধ হচ্ছিল যে আমার জীবনে এমন ঠাণ্ডা বোধহয় কমই ভোগ করেছি। পাহাড়ের প্রান্তে ঘোড়া থেকে নেমে তীব্র শীতে অস্থির হয়ে আগুন জ্বালিয়ে শরীর গরম করতে লাগলাম। এটা কিন্তু সে জায়গা নয় যেখানে আগুন জ্বালিয়ে সঙ্কেত জানানোর কথা ছিল। কিন্তু তীব্র শীত সহ্য করতে না পেরে আমরা আগুন জ্বালাতে বাধ্য হয়েছিলাম। সকাল হতে না হতেই পাহাড়ের প্রান্ত থেকে আমরা রওনা হই। বরফ ঘোড়াগুলোর উরু পর্যন্ত উঠেছিল। সমস্ত রাস্তাটাই বরফের মধ্যে উঠে নেমে অতিক্রম করেছিলাম। এইভাবেই আমরা কারও চোখে না পড়েই কাবুলে পৌঁছে যাই।

বিবি-মা-রুই পৌঁছানোর পূর্বেই দুর্গের ওপর আগুন জ্বলছে দেখতে পেলাম। আগুন দেখে বুঝতে পারলাম যে ওরা সবাই প্রস্তুত হয়ে আছে। আমরা যখন সেতুর কাছে এলাম তখন দক্ষিণ পাশের সেনাদের এগিয়ে যেতে বললাম। মাঝের ও বাঁ পাশের সেনাদের নিয়ে বাবা লুলির পথে অগ্রসর হতে লাগলাম। খাঁ মির্জার প্রাসাদ এ জায়গায় ছিল। মোল্লা বাবার উদ্যানের কাছে যে কবরখানা আছে সেখানে পৌঁছতেই কয়েকজন আহত লোককে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে এখানে আনা হয়েছে দেখা গেল। এরাই প্রথমে এগিয়ে গিয়ে খাঁ মির্জার বাড়ীতে ঢুকে পড়েছিল। তারা ছিল সংখ্যায় চারজন। খাঁ মির্জা যে প্রাসাদে ছিল তারা সেখানে প্রবেশ করতেই গোলমাল চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। সেই সময়ই খাঁ মির্জা জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে পালিয়ে যায়। মোহম্মদ হোসেন কোরবেগির ভাই যে খাঁ মির্জার অধীনে কাজ করতো সেই ঐ চার জনের মধ্যে একজন অর্থাৎ

শের কুলিকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয়। তার প্রতিদ্বন্দ্বী তার মাথা কেটে ফেলার চেষ্টা করবার সময় কোনও রকমে সে পালিয়ে আসে। এই চার জন যারা তরবারি ও শরাঘাতে বিক্ষত হয়েছে, তাদেরই আমার কাছে আনা হয়েছে যা আগেই বলেছি।

রাস্তাটা অত্যন্ত সরু। আমার ঘোড়-সওয়াররা এই সরু রাস্তার ওপর ভিড় করেছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা আর হৈ চৈ আরম্ভ হয়ে গেল। শত্রু-পক্ষের কয়েকজন এই ভিড়ের মধ্যেই একসঙ্গে জড়ো হয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছিল। আমার সৈন্যরা তখন এগোতেও পারে না, পেছতেও পারে না। আমি ইচ্ছা প্রকাশ করলাম যে আমার দলের যে কয়েকজন লোক আমার কাছে আছে তারা ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে শত্রুর ওপর তীর নিক্ষেপ করুক। নির্দেশমত কয়েকজন তাই করে। শত্রুপক্ষ তখন সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালাতে শুরু করলো।

আমরা সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। ধারণা ছিল যে দুর্গ থেকে আমাদের লোক নেমে এসে আমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু তারা কেউ এলো না। শত্রুরা পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গেলে তবে তারা দুই একজন করে আসতে লাগলো। খাঁ মির্জা পালিয়েছে দেখে আমরা ঐ জায়গা ছেড়ে এলাম।

আমেদ ইউসুফ আমার পেছনে ছিল। চার-বাগ ফটক দিয়ে যখন আমি বেরিয়ে আসছিলাম তখন একজন লোক—যাকে আমি তার সাহসের জন্য কাবুলে বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়েছি এবং যাকে নগর-কোটালের পদে নিয়োগ করেছি—খোলা তরবারি নিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে আসছে দেখতে পেলাম। আমার গায়ে শুধু মাত্র একটা হাত-কাটা পুরু কোর্তা, গায়ে কোনও বর্মও নেই। তা ছাড়া শিরস্ত্রাণ পরতেও ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে অবশ্য 'ওহে দোস্ত, ওহে দোস্ত' বলে সম্বোধন করে তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলাম এবং আমার পেছন থেকে আমেদ ইউসুফও চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্যই হোক, কিম্বা অতিরক্ত রক্তপাতের জন্য হোক, তার মতিভ্রমই হোক কিংবা যুদ্ধের হট্টগোল আর চেঁচামেচিতে তার বুদ্ধিভ্রংশই হোক—সে আমাকে চিনতে পারলো না। সে দ্রুত এগিয়ে এসে আমার বাহুতে তরবারির আঘাত করে বসলো। কিন্তু আল্লার আশ্চর্য করুণা সুস্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে যেন

ভেসে উঠলো। তরবারির আঘাতে আমার এক গাছি চুলেরও কোনও ক্ষতি হলো না।

'মানুষের তরবারি
যত আঘাতই হানুক না,
ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা
একটি শিরাও কাটবে না।'

বারংবার আমি এমন এক প্রার্থনা করে এসেছি যার বলে সর্বশক্তিমান আল্লা আমাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এবারও যে এমন বিপদের সম্মুখে পড়েছিলাম—তাও আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি।

আমার প্রার্থনাটি এইরূপ :—'হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো। তুমি এক। তুমি ছাড়া আর কোনও ঈশ্বর নেই। তোমার উপরই আমার সমস্ত নির্ভবতা, অকুণ্ঠ বিশ্বাস। তুমি জগতের একমাত্র প্রভু। হে আল্লা তুমি যা ইচ্ছা করবে তাই ঘটবে। তুমি যা ইচ্ছা কর না—তা কখনও ঘটতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কোনও ক্ষমতা বা বিভূতি নেই যা মহিমময় তোমার কাছ থেকে আসেনি। সকল সত্যের চেয়ে বড় সত্য এই যে তুমি সর্বশক্তিমান। তোমার জ্ঞান দ্বারা সব কিছুই বুঝতে এবং সব কিছুরই সঠিক হিসাব রাখতে পার।'

'হে সৃষ্টিকর্তা, তোমার প্রতি আমার অকুণ্ঠ বিশ্বাস। আমার অন্তরে পাপের এবং কোনও দুষ্কার্যের প্রেরণার উদয় হলে তুমি তাকে আঘাত করে নিঃশেষ কর এবং বাইরে থেকেও আমার কোনও বিপদ যদি ঘনিয়ে আসে তাও তুমি দূর করে দাও। যদি কোনও মানুষের হাত থেকে কিংবা অন্য কোনও প্রাণী থেকে আমার কোনও অনিষ্ট ঘটার কারণ হয়, তবে অশেষ করুণায় সে বিপদ থেকে আমাকে দূরে রাখ। সত্য বলতে তুমিই একমাত্র বিধাতা, জগৎ সিংহাসনের তুমিই একমাত্র প্রভু।'

সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে মহম্মদ হোসেনের বাগানে গেলাম—কিন্তু সেখানে সে নেই। পালিয়ে গিয়ে কোথায়ও সে গা ঢাকা দিয়েছে। বাগানের একটা ভাঙ্গা দেওয়ালের মধ্যে সাত আটজন তীরন্দাজ ঘাঁটি রক্ষা করছিল। তাদের দিকে আমি জোরে ঘোড়া চালিয়ে ছুটলাম। তারা আর সেখানে দাঁড়াতে সাহস করলো না—দৌড়ে পালিয়ে গেল। একজনকে ধরে ফেলে তাকে আঘাত করলাম। সে এমনভাবে ঘুরতে ঘুরতে গড়িয়ে গেল যেন তার মাথাটা কাটা পড়েছে। যে লোকটাকে আঘাত করি তার

নাম—গোকুলতাস। তার বাহুতে আঘাত করেছিলাম। মহম্মদ হোসেনের বাড়ীর দরজায় পৌঁছিয়ে দেখা গেল যে একজন মোগল অলিন্দের ওপর বসে আছে। সে লোকটাকে আমি চিনলাম। সে আমারই চাকুরিতে ছিল। সে ধনুকে তীর লাগিয়ে আমার দিকেই তাক করছিল। চারদিক থেকে সোরগোল উঠলো—'আরে, করছো কি, করছো কি! উনি যে রাজা।' সে তীরের লক্ষ্য ঘুরিয়ে নিয়ে তীরটা ছুঁড়ে দিয়ে দৌড়িয়ে পালিয়ে গেল। তীর ছুঁড়ে আর কি হবে—যখন মির্জা আর তার কর্মচারীরা হয় পালিয়েছে না হয় বন্দী হয়েছে।

আমি প্রাসাদে উপস্থিত হওয়ার পর গলায় দড়ি বেঁধে মাটির ওপর দিয়ে টানতে টানতে সুলতান বিরলাসকে আমার কাছে নিয়ে আসা হলো। তাকে আমি অনেক অনুগ্রহ দেখিয়েছিলাম এবং তাকে নান্‌গেনহার পরগণাটা দিয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও সে আমার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। সে উত্তেজিত হয়ে বল্‌তে বল্‌তে আসছিল—কি দোষ আমি করেছি?

—কি দোষ করেছ? তোমার মত নাম-করা লোকের পক্ষে বিপক্ষে যোগ দিয়ে তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করা—এর চেয়ে বেশী অপরাধ আর কি হতে পারে?

আমার মামার মা শা বেগম ছিলেন বিরলাসের বোনের মেয়ে। সেই-জন্য তাকে অপমানকরভাবে টেনে হিঁচড়ে আনতে নিষেধ করলাম। তা ছাড়া তাকে প্রাণেও মারিনি বা অন্য কোন ক্ষতিও করিনি।

দুর্গের একজন প্রধান কর্মচারী আমেদ কাশিম কোবুরকে নির্দেশ দিলাম যে একদল সৈন্য নিয়ে খাঁ মির্জার খোঁজে বের হোক। স্বর্গোদ্যানের কাছা-কাছি শা বেগম আর রাজপুত্রীরা থাকতেন তাঁদের নিজেদের নির্মিত অট্টালিকায়। প্রাসাদ ত্যাগ করে আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

নগরের দুষ্ট লোকেরা লাঠি ডাণ্ডা নিয়ে দাঙ্গা শুরু করে দিয়েছে। তাদের লক্ষ্য ছিল ঘরের মধ্যে লোকজনদের ধরে তাদের জিনিসপত্র লুঠ করা। এই খবর শুনে জায়গায় জায়গায় সৈন্য মোতায়েন করে দিলাম যাতে তারা দুর্বৃত্তদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারে।

শা বেগম রাজকুমারীদের সঙ্গে একই কক্ষে বসেছিলেন। সাধারণতঃ যে জায়গায় নামি আমি ঘোড়া থেকে সখানেই নেমে উপরে উঠে গিয়ে তাঁদের আগেও যে ভাবে সম্মান দেখিয়ে এসেছি—এবারও সেইভাবেই সেলাম

করলাম। শা বেগম আর রাজকুমারীরা ভীত, বুদ্ধিভ্রষ্ট, লজ্জিত এবং অবসাদ-গ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। দোষ স্খালনের জন্য তাঁদের মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হলো না। তা' ছাড়া আমার কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করার মত শালীনতা দেখানোরও তাঁদের তখন ক্ষমতা ছিল না। এটা আমার মোটেই ইচ্ছা নয় যে তাঁরা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। কিন্তু একথাও ঠিক যে এই সংঘর্ষ ঘটানোর জন্য যারা দোষী—তারা সব এমন দলের লোক যারা কখনও শা বেগম ও রাজপুত্রীদের কথা ঠেলতে পারে না! খাঁ মির্জা শা বেগমের নাতি। সে দিনরাত্রি বেগমদের কাছেই থাকতো। যদি সে তাঁদের পরামর্শ না শুনতো তাহলেও তাঁদের এমন ক্ষমতা ছিল যাতে তাকে দূরে যেতে না দিয়ে কাছেই তাঁদের চোখের সামনে রাখতে পারতেন।

বহুবার বিপজ্জনক অবস্থা এবং দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়ে আমার দেশ, রাজসিংহাসন, ভৃত্য, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে পালিয়ে যখন এঁদের কাছে আশ্রয়ের জন্য গিয়েছি এবং আমার মা'ও গিয়েছেন তখন কিন্তু এঁদের কাছ থেকে কোনরকম অনুগ্রহ বা ভরসার কথা শুনতে পাইনি। খাঁ মির্জা সম্পর্কে আমার ভাই এবং তার মাও সে সময়ে সম্পদশালী দেশের মালিক ছিলেন। কিন্তু আমার কিম্বা আমার মায়ের একটা গ্রাম তো দূরের কথা একটা মুর্গী পর্যন্ত ছিল না। আমার মা ইউনিস খাঁয়ের কন্যা, আর আমি তাঁর দৌহিত্র। কিন্তু এঁরা আমাদের আত্মীয় বলে স্বীকার করুন আর নাই করুন—এঁদের মধ্যে যাঁরাই আমার কাছে এসেছেন তাঁরাই আমার কাছে উপকার পেয়েছেন। আমি তাঁদের আত্মীয় কিংবা ভাই বলেই গ্রহণ করেছি।

শা বেগম যখন আমার কাছে এলেন—তাঁকে আমি 'পেমখান' উপঢৌকন-স্বরূপ দিই—যে জায়গাটা কাবুলের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের প্রতি কোনও রকমের ত্রুটিই আমার পক্ষ থেকে হয়নি।

সুলতান সৈয়দ খাঁ ছিন্ন পরিচ্ছদ পাঁচ ছয়জন অনুচর নিয়ে পায়ে হেঁটে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাঁদের নিজের ভাই বলে গ্রহণ করি। তাঁকে মানদ্রার প্রদেশের তুমান জেলাটি দিলাম।

যখন শা ইসমাইল মার্ভেতে সেবানি খাঁকে পরাজিত করে হত্যা করে এবং যখন আমি কুন্দেজে চলে আসি তখন আন্দেজানের লোকদের আমার দিকে দৃষ্টি পড়ে। তারা ওখানকার কয়েকটি শহরের দারোগাদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই আমার নামে শহরগুলো অধিকার করে নেয় এবং আমাকে সেই সংবাদ জানায়। তখন আমি সুলতান সৈয়দ খাঁকে আমার বিশ্বস্ত

অনুচর এবং কিছু সৈন্য সঙ্গে দিয়ে আমার নিজের দেশ আন্দেজানের শাসনকর্তা করে পাঠাই। তাঁকে খাঁ পদবী দিয়েও ভূষিত করি। এই সময় পর্যন্ত ঐ পরিবারে প্রতিটি মানুষকে যারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের সঙ্গে, আমার পিতৃবংশীয় আত্মীয়দের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করে থাকি সেই একই রকম ব্যবহার করেছি।

এই লেখার মধ্যে আমি কারও ওপর কোনও কটাক্ষ করতে চাইনি। কিন্তু যা আমি বলছি তা একেবারে সরল সত্য কথা। নিজেকে প্রশংসা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসব কথার উল্লেখ করছি না—যা ঘটেছে সেই কথাই বলে যাচ্ছি। যেমন যেমন ঘটেছে সেই ঘটনাগুলোই যতদূর সম্ভব নিখুঁতভাবে লিখছি। সেজন্য ভাল কিংবা মন্দ যে কাজই হোক, অথবা আমার বাবা কিংবা বড় ভাই, বন্ধু কিংবা অপরিচিত যার কথাই হোক আমি নিরপেক্ষভাবে দোষগুণ বিচার করে লিখে গিয়েছি। সেইজন্য পাঠকদের কাছে আমার নিবেদন তাঁরা যেন আমাকে ক্ষমা করেন এবং কঠোরভাব নিয়ে যেন আমার বিচার না করেন।

শা বেগমদের কাছ থেকে চলে এসে আমি খাঁ মির্জা যে প্রাসাদে থাকতো সেইখানে উপস্থিত হই। সেখানে এসে আমি এই দেশের নানা জায়গার সম্ভ্রান্ত লোকেদের, আইমাক ও যাযাবর জাতের সর্দারদের চিঠি লিখে জানিয়ে দিই আমার জয়ের কথা। তারপর ঘোড়ায় চড়ে আমি কাবুল দুর্গে চলে আসি।

মহম্মদ হোসেন পালিয়ে এসে প্রাণভয়ে রাজকুমারীদের পোশাকের আলমারিতে গালিচার মধ্যে লুকিয়েছিল। দুর্গ থেকে মিরাম দিওয়ানা এবং আরও কয়েকজনকে ঐ বাড়ী তল্লাশ করে তাকে খুঁজে বের করতে আদেশ দিই। রাজকুমারীদের প্রাসাদ-ফটকে এসে তারা কর্কশ এবং অশিষ্ট ভাষায় চেঁচাতে থাকে। যাহোক, তারা গালিচার মধ্য থেকে মহম্মদ হোসেনকে আবিষ্কার করে দুর্গের ভেতর নিয়ে আসে।

আমি তার সঙ্গে যথোচিত সম্মানজনক ব্যবহার করি। সে এলেই আমি উঠে দাঁড়াই। তার সঙ্গে উগ্র ব্যবহারের কোনও চিহ্নই দেখাই না। মহম্মদ হোসেন এমন অপরাধ ও পাপকাজের জন্য দায়ী এবং সে এমন বিদ্রোহের ব্যাপারে লিপ্ত হয়েছে যে যদি তাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হতো অথবা অন্য কোনও নৃশংসভাবে হত্যা করা হতো তা'হলেও সেইটাই তার উচিত প্রাপ্য হতো। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কিছুটা আত্মীয়তা

থাকার জন্য—আমার মায়ের ভগ্নীর গর্ভে তার কয়েকটি পুত্র ও কন্যা সন্তান হওয়ায়—আমি নানাদিক বিবেচনা করে তাকে মুক্তি দিয়ে খোরাসানে চলে যাওয়ার সম্মতি দিই।

কিন্তু এই অকৃতজ্ঞ, কাপুরুষ—যাকে আমি এমনভাবে ক্ষমা করেছি এবং প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছি—সে আমার উপকার ও সদাশয়তা একদম বিস্মৃত হয়ে আমার আচরণ সম্বন্ধে কুৎসিত ভাষায় সেবানি খাঁকে নানা কথা বলেছে এবং আমাকে গালাগালি করেছে। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই সেবানি খাঁ তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আমার হয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে।

যে তোমার করে ক্ষতি
নিয়তির হাতে তাকে কর সমর্পণ।
নিয়তি তোমার হয়ে
যথোচিত শাস্তি তার করিবে বিধান।

যে দল খাঁ মির্জার সন্ধানে গিয়েছিল তারা তাকে পাহাড়ের মধ্যেই ধরে ফেলে। সে পালাতেও পারেনি, আর তার এমন শক্তি বা সাহসও ছিল না যে যুদ্ধও করতে পারে। তাকে বন্দী করে নিয়ে এলো। আমি পুরাতন দরবার কক্ষে বসেছিলাম। সেখানেই আমার সামনে তাকে হাজির করা হলো।

তাকে বললাম—এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কোলাকুলি কর।

তখন তার এমন উত্তেজিত সন্ত্রস্ত অবস্থা যে আমার কাছে আসতেই দুইবার আছাড় খেলো। তারপর আমার সামনে এসে নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জানালো। পরস্পর আলিঙ্গন করে ও সেলাম জানিয়ে তাকে আমার পাশে নিয়ে বসাই এবং তাকে সাহস ও ভরসা দিয়ে কথা বলতে থাকি।

সরবত নিয়ে এলে আমি প্রথমে কিছুটা পান করে তার বিশ্বাস জন্মিয়ে সেই পানপাত্র তার হাতে তুলে দিই। আমার সৈন্য দলের কতক অংশের, এ দেশের কতক লোকের এবং মোগলদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ দূর না হওয়ায়, খাঁ মির্জাকে নজরবন্দী করে রাখবার জন্য তার ভগ্নীর প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলাম। আদেশ দিলাম—সে যেন বিনা হুকুমে ঐ জায়গা ত্যাগ না করে। কিন্তু যখন বুঝলাম ষড়যন্ত্র এবং চাপা আন্দোলন থামছে না তখন খাঁয়ের কাবুলে থাকাটা মোটেই সুবিধের মনে হলো না। নানা কথা চিন্তা করে তাকে খোরাসানে যাওয়ার অনুমতি দিলাম।

সে চলে যাওয়ার পর আমি বারানের চার পাশে ঘুরে বেড়াবার জন্য বেরিয়ে পড়ি। বসন্তকালে বারানের আশে পাশের জায়গাগুলো মনোরম হয়ে ওঠে। কাবুলের যে কোনও স্থানের চেয়ে এর সবুজ শোভা অতুলনীয়। এখানে নানা ধরণের টিউলিপ অপর্যাপ্ত। কত রকমের টিউলিপ আছে জানবার ইচ্ছা হওয়ায় আমার অনুচররা চৌত্রিশ রকমের ফুল নিয়ে আসে। সত্যিই বসন্তকালে এমন নয়নাভিরাম স্থান এবং শিকারী পাখী নিয়ে আমোদের জায়গা পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

॥ ১৬ ॥

১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

লুঠতরাজ ও ঘিলজাইদের বাসভূমি তোলপাড় করে ফেলার জন্য কাবুল থেকে যাত্রা করি। ঘিলজাইদের শিবিরের চার মাইল দূর থেকে একটা কালো পর্দার মত দৃশ্য চোখে পড়লো। সেটা হয় ওদের চলার ফলে ধূলো ওড়ার জন্য, না হয় ধোঁয়ার জন্য। আমার দলের তরুণ ও অনভিজ্ঞ সেনারা দ্রুতগতিতে ধাওয়া করলো। আমি তাদের পিছন পিছন ধাওয়া করে তাদের পা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগলাম। এই-ভাবে তাদের গতি খানিকটা রোধ করতে সক্ষম হই। যখন পাঁচ ছয় হাজার লোক দল বেঁধে লুঠতরাজের জন্য বেরিয়ে পড়ে তখন তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা বড়ই কঠিন। যাহোক, আল্লার ইচ্ছায় সবই ঠিক হয়ে গেল। আমার লোকজন শান্ত হয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগলো।

মাইল খানেক দূর থেকে বোঝা গেল যে কালো ছায়ার মত যেটা দেখাচ্ছে সেটা আফগানদের শিবির সমাবেশের জন্যই হয়েছে। একদল লুণ্ঠনকারীকে সেই দিকে পাঠানো হয়। লুঠতরাজের জন্য এই আক্রমণে অনেক ভেড়া লাভ হলো। এক সঙ্গে এতগুলো ভেড় এর আগে কোনও বারই পাওয়া যায়নি। যখন আমরা ঘোড়া থেকে নেমে লুঠের মাল সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলাম, শত্রুপক্ষ একত্রিত হয়ে সমতলভূমিতে নেমে এসে যুদ্ধের জন্য প্ররোচনা দিচ্ছিল। আমাদের দলের কয়েকজন বেগ ও কিছু সৈন্য তাদের একটা দলকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে প্রত্যেককে তরবারির আঘাতে হত্যা করে। নাজির মির্জাও এমনি আর একটি

দলকে পেয়ে তাদের প্রত্যেককে কেটে ফেলে। আফগানদের মাথার খুলি দিয়ে একটা স্তম্ভ খাড়া করা হয়।

আমার কয়েকজন বেগ ও কর্মচারীকে লুঠের মালের এক পঞ্চমাংশ আলাদা করার জন্য নির্দেশ দিলাম। কাশিম বেগ ও আরও কয়েকজনকে অনুগ্রহ দেখিয়ে তাদের লুঠের মাল আর ভাগ করা হলো না। যাহোক, যেগুলো ভাগ করা হলো—তাতেই এক পঞ্চমাংশে দাঁড়ালো ষোল হাজার ভেড়া। সুতরাং মোট সংখ্যা হলো আশি হাজার। তাহলে ক্ষতি খেসারত ধরে এবং যাদের কাছ থেকে এক পঞ্চমাংশ নেওয়া হয়নি—সব যদি এক সঙ্গে যোগ করা যায় তাহলে মোট সংখ্যা এক লাখই দাঁড়াবে।

এইখান থেকে পরদিন সকালে রওনা হই। কাত্তেওয়াজের সমতলক্ষেত্রে সৈন্যদের দিয়ে ঘেরাও করে একটি বড় ব্যূহ রচনা করে শিকারের ব্যবস্থা করা হলো। এখানকার হরিণ আর বন্য গাধা খুব মোটাসোটা চর্বিওয়ালা—আর এগুলো প্রচুর পাওয়া যায়। আমাদের রচিত ব্যূহের মধ্যে অনেক হরিণ আর গাধা আটকা পড়ে গেল। তাদের মধ্যে অনেকগুলোই শিকার করা হলো।

এই শিকারের সময় একটা বন্য গাধাকে তাড়া করে খুব কাছে গিয়ে তীর ছুঁড়লাম। তারপর আর একটা তীর। কিন্তু গাধাটার আঘাত এমন সাঙ্ঘাতিক হল না যাতে সেটি মাটিতে পড়ে যায়। কিন্তু দুইবার আঘাত পেয়ে তার দৌড়ানোর গতি ধীর হয়ে এলো। ঘোড়া ছুটিয়ে গাধাটার কাছে এসে তরবারি দিয়ে ওর দুই কানের পেছনে মাথার নীচে এমন আঘাত করলাম যে ওর শ্বাসনলী কেটে গেল। গাধাটা ঘুরপাক খেয়ে এমনভাবে পড়লো যে ওর পেছনের পা দুটো ঘোড়ার রেকাবের সঙ্গে ধাক্কা খেলো। তরবারির আঘাতটা খুবই জোর হয়েছিল। গাধাটাও খুব মোটা-সোটা ছিল। এর পাঁজরার হাড়টাই মেপে দেখা গেল দুই ফুট লম্বা।

* * * *

সেবানি খাঁ মারখাব অতিক্রম করে মহরম মাসে হিরাট অবরোধ করে। তার উপস্থিতির দু' তিন দিন পর নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তি প্রাচীর ঘেরা শহরের চাবি নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সেবানি খাঁর সঙ্গে দেখা করে শহর তার হাতে সঁপে দেয়।

হিরাট অধিকার করবার পর সেবানি খাঁ ঐ দেশের রাজাদের স্ত্রী ও

শিশু সন্তানদের ওপর কদর্য ব্যবহার করে। শুধু তাদের প্রতি নয়, সেখানকার প্রতিটি লোকের ওপর এমন রূঢ়, অকথ্য, অমানুষোচিত ব্যবহার করে যাতে তার সুনামের আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। পার্থিব লাভের জন্য তার সমস্ত গরিমা ধূলোয় লুটিয়ে পড়ে।

সেবানি খাঁর প্রথম কুকর্ম হলো এই যে সে ঘোর নীচতার বশে শা মনসুরের হাতে খাদিজা বেগমকে সমর্পণ করার আদেশ দেয়—যাতে সে তাকে নীচ ক্রীতদাসীর মত ব্যবহার করে তার সবকিছুই লুণ্ঠন কবতে পারে। তা ছাড়া, সে অশেষ ভক্তিভাজন ও শ্রদ্ধার পাত্র সাধু শেখ পুরাণকে মোগল আবদুলের হাতে তুলে দেয় তাঁর সর্বস্ব লুণ্ঠন করবার জন্য। তাঁর প্রত্যেক পুত্রকেও ঐ একইভাবে এক এক জনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেখানকার কবি ও সাহিত্যিকদের মোল্লা বিনাইয়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়—যাতে সে মোচড় দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে টাকাকড়ি আদায় করে নিতে পারে। এই বিষয় নিয়ে একটা কবিতা খোরাসানের লোকদের মুখে মুখে শোনা যায়।

'কবিদের লুঠ করে অনেক ধন পাবে
বিনাই এই কথা ভেবেছিল।
কিরখর ছাড়া যে, আর কারও কিছু নাই
এ কথা কি কেউ তাকে বলেছিল?
টাকার রং বল, দেখেছে কোন্ কবি
আবদালা কিরখর ভিন্ন।
বিনাই হয়েছিল আনন্দে মশগুল,
(হায়রে) শেষে তার আশা হলো ছিন্ন।'

ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে থাকা সত্ত্বেও সেবানি খাঁ অহঙ্কার বশে কোরাণ ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দিত। সে তার কলম নিয়ে সুলতান আলি ও চিত্রকর বেজাদের লেখা ও অঙ্কন সংশোধন করার ধৃষ্টতা দেখাত। যদি সে কোনও সময়ে দু' লাইনের নীরস কবিতা কোনও রকমে লিখে ফেলতো তা'হলে আর রক্ষা ছিল না। সে সেটা প্রচার-বেদী থেকে পাঠ করে লোককে শোনাতো, বাজারে সেই কবিতা লিখে ঝুলিয়ে রাখতো, আবার এই আনন্দ-জনক ঘটনায় শহরের লোকদের কাছ থেকে দাতব্যের জন্য কিছু অর্থ আদায় করতো। সে হয়তো কোরাণ পাঠ কিছু কিছু করতো, কিন্তু সে যে অসংখ্য

বুদ্ধিহীন, কিম্ভূতকিমাকার, হটকারী, ধর্মবিশ্বাসহীন কাজ ও কথার জন্য দোষী, একথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

এই সময় শা বেগ ও তাঁর ছোট ভাই আমার কাছে উপর্যুপরি দূত পাঠিয়ে তাঁদের সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। যে সময় উজবেকরা সমস্ত দেশ অধিকার করে ফেলেছে তখন আমার মত লোকের অলসভাবে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখা মোটেই উচিত হচ্ছে না। আমার আমীরদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির হলো যে তাঁদের সাহায্যের জন্য আমরা সসৈন্যে বেরিয়ে পড়বো।

আমরা যখন কিলাতে পৌছাই, হিন্দুস্থানের বণিকরা বাণিজ্যের পশরা নিয়ে ঐ দিক দিয়েই আসছিল। সৈন্যরা তাদের পথে আচমকা এসে পড়ায় তারা আর পালাবার সুযোগ পেল না। সাধারণভাবে এই মতবাদেরই প্রাধান্য দেখা গেল যে বর্তমানের মত গোলমেলে সময়ে পরদেশ থেকে যে সব জিনিসপত্র এসে পড়েছে সেগুলো লুঠ করে নেওয়াই উচিত। কিন্তু আমি এ মতবাদে সায় দিইনি।

আমি বললাম—এই বিদেশী বণিকদের অপরাধ কি? যদি ঈশ্বরের ওপর আস্থা রেখে এই সব তুচ্ছ জিনিস লুঠতরাজ করে আত্মসাৎ করতে বিরত হই, তা'হলে ঈশ্বর একদিন না একদিন এর প্রতিদানে আমাদের ওপর অপার করুণা বর্ষণ করবেন। কিছুদিন আগে যখন আমরা ঘিলজাইদের বিরুদ্ধে অভিযান করি এবং যখন মহ্‌মন্দরা তাদের ভেড়ার পাল, আসবাব-পত্র, স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে আমাদের সামনে পড়েছিল, তখনও তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুঠতরাজ করার জন্য অনেকেই প্ররোচনা দিয়েছিল। কিন্তু তখনও ঐ একই রকম ভাবাবেশে আমি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে-ছিলাম। কিন্তু তার ফল কি হয়েছিল? পরদিন সকালে সেই বিদ্রোহী আফগান ঘিলজাইদের, আল্লার দয়ায়, যে সব বিপুল সম্পত্তি সেনাদলের হাতের মধ্যে এসে গেল, তেমন কি আর কোনও বার লুঠের ফলে পাওয়া গিয়েছে?

কিলাত পার হয়ে আমরা শিবির স্থাপন করি এবং কর হিসাবে সামান্য কিছু বণিকদের ওপর ধার্য করে তা আদায় করি।

কিলাত অতিক্রম করার পর খাঁ মির্জা আমার সঙ্গে যোগ দেয়—যাকে কাবুলের বিদ্রোহের পর খোরাসানে যেতে বাধ্য করেছিলাম।

আমি সেইখান থেকে শা বেগ ও মোকিমকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিই

যে তাদের অনুরোধ মত আমি এতদূর এসে পৌঁছেছি। একথাও তাদের জানিয়ে দিই যে উজবেকদের মত বিদেশী শত্রু যখন খোরাসান অধিকার করে বসেছে তখন নিরাপত্তার জন্য সকলের সঙ্গে একযোগে পরামর্শ করে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তার উপায় স্থির করা উচিত। আমার চিঠি পেয়ে তারা কোনও ভদ্রোচিত ভাষায় উত্তর দিয়ে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা তো জানালোই না—বরং কর্কশ, অশিষ্ট ভাষায় তার জবাব দিল। তাদের অশিষ্টতার একটা নিদর্শন হচ্ছে এই—যে চিঠিটা তারা আমাকে লিখেছিল তার পিছনের দিকে মোহরাঙ্কিত করেছিল যেখানে একজন আমীর আর একজন আমীরকে চিঠি লেখার সময় করে থাকে, না ঠিক তাও নয়—যেখানে একজন উঁচু দরের আমীর আর একজন নীচুদরের আমীরকে চিঠি লেখার সময় মোহরের ছাপ দেয়। যদি তারা এমন ঔদ্ধত্যের অপরাধে অপরাধী না হতো এবং ওরূপ অপমানকর ভাষায় চিঠির উত্তর না দিত তা'হলে তাদের পরিণতি এত মন্দ কিছুতেই হতো না। কথায় বলে—

'একটা অতি তুচ্ছ বিবাদ
ঘটায় এমন অঘটন,
যার ফলে প্রাচীন বংশ
সমূলে হয় উৎপাটন।'

তাদের এই উদ্ধত ও কলুষিত আচরণের ফলে তাদের পরিবার পরিজন ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে যে ঐশ্বর্য এবং সম্মান অধিকার করেছিল সবই হাওয়ায় উড়ে গেল।

আমার অনুচরদের এ দেশের সমস্ত অংশের সঙ্গেই ভালভাবে পরিচয় ছিল। তারা পরামর্শ দিল যে নদীগুলি কান্দাহারের দিকে গিয়েছে তার ধার দিয়ে অগ্রসর হয়ে যাওয়া যাক। আমি এই প্রস্তাবই গ্রহণ করলাম। পরদিন সকালে যুদ্ধযাত্রার মত সৈন্য সাজিয়ে মার্চ করে চলতে লাগলাম।

তুফান আরঘুন একা আরঘুন সৈন্যদলের দিকে এগিয়ে গেল। আসিক উল্লা নামে একজন শত্রুপক্ষের লোক দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাত আটজন লোক নিয়ে তুফান আরঘুনের দিকে জোরে ধাওয়া করলো। তুফান একাকী তাদের মুখোমুখি হয়ে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলো। তারপর আসিক উল্লাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে তার মাথা কেটে ফেলে

সেই মাথা আমাদের কাছে নিয়ে আসে। তার এই অদ্ভুত বীরত্ব শুভ সূচনার নিদর্শন বলে ধরে নিলাম।

আমরা আর কালবিলম্ব না করে শত্রুর দিকে এগিয়ে চললাম। যখন তীরের পাল্লার মধ্যে আমরা এসে পড়েছি তখন শত্রুরা সহসা আক্রমণ করায় আমাদের অগ্রগামী সেনারা বিহ্বল হয়ে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো। তারা আমাদের প্রধান সৈন্যদলের দিকেই পিছিয়ে আসছে দেখে তারাও তীর ছোঁড়া বন্ধ রেখে ওদের সঙ্গে মিলবার জন্য এগিয়ে গেল। পেছনের দলকে এগোতে দেখে অগ্রগামী দলও তীর না ছুঁড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো।

শত্রুপক্ষের একজন লোক তাদের লোকজনদের হাঁকডাক করে আমার দিকে ধেয়ে এসে ঘোড়া থেকে নেমে আমাকে লক্ষ্য করে ধনুকে তীর সংযোজন করছিল। আমি তৎক্ষণাৎ তার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে যাই। যখন প্রায় তার কাছে পৌছে গেছি তখন আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস করলো না, ঘোড়ায় চড়ে ফিরে গেল। এই লোকটাকে আমি চিনেছিলাম—সে স্বয়ং শা বেগ।

আমার সৈন্যরা নদী-পথ আগলে রেখে শত্রুর চলার রাস্তা বন্ধ করে দেয়। আমাদের সৈন্যসংখ্যা অল্প হলেও তারা বীরের মত যুদ্ধ করতে থাকে এবং শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

কামবার আলি আহত হয়। কাশিম বেগের কপালে শর বিদ্ধ হয়। ঘোরি বিলাসের ভুরুর ওপরে তীর লেগে সেটা গাল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে।

এই অবস্থাতেও শত্রুদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করি। মারঘানের পাহাড়ের পাশ দিয়ে যে নদী বেরিয়েছে সেই নদী পেরিয়ে আসি। শত্রু-সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতেই আমার সৈন্যরা তাদের দিকে ধাওয়া করে তাদের বন্দী করতে থাকে। আমার কাছে তখন মাত্র এগারো জন সৈন্য ছিল। তাদের মধ্যে একজন আবদাল্লা কিতাবদার।

মোকিম কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে থেকে যুদ্ধ চালাচ্ছিল। আমার সঙ্গের লোকের স্বল্পতা উপেক্ষা করে এবং ভগবানের ওপর আস্থা রেখে রণ-দামামা বাজিয়ে শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলাম।

'আল্লার যদি হুকুম থাকে
এমন দেখা যায়,
বৃহৎসেনা ছোটর কাছে
বেদম মার খায়।'

দামামার শব্দ শুনেও আমাকে এগিয়ে যেতে দেখে ওদের সাহস ফুরিয়ে গেল। ওরা ছুটে পালাতে লাগলো। আল্লা আমাদের প্রতি সদয় হলেন। শত্রুদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে আমি কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হয়ে 'চার-বাগে' এসে আস্তানা করলাম।

শা বেগ ও মোকিম তাদের পালাবার সময় কান্দাহার দুর্গ উদ্ধারের আশা নেই দেখে দুর্গ রক্ষার জন্য কোনও সৈন্য না রেখেই চলে গেল। আলি তারখানের ভাইরা, কুলি বেগ ও আরও কয়েকজন—যাদের আমার প্রতি আনুগত্য ছিল এবং আমাকে সম্মান করতো, তারা কিন্তু দুর্গেই থেকে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে মৌখিক কথাবার্তা চলার পর তারা তাদের ভাই ও আত্মীয়দের জীবনের কোনও হানি হবে না এই আশ্বাস চাওয়ায় আমি তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবো এই কথা জানিয়ে দিই। তারাও দুর্গের ফটক খুলে দেয়।

কয়েকজন অনুচরকে সঙ্গে নিযে আমি দুর্গে প্রবেশ করি। দুই একজন লুণ্ঠনকারীকে দেখতে পেয়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিই। প্রথমে যাই মোকিমের ধনাগারে। সেটা ছিল দেওয়াল ঘেরা শহরের মধ্যে। সেখান থেকে দুর্গে চলে আসি। সে রাত্রে দুর্গনগরেই বাস করি। পরদিন সকালে ফারুকজাদের বাগানে যাই। সেখানেই সৈন্যরা ছিল। কান্দাহার রাজ্যের ভার আমি নাসির মির্জাকে দিই। সমস্ত ধনরত্ন সংগ্রহ করে খচ্চরের পিঠে বোঝাই করার পর আমরা দুর্গের ধনাগরের দিকে আসি। নাসির মির্জা সাতটি খচ্চরের ওপর রৌপ্য মুদ্রা বোঝাই করে নিয়ে গেল। আমি সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার কথা না বলে সেগুলো তাকেই উপহার স্বরূপ দিয়ে দিলাম।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে সৈন্যদের এগিয়ে শিবিরে যেতে বলে আমি ঘোরা পথে অনেক দেরীতে শিবিরে এসে পৌঁছাই। যে শিবির আমি ফেলে গিয়েছিলাম—ফিরে এসে দেখি সে শিবির যেন আর নেই। এ শিবির যেন আমি চিনতেই পারছি না। সেখানে দেখতে পেলাম অসংখ্য ঘোড়া, লম্বা চুলওয়ালা মর্দা ও মাদি উটের শ্রেণী; রেশম বস্ত্র বোঝাই খচ্চরের দল; লম্বা চুলওয়ালা মাদি উটের পিঠে বোঝাই চামড়ার ব্যাগ, তাঁবু আর লাল রংয়ের মখমলের সামিয়ানা। প্রতি বাড়ীতে সিন্দুকে বোঝাই দুই ভাইয়ের হাজার হাজার সের ওজনের জিনিসপত্র থরে থরে সাজানো রয়েছে। প্রতিটি গুদামে তোরঙ্গের ওপর তোরঙ্গ, কাপড়ের বোঝার

ওপর বোঝা এবং আরও অনেক জিনিস একটার পর একটা জড়ো করে রাখা হয়েছে। পোশাকের ব্যাগের ওপর ব্যাগ। টাকা বোঝা পাত্রের ওপর পাত্র সাজানো রয়েছে। প্রত্যেক লোকের বাসায় বা তাঁবুতে অপর্যাপ্ত লুঠের মাল। অনেক ভেড়াও ছিল বটে—কিন্তু অন্য সব মালের কাছে এদের কোনও মূল্য ছিল না।

কিলাতের দুর্গরক্ষী সৈন্যদের ভার আমি কাশিম বেগের ওপর অর্পণ করি। সেই সঙ্গে সেখানকার সমস্ত সম্পত্তি। কাশিম বেগ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি। সে আমাকে যত শীগ্‌গীর সম্ভব কান্দাহার দেশটা ত্যাগ করে যেতে অনুরোধ করে। তার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কাবুলে ফিরে আসার জন্য আবার বেরিয়ে পড়ি। পূর্বেই বলেছি কান্দাহার রাজ্য আমি নাসিব মির্জাকে অর্পণ করি। সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। আমিও কাবুলের পথ ধরি।

কান্দাহার প্রদেশের মধ্যে থাকার সময় আমাদের প্রাপ্ত ধনসম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার সময় হয়নি। কারাবাগে পৌছিয়ে ওগুলো ভাগ করে ফেলার অবসর পাওয়া গেল। টাকাকড়ি গুণে গুণে ভাগ করা কষ্টসাধ্য মনে হওয়ায় দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে ওজন করে ওগুলো ভাগ করা হলো। বেগ, কর্মচারী, ভৃত্য এবং আত্মীয় স্বজনরা ভারবাহী পশুদের পিঠে নিজেদের জিনিসপত্রে বোঝাই ছালা, টাকার থলে আর পশুর খাদ্য নিয়ে চললো। আমরা বহু লুঠের মাল ও ধনরত্ন নিয়ে সগৌরবে কাবুলে পৌছে গেলাম।

ছয় সাত দিন পর শুনলাম যে সেবানি খাঁ কান্দাহার অবরোধ করার আয়োজন করছে। এই রকম ঘটনা ঘটতে পারে সেটা বুঝতে পেরেই দূরদর্শী কাশিম বেগ আমাকে তাড়াতাড়ি কান্দাহার ত্যাগ করে চলে আসার জন্য অতটা ব্যগ্রতা দেখিয়েছিল।

'যুবজন আয়নায় দেখে যা,
সাধুজন পোড়া ইটে দেখে তা।'

কান্দাহারে পৌছিয়ে সেবানি খাঁ নাসির মির্জাকে অবরোধের মধ্যে ফেলেছে।

* * * *

জমা-দুল মাসে আমরা হিন্দুস্থান আক্রমণ করার জন্য কাবুল থেকে

রওনা হই। কাবুল এবং লামঘানের মধ্যে যে সব আফগান বাস করে তারা ডাকাত ও লুণ্ঠনকারী। শান্তির সময়েও তারা এই সব দুষ্কর্ম করে থাকে। তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে অভ্যস্ত এই বলে যে, গোলমাল ভাল করে লাগিয়ে দাও প্রভু যাতে আমরা লুটে পুটে খেতে পারি। কিন্তু তাদের ভাগ্যে কদাচিৎ এ রকম বিশৃঙ্খলা ঘটে থাকে—যাতে তারা তার সুযোগ নিতে পারে।

যখন তারা জানতে পারল যে আমি কাবুল ত্যাগ করে হিন্দুস্থান অভিযানের জন্য সসৈন্যে বেরিয়ে পড়েছি তখন তাদের বেপরোয়া ঔদ্ধত্য দশগুণ বেড়ে গেল। তাদের মধ্যে যারা ভাল ছিল তারাও দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে অন্যায় কাজ করার জন্য ঝুঁকে পড়লো। ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে যেদিন আমরা জাগদালিক থেকে মার্চ করা শুরু করি সেই সময় আফগানরা এই ফন্দী আঁটলো যে—যখন আমরা তাদের দেশের মাঝ দিয়ে আসবো—কারণ সেই দিক দিয়েই আমাদের যাওয়ার পথ--তখন তারা কোটাল কিংবা জাগদালিক গিরি-সঙ্কটের মুখে আমাদের গতিরোধ করবে এবং উত্তর দিকের পাহাড়ে সবাই জড় হয়ে রণ-দামামা বাজিয়ে, তরবারি আস্ফালন করে ভীষণ রণহুঙ্কার তুলে আমাদের বিপর্যস্ত করে দেবে।

সেই জায়গায় পৌঁছিয়েই আমি সৈন্যদের পাহাড়ে উঠে শত্রুপক্ষের যাকে কাছে পাবে তাকেই আক্রমণ করার আদেশ দিলাম। সৈন্যরা তদনুসারে অগ্রসর হয়ে নানা পথ ধরে দলে দলে আফগানদের কাছে উপস্থিত হতেই তারা হতভম্ব হয়ে মুহূর্ত মাত্র দাঁড়িয়ে থেকে একটা তীর পর্যন্ত না ছুঁড়ে পালাতে লাগলো। আফগানদের তাড়িয়ে দিয়ে আমরা পাহাড়ের মাথার ওপর উঠলাম। একজন আফগানকে আমার কাছ দিয়ে পাহাড়ের ঢালু পথে পালিয়ে যেতে দেখে তার বাহুতে শর নিক্ষেপ করে আহত করি। তাকে এবং আরও কয়েকজনকে ধরে ফেলে আমার কাছে আনা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাদের মধ্যে কয়েকজনকে হত্যা করা হয়।

সৈন্যরা অনেক চাউল আটক করে। পাহাড়ের তলদেশে ধানক্ষেত। প্রায় সব গ্রামবাসীই পালিয়ে গিয়েছিল। কয়েকজন কাফের হত হয়। পালিয়ে যাওয়ার সময় কাফেররা একদল লোককে একটা উঁচু পাহাড়ের ওপর বুকে শোয়া অবস্থায় আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখার জন্য রেখে যায়। কাফেররা পালিয়ে যাওয়ার পর তারা পাহাড় থেকে তাড়াতাড়ি নেমে

এসে তীর নিক্ষেপ করে আমাদের বিরক্ত করতে থাকে। কাশিম বেগের জামাতা পুরাণকে আহত করে তাকে ধরবার জন্য এগিয়ে আসতে থাকে। তার অবশিষ্ট লোক সেই দিকে ছুটে এসে শত্রুপক্ষকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে এবং পুরাণকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে। আমরা এক রাত্রি কাফেরদের ধানক্ষেতেই কাটিয়ে দিই। সেখান থেকে অনেক ধান সংগ্রহ করে আমরা শিবিরে ফিরে আসি।

হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হওয়া এ সময়ে সুবিধা হবে না মনে করে আমি মোল্লা বাবাকে কিছু সৈন্য দিয়ে কাবুলে পাঠিয়ে দিই। তার কয়েক দিন পর শীতঋতুর মাঝামাঝি সময়ে আমি কাবুল পৌঁছে যাই।

এ পর্যন্ত তাইমুরের বংশধররা রাজতক্তে বসলেও তাঁরা 'মির্জা' এই উপাধি ছাড়া অন্য উপাধি গ্রহণ করেননি। এই সময়ে আমি নির্দেশ জারি করি যেন আমাকে সম্রাট বলে সম্বোধন করা হয়।

এই বছরের শেষে জেল্‌কদ মাসের চার তারিখ মঙ্গলবার সূর্য যখন মীনে সেই সময় হুমায়ূনের জন্ম হয়। হুমায়ূনের জন্ম উপলক্ষে একটি ভোজের আয়োজন করা হয়। সম্ভ্রান্ত, সাধারণ, ছোট বড় সকলেই নানা রকমের উপহার নিয়ে আসে।

॥ ১৭ ॥

১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

অভিযান থেকে ফেরার কয়েক দিন পর যখন আমরা কাবুলে বাস করতে আরম্ভ করেছি—সেই সময় কাচ্‌বেগ, ফকির আলি, বাবা চেহেরা আমাকে পরিত্যাগ করে যাওয়ার মতলব করলো। তাদের ষড়যন্ত্রটা ধরা পড়ে যেতেই আমি কয়েকজন লোক পাঠিয়ে তাদের ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। জাহাঙ্গীর মির্জার জীবনকালেও তারা প্রায়ই এই রকম কদর্য ব্যবহার দেখিয়েছে। আমি আদেশ দিলাম—বাজারে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্য জায়গায় এদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক। বাজারের ফটকের কাছে নিয়ে গিয়ে তাদের ফাঁসি দেওয়ার জন্য যখন গলায় দড়ি পেঁচানো হচ্ছে, সেই সময় কাশিম বেগ তাদের ক্ষমা করার জন্য আন্তরিক আবেদন জানায়। এই

বেগকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ওদের মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিলেও কারাগারে বন্দী করে রাখার হুকুম দিলাম।

এক রাত্রে চার-বগের দরবার কক্ষে নমাজের পর বসেছিলাম। এমন সময় মুসা খাজা এবং আর একজন লোক দ্রুতবেগে আমার কাছে এসে কানে কানে ফিসফিস করে বললো মোগলরা যে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মতলব এঁটেছে, এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। আমি কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না যে তারা আবদুল রেজ্জাককেও তাদের ষড়যন্ত্রের মধ্যে টেনেছে। আরও বিশ্বাস করতে পারলাম না যে—তারা এই ষড়যন্ত্র কার্যকরী করার জন্য সেই রাত্রিই ধার্য করেছে। আমি সেইজন্য এদের এই সংবাদে যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল ততটা না দিয়েই একটু পরেই হারেমের দিকে গেলাম। হারেমের কাছে আসতেই দেখতে পাই যে আমার অনুচরদের মধ্যে সব শ্রেণীর লোক—এমন কি রাতের পাহারাদাররাও চলে যাচ্ছে।

তারা চলে গেল। শুধু কয়েকজন আমার নিজের বিশ্বাসভাজন লোক এবং ক্রীতদাস সঙ্গে নিয়ে বাজারের দিকে আসতে থাকি। লোহা-ফটকের গড়খানার কাছে এসে পৌঁছতেই খাজা মহম্মদ আলি বাজারের দিক থেকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলো, এবং—। [এই বছরের ঘটনাগুলির বর্ণনা আত্মচরিতে হঠাৎ এইখানেই শেষ হয়েছে]।

১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাবরের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

[আত্মচরিতের ধারা আবার ১৫০৮ সালে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পুনরায় ১৫১৯ সালের জানুয়ারী মাস থেকে চলতে থাকে।

বাবর তাঁর কিছু বিশ্বাসী অনুচর নিয়ে সংঘর্ষে নেমে পড়েন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন যে বিদ্রোহীদের সংখ্যা প্রথমে তিন হাজার হলেও ক্রমে এই সংখ্যা বার হাজারে দাঁড়ায়। এই ভাগ্য বিপর্যয় সত্ত্বেও নিরাশার মধ্যেই সাহসের স্ফুলিঙ্গ তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। প্রত্যেকটি সংঘর্ষে তিনি নিজে বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। যেখানেই বিদ্রোহীদের দেখতে পেয়েছেন সেখানেই তাদের উপর অপূর্ব সাহসের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। একবার তিনি নিজের গণ্ডী ছাড়িয়ে আবদুল রেজ্জাককে দ্বন্দ্ব

যুদ্ধে আহ্বান করেন। কিন্তু সে আহ্বানে কোনও সাড়া দেয় না রাজকুমার আবদুর্ল রেজ্জাক। কিন্তু তার পাঁচজন সহচর একটি কক্ষে একে একে তাঁর সম্মুখীন হয় এবং তাঁর তরবারির আঘাতে প্রত্যেকেই ধরাশায়ী হয়। তাদের নাম দেখে মনে হয় তারা ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির লোক।

শত্রুরা তাঁর সাহসের প্রশংসাও করতো এবং তাঁকে ভয়ও করতো। একের পর এক যুদ্ধে শত্রুদের পরাজিত করে বাবর পুনরায় কাবুল ও গজনির একছত্র সম্রাটরূপে অধিষ্ঠিত হন।

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যা বাবরের ভাগ্যের ওপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে। শা ইসমাইল সেই সময় পারশ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। একদল শত্রুসৈন্য তাঁর রাজ্যের এক অংশ আক্রমণ করায় তিনি সেবানি খাঁয়ের কাছে সাহায্যের জন্য দূত প্রেরণ করেন। সেবানি খাঁ উত্তরে তাঁকে কতকগুলো উপদেশ দিয়ে চিঠি লেখে ও সেই সঙ্গে দূত মারফৎ ফকিরের ভিক্ষাপাত্রও পাঠিয়ে দেয়। এর উত্তরে শা ইসমাইল একটা টেকো আর আর কিছু তুলো পাঠিয়ে দেন—এই কথা তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে—সে ঘরের কোণে বসে নিশ্চিন্তে সুতো কাটুক, যে কাজের জন্যই সে উপযুক্ত।

এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম না করে এবং শত্রুকে প্রস্তুত হওয়ার সময় না দিয়ে শা ইসমাইল সৈন্য চালনা করলেন। সেবানি খাঁ আঠাশ হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসে। মার্ভের দশ মাইল দূরে একটা নদী অতিক্রম করে আসার আগে শা ইসমাইল আগে ভাগে সৈন্য পাঠিয়ে নদী পার হওয়ার পর নদীর সেতু ভেঙ্গে ফেলে সতেরো হাজার পারশ্যের অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেবানি খাঁ পরাস্ত হয়। তার পিছিয়ে যাওয়ার পথও রুদ্ধ হয়। সে অবশ্য পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। নদীর ধারে একটা ঘেরা জায়গায় সে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেটাও অধিকৃত হয়ে গেলে সে ঘোড়ায় চড়ে নদীর দিকের দেওয়াল টপকাতে গিয়ে পড়ে যায়। এতেই তার মৃত্যু ঘটে। তাঁর মাথার খুলিতে ঘাস পুরে কনষ্ট্যাণ্টিনোপলে তুর্কির সুলতানের কাছে পাঠানো হয়। সেই মাথার খুলিটা স্বর্ণখচিত করার পর অনেক বড় বড় উৎসবে দেখানো হতো।

বাবরের সবচেয়ে বড় শত্রু, যে তাঁর সমস্ত দুর্গতির মূল এবং যে তাঁকে পূর্বপুরুষের রাজত্ব থেকে তাড়িয়েছে—তার মৃত্যুতে বাবরের মনে পৈত্রিক রাজ্য পুনরুদ্ধার করার আশা জেগে ওঠে।

এই সময় শা ইসমাইল কয়েকজন সৈন্যকে সঙ্গে দিয়ে বাবরের ভগ্নী

খানজাদে বেগমকে বাবরের কাছে পাঠিয়ে দেন। বাবর বছর দশেক, আগে যখন সমরকন্দ ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখন তাঁর এই ভগ্নী সেবানি খাঁর হাতে আটক পড়েছিল।

বাবরের অবস্থার এত দ্রুত উন্নতি হলো যে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি হিসার, বোখারা ও সমরকন্দ অধিকার করে ফেলেন। কিন্তু উজবেগদের ক্ষমতাও ক্রমে ক্রমে এমন বেড়ে উঠলো যে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাবর আবার সমরকন্দ হারিয়ে কাবুলে ফিরে এলেন।

এই সময় থেকে তাঁর জীবনের শেষ সময়ের কিছু পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পূর্ব-পুরুষদের রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করার আশা তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তবে দৈব প্রেরণায় হিন্দুস্থান জয় করার ইচ্ছা তাঁর জেগে ওঠে এবং সেই দিকেই তিনি মনঃসংযোগ করেন।

পরবর্তী আত্মকথা ভারতে প্রথম আক্রমণের বর্ণনা দিয়ে পুনরায় শুরু হয়েছে।]

॥ ১৮ ॥

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

মহরম মাসের প্রথম তারিখে উপত্যকার নিম্নাংশে ভীষণ ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্প প্রায় আধঘণ্টা চলে। পরদিন সকালে বাজুর দুর্গ আক্রমণ করার জন্য এইখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। দুর্গের কাছাকাছি এসে শিবির স্থাপন করে বাজুরের সুলতানের কাছে একজন বিশ্বাসী লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিই যে—সে তার লোকজন সমেত আমার বশ্যতা স্বীকার করে দুর্গ আমার হাতে সমর্পণ করুক। কিন্তু এইসব বেকুব আর হতভাগার দল আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করে অদ্ভুত উত্তর পাঠায়। আমি তখন সৈন্যসামন্তদের অবরোধের জন্য যন্ত্রপাতি, মই এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করতে আদেশ দিই। সমস্ত আয়োজন ঠিক করার জন্য আমরা একদিন শিবিরে অপেক্ষা করি।

বাজুরের অধিবাসীরা তখনও পর্যন্ত গাদা বন্দুক কি জিনিস চোখে দেখেনি। যখন বন্দুকের আওয়াজ শুনলে তখন তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নানারকম অসঙ্গত কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি করে ঠাট্টা-তামাসা করতে লাগলো।

সেইদিনই গাদা বন্দুক দিয়ে আলি কুলি পাঁচজন লোককে এবং ওয়ালি খাজিন আরও দুইজনকে মেরে ফেলে। আরও সব বন্দুকধারী সৈন্য সাহস দেখিয়ে ভাল কাজ করেছিল। তারা ঢাল, বর্ম, শিরস্ত্রাণ ফেলে দিয়ে এমন নিশানা করে বন্দুক ছুঁড়তে থাকে যে সন্ধ্যার আগেই দুর্গের মধ্যের সাত, আট, দশজন বাজুরিকে ধরাশায়ী করে ফেলে। এরপর দুর্গের লোকরা এমন ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়ে যে বন্দুকের ভয়ে তারা আর দুর্গ থেকে মাথা বের করতে সাহস করলো না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে সৈন্যদের তখনকার মত সরিয়ে আনা হয়। তাদের নির্দেশ দেওয়া হলো যে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই তারা যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুর্গ আক্রমণের জন্য আবার বেরিয়ে পড়বে।

ঊষার আলো দেখা দিতেই রণ-দামামা বাজিয়ে যুদ্ধোদ্যম শুরু করার জন্য আদেশ দেওয়া হলো। সৈন্যরা শৃঙ্খলার সঙ্গে তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হয়ে গেল।

দোস্ত বেগের লোকেরা দুর্গের উত্তর-পূর্ব দিকে একটা বুরুজের পাদদেশে পৌঁছিয়ে দুর্গের দেওয়ালের নীচে গর্ত খনন করে দেওয়াল ভাঙ্গার কাজ শুরু করে দিল। আলিকুলিও সেখানে ছিল। সেদিনও সে তার গাদা বন্দুকের সদ্ব্যবহার করেছিল। বিদেশে তৈরী বন্দুকটা দুইবার ছোঁড়া হয়। ওয়ালি খাজিন তার বন্দুক দিয়ে একটা লোককে মেরে ফেলে। দুর্গের মাঝামাঝি জায়গার বাঁ পাশে মই লাগিয়ে কুতুব আলি দেওয়ালের ওপর উঠে গিয়ে শত্রুপক্ষের কয়েকজনের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করে। প্রধান সৈন্যদল যেখানে ছিল সেই জায়গায় দুর্গ দেওয়ালে মহম্মদ আলি আর তার ছোট ভাই মই দিয়ে উঠে বর্শা আর তরবারি নিয়ে বীরের মত যুদ্ধ করে। বাবা ইসাওয়েল আর একটা মই দিয়ে দেওয়ালের ওপর উঠে একটা কুঠার নিয়ে প্রাচীরের মাথা ভাঙ্গতে শুরু করে। আমাদের দলের অনেকেই সাহস করে দুর্গ-দেওয়ালে চড়ে তীর ধনুক দিয়ে শত্রুদের এমন বিপর্যস্ত করে তোলে যে তারা আর মাথা তুলতে পারে না। আমাদের দলের আরও কতকগুলি লোক শত্রুপক্ষের বাধা দেওয়ার শত চেষ্টা সত্ত্বেও এবং তাদের তীর ধনুকের পরোয়া না করে দুর্গ-প্রাচীরে গর্ত করে ওদের প্রতিরোধের স্থানগুলি ভেঙ্গে ফেলতে থাকে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় দোস্ত বেগের লোকেরা উত্তর-পূর্ব দিকে কেল্লার যে অংশে তারা গর্ত খুঁড়ছিল সেখানে একটা ভাঙ্গনের সৃষ্টি করলো।

এই ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে তারা কেল্লার মধ্যে ঢুকে পড়ে শত্রুদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল। প্রধান সেনাদলও সেই সময় মই দিয়ে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়লো। আল্লার অনুগ্রহে আমরা দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই এই সুরক্ষিত দুর্গ দখল করে ফেলি। আমার সকল শ্রেণীর অনুচরই খুব সাহস ও সহনশীলতা দেখিয়ে তারা যে সত্যই বীর এই সুখ্যাতি লাভ করেছে।

বাজুরের অধিবাসীরা শুধু বিদ্রোহী নয় তারা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরও বিরোধী। তাদের এই বিদ্রোহ এবং শত্রুতার জন্য তারা দণ্ডভোগের যোগ্য। এ ছাড়াও, তারা বিধর্মী কাফেরের রীতিনীতি পালন করে তাদের মধ্য থেকে ইসলাম ধর্মকে একেবারে নির্মূল করে ফেলায় তাদের তরবারির আঘাতে শিরশ্ছেদ করা হয় এবং তাদের স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনকে বন্দী করা হয়। তিন হাজারের ওপর লোককে এইভাবে হত্যা করা হয়।

বাজুরের বিরুদ্ধে অভিযান এইরকম সন্তোষজনকভাবে শেষ হওয়ায় একটি উঁচু মাটির ঢিপির ওপর নরমুণ্ড সাজিয়ে একটি বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করতে আদেশ দিই।

মহরম মাসের দশ তারিখ বুধবার আমি অশ্বারোহণে বাজুর দুর্গে যাই। সেখানে সুরাপান উৎসবের আয়োজন করা হয়। বাজুরের কাছাকাছি গ্রাম থেকে কাফেররা চামড়ার পাত্রে মদ নিয়ে এসেছিল। আমি সারারাত এইখানেই কাটাই। পরদিন সকালে দুর্গের বুরুজ, প্রাচীর ইত্যাদি নানাস্থান পরিদর্শন করে অশ্বারোহণে শিবিরে ফিরে আসি।

বাজুরের ওপরের দিকে একটা পাহাড়ে শিকার করতে যাই। এই পাহাড়ের বুনো মহিষ কালো, কিন্তু তার লেজ অন্য রংয়ের। এই পাহাড়ের তলায় হিন্দুস্থানের দেশগুলির ষাঁড় ও হরিণ সবই কালো রংয়ের। এই দিনই আমি 'সারিক' পাখী ধরি। তার রংও কালো, চোখও কালো। এই দিন 'বুরকুট' নামে আমার একটা পোষা বাজ একটা হরিণকে ঘায়েল করে।

সৈন্যদের খাদ্য-শস্যের অভাব হওয়ায় আমরা খেরাজ উপত্যকায় গিয়ে সেখানে প্রচুর শস্য আটক করি। তারপর ইউসুফজাই আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্য সাওয়াদের দিকে অগ্রসর হই।

পরদিন আমরা অগ্রসর হয়ে চন্দুল ও বাজুর নদীর সংযোগস্থলে শিবির

স্থাপন করি। ইউসুফজাইরা কিছু পরিমাণ 'কামাল' সুরা নিয়ে আসে। এ খেতে সুস্বাদু কিন্তু একটুতেই ঘোর মাতাল হয়ে যেতে হয়। আমি একটি পাত্র তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজে খাই, আর এক এক ভাগ তাঘাই আর আবদুল্লাকে দিই। কিন্তু এটুকু খেয়েই আমি এমন মাতাল হয়ে পড়ি যে যখন বেগরা সন্ধ্যাকালীন নমাজের সময় সমবেত হয়—তখন আমার পক্ষে তাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার সামর্থ্য ছিল না। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে এখন আমি একটি পুরো 'কামাল' খেলেও কিছুমাত্র নেশা হয় না। সেবার কিন্তু ঐটুকু খেয়েও আমার চূড়ান্ত মত্তাবস্থা ঘটেছিল।

ত্রিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে শাহাবাজ কালেন্দার নামে একজন আল্লায় অবিশ্বাসী অসাধু লোক ইউসুফজাই ও দিলজাক উপজাতির মনে ধর্মে অবিশ্বাসের প্রেরণা জুগিয়েছিল। মকাম পাহাড় হঠাৎ শেষ হওয়ার পর একটা ছোট পাহাড় দেখা যায়—সেটা যেন চারিপাশের সমতলভূমি চোখ মেলে দেখছে। দৃশ্যটা অতি সুন্দর। নীচু জমি থেকে এই পাহাড়টাও মনোরম দেখায়। এই পাহাড়ের ওপর শাহাবাজ কালেন্দারের কবর আছে। আমার মনে হলো—এমন সুন্দর নয়নাভিরাম জায়গায় একজন অবিশ্বাসীর কবর থাকবে—এটা অন্যায়। সেইজন্য আমি আদেশ দিলাম-- কবরটা ভেঙ্গে ফেলে মাটির ধূলোয় মিশিয়ে দেওয়া হোক। এই জায়গাটা আবহাওয়া ও দৃশ্যের দিক দিয়ে খুব সুন্দর হওয়ায় আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। আমি এখানে উত্তেজক সুরা পান করি এবং কিছু সময় এখানেই থেকে যাই।

পরদিন ভোরে সিন্ধু নদের দিকের রাস্তা ধরে এগোতে থাকি। এই নদীর তটভূমির নীচ ও ওপরের মাটি কেমন পরীক্ষা করে দেখার জন্য একদল সৈন্য পাঠাই। নদীর দিকে সৈন্য পাঠিয়ে দিয়ে গণ্ডার শিকার করতে বেরিয়ে পড়ি। অনেকগুলো গণ্ডার চোখে পড়লো বটে, কিন্তু দেশটা ঝোপঝাড়ে পূর্ণ বলে তাদের একটারও নাগাল পাওয়া গেল না। একটি স্ত্রী গণ্ডার ছানা-পোনা নিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে সমতলভূমির মধ্য দিয়ে ছুটে পালালো। তাকে লক্ষ্য করে অনেকগুলো তীর ছোঁড়া হলো বটে, কিন্তু কাছেই ঝোপে-ঘেরা জমি থাকায় তার মধ্যে ঢুকে গেল। ঝোপঝাড়ে আগুন লাগালাম কিন্তু কোনও গণ্ডার খুঁজে পাওয়া গেল না। আর একটা গণ্ডারের অবশ্য দেখা পাওয়া গেল—সেটা আগুনে পুড়ে যাওয়ায় খোঁড়া হয়ে

দৌড়াতে পারছিল না এটাকেই হত্যা করে তার দেহের এক একটা অংশ শিকারের চিহ্নরূপে কেটে নিই। যে দল নদী পথের অবস্থা দেখবার জন্য গিয়েছিল, তারাও ফিরে এসে গণ্ডারের এক একটা অংশ কেটে নেয়।

পরদিন সকালে আটকের কাছে ঘোড়া, উট ও মালপত্র সহ সিন্ধু নদ পার হই। শিবির-বাজার ও পদাতিক দল ভেলায় পার হয়। সেইদিনই সেখানকার অধিবাসীরা একটি সুসজ্জিত অশ্ব উপঢৌকন-স্বরূপ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে সম্মান জানায়। আমাদের সমস্ত লোকজন পার হয়ে এলে সেদিনই দুপুরের নমাজের পর সৈন্য চালনা করে এগিয়ে যাই। রাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত এইভাবে চলে কাচ্‌হ-কট নদীর কাছে থামি। তারপর সেই নদী পার হয়ে সেই রাত্রেই সংদাকি গিরি-সংকট অতিক্রম করে বিশ্রাম নিই। সৈয়দ কাশিমের ওপর পেছনের সৈন্যদলের ব্যূহ রক্ষা করার ভার ছিল। কয়েকজন গুজরকে অনুসরণ করতে দেখে সে তাদের কয়েকজনের মাথা কেটে ফেলে ও সেগুলো আমার কাছে নিয়ে আসে।

সংদাকি থেকে ভোরে যাত্রা করে দুপুরের নমাজের সময় সোহান নদী পার হয়ে শিবির স্থাপন করি। আমাদের দলের যারা পিছনে পড়েছিল তারা রাতের মাঝামাঝি সময়ে ক্রমে ক্রমে এসে হাজির হলো। এই কষ্টকর দীর্ঘ পথ চলতে আমাদের অনেক সময় লেগেছিল—আর সেটা এমন সময়ে যখন আমাদের ঘোড়াগুলো আগে থাকতেই পরিশ্রমে কাতর হয়ে রুগ্ন হয়ে পড়েছিল। এই ধাক্কায় অনেকগুলো ঘোড়াই চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়ে। আর কতক রাস্তাতেই পড়ে গেল—আর উঠলো না।

এখানে শিবির স্থাপন করার পর লাঙ্গের খাঁকে পাঠাই মালিক হেস্তকে আমার কাছে নিয়ে আসার জন্য। সে তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। আমার মহানুভবতা এবং আমি তাকে অনেক রকমে অনুগ্রহ দেখাব—এই সব কথা বলে তাকে বুঝিয়ে রাতের নমাজের সময় আমার কাছে নিয়ে এল। মালিক হেস্ত একটা সাজ সমেত ঘোড়া আমাকে নজর-স্বরূপ দেওয়ার জন্য সঙ্গে এনে আমার বশ্যতা স্বীকার করলো। তার বয়স সে সময় মাত্র বাইশ-তেইশ বছর।

আমাদের শিবিরগুলির চার পাশে অনেক ভেড়ার পাল ও দলে দলে বাচ্ছা খচ্চর চরে বেড়াচ্ছিল। আমি যখন হিন্দুস্থান জয়ের সঙ্কল্প করেছি এবং যে দেশগুলোর মধ্যে এখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি সেগুলো অনেক দিন

তুর্কিদের দখলে থাকায় সে দেশ আমারই রাজত্বের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করায়, যুদ্ধ করেই হোক কিংবা শান্তিপূর্ণ উপায়েই হোক—তা অধিকার করার জন্য স্থির সঙ্কল্প করি। এইজন্য পাহাড়ের অধিবাসীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করাই উচিত হবে বলে ঠিক করলাম। আমি সেইজন্য এই আদেশ জারি করি যে এখানকার বাসিন্দাদের ভেড়া বা অন্য পশুর যেন কেউ কোনও ক্ষতি না করে, আর তাদের কাছ থেকে এক টুকরো সুতো কিংবা একটা ভাঙ্গা সুঁচও যেন কেউ না নেয়।

'বেহেরে'র মাতব্বরদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের সম্পত্তির ওপর দুই লক্ষ টাকা কর ধার্য স্থির হয়। এই টাকা আদায়ের জন্য কয়েকজন আদায়কারী নিযুক্ত করি। আমি তারপর দেশটা ঘুরে দেখার জন্য ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ি। কিছু সময় ঘোরাঘুরি করার পর একটা নৌকোয় উঠে কিছু সিদ্ধি পান করি।

পতাকাবাহী হায়দার আলেমদারকে বালুচিদের কাছে পাঠাই। বালুচিরাই 'বেহের' দেশটায় বসতি স্থাপন করেছে। তারা একটা বাদামি রংয়ের ঘোড়া নজরা স্বরূপ নিয়ে এসে আমার বশ্যতা-স্বীকার করে।

কয়েকজন সৈন্য 'বেহেরে'র অধিবাসীদের ওপর জোর-জুলুম ও কুব্যবহার করেছে শুনতে পেয়ে আর একদল সৈন্যকে তাদের সন্ধানে পাঠাই। তারা কয়েকজন দুষ্কৃতকারীকে ধরে আনলে কয়েকজনকে প্রাণদণ্ড দিই। আর কয়েকজনের নাক বিদ্ধ করে সেই অবস্থায় শিবিরে শিবিরে ঘুরিয়ে আনার আদেশ দিই।

কেউ কেউ বলাবলি করছিল যে যদি কয়েকজন লোককে দূত-স্বরূপ শান্তি ও বন্ধুত্বের বাণী বহন করে যে সব দেশ তুর্কিদের অধিকারে ছিল সেই সব দেশে পাঠানো হয় তাহলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। আমি ভেবে-চিন্তে মোল্লা মুরসিদকে দূত আখ্যা দিয়ে সুলতান ইব্রাহিমের কাছে এই দাবী জানিয়ে পাঠাই যে প্রাচীন কাল থেকে যে দেশ বরাবর তুর্কি জাতির অধীনে ছিল তা আমার হাতে সমর্পণ করতে হবে। সুলতান ইব্রাহিমের কাছে ঐ ধরণের চিঠি ছাড়াও দৌলত খাঁয়ের নামেও চিঠি দিই। মোল্লা মুরসিদকে মৌখিক নানা উপদেশ দিয়ে দৌত্য কার্যে পাঠাই।

হিন্দুস্থানের লোকেরা বিশেষ করে আফগানরা এক অদ্ভুত নির্বোধ জাত। তাদের না আছে কোনও চিন্তাশক্তি, না আছে দূরদৃষ্টি। তারা রোখ করে বীরের মত যুদ্ধও চালাতে পারে না, অথচ বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের মধ্যেও

থাকতে চায় না। দৌলত খাঁ আমার দূতকে লাহোরে আটকে রাখে। কিন্তু সে নিজে দূতের সঙ্গে দেখাও করে না, কিংবা তাকে সুলতান ইব্রাহিমের কাছেও যেতে দেয় না। ফলে, আমার দূত পাঁচ মাস পরে কোনও উত্তর না নিয়েই কাবুলে ফিরে যায়।

এই সময়ে এমন অঝোরে বৃষ্টি নামলো যে সমস্ত সমতলভূমি জলে ডুবে গেল। 'বেহেরে' ও পাহাড়ের মাঝখানে যেখানে আমাদের শিবির, তার কাছাকাছি একটা ছোট নদী ছিল। দুপুরের নমাজের সময় দেখা গেল যে নদীটা চওড়ায় একটা প্রকাণ্ড হ্রদের আকার ধারণ করেছে। বিকেল এবং সন্ধ্যার নমাজের মাঝামাঝি সময়ে জল কতদূর উঠেছে দেখবার জন্য ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেলাম। বৃষ্টি এবং বাতাস এমন জোর চলছিল যে ফেরবার সময় মনে হলো যেন আমরা আর তাঁবুতে পৌঁছতে পারবো না। নদীতে বন্যা হয়ে গিয়েছে। সেই নদী আমি সাঁতরিয়ে পার হয়ে এলাম। সৈন্যরা সেদিন খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

পরদিন সকালে অশ্বারোহণে ভ্রমণ শেষ করে একটা নৌকায় উঠি। সেখানে সদলে সুরাপান চলে। নৌকায় যেদিকে দাঁড় থাকে অর্থাৎ সম্মুখ ভাগে খানিকটা জায়গা ছাদ দিয়ে ঘেরা ছিল। উপরের ছাদটা সমতল। আমি এবং আরও কয়েকজন সেই ছাদের ওপরে বসি। কেউ কেউ ছাদের নীচে পাটাতনের ওপর বসেছিল। নৌকার হালের দিকেও বসার জায়গা ছিল। —গাদাই ও নামান সেখানে বসেছিল। মধ্যাহ্নের নমাজের পর পর্যন্তও আমরা মদ্যপান করতে থাকি। তারপর মদে বীতস্পৃহ হয়ে ভাং খেলাম। নৌকার পেছনের দিকে যারা বসেছিল তারা বুঝতে পারেনি যে আমরা ভাং খাচ্ছি। তারা সমানে মদ খেয়েই চলেছে। নমাজের সময় আমরা নৌকা থেকে নেমে আসি। ঘোড়ায় চড়ে অনেক রাতে আমরা শিবিরে ফিরে যাই।

নামান আর গাদাই ভেবেছিল যে আমি মদ ছাড়া আর কিছুই খাইনি। আমাকে খুব খুসী করবে বলে তারা এক কলসী মদ এক একজনের ঘোড়ায় পালটা পালটি করে তুলে অনেক কষ্টে আমার জন্য নিয়ে আসে। মদের পাত্র আমার কাছে নিয়ে আসার সময় তারা মদোন্মত্ত অবস্থায় ছিল। তারা বল্‌লো—মদের কলসীটা অন্ধকার রাতেও আপনার জন্য কষ্ট করে এনেছি। দুইজনকে পালা করে এই কলসী বয়ে আনতে হয়েছে।

তাদের বলা হলো যে আমরা কিন্তু অন্য জিনিস খেয়েছি। ভাংখোর

আর মদ-খোরদের কিন্তু নেশা আলাদা রকমের। তারা একে অন্যকে বরদাস্ত করতে পারে না, পরস্পরের দোষ দেখে।

আমি বলি—'দলের সৌহার্দ্য যেন নষ্ট করো না। যে মদ খেতে চায় সে মদ খাবে, আর যে ভাং খেতে চায় সে তাই খাবে। একদল যেন আর এক দলকে এই নিয়ে কোনও কটু কথা বা মিছামিছি দোষারোপ না করে।'

কয়েক জন মদ নিয়ে বসলো আর কয়েকজন ভাং নিয়ে। কিছুক্ষণ ভালভাবেই চললো। বাবা জান নৌকায় যায়নি। আমরা শিবিরে ফিরে আসার পর তাকে ডেকে পাঠানো হয়। সে মদ্য পান করাটাই পছন্দ করে। তার্দি কিপচাককেও ডাকা হয়। সেও মদ্যপায়ীদের দলেই ভিড়ে গেল। মদ্যপায়ী এবং ভাং-খোররা কখনই একদলে মিলে-মিশে থাকতে পারে না। যারা মদ খাচ্ছিল তারা বেকুবের মত নানা কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলো ও ভাং-খোরদের সম্বন্ধে অশিষ্ট মন্তব্য করতে লাগলো। বাবা জানও মাতাল হয়ে আবোল তাবোল বকতে শুরু করলো। মাতালরা এক এক গ্লাস মদ নিয়ে তার্দি মহম্মদের হাতে তুলে দিচ্ছিল, সেও এক চুমুকে শেষ করছিল। অতিরিক্ত মদ খেয়ে সে অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে পাঁড় মাতাল হয়ে উঠলো। মাতাল হয়ে সকলে গণ্ডগোল ও ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ করলো। আমি সকলকে শান্ত করার জন্য যতই চেষ্টা করি সবই বিফল হয়। দলটির ব্যবহার অত্যন্ত বিরক্তিজনক হয়ে ওঠে। শীগগিরই দলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

পরদিন ভোরে ঘোড়ায় চড়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর পর নৌকায় উঠি। সেখানে সুরাপান চলতে থাকে, নৌকাতে রাত্রের নমাজের সময় পর্যন্ত হরদম মদ্যপান চলে। যখন সবাই পাঁড় মাতাল হয়ে পড়েছে তখন নদীতীর থেকে প্রত্যেকে এক একটা জ্বলন্ত মশাল হাতে ঘোড়ার পিঠে একবার এপাশে আর একবার ওপাশে হেলে পড়তে পড়তে, জোর কদমে শিবিরে ফিরে আসি। আমি খুবই মাতাল হয়ে পড়েছিলাম। পরদিন সকালে যখন শুনি যে আমরা জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে শিবিরে এসেছি—সে কথা কিন্তু আমি কিছুতেই স্মরণ করতে পারলাম না। শিবিরে ফিরেই আমি ভয়ানক বমি করতে থাকি।

কিছু পরে আমি আবার ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে তারপর নৌকায় নদী পার হয়ে ওপারের বাগানগুলো দেখতে যাই। এইসব বাগানে আখের চাষ হয়। জমিতে জল সেচনের জন্য চরখি ও বালতির ব্যবহার পর্যবেক্ষণ

করি। চরখির চাকা ঘুরিয়ে জল তুলেও দেখি। তারপর বাগানের লোকদের দিয়ে বারবার জল তুলিয়ে সেচের কাজ কেমন হয় তা দেখতে থাকি।

সেদিন বেরোবার সময়ও ভাং খেয়েছিলাম। বাগান দেখা শেষ করে নৌকায় ফিরে আসি। মানুচেহর খাঁ ভাং খেয়েছিল। কিন্তু এত কড়া ভাং সে খায় যে বরাবর দুই জন লোককে তার হাত ধরে থাকতে হয়েছিল—যাতে সে পড়ে না যায়।

আমরা নদীর মাঝখানে এসে নোঙ্গর ফেলে চুপ করে বসে থাকি। তারপর আবার নোঙ্গর তুলে স্রোতের মুখে নৌকা ভাসিয়ে দিই। এই-ভাবে কিছুক্ষণ চলার পর আবার আমাদের ইচ্ছা হলো যে নৌকা বেয়ে উজান ভেঙ্গে চলতে হবে। সে রাত্রিটা নৌকাতেই কাটাই। পরদিন ভোরে শিবিরে ফিরে আসি।

রবিয়ল মাসের দশ তারিখে শনিবারে সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করে। সেইদিন দুপুরের নমাজ পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াই। তারপর একটা নৌকায় উঠে সুরাপান উৎসবে মেতে যাই। নদীর একটা বড় শাখা ধরে ভাঁটার টানে চলতে থাকি। তারপর, 'বেহেরে'র অনেকটা দূরে নৌকা থেকে ডাঙ্গায় নেমে অনেক দেরীতে শিবিরে ফিরে আসি।

এই দেশের শাসন-ব্যবস্থার একটা সুরাহা করে ফেলি—যাতে এখানে ভবিষ্যতে শান্তি বজায় থাকে। তারপর 'বেহেরে' থেকে কাবুলে ফিরে আসার জন্য বেরিয়ে পড়ি। আমাদের যাত্রার দিনেও অসম্ভব বৃষ্টি হয়। শিবিরের তাঁবুর পেছন দিক দিয়ে রাত্রের নমাজের সময় পর্যন্ত ঝর্‌ঝর্‌ করে বৃষ্টির জল পড়তে থাকে।

আফগানি সৈন্যরা পৌঁছে গেলে আমরা পরদিন সকালে সেইখান থেকে সসৈন্যে যাত্রা করে চার মাইল অগ্রসর হয়ে থামি। এইখানে উঁচু জমির ওপরে উঠে শিবিরের জায়গা পর্যবেক্ষণ করি' সৈন্যদের সঙ্গে কতগুলি উট আছে গুণে দেখতে নির্দেশ দিই। গুণে দেখা গেল সাত শ'র মত উট আছে।

রণবাদ্য বেজে উঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখান থেকে মার্চ করে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় আটক গিরি-সংকটের নীচে থামি। দুপুরের নমাজের পর আমরা আবার চলা শুরু করে গিরি-সংকট অতিক্রম করে নদী পার হয়ে একটা উঁচু পাহাড়ে উঠে বিশ্রাম করি। তারপর আবার মাঝরাতে বেরিয়ে পড়ি।

'বেহেরেতে' যাওয়ার সময় বেলা নটায় নদী হেঁটে পার হয়েছিলাম। সেই পথটা পরীক্ষার সময় শস্য বোঝাই একটা ছোট নৌকা নদীর মধ্যে কাদায় আটকে আছে দেখা গেল। নৌকার লোকেরা চেষ্টা করেও নৌকোটাকে মুক্ত করতে পারলো না। সেই শস্য আটক করে আমার লোকদের মধ্যে ভাগ করে দিই। খুব প্রয়োজনের সময় শস্যটা পাওয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় সিন্ধু ও কাবুলের নদীর সংযোগস্থলে এসে থামি; ছয়টি নৌকো জোগাড় করে আমার দক্ষিণ ও বামদিকের এবং মাঝের সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দিলে তারা নদী পার হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। নদী পার হতে চারদিন সময় লেগে যায়।

সূর্যোদয়ের সময় নদীতীর থেকে আবার মার্চ করা শুরু হয়। সেদিন আমি ভাং খেয়েছিলাম। ভাংয়ের গোলাপি নেশার প্রভাবের মধ্যে আমি কয়েকটি সুন্দর উদ্যান দেখেছিলাম। উদ্যানের নানা কেয়ারি লাল, হলুদ রংয়ের আরঘান ফুলে ঢাকা রয়েছে। একদিকের কোয়ারিতে হলুদ রংয়ের, আর একদিকের কেয়ারিতে লাল ফুল ফুটে রয়েছে। অনেক জায়গায় আবার একই কেয়ারিতে সব রকমের ফুলই একসাথে জড়াজড়ি করে ফুটে রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে ফুলগুলোকে কেউ যেন ছুঁড়ে ফেলে ছড়িয়ে রেখেছে।

আমার শিবিরের কাছে একটা উঁচু মাটির ঢিপির উপর বসে আমি এই ফুলের বাহার দেখছিলাম। এই উঁচু জায়গার চার পাশে সাজানো কেয়ারির মধ্যে ফুলগুলো যেন বাঁধা পড়ে ফুটে আছে। একদিকে পীত রংয়ের ফুল—আর অন্যদিকে লাল ত্রিকোণ কেয়ারিগুলিতে যেন সুবিন্যস্ত করে রাখা হয়েছে। আর দুই পাশে ফুলের সমারোহ যেন কিছু কম। কিন্তু যতদূর চোখের দৃষ্টি যায় একই রকমের মন মাতানো দৃশ্য ফুলবাগানগুলির। পেশোয়ারের কাছাকাছি জায়গাতে ফুল বাগানের দৃশ্য বসন্তকালে অদ্ভুত সুন্দর হয়।

পরদিন প্রত্যুষে শিবির তুলে রওনা হই। যেখানে নদী থেকে রাস্তাটা পৃথক হয়েছে সেইখানে বাঘের ভীষণ গর্জন শোনা গেল, বাঘটাও বেরিয়ে এলো। ঘোড়াগুলো বাঘের ডাক শুনে ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠে আয়ত্তের বাহিরে চলে গেল। তারা আরোহীদের পিঠে নিয়ে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলো। বাঘটা আবার জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলো।

একটা মোস এনে টোপ হিসেবে জঙ্গলের মধ্যে বেঁধে রাখতে নির্দেশ দিলাম—যাতে খাদ্যের লোভে বাঘটা বেরিয়ে আসে। বাঘটা আবার গর্জন

করতে করতে বেরিয়ে এলো। তখন চার দিক থেকেই তার ওপর শর বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। আমিও ওকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। খালওয়া তাকে বর্শার আঘাত করতেই বাঘটা বেঁকে দাঁড়িয়ে তার দাঁত দিয়ে বর্শার ফলাটা ভেঙ্গে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার দেহের অনেক জায়গায় আঘাত পেয়ে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। সেই সময় ইসেয়াওয়াল তরবারি বের করে এগিয়ে যেতেই যখন বাঘটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছে সেই সময়েই তার মাথায় আঘাত করলো। তারপর, আলি সিস্তানি তার কোমরে আঘাত করতেই বাঘটা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নদীর মধ্যেই ওটাকে মারা হয়। জল থেকে তুলে নিয়ে আসার পর আমি বাঘটার ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিই।

পরদিন সকালে আবার মার্চ শুরু হয়। তারপর বেক্‌রামে এসে থামি। আমরা 'গুর-কাটরি' পরিদর্শন করি। পৃথিবীর কোনও স্থানেই এখানকার মত সাধুদের জন্য অন্ধকার এবং অপ্রশস্ত কুঠরি দেখা যায় না। দরজার মধ্যে প্রবেশ করে দুই এক সিঁড়ি নেমে তোমাকে শুয়ে পড়তে হবে—তারপর সেই অবস্থাতেই বুকে হেঁটে তোমাকে এগোতে হবে। আলো না নিয়ে গেলে তোমার প্রবেশ করা অসম্ভব। মাথার অথবা দাড়ির চুল যা মানত-স্বরূপ নানা ভক্তরা দিয়েছে, প্রচুর পরিমাণে সেগুলো চারিদিকে এবং গুহার কাছাকাছি ছড়িয়ে আছে। চারিদিকেই কুঠরি—ঠিক যেমন মঠে কিংবা শিক্ষায়তনে থাকে। কক্ষগুলির সংখ্যা অনেক।

এই দিনই আমার সবচেয়ে ভাল বাজপাখীটি হারাই। আমার প্রধান শিকারী শিখেমের তত্ত্বাবধানে সেটা ছিল। এই বাজটা খুব নিপুণভাবে বক ও সারস পাখী ধরতে পারতো। আগে দু' তিনবার এটা পালিয়েছিল। এমন অব্যর্থভাবে বাজটা শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো যে তার এই গুণপনার জন্য আমার মত অনিপুণ লোকও ভাল পাখী শিকারী এই আখ্যা পেয়েছিল।

আমার সঙ্গী ছয় জন প্রধান আফগান সর্দারকে হিন্দুস্থানের লুঠের মাল থেকে প্রত্যেককে একশ রৌপ্য মুদ্রা, একটি কোর্তা, তিনটি বলদ এবং একটি করে মোষ দিই। আর সকলকেও মুদ্রা, কাপড়, বলদ এবং মোষ তাদের অবস্থানুযায়ী দিয়েছিলাম।

আমরা আলি মসজিদের ভূমিতে পৌছলে মারুফ নামে একজন লোক

দশটি ভেড়া, দুই বোঝা চাল ও আট খণ্ড বড় আকারের পণির ভেট-স্বরূপ নিয়ে আসে।

মধ্যাহ্ন নমাজের সময় আমি কাবুলে পোঁছে যাই। আমি কাবুলের সেতুর কাছে না পোঁছানো পর্যন্ত কেউ আমার আসার কথা জানতে পারেনি। তখন আর হুমায়ুন আর কামরাণকে ঘোড়ায় চড়িয়ে আমার কাছে আনার সময় ছিল না। কাছাকাছি যে সব ভৃত্য ছিল তারাই তাঁদের কোলে করে নগর-ফটক এবং দুর্গ-ফটকের মাঝামাঝি জায়গায় আমাকে সম্মান দেখানোর জন্য নিয়ে আসে। বিকেল বেলার নমাজের সময়ের কাছাকাছি নগরের কাজিকে সঙ্গে নিয়ে কাশিম বেগ এবং আমার যে সব সভাসদরা কাবুলে ছিল তারা এসে অভিনন্দন জানায়।

বিকালের নমাজের পর আমাদের এক আনন্দজনক বৈঠক বসলো। আমি আমার নিজের পোশাকের আলমারি থেকে একটা পোশাক বের করে শা' হোসেনকে উপহার দিয়ে তাকে সম্মানিত করি।

পরদিন ভোরে একটা নৌকায় প্রভাতি উৎসব উদ্‌যাপন করি। এই উৎসবে নূর বেগ বাঁশী বাজায়। সে তখনও সাধুজনোচিত কঠোর জীবন যাপন শুরু করেনি। দুপুরের নমাজের সময় আমরা নৌকা থেকে নেমে এসে পাহাড়ের উপর যে উদ্যান রচনা করেছিলাম সেখানে আমোদ উৎসব করি। বিকালের নমাজের সময় বেগুনি বাগানে গিয়ে আমরা সুরাপাত্র নিয়ে বসি। দুর্গ-প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে আমি দুর্গে ফিরে আসি।

সুলতান মির্জার জ্যেষ্ঠা কন্যা কাবুলে এলেন। সেখানে তাঁর বাসস্থান ঠিক হলে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য যাই। ঠিক আমার বড় বোনের মত তাঁকে সম্মান দেখিয়েই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সৌজন্য দেখিয়ে নত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করি। তিনিও নত হয়ে অভিবাদন করলেন। তারপর তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে পরস্পর আলিঙ্গন করি। এরপর এই রীতিই বরাবর আমরা মেনে চলেছি।

সেদিন আমি উপবাস করেছিলাম। ইউনিস্ আলি ও আরও কয়েক জন বিস্ময় প্রকাশ করে বললো—আজ মঙ্গলবার। আজও উপবাস। আশ্চর্য!

আমরা কাজির বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হই। সেই রাত্রে আমরা একটি অনন্দোৎসব করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কাজি আমার কাছে এসে বলেন—আমার বাড়ীতে এমন ব্যাপার কোনও দিন দেখা যায়নি। তবে আপনি যখন সম্রাট ও প্রভু, তখন আমার কি আর বলবার আছে।

আমাদের উৎসব পর্বের জন্য সব রকম জোগাড়-যন্ত্রই করা হয়েছিল। কিন্তু কাজিকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা সুরাপানটা বাদ দিই।

আমার বাগানে সমতলভূমির কয়েকটি চারা ও ডুমুর গাছ রোপণ করি। দুপুরের নমাজের সময় সুরাপান উৎসব হয়। পরদিন নতুন ঘেরা জমিটার মধ্যে খুব ভোরে আবার সুরাপান চলে। দুপুরের পর আমরা ঘোড়ায় চড়ে কাবুলে ফেরার জন্য রওনা হই। হাসানের বাড়ী পৌঁছিয়ে সুরার ঘোরে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ি। আবদালা ঘোর মাতাল হয়ে তার গায়ের পোশাক সমেত জলের মধ্যে পড়ে যায়। এত রাতে জলে পড়ায় তার খুব সর্দি লাগে। নড়তে চড়তে না পারায় সে সমস্ত রাতটা কুতলুকের বাড়ীতে কাটিয়ে দেয়। পরের দিন সে লজ্জিত হয়ে আমার সামনে এসে মাত্রা ছাড়িয়ে সুরা পান করার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে বলে, সে প্রতিজ্ঞা করেছে—আর সে মদ খাবে না।

আমি তাকে বলি—তোমার এই অনুতাপ আর মদ ছাড়ার প্রতিজ্ঞা কতদিন থাকে দেখা যাক। তোমাকে ছাড়তে হবে না। তুমি যেখানে খুসী মদ খেতে পার। তার প্রতিজ্ঞা সে কয়েক মাস রক্ষা করেছিল, তারপর আর পারেনি।

আমি সবিরাম জ্বরে ভুগছি মনে হতে শরীরের কিছু রক্ত ক্ষরণ করে ফেলি। সেই সময় দু'দিন—কোনও সময় তিন দিন অন্তর অন্তর জ্বরের আক্রমণ হচ্ছিল। প্রত্যেক বার ঘাম না হওয়া পর্যন্ত জ্বরের উত্তাপ উঠত। ঘাম হলে তবে মুক্তি পেতাম। দশ বার দিন পর মোল্লা খাজা নার্সিসাস ফুল মদের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করে। আমি দুই একবার খেলাম বটে, কিন্তু তাতে আমার কোনও উপকার হলো না।

হাসান বেগ আমার কাছে একটা সুরাপান উৎসব করার জন্য অনুমতি চাইলেন। সে তার বাড়ীতে মহম্মদ আলি এবং আরও কয়েকজন সভাসদ বেগদের নিয়ে গেল। আমি তখনও জ্বরের জন্য সুরাপান করছি না। আমি বল্লাম—জীবনে কখনও প্রাজ্ঞের মত বসে থাকিনি, যখন আমার বন্ধুরা আমোদ আহ্লাদ করছে। যখন তারা ঢক্ ঢক্ করে মদ গিলছে আর স্ফূর্তি করছে তখন আমি সে দৃশ্য ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে দেখিনি। যাক, এখন তোমরা আমার কাছে বসেই মদ খাও, যাতে আমি সাদা চোখে যারা মাতাল হয় তাদের—আর যে মাতাল নয় তার বিভিন্ন ধরণের মনের গতি এবং হাব-ভাব পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পারি।

ছবির গ্যালারির দক্ষিণ পূর্ব কোণে ছোট ছোট তাঁবুর সারি ছিল। সেইখানে আমি মাঝে মাঝে বসতাম। বৈঠকটা এখানেই বসে। ভাঁড়ামিতে ওস্তাদ ঘিয়াস এসে উপস্থিত হলো। তাকে ওরা ঠাট্টা তামাসা করে দলের মধ্যে ভিড়তে দিচ্ছিল না। অবশেষে নানা রকমের ভাঁড়ামি দেখিয়ে সে জোর করেই দলের মধ্যে জায়গা করে নিল।

আমি কোনও রকম প্রস্তুত না হয়েই এই কবিতাটা তৎক্ষণাৎ রচনা করে ফেলি এবং সেটা ঐ দলের কাছে পাঠিয়ে দিই।

'যখন, বন্ধুরা সব ভূরি ভোজে ব্যস্ত
গোলাপ বাগের সুষমায় মন ন্যস্ত
আমি তখন একা সঙ্গীহীন,
ভাবছি বসে,
ওদের কেমন সুখে কাটছে দিন।
ভাবছি বসে,
লুঠছে ওরা হরেক মজা কত,
আমিই শুধু একা ভাগ্যহত।
লুটুক মজা। হিংসা করি না তো।
তাদের তরে মাগি আশিস্ শত।
হে আল্লা, কর ওদের 'দোয়া',
দুখের আঁচের পায়না যেন ছোঁয়া।'

মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নের নমাজের মাঝামাঝি সময় সুরাপায়ী দলটি মূর্খের মত ব্যবহার করতে লাগলেন। যখন তাদের এই রকম মত্তাবস্থা, আমি সেখান থেকে সরে পড়ি।

এর কয়েকদিন আগে আমি ওষুধ হিসাবে ফুল মেশানো মদ পান করি, কিন্তু তাতে রোগের কোনও উপশম না হওয়ায় আমি ওটা খাওয়া ছেড়ে দিই। আমার অসুখ প্রায় সেরে এসেছে এমন সময় আমি আপেল গাছের তলায় একটা উৎসবের আয়োজন করি। সেদিন কিন্তু আমি ওষুধ মেশানো মদ খাই।

হায়দার তকির বাগানে টেংরি বার্দি কয়েকজন বেগ এবং তরুণ কর্মচারীদের নিয়ে একটা ভোজের আয়োজন করে। রাতের নমাজের পর

আমরা সেখান থেকে উঠে চলে আসি। তারপর বড়-দরবার-তাঁবুতে সকলে একসঙ্গে সুরাপান করতে বসে যাই।

বৃহস্পতিবার মাসের পঁচিশ তারিখে আমার রোগ আরোগ্যের জন্য পবিত্র কোরাণ পাঠ করতে মোল্লা মহম্মদকে নিযুক্ত করা হয়।

শা' হোসেনের বাড়ীতেও আমি গিয়েছিলাম। সেখানে সুরাপান উৎসব চলে। সেই উৎসবে আমার অনেক সম্ভ্রান্ত আমীর এবং সভাসদ যোগ দেয়।

একদিন বৈকালিক ও সান্ধ্য নমাজের মাঝামাঝি সময়ে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়। আমরা পায়রা-বাড়ীর ছাদে চলে যাই। সেখানেই সুরাপান করতে বসি। খানিকটা রাত হয়েছে, এমন সময় কয়েকজন অশ্বারোহীকে রাস্তা দিয়ে নগরের দিকে আসতে দেখা গেল। আমি স্থির নিশ্চয় করলাম যে এরা দরবেশ মহম্মদ ও তার দলের লোক। আমার ঠিক ধারণা হলো যে ওরা মির্জা খাঁয়ের দূত হিসাবে আমার কাছে আসছে। দরবেশ মহম্মদকে ছাদের উপরেই ডেকে পাঠালাম। তাকে বললাম দূতি-আলির আদব কায়দা ফেলে রেখে আমাদের সঙ্গে উৎসবে যেতে যাও দেখি।

দরবেশ মহম্মদ আমার কাছে এসে কয়েকটি উপহার দ্রব্য যা সে সঙ্গে এনেছিল সেগুলো আমার সামনে রেখে আমাদের সঙ্গে বসে গেল। এ সময় সে সংযম পালন করছিল। তাই সে মদ্যপান করলো না। আমরা কিন্তু খুবই মাতাল হয়ে পড়ি।

পরদিন সকালে যখন আমি দরবার কক্ষে বসি তখন দূত হিসাবে যে রকম আদব কায়দা ও সৌজন্য দেখানোর প্রথা আছে সেইভাবে দরবেশ মহম্মদ আমার সম্মুখে হাজির হলে—তার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর মির্জা খাঁ আনুগত্য দেখিয়ে যে সব উপঢৌকন পাঠিয়েছে সেগুলো আমার সামনে ধরে দেয়।

আবদল রহমান আফগানরা গার্দেজের সীমার মধ্যে বসতি স্থাপন করলেও আমাকে কোনও কর দিচ্ছিল না। তারা শান্তিভঙ্গ করতেও শুরু করছিল। আসা যাওয়ার পথে তারা বিদেশী যাত্রী ও বণিকদের পীড়ন করছিল। এই আফগানদের শিক্ষা দেওয়ার এবং তাদের বাসস্থান তছনছ করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। সে রাত্রে আমরা পথ হারিয়ে পাহাড় আর পতিত জমির মধ্যে অনবরত ঘুরপাক খেতে থাকি। কিছু সময় এইভাবে

কাটার পর আবার আমরা পথ খুঁজে পাই। তারপর 'চস্‌মা-ই-তীরে'র গিরি-সংকট অতিক্রম করে ভোরের নমাজের সময় সমতলভূমিতে নেমে সৈন্যদের দেশটা তন্নতন্ন করে শত্রুদের সন্ধান করতে পাঠাই। একদলকে লুঠতরাজ এবং আর একদলকে কিরমাস পাহাড়ের ধারে শত্রুদের বাড়ীঘর ভেঙ্গে ফেলতে পাঠিয়ে দিই। একটা বড় গোছের দল উপত্যকায় লুঠতরাজ করতে এগিয়ে যায়।

এই শেষোক্ত দলটি খুব বড় বুঝতে পেরে তাদের চলে যাওয়ার পর আমিও পেছন পেছন যেতে থাকি। ওখানকার অধিবাসীরা অনেক দূরে এবং উঁচুতে থাকায় যে সব সৈন্যরা তাদের খুঁজে বের করতে গিয়েছিল তাদের ঘোড়াগুলোই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারা সামান্য জিনিসও লুঠ করে আনতে পারল না।

সমতলক্ষেত্রে চল্লিশ পঞ্চাশ জন আফগানকে দেখা গেল। অগ্রগামী সৈন্যদের সাহায্য করবার জন্য যাদের পাঠানো হয়েছিল তারা আফ-গানদের দিকে এগিয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন আমাকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়ার কথা বলতে আমার কাছে ছুটে এলো। আমি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু আমি পৌছানোর আগেই হোসেন হাসান অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তাড়াহুড়ো করে ঘোড়া চালিয়ে আফগানদের মধ্যে পৌঁছে গেল। যখন সে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য আস্ফালন করছে, সেই সময় তার ঘোড়া তীরবিদ্ধ হয়ে লাফিয়ে উঠে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। সে মাটি থেকে উঠতে না উঠতেই পায়ে তারবারির আঘাত পেয়ে আবার মাটিতে পড়ে যায়। তখন আফগানরা তরবারির আঘাতে তাকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলে। আমীররা দূর থেকে এই দৃশ্য দেখতে থাকে; তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেল না।

আমি এই সংবাদ পাওয়ামাত্র কয়েকজন পার্শ্বচর এবং বাছাই-করা সৈন্যকে অকুস্থলে তাড়াতাড়ি যেতে বলি। আমি নিজেও তাদের অনুসরণ করে দ্রুত চলে আসি। প্রথমেই মোমিন আত্‌কে এগিয়ে গিয়ে বর্শা দিয়ে একজন আফগানকে আঘাত করে তার মাথা কেটে নিয়ে আসে। আবদল হাসান বর্মপরা না থাকলেও সাহসভরে এগিয়ে যায়। যে রাস্তা দিয়ে আফগানরা মার্চ করে আসছিল সেইখানে উপস্থিত হয়ে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আফগানদের আক্রমণ শুরু করে। তরবারির আঘাতে একজন আফগানের মাথা কেটে ফেলে সেটা জয়চিহ্ন স্বরূপ নিয়ে আসে। সে নিজেও দেহে

তিন জায়গায় আঘাত পায়। তার ঘোড়াও জখম হয়। মহম্মদ কিপলিনও তরবারি হাতে বীরের মত অগ্রসর হয়ে একজন আফগানকে আক্রমণ করে। প্রথমে তাকে বন্দী করে, তারপর তার মাথা কেটে নিয়ে আসে।

আবদল হাসান ও মহম্মদ কিপলিন আগেও অনেকবার সাহসের কাজ দেখিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু এই ব্যাপারে তারা যে বীরত্বের নিদর্শন দেখায়—তার তুলনা হয় না। চল্লিশ পঞ্চাশজন আফগান যারা উপস্থিত ছিল—তাদের সবাইকেই একে একে হত্যা করা হলো। আফগান বধের পর আমরা একটা কর্ষিত জমির উপর বিশ্রাম করি। সেখানেই আফগানদের মাথার খুলি দিয়ে একটা স্তম্ভ তৈরী করা হয়।

আমি রাস্তার উপর এসে দেখতে পেলাম—যে সব বেগরা হুসেনের সঙ্গে ছিল তারা সেখানে এসে পৌঁছেছে। তাদের দেখে রাগে আমার শরীর জ্বলতে থাকে। তাদের উচিত শাস্তি দিতেও তখনই ঠিক করে ফেলি। তাদের বলি—তোমরা এতগুলো লোক সঙ্গে থাকতেও যখন আফগানরা একটি গুণবান তরুণকে অমন নৃশংসভাবে হত্যা করতে পেরেছে, আর তোমরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য কাপুরুষের মত দেখেছো, তখন তোমাদের এই অকর্মণ্যতার জন্য শাস্তি পেতেই হবে। এই অপরাধে তোমাদের সকলকে মর্যাদাচ্যুত করলাম। তোমাদের ওপর যে শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল—তাও তোমাদের হাত থেকে তুলে নেওয়া হলো। তোমাদের দাড়ি কামিয়ে দিয়ে ঐ হীন অবস্থায় তোমাদের সকলকে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়ে লোকদের দেখাতে হবে যে একজন যুবার অমূল্য জীবন ঘৃণ্য আফগানের হাত থেকে রক্ষা না করার ফলে কি শাস্তি পেতে হয়। সমতলভূমিতে দাঁড়িয়ে তোমরা এই দৃশ্য দেখেছো, অথচ একটা আঙ্গুলও তোমরা নাড়নি। এই তোমাদের শাস্তি।

যে সব সৈন্য কিরমাসের দিকে গিয়েছিল তারা কয়েকটা ভেড়া এবং কিছু লুঠের মাল নিয়ে এল। একজন আফগান তরবারি তুলে ধেয়ে আসছে দেখে দৃঢ়চেতা বাবা কিস্‌কে মাটিতে দাঁড়িয়ে একটুও বিচলিত না হয়ে ধনুকে তীর লাগিয়ে তাকে বিদ্ধ করে ধরাশায়ী করলো।

পরদিন ভোরে আমরা কাবুলে ফেরার জন্য রওনা হলাম। আমি মহম্মদ আকার গ্রামে গিয়ে থামি। সেখানে ভাং খাওয়ার পর কিছু মদ জলে নিক্ষেপ করে মাছদের মাতাল করে দিয়ে এইভাবে কিছু মাছ ধরা হয়।

কাবুলে পৌঁছানোর পর মহম্মদ ফজলি ও খসরুর কর্মচারীদের নিলাব

দুর্গের পতনের ব্যাপারে তাদের আচরণ সম্বন্ধে তদন্ত করি। তদন্তের পর পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেল যে তারা ঠিকভাবে কাজ করেনি। তারা সত্যই দোষী। তাদের সকলকেই শাস্তি-স্বরূপ নীচু পদে নামিয়ে দেওয়া হয়।

দুপুরের নমাজের কাছাকাছি সময় সমতলভূমির একটা গাছের নীচে সুরাপানের বৈঠক বসে। সেইখানে কিস্‌কে মোগলকে একটা সম্মানসূচক পোশাক প্রদান করি।

ইসতালিফে একদিন সুরাপানের আড্ডার আয়োজন করা হয়। গন্তব্য-স্থানের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছিয়েছি—এমন সময় আমার দলের লোকেরা একটা বড় সাপ মারে। সাপটা লম্বায় একটা প্রমাণ মানুষের সমান ও মানুষের বাহুর মত মোটা। এই সাপের মুখ দিয়ে একটা সরু সাপ বেরিয়ে এলো। কিছু আগেই বড় সাপটা সেটাকে গিলে খেয়েছিল। ছোট সাপটার দেহের প্রত্যেক অঙ্গই অক্ষত আর সাপটাও বেঁচে ছিল। ক্ষীণ সাপটা মোটা সাপটার চেয়ে লম্বায় কিছু ছোট ছিল। ক্ষীণ সাপটার ভেতর থেকে আবার একটা মোটা ইঁদুর বেরিয়ে আসে। আশ্চর্যের বিসয় সেটাও জীবন্ত এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অক্ষত ছিল।

আমি কতকগুলো চিঠি লিখে কিচ্‌কিনে তুন্‌কেতারের হাতে দিয়ে পাহাড়ের ওপাশের আমীরদের কাছে পাঠিয়ে দিই। তাদের কাছে আমার এই ইচ্ছাটা জানাই—তারা যেন তাদের দেশের সমস্ত সেনাকে একত্র করে প্রস্তুত থাকে। আমি এ কথাও উল্লেখ করি যে আমার সেনারা অভিযানের জন্য তৈরী, তারাও যেন সৈন্য সজ্জা করে শিবিরে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

পরদিন সকালেও ঘোড়ায় চড়ে খুব বেড়াই এবং ভাং খাই। পারওয়ান নদী যেখানে রাস্তার পাশে মিলেছে সেখানকার জলে এ দেশের তৈরী একটা ওষুধ ফেলা হয়, যা জলের মাছকে অবশ করার জন্য এদিকে ব্যবহার হয়। এইভাবে আমরা অনেকগুলো মাছ ধরি। মির শা' বেগ আমাকে একটা ঘোড়া উপঢৌকন দেয়। একটা ভোজের ব্যবস্থা করেও আমাদের সম্বর্ধনা করে।

রাতের নমাজের পর সুরাপান বৈঠক বসে। দরবেশ মহম্মদও এই সময় উপস্থিত ছিল। সে বয়সে তরুণ ও একজন যোদ্ধা হলেও কোনও দিনই সে সুরাপান করেনি। সে কঠোর নিয়মে সুরা বর্জন করে এসেছে। কুতলুক খাজা অনেকদিন আগে থেকেই সৈনিক বৃত্তি পরিত্যাগ করে দরবেশ

হয়েছে। তার বয়সও অনেক, দাড়িও পেকেছে। কিন্তু সে বরাবর সুরাপান উৎসবে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

মহম্মদ দরবেশকে আমি বলি—'কুতলুক খাজার পাকা দাড়ি দেখেও কি তোমার লজ্জা হয় না? সে বুড়ো, তার দাড়িও পাকা, অথচ সে কেমন মদ খায়। আর তুমি একজন যুবক, তারপর সৈনিক, তোমার দাড়িও কাঁচা—অথচ তুমি মদ খাওনা! এর কোনও মানে হয়?'

এমন নীতি আমার নয় এবং আমি এটা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলে মনে করি যে—যে লোক মদ খায়না ও যার মদ খাওয়ার ইচ্ছাও হয় না, তাকে জোর-জবরদস্তি করে মদ খাওয়ানোর চেষ্টা করি। সুতরাং ওকে যে এতগুলো কথা বল্‌লাম সেটা শুধু আমোদ করার জন্য, পীড়াপীড়ি করে মদ খাওয়ানোর জন্য নয়।

পরদিন সকালে অশ্বারোহণে আলুন গ্রামে পৌঁছাই। সেখানে আহারাদি শেষ করে 'বাঘাত খামে' চলে যাই। দুপুরের নমাজের পর আমাদের সুরাপানের বৈঠক বসে।

পরদিন ভোরে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো। খান সৈয়দের সমাধি দেখে এবং সমাধিস্থল প্রদক্ষিণ করে করে 'চিনেতে' একটা ভেলায় চড়ি। পেন্‌জির নদীর সঙ্গমস্থলে যেখানে পাহাড় জলের সঙ্গে মিশেছে, আমাদের ভেলাটা জলের ভিতরের একটা পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খায়। ধাক্কা লাগার সময় ভেলাটা এমন ভীষণভাবে কেঁপে ওঠে যে কয়েকজন লোক ঐ ঝাঁকুনি সামলাতে না পেরে নদীর মধ্যে উল্‌টিয়ে পড়ে। তাদের অতি কষ্টে আবার তুলে নেওয়া হয়। একটা চামচে সমেত চীনে মাটির পেয়ালা ও একজোড়া করতালও জলে পড়ে যায়। সেখান থেকে সরে গিয়ে আমাদের ভেলা যেই পাহাড়ের উল্‌টো দিকে গিয়েছে তখন নদীর জলের ভিতর একটা কিছুর সঙ্গে আবার ধাক্কা লাগে। জানিনা ওটা জলের মধ্যে ডুবে থাকা কোনও গাছের ডাল কিংবা জলের গতিরোধের জন্য জলের মধ্যে পোঁতা খুঁটি কি না। ধাক্কা লেগে শা' হোসেন উল্‌টিয়ে জলে পড়ে আর জলে পড়ার সময় মির্জাকে ধরে ছিল বলে সেও জলে পড়ে যায়। তার হাতে ফুটি কাটার জন্য একটা ছুরি ছিল। যখন জলে পড়তে যাচ্ছে তখন ভেলায় বিছানো মাদুরে ছুরিটা গেঁথে রাখে। ভেলাটাকে ধরতে না পেরে তার গায়ের দামী পোশাক নিয়েই সে সাঁতরাতে থাকে।

ভেলা থেকে নেমে সে রাত্রিটা আমরা মাঝিদের বাড়ীতেই কাটাই

যে পেয়ালাটা জলে পড়ে যায় সেই রকম একটা সাতরঙ্গা পেয়ালা দরবেশ মহম্মদ আমাকে উপহার দেয়।

২৫শে সোমবার আমি সর্বোচ্চ সম্মানের দ্যোতক একটি পোশাক এবং সাজ সমেত একটা ঘোড়া দরবেশ মহম্মদকে প্রদান করি ও তাকে 'বেগ' পদবীতে ভূষিত করি। চার পাঁচ মাস আমি মাথার চুল কাটিনি। ২৭শে তারিখ বুধবার আমি চুল কাটি। এই দিনে আমাদের সুরাপান উৎসব হয়।

ইউসেফজাইদের সায়েস্তা করার জন্য আমি অভিযান শুরু করি। যখন আমি ঘোড়ায় চড়তে যাই তখন আমার অশ্বরক্ষী বাবা জান প্রচলিত নিয়মবিরুদ্ধভাবে ঘোড়া আমার সামনে আনায় আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তার মুখে ঘুঁষি মারি এবং তাতে আমার বুড়ো আঙ্গুলের হাড় নড়ে যায়। প্রথমে আমি এর গুরুত্ব বুঝতে পারিনি, কিন্তু যখন যাত্রার শেষে ঘোড়া থেকে নামি তখন আঙ্গুলের ব্যথা অসহ্য হয়ে ওঠে। অনেকদিন আমি এই ব্যথায় ভুগি। সে সময় একটা চিঠিও লিখতে পারিনি। যাহোক কিছুদিন পর ব্যথাটা সেরে যায়।

আমরা কিরিক আরিকে গিয়ে থামি। আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে একটা নৌকায় উঠি। এই জায়গাতেই নয়া চাঁদের উৎসব পালন করি। নুর উপত্যকা থেকে কয়েকজন কতকগুলো পশুর পিঠে মদের পাত্র বোঝাই করে নিয়ে আসে। সন্ধ্যার নমাজের পর সুরাপান বৈঠক বসে। দরবেশ মহম্মদ কোনও সময়েই সুরাপান করেনি। শৈশবকাল থেকে এ পর্যন্ত আমি এই নিয়মই পালন করে এসেছি যে—কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদ খাওয়ার জন্য জোর-জবরদস্তি করবো না। দরবেশ মহম্মদ বরাবরই আমাদের দলে থাকে। কিন্তু তাকে কখনও মদ খেতে বলিনি। মহম্মদ আলি কিন্তু তাকে এভাবে চলতে দিতে ইচ্ছুক নয়। সেদিন তাকে নানাভাবে অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি করে তাকে কিন্তু সুরাপান করায়।

ঈদের দিন সোমবার সকালে আবার আমরা মার্চ শুরু করি। পথের মধ্যে আমি ভাং খাই। যখন ভাং খাই তখন আমার কাছে আপেলের মত একটা ফল আনা হয়। দরবেশ মহম্মদ এমন ফল কখনও দেখেনি। আমি তাকে বলি যে এটা হচ্ছে হিন্দুস্থানি ফুটি। সেটাকে কেটে এক টুক্‌রো তাকে দিই। সে তাড়াতাড়ি সেটা মুখে ফেলে আগ্রহভরে চিবুতে থাকে। সারাদিন তার মুখের তিক্তাস্বাদ যায়নি। কিছু মাংস তৈরী হয়ে

গিয়েছে এবং খাওয়ার জন্যও পরিবেশন করা হয়েছে এমন সময় লেঙ্গার খাঁ কিছু ভাং উপঢৌকন স্বরূপ নিয়ে উপস্থিত হলো এবং আমার কাজে সে নিজেকে উৎসর্গ করবে জানালো। বিকেলের নমাজের পর আমি কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নিয়ে একটা ভেলায় উঠে স্রোতের টানে ভেসে যাই।

পরদিন সকালে আমরা অগ্রসর হয়ে খাইবার-পাসের নীচে গিয়ে থামি। সেই দিনই সুলতান বেজিদ সেখানে পৌঁছিয়ে এই সংবাদ দেয় যে আফ্রিদি আফগানরা তাদের পরিবারবর্গ এবং জিনিষপত্র নিয়ে 'বারে'তে বসবাস করছে। সেখানে তারা প্রচুর পরিমাণে ধানের আবাদ করেছে, মাঠ থেকে তখনও তারা ধান কেটে নিয়ে যায়নি। আমি তখন ইউসেফজাই আফগানদের দেশ লুণ্ঠন করবো স্থির করেছি, সুতরাং অন্য ব্যাপারে মাথা গলানোর মত সময় ছিল না। দুপুরের নমাজের সময় সুরাপানের বৈঠক বসে। এই বৈঠকের সময় আমি খাজা কালানকে এই সব দেশে আমাদের অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে একখানা চিঠি লিখি। চিঠিটার এক পাশে এই কবিতাটি লিখে দিই:

'ওগো, মলয় পবন!
চকিত-নয়না হরিণ শিশুটিরে
বোলো দয়া করে,
অভিশাপ দিয়েছ তুমি মোরে,
যার ফলে মরু ও পাহাড়ে
আমি মরি ঘুরে।'

সেখান থেকে ভোরে রওনা হয়ে খাইবার গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে আলি মসজিদে গিয়ে থামি। দুপুরের নমাজের সময় মালপত্র পরে আসবে এই ব্যবস্থা করে আমরা এগিয়ে যাই এবং রাতের দ্বিতীয় প্রহরে কাবুল নদীর তীরে পৌঁছাই। সেখানে অল্প সময় নিদ্রা যাই। ভোর হতেই নদীতে হেঁটে পার হওয়ার মত জায়গা খুঁজে নিয়ে পার হয়ে যাই। আমার অগ্রগামী সেনাদের মারফৎ সংবাদ পাই যে আফগানরা আমাদের আসার খবর পেয়েই পালিয়েছে। যাহোক রাস্তা ধরে চলতে চলতে আবার সওয়াদ নদী পার হয়ে আফগানদের শস্যক্ষেত্রের মধ্যে উপস্থিত হই।

যে পরিমাণ শস্য পাব বলে আমাদের বিশ্বাস জন্মানো হয়েছিল—তার অর্ধেকও দেখলাম না। অর্ধেক কেন চার ভাগের এক ভাগও নয়। সুতরাং হাস্‌নাঘরকে শস্যভাণ্ডাররূপে সুরক্ষিত করার যে পরিকল্পনা ছিল সেটা ত্যাগ করতে হলো। যে সব প্রধানরা এই অভিযানের জন্য আমাদের প্ররোচিত করেছিল তারা লজ্জিত হলো। বিকেলের নমাজের কাছাকাছি সময় কাবুলের দিকের নদীটা পার হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি।

পরদিন ভোরে বেগদের উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ জারি করি। তারা এলে পরামর্শ সভায় যোগ দিতে তাদের আহ্বান করা হয়। পরামর্শের পর স্থির হয় যে আফ্রিদি আফগানদের দেশটা লুণ্ঠন করতে হবে, আর পেশোয়ার দুর্গকে এমনভাবে সজ্জিত করতে হবে যাতে লুঠের মালপত্র ও শস্য সেখানে সুরক্ষিত করে রাখা যেতে পারে। সেখানে একদল সৈন্য রাখারও সিদ্ধান্ত করা হয়।

এই সব ব্যাপার সুরাহার পর আমরা যাত্রা শুরু করে 'বিশ্বাস-উদ্যানে' গিয়ে পৌঁছাই। এই ঋতুতে বাগানটি ফলে ফুলে শোভা পাচ্ছিল। গাছে লাল রঙের ডালিম ঝুলছিল। কমলালেবুর গাছ সবুজ রং নিয়ে যেন আনন্দে হাসছে। অসংখ্য কমলালেবুতে গাছগুলো ভরে আছে। ভাল জাতের কমলালেবু তখনও পাকেনি। এখানকার ডালিমগুলো বেশ ভাল বটে কিন্তু আমাদের দেশের মত অত সুন্দর নয়। এবার এই বাগান দেখে যে রকম আনন্দ পেয়েছি এমনটি কিন্তু আগে হয়নি। যে তিন চার দিন আমরা এই বাগানে ছিলাম আমাদের শিবিরের সকলেই প্রচুর পরিমাণে ডালিম খেয়েছে।

উদ্যান থেকে বেরিয়ে এলাম। এখানে আমরা দিনের প্রথম প্রহর পর্যন্ত ছিলাম। নানা লোককে কমলালেবু বিতরণ করি। শা হাসানকে দুটো গাছের কমলা দিই। বেগদের কাউকে একটা গাছের, কাউকে দুটো গাছের কমলালেবু দেওয়া হয়। শীতকালে লেমঘানের ভিতর দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা থাকায় জলাশয়ের ধারের প্রায় কুড়িটা কমলালেবু গাছের ফল আমার ব্যবহারের জন্য রাখার ব্যবস্থা করি। এই দিনই আমরা গন্দামাকে পৌঁছে যাই।

পরদিন সকালে আমরা জগদালিকে গিয়ে উপস্থিত হই। সন্ধ্যার নমাজের সময় আমাদের সুরাপান বৈঠক বসে। আমার অনেক সভাসদ এই সময় উপস্থিত ছিল। উৎসবের শেষে গাদাই মহম্মদ খুবই বাচাল এবং

ব্যবহারে বিরক্তিজনক হয়ে উঠেছিল। সে মাতাল হয়ে যে বালিশে হেলান দিয়ে আমি বিশ্রাম করি সেই বালিশে শুয়ে পড়তেই তাঘাই তাকে সেখান থেকে বের করে দেয়।

ভোর হওয়ার আগেই সেখান থেকে রওনা হয়ে বারিক নদীর ধারের গ্রামগুলি পর্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করি। অনেক তুরাক গাছ সুন্দর ফলে শোভা পাচ্ছিল। আমরা এই জায়গায় থামি। 'ইউলকেরান' নামে একটা খাবার দিয়ে মধ্যাহ্নের আহার শেষ করে এখানকার শস্যসম্পদের প্রাচুর্যকে সম্মানিত করার জন্য সুরাপান চলতে থাকে। আসবার সময় রাস্তায় একটা ভেড়া পাওয়া গিয়েছিল। আমার লোকেরা সেই ভেড়া জবাই করে তার কিছুটা মাংস ছাড়িয়ে নিয়ে রান্না করে। ওক গাছের ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে উৎসব পালন করা হয়।

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে না পড়া পর্যন্ত আমরা এইখানে সুরাপান চালিয়ে যাই, তারপর আবার যাত্রা শুরু করি। যারা এই সুরাপানের দলে ছিল তার সবাই সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে পড়েছিল। সৈয়দ কাশিম এমন মাতাল হয় যে তার দু'জন ভৃত্য তাকে ঘোড়ার উপর বসিয়ে অতি কষ্টে শিবিরে আনতে পেরেছিল। দোস্ত মহম্মদের নেশাও এমন জোর হয়েছিল যে আমিন এবং আর যারা তার সঙ্গে ছিল, নানা কসরৎ করেও তাকে ঘোড়ায় ওঠাতে পারেনি। তার মাথায় অনেক জল ঢালা হলো, কিন্তু কোনও ফল হলো না। এই সময়ে একদল আফগানকে অদূরে দেখা গেল। ঘোর মাতাল অবস্থায় আমিন গম্ভীরভাবে এই মত প্রকাশ করলো যে তাকে এই অবস্থাতেই এখানে ফেলে রাখা ভাল—যাতে সে শত্রুর হাতে পড়তে পারে। তার মাথাটা শত্রুরা কেটে নিয়ে গেলেই খুব ভাল হবে। যা হোক, আর একবার চেষ্টা করে তারা কোনও রকমে ঘোড়ার পিঠে ছুঁড়ে ফেলে ঘোড়া চালিয়ে তাকে দূরে নিয়ে আসে।

মাঝরাতে আমরা কাবুলে পৌঁছে গেলাম। আমি একা এগিয়ে গিয়ে কাবিল বেগের সমাধির নিকট এসে প্রথম এক পেয়ালা সুরাপান করি। দলের লোকজন একে একে সেখানে এসে হাজির হয়। সূর্যের তাপ বেড়ে উঠলে আমরা বেগুনি-বাগানে বিশ্রামের জন্য যাই। সেখানে একটা জলাশয়ের ধারে মদের পেয়ালা নিয়ে বসে যাই। দুপুরে আমরা একটু ঘুমিয়ে নিই। দুপুরের নমাজের পর আবার আমরা সুরাপান করতে বসি। বিকালের উৎসবে আমি টেংরি কুলি বেগ ও মেহেন্দির হাতে সুরার পেয়ালা

তুলে দিই—যা আগে আমি কখনও করিনি। রাতের নমাজের সময় আমি স্নানশালায় পৌঁছিয়ে সেখানেই রাতটা কাটিয়ে দিই।

রবিবারে ফটকের উপরের ছোট ছবি-ঘরে এক বৈঠক বসে। ঘরটা খুব ছোট হলেও আমাদের দলে লোক ছিল ষোলো জন। পরদিন শস্যের ফলন কেমন হয়েছে আমি দেখতে যাই। এই দিন আমি ভাং খাই। সে রাতে খুব বৃষ্টি হয়। অধিকাংশ বেগ এবং সভাসদ—যারা আমার সঙ্গে ছিল—আমার তাঁবুতেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। তাঁবুটা খাটানো হয়েছিল বাগানের মাঝখানে।

পরদিন সকালে সেই তাঁবুতে সুরাপান বৈঠক বসে। রাত্রি পর্যন্ত আমাদের মদ খাওয়া চলে। পরদিন ভোরেও এক পেয়ালা সুরাপান করে মাতাল হওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়ি। দুপুরের নমাজের সময় ইস্তালিফ ত্যাগ করে রাস্তাতেই ভাং খাই। এদিকে ফসলের অবস্থা খুব ভাল ছিল। শস্যক্ষেত্রের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে আমার সঙ্গীদের কয়েকজন—যারা মদ খেতে খুবই পটু তারা—আর একটা সুরাপান বৈঠকের আয়োজন করার মতলব করছিল। আমি যদিও ভাং খেয়েছিলাম, শস্যের অসাধারণ প্রাচুর্য দেখে যে সব গাছে পর্যাপ্ত ফল ধরেছিল সেই সব গাছের নীচে বসে মদ খাওয়া শুরু করি। সে জায়গাতেই রাত্রের নমাজের সময় পর্যন্ত এই বৈঠক চলতে থাকে। মোল্লা মহম্মদ খালিফা সেইখানে পৌঁছে যেতেই তাকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাই। আবদাল্লা খুব মাতাল হয়ে পড়ায় এমন একটা মন্তব্য করলো যেটা খালিফাকে আঘাত করে। মোল্লা মহম্মদ সেখানে উপস্থিত আছে সে কথা বিস্মৃত হয়ে সে এই কবিতাটি আবৃত্তি করে :

'পরীক্ষা তুমি যাকেই করো,
হোক সে ছোট হোক সে বড়,
দেখবে তুমি নিজের চোখেই,
একই ক্ষতে ভুগছে সবাই।'

মোল্লা মহম্মদ মদ খায় না। কবিতাটি লঘুভাবে আবৃত্তি করার জন্য সে আবদাল্লাকে ভর্ৎসনা করলো। আবদাল্লা তার বিচারশক্তি ফিরে পাওয়ার পর খুবই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। সে তারপর থেকে সারা সন্ধ্যাটা খুব মোলায়েম ও মিষ্ট ভাষায় কথাবার্তা বলতে লাগলো।

১৬ই বৃহস্পতিবারে আমি বেগুনি-বাগানে ভাং খাই। আমার কয়েক-জন বন্ধুস্থানীয় সহচরকে সঙ্গে নিয়ে একটা নৌকায় চড়ি। হুমায়ুন এবং কামরাণও আমাদের সঙ্গে ছিল। হুমায়ুন খুব সুন্দর নিশানা করে একটা পানকৌড়ি শিকার করে।

প্রায় দুপুরবেলায় আবার আমরা ঘোড়ায় চড়ি। সহিস ও ভৃত্যদের বিদায় করে দিয়ে একটা গুপ্ত জলপথের ধারে পৌঁছে যাই। তারপর আমরা ভাটিখানার পেছন দিক দিয়ে রাতের প্রথম প্রহরের শেষের দিকে তারদি বেগের জলনালার কাছে পৌঁছে যাই। তারদি বেগ আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। আমি খুব ভালভাবেই জানতাম যে তারদি বেগের চিন্তাহীন শপথের কথা এবং এও জানতাম যে সুরাপাত্র হাতে নিতে সে অপছন্দ করবে না। আমার সঙ্গে যে টাকা ছিল তা তার হাতে তুলে দিয়ে বল্‌লাম যে কয়েকজন ফুর্তিবাজ সহচরের সঙ্গে আমি আমোদ-করতে চাই। সে যেন মদ এবং আনুসঙ্গিক জিনিষপত্র কিনে নিয়ে আসে।

মদ আনতে তারদি বেগ বেরিয়ে গেল। তারদি বেগের একজন ক্রীতদাসকে আমার ঘোড়াটাকে মাঠে ঘাস খাওয়াতে পাঠালাম। আমি জলাশয়ের পেছনে একটা উঁচু মাটির ঢিবির উপর বসে পড়ি। রাতের প্রথম প্রহরে প্রায় নয়টায় তারদি বেগ এক কলসী মদ নিয়ে এলো। আমরা সুরাপাত্র নিয়ে বসে গেলাম। তারদি বেগ যখন মদ নিয়ে আসছিল তখন মহম্মদ কাশিম ও শাহজাদা তার উদ্দেশ্য আন্দাজে বুঝে নিয়ে তার পিছু পিছু ধাওয়া করে। তারা কিন্তু বুঝতে পারেনি যে আমার আদেশেই সে মদ আনছে। আমাদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানাই। তারদি বেগ আমাকে জানায় যে হুল-হুল আমাদের সঙ্গে মদ খেতে চায়। আমি বল্‌লাম—'স্ত্রীলোককে মদ খেতে আমি কখনও দেখিনি। বেশ, তাকে আমাদের দলে যোগ দিতে বল।' সে শাহি নামে একজন সাধু লোককেও ডেকে আনে। সে লোকটা বাঁশী বাজায়।

আমরা জলাশয়ের পিছনের উঁচু জমির ওপর বসে সান্ধ্য নমাজের সময় পর্যন্ত মদ্যপান করতে থাকি। তারপর আমরা তারদি বেগের বাড়ীতে এসে মোমবাতির আলোয় রাতের নমাজের সময় পর্যন্ত সুরাপান চালিয়ে যাই। আমাদের এই উৎসবটা খুবই আমোদজনক ও নির্দোষ হয়েছিল।

আমি শুয়ে পড়লাম। আমার অন্যান্য সঙ্গীরা রাতের শেষ যাম ঘোষণা

করে দামামা না বাজা পর্যন্ত সুরাপান চালিয়েছিল। হুল-হুল মত্ত অবস্থায় আমার কাছে এসে নানা উৎপাত শুরু করে দেয়। আমি যেন খুব মাতাল হয়ে পড়েছি এই ভান করে শয্যায় শুয়ে পড়ি। এই ছলনার আশ্রয়ে সে রাতে তার হাত থেকে উদ্ধার পাই।

আমি একাই বেরিয়ে পড়বো এই ইচ্ছা করে ওদের কাউকে না জানিয়ে ঘোড়ায় চড়ার আয়োজন করি। কিন্তু ওরা আমার মতলব ঠিক পাওয়ায় আমি কৃতকার্য হতে পারিনি। ভোরের দামামা বেজে উঠলে আমি ঘোড়ায় উঠি। তারদি বেগ ও শাহজাদাকে আমার সঙ্গী হতে বললে তারাও ঘোড়ায় উঠে পড়ে। প্রভাতী নমাজের সময় আমরা ইস্তালিফে পৌছে যাই। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি ভাং খাই। তারপর শস্যের অবস্থা দেখার জন্য আমরা ঘুরে বেড়াতে থাকি। সূর্যোদয়ের সময় আমরা ইস্তালিফের উদ্যানে গিয়ে থামি। সেখানে আঙুর খাই। তারপর আতামিরের বাড়ীতে গিয়ে ঘুমাই।

আমরা যখন নিদ্রায় মগ্ন, তখন আতামির আমাদের অভ্যর্থনার জোগাড় করে এক কলসী মদ ঠিক করে রাখে। মদটি খুবই উপাদেয় ছিল। কয়েক পেয়ালা পান করে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠি। দুপুরের নমাজের সময় একটা সুন্দর উদ্যানে গিয়ে থামি। সেখানে আমাদের আমোদ বৈঠক বসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমিন আমাদের সঙ্গে যোগদান করে। রাতের নমাজের সময় পর্যন্ত আমরা সুরাপান চালিয়ে যাই।

পরদিন প্রাতর্ভোজনের পর ইস্তারঘাচের নীচে রাজ-উদ্যানের চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। একটা আপেল গাছে অনেকগুলো ফল ধরেছে। কতকগুলো শাখায় পাঁচ ছয়টা পাতা বিচ্ছিন্নভাবে তখনও রয়েছে। এমন সুন্দর যে কোনও চিত্রকরের অশেষ নৈপুণ্য থাকলেও এই চিত্রটি ঠিকভাবে তুলি দিয়ে আঁকার চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

দুর্গে পৌছে সুরাপান উৎসবের আয়োজন করি। এই বৈঠকের নিয়ম ছিল যে কেউ মদ খেয়ে মাতাল হলেই তাকে সে স্থান ত্যাগ করতে হবে—আর তার জায়গায় আর একজনকে নিমন্ত্রণ করে আনা হবে।

॥ ১৯ ॥

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের আরও ঘটনাবলী

কুলবের নীচের পাহাড়ে আমরা অনেকগুলো হরিণ শিকার করি। আমার আঙ্গুলে ব্যথা হওয়ার পর থেকে আমি এ পর্যন্ত তীর ছুঁড়িনি। এই-দিন তীর ছুঁড়ে একটা হরিণের কাঁধের হাড় বিদ্ধ করি। শরটি আধা-আধি বিঁধে যায়। বিকেলের নমাজের সময় একটা ভেলায় চড়ি। সেখানেও সুরাপান চলে। সন্ধ্যার নমাজের পর ভেলা থেকে নেমে তাঁবুতে গিয়ে মদ নিয়ে বসে যাই।

পরদিন ভোরে আবার ভেলায় উঠে ভাং খাই।

শুক্রবারে পুনরায় কিছুদূর অগ্রসর হতেই অনেকগুলো তিতির পাখী চোখে পড়লো। রাতেও সুরাপান চললো।

একটা ভেলায় চড়ে কমলালেবুর বাগানের কাছে এসে ডাঙ্গায় নামি। কমলালেবুগুলো প্রায় পীত রং ধারণ করতে চলেছে। আর সবুজরঙা গাছগুলোও চমৎকার দেখাচ্ছে। এই কমলালেবুর বাগানে আমরা পাঁচ ছয় দিন অবস্থান করি।

স্থির করেছি যে চল্লিশ বছর বয়সেই আমি মদ খাওয়া একেবারে ছেড়ে দেব। আমার চল্লিশ বছর বয়স পূর্ণ হতে এক বছরের কম বাকি। তাই এ সময়ে আমি খুব বেশী মদ খেতে থাকি। মোল্লা ইয়ারেক একটা সুর বাজালো—যে সুর ও তাল তার নিজের তৈরী। সুরটা খুবই সুন্দর। আমি এসব বিষয়ে কোনও মনোযোগ দিইনি। আমার খেয়াল হলো যে আমাকেও কিছু একটা রচনা করতে হবে। এই ঘটনায় আমার মনে 'চারঘা'র তালে একটা গীত রচনা করার কথা জেগে উঠ্‌লো। সে কথা পরে সময়মত উল্লেখ করা যাবে।

সেদিন সুরার প্রথম পেয়ালা হাতে নিয়ে আমোদ করে বললাম—যে কেউ 'তাজিক' সঙ্গীত গাইতে পারবে—তাকেই একটা বড় পাত্রপূর্ণ সুরা পান করতে দেওয়া হবে। এর ফলে অনেকেই বড় পাত্রপূর্ণ সুরা পান করতে পায়।

সকাল নয়টার সময় আমাদের বৈঠকে যোগদানকারী যে কয়জন 'তাল' গাছের নীচে বসেছিল তারা প্রস্তাব করলো যে যারা তুর্কি গান গাইতে

পারবে তাদেরও বড় পাত্র ভর্তি সুরা দেওয়া হবে। কেউ কেউ তুর্কি সঙ্গীত গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরা দাবী করলো এবং তারা তা পেল। সূর্য যখন মাথার উপরে তখন আমরা কমলালেবুর গাছের দিকে গেলাম এবং খালের ধারে বসে মদ খেলাম।

কিছুদিন পরে সকালে অনেক অপরাধে অপরাধী খামজে খানকে—যে অনেক নির্দোষ লোক হত্যা করে রক্তের স্রোত বইয়েছে, মৃত্যুদণ্ড দিলাম। এই দণ্ড কার্যে পরিণত করার জন্য অত্যাচারিতদের হাতেই তাকে সমর্পণ করলাম—যাতে তারা বিধিমত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে।

কোরাণের কিছু অংশ পাঠ করার পর আমি কাবুলে ফিরে আসি। এখানে এসে ঘোড়াদের দানা খাইয়ে এবং নিজেরাও তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে আমরা আবার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলাম।

[আত্মচরিতে আবার বিরতি। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ ভারতে দ্বিতীয় অভিযানের শেষ থেকে পঞ্চম অভিযান আরম্ভ পর্যন্ত ঘটনাগুলির কথা আত্মচরিতের পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় না। ভারতের বিরুদ্ধে বাবরের তৃতীয় অভিযান ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়।

যে সব আফগানরা বাবরের সঙ্গে যোগ দেয় এবং যারা পরে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাদের মধ্যে অনেককে বাবর হত্যা করেন। কৃষক-সমাজ তাতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে—কারণ এই সব আফগানরা তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছিল। বাবর শিয়ালকোট পর্যন্ত অগ্রসর হন। এখানকার অধিবাসীরা আত্মসমর্পণ করে তাদের সম্পত্তি রক্ষা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু সৈয়দপুরের অধিবাসীরা প্রতিরোধ করায় তাদের তরবারির মুখে প্রাণ দিতে হয়।

এই সময় বাবর সংবাদ পান যে কান্দাহারের দিক থেকে তাঁর রাজ্য আক্রান্ত হয়েছে। এই ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে বিদেশী রাজ্য জয় করার চেষ্টার আগে নিজের রাজ্য সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। তিনি তখন বাদাক-সান প্রদেশের শাসনভার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনের হাতে সমর্পণ করেন। তার পর তাঁর ভারত আক্রমণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করার শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হয়।

দিল্লীর সাম্রাজ্য তখন এমন ছিল না যেমন পরে বাবরের পৌত্র আকবরের সময় হয়েছিল। কিছুকাল পূর্ব থেকেই ভারতের অনেক স্থান আফগান আক্রমণকারীদের হাতে গিয়ে পড়েছিল। সম্রাট ইব্রাহিমের রাজ্যশাসন

পদ্ধতি খুবই অসন্তোষজনক ছিল। তিনি আফগান আমীরদের আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তারা অনেকেই গঙ্গার অপর পারে চলে যায় এবং বদাউন থেকে বিহার পর্যন্ত সব প্রদেশ বিদ্রোহীদের কবলিত হয়। বঙ্গদেশে তখনও স্বাধীন নরপতি ছিল, মালব ও গুজরাটেও তাই। হিন্দু রাজপুত রাজারা রাণা সঙ্গকে দলের প্রধান ঠিক করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। পাঞ্জাব তখন দৌলত খাঁয়ের অধীন ছিল। তার দুই পুত্র গাজি খাঁ ও দিলওয়ার খাঁ নিজেরাও আফগান হওয়ায় ভারত সাম্রাজ্যের অন্য অংশের আফগান আমীরদের অদৃষ্ট দেখে সম্রাট ইব্রাহিমের আয়ত্তের বাহিরে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল। তারা বাবরের নিকট দূত পাঠিয়ে তাদের আনুগত্য জানায় এবং তাদের উদ্ধারের জন্য ভারত আক্রমণের প্ররোচনা দেয়। বাবরের মন নেচে ওঠে, কারণ তাঁর অন্তরের অভিলাষ পূরণের সুযোগ এই আহ্বান এনে দিল। বাবর চতুর্থবার হিন্দুস্থানে প্রবেশ করলেন। যে সব আফগানরা তখনও সম্রাট ইব্রাহিমের স্বার্থ দেখছিল তারা লাহোরে বাবরের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করলো। তারা পরাজিত হয়। বাবরের সৈন্য লাহোর শহর ও বাজার ভস্মীভূত করে ফেলে।

এই যুদ্ধের ফলে দৌলত খাঁর ক্ষমতা খুব বেড়ে যায়। কারণ সেই বাবরকে ভারতে আহ্বান করে আনে। সে তার দুই পুত্র গাজি খাঁ ও দিলওয়ার খাঁ সহ তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়।

যাহোক বাবরকে দিয়ে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সে মতলব আঁটতে থাকে—কি করে বাবরের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সে শঠতা করে বাবরকে জানায় যে একদল সৈন্য তাঁর অগ্রগতি রোধ করার জন্য অপেক্ষা করছে, সুতরাং তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেবার জন্য বাবর যদি একদল সৈন্য আগেভাগে পাঠিয়ে দেন তাহলে খুব ভাল হয়। দৌলত খাঁর উপদেশ মত কাজ করার জন্য বাবর প্রস্তুত হচ্ছিলেন—কিন্তু দিলওয়ার খাঁ তাঁকে গোপনে জানিয়ে দেয় যে তার বাবার উপদেশটা বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্ত মাত্র। বাবর কথাটা বিশ্বাস করেই হোক অথবা বিশ্বাস করার ভান করেই হোক দৌলত খাঁ ও গাজি খাঁকে বন্দী করেন। পরে অবশ্য তারা মুক্তি পেয়ে বাবরের কাছ থেকে পালিয়ে যায়। তাদের সম্পত্তি তখন দিলওয়ার খাঁর হস্তগত হয়। এই সব ব্যাপারের পর বাবর আর দিল্লীর দিকে এগিয়ে অভিযান চালিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে করলেন না। তিনি লাহোরে চলে এলেন। তারপর শতদ্রু নদী

পার হয়ে কাবুলে প্রত্যাবর্তন করলেন। সে যাই হোক, সিন্ধু নদের অপর দিকেও স্থায়ী ঘাঁটি করতে তিনি সক্ষম হলেন। এইবারের অভিযানে সম্রাট ইব্রাহিমের ভাই সুলতান আলাউদ্দিন তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। খুব সম্ভবতঃ বাবর তার মনে এই আশার সঞ্চার করতে পেরেছিলেন যে তাকেই তিনি হিন্দুস্থানের সম্রাট করে দেবেন।

বাবর সিন্ধুনদের ওপারে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৌলত খাঁ ও গাজি খাঁ তাদের পার্বত্য গুপ্তস্থান থেকে নেমে এসে দিলওয়ার খাঁকে বন্দী করে। তারপর দ্রুত অগ্রসর হয়ে আলাউদ্দিনকে যুদ্ধে পরাজিত করে। আলাউদ্দিন কাবুলে পলায়ন করে।

দৌলত খাঁ শীগগিরই জানতে পারে যে আলাউদ্দিন কাবুলে উপস্থিত হলে বাবর তাকে সমাদরে গ্রহণ করেছেন। বাবর বাল্খের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে সেই দিকে যাওয়ার জন্য আলাউদ্দিনকে হিন্দুস্থানে পাঠালেন। তাঁর সেনাপতিদের এই নির্দেশ দিলেন যে তারা আলাউদ্দিনের সঙ্গে দিল্লী অভিযানে যেন সর্ব প্রকারে সাহায্য করে যাতে সে দিল্লীর মসনদে বসতে পারে। চতুর দৌলত খাঁ এই সংবাদ শুনে তৎক্ষণাৎ আলাউদ্দিনকে চিঠি লিখে তার কৃতকার্যতার জন্য সম্বর্দ্ধনা জানায় এবং সে নিজেও তাকে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

এই দুইজনের মধ্যে এক সন্ধি হয়—যার ফলে সমগ্র পাঞ্জাব দৌলত খাঁর ভাগে পড়ে অর্থাৎ যে প্রদেশটা এতদিন বাবরের অধীন ছিল। বাবর এই কথা শুনে স্থির করলেন যে এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করায় আলাউদ্দিনকে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন তার আর কোনও মূল্য রইলো না। দৌলত খাঁর সঙ্গে আলাউদ্দিনের ঐ ভাবে সন্ধি হওয়ায় তাঁর সঙ্গে সমস্ত চুক্তি নাকচ হয়ে গিয়েছে।

আলাউদ্দিনের সৈন্যরা যখন দিল্লীতে উপস্থিত হয় তখন তার অশ্বারোহী সৈন্যসংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার।

দিল্লী অবরোধ, আলাউদ্দিনের পরাজয় এবং পরবর্তী ঘটনাগুলি বাবর নিজেই আত্মচরিতে বিবৃত করেছেন। আত্মচরিত পুনরায় শুরু হয়েছে পঞ্চম ও শেষবার হিন্দুস্থান আক্রমণের বিবরণ দিয়ে।]

॥ ২০ ॥

১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের শফর মাসের ১লা তারিখ শুক্রবারে যখন রবি ছিলেন ধনুরাশিতে—আমি হিন্দুস্থান আক্রমণের অভিযানে বেরিয়ে পড়ি। সম্ভ্রান্ত বা সাধারণ, ভাল বা মন্দ, ভৃত্য অথবা ভৃত্য নয়—এমন লোক দিয়ে তৈরা বাহিনীর লোকসংখ্যা বারো হাজার।

বাগ-ই-ওয়াফাতে এসে আমরা থামি। এখানে হুমায়ুন ও তার সৈন্য-বাহিনীর জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করতে বাধ্য হই। আমি বারংবার এই স্থানটির সীমা, বিস্তৃতি, এর সৌন্দর্য ও মহিমার কথা আমার স্মৃতি-কথাতে বলেছি। যে কেউ এই জায়গা দেখবে তার এই স্থানের রমণীয়তার কথা স্বীকার না করে উপায় নাই। যে কয়দিন আমরা এখানে অপেক্ষা করেছি ততদিন প্রত্যেক বৈঠকেই প্রচুর পরিমাণে সুরাপান করেছি—প্রতিদিন ভোরের পেয়ালাও বাদ দিইনি। যখন সুরাপান চলতো না, তখন ভাং খাওয়ার বৈঠক বসতো।

ধার্য সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও হুমায়ুন না আসায় তাকে কটু ভাষায় চিঠি লিখি। কর্তব্যচ্যুতির জন্য তার কৈফিয়ৎ তলব করি এবং তাকে গাল মন্দ দিতে থাকি। অবশেষে হুমায়ুন এসে পৌঁছায়। তার এই দীর্ঘ বিলম্বের জন্য তাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে ভৎর্সনা করি। বুধবারে সেখান থেকে আবার যাত্রা শুরু হয়। আমি একটি ভেলায় চড়ে নদীর ভাটিতে এগিয়ে যাই। সর্বক্ষণেই সুরাপান চালিয়ে আমরা কোস্‌-গুমবেজে পৌঁছাই। সেখানে ভূমিতে অবতরণ করে শিবিরে যাই।

দু' একদিন পর যখন আমরা বেক্‌রামে থেমেছিলাম, সেই সময় আমি জ্বরে আক্রান্ত হই। সঙ্গে প্রবল কাসি। যখন কেসেছি গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। আমার এই অসুস্থতার কারণ কি তা জানতাম। এটা যে আমাব কোনও পাপের শাস্তি তাও বুঝতে পেরেছিলাম।

এর আগে আমার মাথায় ভাল বা মন্দ, আমোদ বা ঠাট্টার যে ভাবই এসেছে—সেই ভাবটাই খুব হালকা স্ফূর্তির জন্য কবিতায় রূপ দিয়েছি। সেই কবিতা কদর্য বা ঘৃণ্য ভাবের হলেও আমি লিখতে কোনও লজ্জা বোধ করিনি। বর্তমান মনের অবস্থায় যখন আমি কবিতার কয়েকটি পদ লিখে ফেলেছি আমার মনে তখন এই চিন্তার উদয় হলো এবং আমার অন্তর

এমন অনুশোচনায় ভরে উঠলো যে মানুষের যে রসনা মহিমা ও গরিমার বিষয়বস্তু বার বার আবৃত্তি করে যেতে পারে, সে কেন এই রকম বিকৃত রুচির কবিতা আবৃত্তি করবে। আমি মন-মরা হয়ে ভাবতে লাগলাম যে যার অন্তর মহান ভাবধারায় পূর্ণ হয়ে উচ্চ স্তরে উঠে যায় ৮. আবার কি করে নীচ এবং কদর্য চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে মহৎ চিন্তাগুলোকে দূরে সরিয়ে দেয়। সেই সময় থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করি যে শ্লেষাত্মক কিংবা কুরুচিপূর্ণ কবিতা আর লিখবো না। আগে যখন আমি কবিতা লিখে আবৃত্তি করেছি তখন কিন্তু আমি কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিনি এবং এ কথাও তখন মনে আসেনি যে এই ভাবের কবিতা লেখা কতটা নিন্দনীয়।

(আরবী) 'নিজ প্রতিশ্রুতির কথা,
যে জন অনায়াসে যায় ভুলে।
সেই প্রতিশ্রুতি মূর্ত হয়ে তাহারই জীবনে,
প্রতিশোধ লবে তুলে।
যে লোক সত্যের আশ্রয়ী,
অঙ্গীকার রক্ষা করে সেই জন।
আল্লা তার দিকে মুখ তুলে চান,
অসীম করুণা তাঁর করেন বর্ষণ।'

(তুর্কী) কবিতার ভাষা মোর !
কিবা করি বল দেখি
তোমায় নিয়ে।
শোণিতে দিয়েছ তুমি
বিষ মিশিয়ে।
ব্যঙ্গের ধুয়া ধরি
কবিতা রচনা করি'
কতদিন পাইবে আমোদ ?
এতো শুধু মিছে বলা,
অপবিত্র ভাবে চলা,
এতো নহে বিশুদ্ধ প্রমোদ।
যদি তুমি বুঝে থাক
এ পাপ থেকে দূরে রাখ।

বল্‌গা তোমার টেনে ধর,
এ জমিন্‌ ছেড়ে দূরে সর।

(আরবী) 'আত্মার পরে করেছি অত্যাচার।
যদি তুমি নাহি কর বিভু, মোরে ক্ষমা !
অভিশপ্তের সংখ্যা বাড়িবে শুধু
দুঃখের মোর নাহিকো রহিবে সীমা।'

অনুতপ্ত হয়ে এখন থেকে আমি আত্মসংযম করি। প্রতিজ্ঞা করলাম—কোনও রকম অলস চিন্তার আমি প্রশ্রয় দেব না। কোনও কদর্য বিষয় নিয়ে আমোদ করবো না, তা যদি করি তাহলে আমার কলম ভেঙ্গে ফেলবো। বিদ্রোহী-নফরের ওপর সর্বশক্তিমান আল্লার সিংহাসন থেকে এইরূপ অন্তর-শুদ্ধির আদেশ তাঁর অদ্ভুত করুণারই ফল। আল্লার যে ভৃত্য তাঁর নির্দেশ এবং শাস্তির উপকারিতা অনুভব করে সেই জানে—সেটা শাস্তি নয়, তাঁর অসীম কৃপা।

কোস্‌-গুমবেজ থেকে সৈন্য চালনা করে আলি মসজিদে এসে থামি। এখানে শিবির স্থাপনের জায়গা সঙ্কীর্ণ হওয়ায় আমি কাছাকাছি একটা উঁচু টিলার ওপর আমার থাকবার তাঁবু খাটাই। সৈন্যরা সমতলভূমিতেই তাদের শিবির ফেলে। যে পাহাড়ের ওপর আমার শিবির খাটানো হয় সেখান থেকে চার পাশের দৃশ্য বেশ ভালভাবে দেখা যায়। নীচের শিবির-গুলিতে যে আগুন জ্বালানো হয়েছে তার আভা খুবই উজ্জ্বল আর সুন্দর দেখাচ্ছিল। এই রকম দৃশ্য দেখার জন্য যখনই আমি এইখানে থেমেছি—তখনই মনের উল্লাসে আমি প্রচুর সুরাপান করেছি।

সূর্য ওঠার আগেই ভাং খাই, তারপর আবার যাত্রা শুরু করি। সেদিন আমি উপবাস করেছিলাম। বেকরামের কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত আমরা চলতে থাকি। সেখানে পৌছিয়েই গণ্ডার শিকার করতে বেরিয়ে যাই। সিয়া-আব নদী পেরিয়ে ভাটির দিকে একটা জায়গা শিকারের জন্য ঘিরে ফেলা হয়। আমরা কিছুদূর এগুতেই একজন লোক এসে জানালো যে একটা গণ্ডার ছোট বনে ঢুকেছে। লোকেরা বন ঘিরে ফেলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা সেই বনের দিকে গেলাম এবং চারিদিকে ঘিরে ফেল্লাম। হল্লা শুরু করতেই গণ্ডারটা বন থেকে ছুটে বেরিয়ে সমতলভূমিতে এসে দৌড়ে পালালো।

হুমায়ুন আর তার সঙ্গীরা আগে কখনও গণ্ডার না দেখায় খুবই আমোদ অনুভব করলো। তারা গণ্ডারকে অনুসরণ করে অনেকগুলি তীর নিক্ষেপ করে শেষটায় তাকে ধরাশায়ী করলো। গণ্ডারটা কিন্তু কোনও মানুষ বা ঘোড়াকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেনি। হুমায়ুন আর তার দল আর একটা গণ্ডারও শিকার করে।

আমি অনেক সময় ভাবতে চেষ্টা করেছি যে হাতী আর গণ্ডারকে যদি মুখোমুখি আনা যায় তাহলে তারা পরস্পর কেমন ব্যবহার করে দেখতে হবে। হাতীর মাহুতরা হাতীদের নিয়ে আসতেই একটা হাতী গণ্ডারের সামনা সামনি পড়ে গেল। মাহুতরা হাতী তার সামনা সামনি নিয়ে আসতেই গণ্ডারটা ভয় পেয়ে অন্যদিকে ছুটে পালালো।

মোটামুটি এই সংবাদ পাওয়া গেল যে গাজি খাঁ যুদ্ধের জন্য ত্রিশ চল্লিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেছে। আর বৃদ্ধ দৌলত খাঁ কোমরের দুই ধারে দুই খানি তলোয়ার ঝুলিয়ে অপেক্ষা করছে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে। আমার একটা চলতি কথা মনে পড়ে গেল। সেটা হচ্ছে এই—নয় জন বন্ধুর চেয়ে দশজন বন্ধু ভাল। কোনও সুবিধাজনক অবস্থাকেই হাতছাড়া করতে নেই। আমি বিবেচনা করে দেখলাম যে যুদ্ধে নেমে পড়ার আগে আমার সৈন্যবাহিনীর যে অংশ লাহোরে আছে তার সঙ্গে সংযোগ সাধন করাই আমাদের পক্ষে উচিত হবে। সেইজন্য দূত মারফৎ আমার উপদেশ সেখানকার আমীরদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তার পর দ্বিতীয়বার যাত্রা শুরু করে চেনাব নদীর তীরে পৌছিয়ে সেখানে শিবির সন্নিবেশ করলাম।

অশ্বপৃষ্ঠে আমি বাহ্‌লুলপুর রাজ্যের দিকেই এগিয়ে গেলাম এবং তার চারদিক বেশ ভাল ভাবেই পর্যবেক্ষণ করলাম। চেনাব নদীর তীরে এই রাজ্যের দুর্গ অবস্থিত। আমার জায়গাটা খুব পছন্দ হয়ে গেল। ঠিক করলাম যে শিয়ালকোটের জনসাধারণকে আমি এইখানে নিয়ে আসবো। আল্লার ইচ্ছা হলে যখনই আমি সুবিধা পাব আমার এই মতলব হাসিল করবো। আমি একটা নৌকা করে বাহ্‌লুলপুর থেকে শিবিরে ফিরে আসি। নৌকাতেই একটা আমোদ-বৈঠক বসে। কেউ সুরাসার, কেউ সুরা, আবার কেউ কেউ খেলো ভাং। রাতের নমাজের সময় নৌকা থেকে ডাঙ্গায় নামি। আমার শিবিরেও সে রাত্রে কিছু কিছু সুরাপান চলে। একদিন ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য সেই নদীর তীরেই থেকে যাই।

রবিয়ল মাসের ১৪ই তারিখ শুক্রবার আমরা শিয়ালকোটে পৌছে যাই।

যত বারই আমরা হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেছি তত বারই অগণিত জাট আর গুর্জর দলে দলে পাহাড় আর বন থেকে নেমে আসে ষাঁড় আর মোষ লুঠ করার জন্য। এই সব শয়তানরা এ দেশের জনসাধারণের অনেক দুঃখ কষ্টের কারণ। তারা এদের উপর অত্যাচার করার অপরাধে অপরাধী। এই দেশগুলো আগে বরাবর বিদ্রোহ করে এসেছে এবং অল্প রাজস্বই তারা আদায় দিয়েছে। বর্তমানে যখন আমি এই দেশ অধিকার করে নিয়েছি তখনও তারা সেই সাবেক চালেই চলতে আরম্ভ করলো। আমার দরিদ্র প্রজারা যখন শিয়ালকোট থেকে যাত্রা করে অর্ধনগ্ন ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় নানা দুঃখকষ্ট সহ্য করে আমার শিবিরের দিকে আসতে থাকে তখন তারা চলতি পথেই আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়। আমি অত্যাচারীদের খুঁজে বের করি ও তাদের মধ্যে দু' তিন জনকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে হুকুম দিই।

পরদিন সকালে আবার যাত্রা শুরু করে পার-সার-উরে গিয়ে থামি। এইখানে মহম্মদ আলি ও আরও কয়েকজন এসে আমাকে সম্মান জানায়। লাহোরের দিকে রাবি নদীর তীরে শত্রুপক্ষ শিবির স্থাপন করেছে। সেখানকার সংবাদ আনবার জন্য আমি একদল লোককে পাঠাই। রাতের তৃতীয় প্রহরের শেষে তারা ফিরে এসে সংবাদ দেয় যে তাদের আগমনের সংবাদ পাওয়া মাত্রেই শত্রুপক্ষের লোক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যে যার মত ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

দৌলত খাঁ একজন লোক পাঠিয়ে আমাকে সংবাদ দেয় যে গাজি খাঁ পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। যদি আমি দৌলত খাঁর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাকে অভয় দান করি, তাহলে সে আমার ক্রীতদাস হয়ে তার রাজ্য আমার হাতে তুলে দেবে। এই কথা শুনে আমি মির মিরাণকে তার ঠিক কি মনোভাব জানবার জন্য পাঠিয়ে দিই ও তাকে আমার কাছে আনবার জন্য বলে দিই। তার পুত্র আলি খাঁও তার সঙ্গে যায়। আমি এই বৃদ্ধ লোকটির অসৎ ব্যবহার এবং বোকামির ব্যাপারটা লোক-সমাজে প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য মিরাণকে এই আদেশ দিই যে দৌলত খাঁ যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তা হলে যে দুইখানি তরবারি সে কোমরের দুই ধারে ঝুলিয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে স্থির করেছিল—সেই তরবারি গলায় ঝুলিয়ে তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে। যখন ব্যাপারটা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে, তখনও দৌলত খাঁ নানা ছল চাতুরির আশ্রয় নিয়ে আমার সামনে আসতে বিলম্ব করেছে। যাহোক অবশেষে তাকে আমার

কাছে নিয়ে আসা হলো। তার গলায় ঝুলানো তরবারি দু'খানা সরিয়ে নিতে বল্‌লাম। আমাকে সম্মান দেখানোর জন্য নতজানু হতে সে বিলম্ব করছে দেখে আমার লোকদের তার পায়ে ধাক্কা দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে আমাকে সম্মান দেখাতে আদেশ করলাম। এইভাবে সম্মান দেখানো হয়ে গেলে তাকে আমার সম্মুখে আসন গ্রহণ করার জন্য বলি। আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলো তাকে হিন্দুস্থানী ভাষায় অক্ষরে অক্ষরে তর্জমা করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য হিন্দুস্থানী ভাষা জানে এমন একজন দোভাষী নিযুক্ত করি। তাকে বলেছিলাম—'আমি তোমাকে পিতৃস্থানীয় বলে সম্বোধন করেছি। তুমি আমার কাছে যে সম্মান বা শ্রদ্ধা আশা করতে পার তার চেয়েও তোমাকে বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছি। বেলুচিদের অত্যাচার ও অসম্মানের হাত থেকে তোমাকে এবং তোমার ছেলেদের আমি বাঁচিয়েছি। তোমার পরিবারবর্গ ও স্ত্রীলোকদের ইব্রাহিমের দাসত্ব থেকে আমি মুক্ত করেছি। তাতার খাঁ যে দেশগুলো অধিকার করে সাত লক্ষের ওপর রাজস্ব আদায় করতো সে দেশগুলোর অধিকার তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। তোমার আমি এমন কি অনিষ্ট করেছি, যাতে তুমি এইভাবে কোমরে দুইখানি তলোয়ার ঝুলিয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধে নামবার ইচ্ছা করে তোমার সৈন্যদের নিয়ে আমার রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছো?'

আমার কথা শুনে লোকটা হতভম্ব হয়ে কয়েকটা কথা উচ্চারণ করার চেষ্টা করলো বটে, কিন্তু তার কিছুই বোঝা গেল না। সত্যি কথা বলতে গেলে আমার এই নির্জলা সত্য কথাগুলোর উত্তরে তার কিই বা বলার ছিল। যাহোক, অবশেষে এই স্থির হলো যে সে এবং তার পরিবারবর্গ তার নিজ উপজাতিদের ওপর কর্তৃত্ব করবে এবং তাদের গ্রামগুলো তার অধিকারে থাকবে। কিন্তু অবশিষ্ট ভূসম্পত্তি থেকে সে বঞ্চিত হবে। আর মির মিরাণের শিবিরের কাছাকাছি তাদের থাকতে হবে।

প্রথম রবিয়ল মাসের ২২শে তারিখ শনিবারে দৌলত খাঁর দল যখন তাদের আত্মীয় পরিজন এবং আশ্রিতদের দুর্গের বাহিরে নিয়ে আসছিল, তখন তাদের ওপর কোনও খারাপ ব্যবহার না হয় সেটা দেখবার জন্য মিলওয়াত দুর্গকটকের উল্টোদিকে একটা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়েছিলাম। কয়েকজন বেগ যারা আমার কাছে ছিল তাদের দুর্গে প্রবেশ করে ওদের সমস্ত ধন সম্পত্তির দখল নিতে এবং সেগুলোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিই। যদিও শোনা গিয়েছিল যে গাজি খাঁ এই স্থান থেকে

পালিয়েছে—কিন্তু কেউ কেউ আবার বলতে লাগলো তাকে দুর্গের ভিতর দেখা গেছে। এইজন্য আমি কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং ভৃত্যকে ফটকের সামনে মোতায়েন করে এই নির্দেশ দিই যে কিছুমাত্র সন্দেহ হলেই তারা কোনও ব্যক্তিই হোক কিংবা কোনও জিনিসপত্রই হোক ভাল-ভাবে পরীক্ষা করে দেখবে যাতে কোনও ছল চাতুরি করে গাজি খাঁ না পালাতে পারে। কারণ, আমার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল তাকে বন্দী করা। তাদের আরও নির্দেশ দিই যে কোনও ধনরত্ন কিংবা মূল্যবান পাথর গোপনে নগরের বাহিরে পাচার করার চেষ্টা হলে তৎক্ষণাৎ যেন সেগুলো আটক করা হয়। দুর্গের ফটকের সামনে কতকগুলো সৈন্য দাঙ্গা আরম্ভ করতেই তাদের দমন করার জন্য কতকগুলি তীর নিক্ষেপ করি। হঠাৎ একটা তীর হুমায়ুনের শিক্ষককে বিদ্ধ করে। সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

দু' রাত্রি পাহাড়ের ওপর কাটিয়ে সোমবারে আমি দুর্গে প্রবেশ করে পর্যবেক্ষণ শুরু করি। গাজি খাঁর গ্রন্থশালা পরীক্ষা করে দেখতে পাই সেখানে অনেক মূল্যবান পুস্তক আছে। সেই পুস্তকের কতকগুলো হুমায়ুনকে দিই এবং কতকগুলো কামরাণের কাছে পাঠিয়ে দিই। কতকগুলো ধর্মসংক্রান্ত বইও সেখানে ছিল। কিন্তু প্রথম দেখে যতটা মূল্যবান মনে হয়েছিল ভাল করে দেখবার পর আর ততটা ভাল মনে হলো না।

দুর্গে আমি সারারাত ছিলাম। পরদিন সকালে শিবিরে ফিরে আসি। আমাদের এ ধারণাটা ভুল যে গাজি খাঁ দুর্গের মধ্যেই আছে। সেই ভীরু বিশ্বাসঘাতক পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। সঙ্গে নিয়েছে তার অল্প কয়েকজন অনুচর। তার বাবা, বড় ও ছোট ভাইদের, তার মাকে, তার বড় ও ছোট বোনদের সে মিলওয়াতেই ফেলে গিয়েছে।

'অবিশ্বাসী লোকটিরে
চিনে রাখ ভাল করে,
কখনও কি দেখিবে ও
সৌভাগ্যের মুখ ?
স্ত্রীপুত্র কন্যা ত্যাগী জন
আত্মসুখে রহে সে মগন,
ঈশ্বর তাহার প্রতি,
রহেন বিমুখ।'

খাজা কালান কতকগুলো উটের পিঠে মদের পাত্র বোঝাই করে গজনির মদ শিবিরে নিয়ে আসে। তার বাসস্থান ছিল দুর্গ ও শিবিরের মুখোমুখি একটা উঁচু টিলার ওপর। সেখানে আমাদের একটা স্ফূর্তির বৈঠক বসে। বৈঠকে কেউ বা খেল সুরা, কেউ বা খেল সুরাসার। এ রকম সুন্দর আড্ডা খুব কমই হয়।

সেখান থেকে যাত্রা করে মিলওয়াতের পাশ দিয়ে আরকেন্দের ছোট ছোট পাহাড় অতিক্রম করে আমরা 'দূনে' পৌঁছে যাই। হিন্দুস্থানী ভাষায় উপত্যকাকে 'দূন' বলে। সবচেয়ে মনোরম প্রবাহিনী এই উপত্যকার ভেতর দিয়ে গিয়েছে। এই উপত্যকাটি অতি সুন্দর। এর নদীর দু' পাশে শস্যক্ষেত্র। কোনও কোনও জমিতে এখানকার লোকেরা ধান বোনে। উপত্যকার মধ্য দিয়ে যে নদী বয়ে যাচ্ছে তার স্রোতের বেগ এমন যে তিন চারটি জাঁতাকল চালানো যায়। উপত্যকাটি তিন মাইল, এমন কি কোনও কোনও জায়গায় পাঁচ মাইল প্রশস্ত। এখানকার পাহাড়গুলো খুব ছোট। গ্রামগুলি পাহাড়ের ধারে ধারে অবস্থিত। যেখানে কোন গ্রাম নেই, সেখানে ময়ূর আর বাঁদরের বাস। এখানে মোরগ জাতীয় অনেক পাখীও দেখা যায় যেগুলো দেখতে গৃহপালিত মোরগের মত। তারা আকারেও ঐ রকম, তবে সাধারণতঃ এক রংয়ের।

গাজি খাঁয়ের কোনও সংবাদ না পাওয়ায় আমি এই আদেশ সকলের কাছে পাঠাই যে তার যেখানে থাকা সম্ভব সেখানেই তার সন্ধান করে এবং যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তাকে বন্দী করে আনতে হবে। ছোট ছোট পাহাড়খচিত এই উপত্যকায় কতকগুলি সুদৃঢ় দুর্গ আছে। উত্তর-পূর্ব দিকে একটি দুর্গ—নাম 'কোটিলা'। দুর্গটি পাহাড়ে ঘেরা—যার খাড়াই দেড়শ' ফুট। এই দুর্গের প্রধান ফটকে ষোলো ফুট পরিসর একটি জায়গা আছে যেটা টানা-সেতুর কাজে ব্যবহার করা হয়। এই সেতুটি দুইখানি লম্বা তক্তা দিয়ে তৈরী করা—যার উপর দিয়ে ওদের ঘোড়া ও সৈন্য পারাপার করে। পার্বত্য প্রদেশের দুর্গগুলির মধ্যে এই একটি—যেটাকে প্রতিরোধ করার জন্য গাজি খাঁ প্রস্তুত হয়ে সৈন্য সমাবেশ করে। আমার যে সৈন্যদল আক্রমণ চালানোর জন্য এদিকে এসেছিল তারা প্রবলভাবে আক্রমণ চালিয়ে প্রতিরোধ ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম করে এবং দুর্গটি প্রায় দখল করে ফেলে। কিন্তু তখন রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। দুর্গরক্ষী সৈন্যগণ এই সুযোগে দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। কাছাকাছি আর একটি দুর্গ আছে—যার আশে পাশে

সমস্ত জায়গাই পাহাড়ে ঘেরা। কিন্তু এটা আগেকার বর্ণিত দুর্গের মত অতটা সুদৃঢ় নয়। আলিম খাঁ পালিয়ে এসে এই দুর্গেই আশ্রয় নেয় সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

একদল সৈন্যকে গাজি খাঁকে অনুসরণ করে বন্দী করবার জন্য পাঠিয়ে আমি স্থির প্রতিজ্ঞারূপ রেকাবে পা দিয়ে এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসরূপ বল্‌গায় হাত দিয়ে লোদি আফগান বংশের সুলতান বাহ্‌লুলের পৌত্র এবং সুলতান ইস্কান্দারের পুত্র সুলতান ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। এই সময়ে হিন্দুস্থান সাম্রাজ্য ও দিল্লীর সিংহাসন সুলতান ইব্রাহিমের দখলে ছিল। তাঁর অধীনে এক লক্ষ সৈন্য এবং তাঁর ও তাঁর আমীরদের মোট এক হাজার হাতি ছিল। মিলওয়াত দুর্গ থেকে যে স্বর্ণ এবং মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছিল তার অধিকাংশই বাল্‌খ ও কাবুলে আমার স্বার্থরক্ষার জন্য আমার আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, পুত্র-কন্যা এবং আমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের কাছে উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিই।

এইখানে আমরা জানতে পারি যে সুলতান ইব্রাহিম দিল্লীর এক দিক থেকে অগ্রসর হয়ে আসছে, আর এক দিক থেকে আসছে হিসার-ফিরোজের শিকদার সেখানকার এবং পার্শ্ববর্তী দেশের সৈন্যদের নিয়ে। হিসার-ফিরোজের সৈন্যরা আমাদের দিকে প্রায় ত্রিশ মাইল এগিয়ে এসেছে। ইব্রাহিমের শিবিরের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য আমি কিত্তে বেগকে পাঠাই। আর মোমিন আট্‌কেকে হিসার-ফিরোজের সৈন্যদল কতদূর এগিয়ে এলো সেই সংবাদ আনার জন্য যেতে বলি।

জেমাদি মাসের উনিশ তারিখ সোমবার আম্বালা থেকে যাত্রা করে এগিয়ে গিয়ে একটা পুকুরপাড়ে শিবির ফেলা হয়। সৈন্যব্যূহের দক্ষিণ বাহুর অধিনায়ক হিসাবে হুমায়ুনকে নিযুক্ত করি। এই জায়গায় বিবান এসে আমার বশ্যতা স্বীকার করে। এইসব আফগানদের ব্যবহার বিরক্তি-উদ্রেককারী এবং এরা অশিষ্ট ও মূর্খ। যদিও দিলওয়ার খাঁ সৈন্যসংখ্যার দিক দিয়েই হোক, বা পদগৌরবেই হোক—তার চেয়ে অনেক উঁচু তবুও সে আমার সম্মুখে বসার সম্মান এখনও পায়নি এবং যদিও আলিম খাঁর পুত্ররা যারা সত্যই রাজকুমার তারাও আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে—কিন্তু এসব দেখেশুনেও বিবান খাঁ আমার সামনে বসবার জন্য আবদার জানায় এবং বৃথাই আশা করে যে আমি তাকে অনুমতি দেব।

পরদিন সকালে হুমায়ুন তার হালকা বাহিনী নিয়ে হামিদ খাঁকে হঠাৎ

আক্রমণ করার জন্য বেরিয়ে পড়ে। অগ্রগামী প্রহরী হিসাবে হুমায়ুন একশো কি দেড়শো জন বাছাই করা সৈন্য পাঠিয়ে দেয়। এই দলটি শত্রুসৈন্যের কাছাকাছি এসে তাদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়। যতক্ষণ না হুমায়ুনের পশ্চাৎবর্তী সৈন্যরা এগিয়ে এসে রণক্ষেত্রে দেখা দেয়, ততক্ষণ তারা সঙ্ঘর্ষ চালিয়ে যায়। হুমায়ুনের সৈন্যদের দেখামাত্র শত্রুপক্ষ ভীত হয়ে পালাতে থাকে। আমাদের সৈন্যরা শত্রুপক্ষের একশো কি দুশো সৈন্যকে বন্দী করে; তাদের মধ্যে অর্ধেকের শিরশ্ছেদ করা হয়। বেগ মিরাক মোগল হুমায়ুনের বিজয়বার্তা আমার শিবিরে নিয়ে আসে। এই জায়গাতেই আমি এক সেট পুরা সম্মানের পোশাক, আমার নিজের আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া এবং কিছু নগদ অর্থ তাকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়ার আদেশ দিই।

হুমায়ুন একশ বন্দী এবং সাত আটটি হাতী নিয়ে আমার শিবিরে পৌঁছিয়ে আমাকে সম্মান জানায়। একটা দৃষ্টান্ত দেখানোর জন্য আমি বন্দুকধারী সৈন্যদের এই বন্দীদের গুলি করে হত্যার আদেশ দিই। হুমায়ুনের এইটিই প্রথম যুদ্ধযাত্রা। যুদ্ধ ব্যাপারটা সে এই প্রথম দেখলো! এটা খুব শুভ লক্ষণ। হুমায়ুনের হালকা বাহিনীর কয়েকজন—যারা পলায়নপর শত্রুর পেছন পেছন ধাওয়া করেছিল তারা হিসার-ফিরোজে পৌঁছানো মাত্র সে দেশ দখল-করে নেয় এবং লুঠতরাজ করে সেখান থেকে ফিরে আসে। হিসার-ফিরোজ এবং তার অধীনস্থ জেলাগুলি যার রাজস্বের পরিমাণ দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার—তার অধিকার আমি হুমায়ুনকে দিই এবং উপহার স্বরূপ আরও দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা তাকে নগদ দিই।

ঐ জায়গা থেকে রওনা হয়ে আমরা শাহাবাদে পৌঁছই। আমি কয়েক-জন উপযুক্ত লোককে সুলতান ইব্রাহিমের শিবিরের সংবাদ আনবার জন্য পাঠিয়ে এই জায়গায় কয়েকদিন অপেক্ষা করি। এখান থেকে বিজয়বার্তা জানিয়ে কয়েকখানা চিঠি রহমত পেয়াদার মারফৎ কাবুলে পাঠিয়ে দিই।

হুমায়ুনের মন্তব্য

[এই জায়গায় এবং এই দিনেই আমার দাড়িতে প্রথম ক্ষুর কিংবা কাঁচি ব্যবহার করি। আমার মহামান্য পিতা তাঁর এই আত্মচরিতে তিনি কবে প্রথম ক্ষুর ব্যবহার করেছিলেন তা নিবদ্ধ করেছেন। তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমি বিনীতভাবে নিজের সম্বন্ধে অনুরূপ ঘটনা লিখে রাখছি।

এখন আমার বয়স ছেচল্লিশ। আমি মহম্মদ হুমায়ুন পরলোকগত সম্রাটের নিজের হাতে লেখা আত্মচরিতের পাণ্ডুলিপি থেকে একটি অনুলিপি করে রাখছি।]

এই স্থানে থাকবার সময় সূর্য মেষরাশিতে প্রবেশ করে। আমরা পুনঃ পুনঃ এই সংবাদ পাচ্ছিলাম যে সুলতান ইব্রাহিম ধীরে ধীরে দু' এক মাইল অগ্রসর হয়ে সেই জায়গায় দু' তিন দিন বিশ্রাম করছেন। আমরাও সেইভাবেই অগ্রসর হচ্ছি তাঁর সম্মুখীন হওয়ার জন্য এবং যমুনার তীরে শিবির ফেলছি।

হায়দার কুলিকে খবর সংগ্রহ করতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। যমুনা নদীর যে জায়গায় জল কম সেইখানে পার হয়ে নদীর ওপারে এলাম। সিরসাতে একটা সুন্দর প্রস্রবণ দেখা গেল। সেই প্রস্রবণ একটি নদীর সৃষ্টি করেছে। জায়গাটি খুব মনোরম। তারদি বেগ খুব প্রশংসা করতে লাগলো জায়গাটির।

আমি বল্লাম—এটি তোমারই হোক।

তার প্রশংসার ফলে আমি সত্যই এ জায়গাটি তাকেই দিলাম। একটা নৌকার ওপর চাঁদোয়া টাঙ্গিয়ে পাল তুলে নদীর বুকে চলতে লাগলাম—আবার কখনও বা নদীর ছোট ছোট খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে নৌকা চালাতে লাগলাম।

ভাটির দিকে নদীর তীরে তীরে দুইবার সৈন্য চালনা করে এগোতে থাকি। এই সময়ে হায়দার কুলি—যাকে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল সে—ফিরে এসে জানায় যে নদীর অপর পারে দাউদ খাঁ ও হাতিম খাঁ ছয় সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সুলতান ইব্রাহিমের ঘাঁটি থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরে চলে এসেছে। তারা রাস্তা ধরে আমাদের দিকেই এগুচ্ছে। আমি আমার সৈন্যব্যূহের বাম বাহু এবং ইউনিস আলির অধীনে ব্যূহের মধ্যবর্তী সৈন্যদলের কতকাংশকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে শত্রু সৈন্যের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আদেশ দিই।

মধ্যাহ্ন নমাজের সময় আমার সৈন্যরা আমাদের শিবিরের সামনে দিয়েই নদী পেরিয়ে ওপারে গেল। অপরাহ্ন ও সান্ধ্য নমাজের মাঝামাঝি সময়ে তারা ওপারের তীর ধরে অগ্রসর হয়ে চললো। পরদিন সকালে নমাজের সময় তারা শত্রুসৈন্যের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। শত্রুপক্ষ তাদের সৈন্যদলের শৃঙ্খলা কিছুটা রক্ষা করে আমার সৈন্যদের সম্মুখীন হতে যাত্রা

করে। কিন্তু আমার সৈন্যরা এগিয়ে আসতেই তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়, তারা পালাতে শুরু করে। আমার সৈন্যরা পশ্চাদ্ধাবন করে, শত্রুসৈন্য বধ করতে করতে ইব্রাহিমের শিবিরের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তারা শত্রুপক্ষের একজন সেনাপতি এবং আরও সত্তর আশি জন সৈন্যকে বন্দী করে। বন্দীদের এবং সেই সঙ্গে সাত আটটি হাতী নিয়ে তারা আমাদের শিবিরে ফিরে আসে। শত্রুপক্ষের ভীতি সঞ্চারের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকজন বন্দীকে হত্যা করা হয়।

পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করার সময় আমার সমস্ত সৈন্য সাজিয়ে যুদ্ধ অভিযানের উপযোগী দক্ষিণ, বাম এবং মধ্যবর্তী ব্যূহ রচনা করি। এই-ভাবে সৈন্য সাজিয়ে 'ভিম' উদ্‌যাপন করা হয়। প্রচলিত রীতি অনুসারে 'ভিমে'র অর্থ এই যে যখন সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, অশ্বারোহী সৈন্যরা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করেছে, পদাতিকেরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়েছে—তখন সেনাধ্যক্ষকে হাতে ধনুক অথবা চাবুক নিয়ে চলতি নিয়ম অনুসারে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করে বলতে হবে—কতগুলো সৈন্য যুদ্ধাভিযানে যাত্রা করছে। আমি আন্দাজে যে সংখ্যা নির্ণয় করি কার্যতঃ দেখা গেল আসল সৈন্যসংখ্যা তার চেয়ে কিছু কম।

এই জায়গাতেই আমি নির্দেশ দিই যে 'রুমের' রীতি অনুসারে কামানবাহী শকটগুলি একটির সঙ্গে আর একটি ষাঁড়ের চামড়ার পাকানো দড়ি দিয়ে বাধতে হবে যেমন লোহার শিকল দিয়ে করা হয়। প্রতি দুইটি কামানবাহী শকটের মধ্যবর্তী জায়গায় থাকবে ছয় সাতটি রক্ষণ-স্তম্ভ। গোলন্দাজ বাহিনী কামান ও রক্ষণ-স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে গোলা ছুঁড়বে। কামান, বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র সাজিয়ে ফেলার জন্য আমি পাঁচ ছ' দিন অপেক্ষা করি। সব সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো হয়ে গেলে আমি আমীর ও অভিজ্ঞ লোকদের ডেকে এনে সাধারণভাবে সলাপরামর্শ করি। আলোচনায় স্থির হয় যে পাণিপথ একটা বড় শহর। সেই শহরের দালান-কোঠা আমার সৈন্যদলের একটা অংশের রক্ষার কাজ করবে। সম্মুখভাগে রক্ষা-আবরণী এবং ঢাকা কামানের ব্যবস্থা রাখতে হবে, তার পেছনে থাকবে গোলন্দাজ সৈন্য ও পদাতিক বাহিনী। এই রকম সঙ্কল্প স্থির করে আমরা অগ্রসর হই এবং দু' বার সৈন্য চালনা করেই পাণিপথে পৌঁছে যাই। আমাদের দক্ষিণে ছিল শহর ও শহরতলী। আমাদের সম্মুখভাগে কামান এবং রক্ষা-স্তম্ভগুলি সাজিয়ে ফেলি যেগুলো আমরা প্রস্তুত করে এনেছি। বাম

দিকে এবং আরও নানা জায়গায় পরিখা খনন এবং গাছের ডাল-পালা সাজিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলা হয়। তীর ছুঁড়লে যতটা যায় ততটা পরিমাণ জায়গা মাঝে মাঝে ফাঁক রাখা হয় যেখানে প্রয়োজন মত একশো, দেড়শো সৈন্য ছুটে এসে দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

আমার সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু খুব ভীত চকিত হয়ে পড়লো। এ রকম ভয় ও সঙ্কোচ কোনও সময়েই উচিত নয়। সর্বশক্তিমান আল্লা যা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন তা কিছুতেই নড়চড় হয় না। অবশ্য তাঁদের খুব দোষও দেওয়া যায় না। ভয় পাওয়ার তাদের কারণ ছিল। কারণ, তারা নিজেদের দেশ থেকে দু' তিন মাসের রাস্তা পার হয়ে এখানে এসেছে। তাছাড়া তাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত জাতির সঙ্গে লড়াই করতে হবে—যাদের ভাষা আমরা বুঝি না, আর আমাদের ভাষাও যারা বোঝে না।

'বিপদে পড়েছি আমরা সবাই
মাথা মুণ্ডু তাই কারো ঠিক নাই,
ঘিরিয়া মোদের অদ্ভুত জাতি,
জানিনা তাদের কিবা মতি গতি।'

আমাদের মুখোমুখি শত্রুসৈন্য সংখ্যা আন্দাজে মনে হলো এক লাখের মত। সম্রাট ও তাঁর কর্মচারীদের হাতীর সংখ্যা হাজার খানেক হবে। সম্রাট তাঁর পিতা ও পিতামহের সঞ্চিত ধনরত্নের অধিকারী। তাছাড়া সঞ্চিত নগদ মুদ্রাও যথেষ্ট আছে—যা এখনই ব্যবহার করা চলবে। হিন্দুস্থানের একটা প্রথা এই যে, কেউ এই রকম অবস্থায় পড়লে—যেমন আমার শত্রুপক্ষ এখন পড়েছে—সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সে ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহ করে তার শক্তি বাড়িয়ে থাকে। যদি সম্রাট এই পন্থা অবলম্বন করতেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আরও এক বা দু' লক্ষ অতিরিক্ত সৈন্য সংগ্রহ করতে পারতেন। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লা যা করেন তা ভালই করেন। সম্রাটের নিজের সৈন্যবাহিনীকেই সন্তুষ্ট করার মত উদারতা ছিল না, অর্থ ব্যয় করে ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহ করাতো অনেক দূরের কথা। তাঁর সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করার কোনও ইচ্ছাই ছিল না। কি করে তাঁর সৈন্যদের সন্তুষ্টি বিধান করবেন? তিনি নিজে ছিলেন পয়লা নম্বরের কৃপণ, ধন সঞ্চয় করাই তাঁর একমাত্র ব্যসন। তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ যুবক। সৈন্য নিয়ে চলাফেরা এবং অন্য সব ব্যবস্থাই তাঁর দায়সারা গোছের এবং অবহেলার জিনিস। কোনও রকম শৃঙ্খলা না রক্ষা করেই তিনি সৈন্য চালনা করেন, যেখানে-সেখানে

কোনও কিছু সিদ্ধান্ত না করেই থেমে যান। আবার কোনও রূপ দূরদর্শিতার পরিচয় না দিয়েই যুদ্ধে রত হন।

যখন আমার সৈন্যরা পাণিপথে তাদের অবস্থানভূমি এবং তদ্‌সংলগ্ন স্থান কামান বন্দুক, গাছের ডাল-পালা সাজিয়ে এবং গড়খাই খনন করে সুরক্ষিত করছে, সেই সময় মহম্মদ সরবান্‌ আমার কাছে এসে বললো—'আপনি যেভাবে আমাদের জায়গা সুরক্ষিত করছেন তাতে সম্রাট কখনই এখানে এসে যুদ্ধ আরম্ভ করার চিন্তাই করবেন না।'

উত্তরে আমি বলি—'উজবেকের সুলতান আর খাঁদের কথা স্মরণ করেই বোধ হয় তুমি এই কথা বলছো। এ কথা ঠিক—যে বছর আমরা সমরকন্দ ত্যাগ করে হিসারে চলে আসি, সেই সময় উজবেকদের কয়েক জন খাঁ এবং সুলতানরা একত্র হয়ে দরবেন্দ থেকে অভিযান চালিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। আমি মোগলদের পরিবারবর্গ ও ধনসম্পত্তি এবং সৈন্যদের সেই শহরে এবং শহরতলীতে জড়ো করি এবং সেখানে আসবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে অবরোধের মত অবস্থার সৃষ্টি করি। খাঁ এবং সুলতানরা কোন্‌ সময়ে আক্রমণ করার সুবিধা এবং কোন্‌ সময় পিছিয়ে যেতে হবে তা ধারণা করতে পেরেছিল। যখন তারা দেখলো যে আমরা শেষ রক্তবিন্দু পাত করে হিসার রক্ষা করতে কৃতসঙ্কল্প এবং আমরা আক্রমণ প্রতিরোধ করার সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক করে ফেলেছি, তখন তারা তাদের জয়লাভের কোনও আশা দেখতে না পেয়ে বুন্দাকের দিকে পালিয়ে গেল। কিন্তু যারা তখন আমাদের সঙ্গে লড়তে এসেছিল তাদের সঙ্গে বর্তমান শত্রুদের বিচার করতে যেওনা। এদের এমন কিছু বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা নেই যাতে তারা বুঝতে পারে যে কখন তাদের অগ্রসর হওয়া উচিত—আর কখনই বা পিছিয়ে যাওয়া সঙ্গত!'

আল্লার ইচ্ছায় সবই আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল। আমার ভবিষ্যদ্বাণীই ঠিক ঠিক ফলে গেল। সাত আটদিন আমাদের পাণিপথে থাকার সময় আমার সৈন্যদলের কয়েকজন শত্রুপক্ষের অগণিত শিবিরের কাছাকাছি গিয়ে শর নিক্ষেপ করে এলো। কিন্তু শত্রুপক্ষ কোনও রকমেই শিবির থেকে নড়লো না এবং শিবিরের বাইরে এসে আক্রমণ করার কোনও উদ্যম দেখালো না।

আমাদের পক্ষের কয়েকজন হিন্দুস্থানি আমীরের উপরোধে চার পাঁচ হাজার সৈন্য নৈশ আক্রমণের জন্য পাঠাই। আমার এই সৈন্যদলটি প্রথমটা

শৃঙ্খলার সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেনি। এলোমেলোভাবে অভিযান চালনা করে তারা মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। সকাল হয়ে গেলেও তারা শত্রু-শিবিরের কাছে কাছেই রয়ে গেল যদিও দিনের আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই সময় শত্রুপক্ষ রণদামামা বাজিয়ে, হস্তী বাহিনীকে প্রস্তুত করে তাদের দিকে ধাওয়া করলো। আমার সৈন্যরা তখন কোনও উল্লেখযোগ্য ফলই দেখাতে পারেনি। তবে, শত্রুপক্ষের অগণিত সৈন্য তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করলেও তারা নিরাপদে পিছিয়ে এলো। একটি লোকেরও প্রাণহানি হয়নি। শুধু মহম্মদ আলি একটি শরাঘাতে আহত হয়েছিল, কিন্তু জখম মারাত্মক নয়। শুধু এই আঘাতের জন্য যুদ্ধের দিন সে তার নিজের জায়গায় উপস্থিত থেকে যুদ্ধ করতে পারেনি। কি ব্যাপার ঘটেছে জানতে পেরে আমি হুমায়ুনকে তার অধীনস্থ সৈন্য নিয়ে হু' মাইল এগিয়ে যেতে বলি—যাতে আমার পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যদের সে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে পারে। আমিও আমার অবশিষ্ট সৈন্য সজ্জিত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। যে সব সৈন্য শত্রুপক্ষকে বিব্রত করার জন্য নৈশ অভিযানে গিয়েছিল তারা পিছিয়ে আসার পথে হুমায়ুনের দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে তারই সঙ্গে নিরাপদে ফিরে আসে। আমাদের আক্রমণ করার জন্য শত্রুপক্ষের কোনও আয়োজন না দেখে আমি আমার সৈন্যদের সরিয়ে এনে শিবিরে পাঠিয়ে দিই।

রাত্রে একটা মিথ্যা বিপদসূচক সঙ্কেতধ্বনি শোনা গেল। প্রায় পঁচিশ মিনিট ধরে সাজ সাজ রব এবং হৈ হুল্লোড় চল্‌লো। এই রকম বিপদসূচক সঙ্কেতধ্বনি আমার যে সব নতুন সৈন্যরা শোনেনি বা এইরকম ব্যাপার দেখেনি তারা আতঙ্কিত হয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলো। যা হোক, অল্প সময়ের মধ্যেই এই আতঙ্ক দূর হলো।

ভোরের নমাজের সময় যখন উষার আলো এমন যে কোনও জিনিসকে দেখে চেনা যাচ্ছে অর্থাৎ একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে এমন সময় অগ্রগামী পর্যবেক্ষক দলের কাছ থেকে সংবাদ এলো যে শত্রুপক্ষ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে এগিয়ে আসছে। আমরা তৎক্ষণাৎ শিরস্ত্রাণ, বর্ম পরিধান করে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করলাম। সেনাবাহিনীর দক্ষিণ ভাগে হুমায়ুন এবং বাম ভাগে মহম্মদ সুলতান মির্জা সৈন্য পরিচালনা করছিল। মধ্যবর্তী সেনাবাহিনীর দক্ষিণাংশের পরিচালনার ভার ছিল চিন্ তাইমুর সুলতানের ও বামাংশের ভার ছিল খলিফার উপর। অশ্বশালার অধিনায়ক আব্দুল

আজিজের উপর রিজার্ভ সৈন্যদলের ভার ছিল। দক্ষিণ বাহুর সেনাদলের পার্শ্বরক্ষী হিসাবে ওয়ালি কাজিলকে তার মোগল দলবলসহ নিযুক্ত করি। এই পার্শ্বরক্ষীদের এই নির্দেশ দিই যে শত্রুসৈন্য কাছাকাছি এসে পড়লে দুইপাশের পার্শ্বরক্ষী সেনাদল ঘুরে গিয়ে যেন শত্রুসৈন্যের পশ্চাৎভাগে উপস্থিত হয়।

শত্রুসৈন্য দৃষ্টিগোচর হলে তাদের হাবভাব দেখে মনে হলো যে তাদের সমস্ত শক্তি বেশীরভাগ আমার দক্ষিণ বাহুর সৈন্যদলের ওপরই প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে। আমি সেজন্য রিজার্ভ সৈন্যের অধিনায়ক আব্দুল আজিজকে তার সৈন্যদলসহ দক্ষিণবাহুর সৈন্যগণের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের দল পুষ্ট করতে নির্দেশ দিই। সুলতান ইব্রাহিমের সৈন্যদের এগিয়ে আসতে দেখে ধারণা হলো যে তারা থামবে না, দ্রুত অগ্রসর হয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারা নিকটবর্তী হয়ে আমার সৈন্যদের দৃঢ় অবস্থান দেখে বুঝতে পারে কি সুশৃঙ্খলভাবে আমরা সৈন্যসজ্জা করেছি এবং কিভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিক করেছি। এই সব দেখে তারা কিছুক্ষণের জন্য থেমে যায় এবং যেন ভাবতে থাকে যে এখন থামবে না এগিয়ে আসবে। তাদের অবশ্য থামার উপায় ছিল না কিন্তু তারা আগের মত দ্রুত এগোতেও পারছিল না।

দক্ষিণ ও বাম প্রান্তের পার্শ্ববর্তী সৈন্যদের নির্দেশ পাঠাই যে তারা যেন শত্রুসৈন্যদের চক্রাকারে ডিঙ্গিয়ে অতি দ্রুত তাদের পশ্চাৎভাগে উপস্থিত হয়ে আক্রমণ শুরু করে দেয়। দক্ষিণ ও বামবাহুর সৈন্যদেরও আদেশ দেওয়া হয় যেন তারা তখনই শত্রুসৈন্যের ওপর আক্রমণ শুরু করে। পার্শ্বরক্ষী সৈন্যরা উপদেশ মত শত্রুসৈন্যের পিছনে হাজির হয়ে তাদের ওপর শর নিক্ষেপ করতে থাকে।

মেহ্‌দি খাজা বাম পার্শ্বের সৈন্যদের পুরোভাগে এগিয়ে যায়। শত্রুপক্ষের একদল লোক একটা হাতী নিয়ে তার দিকে ধাওয়া করে। আমার সৈন্যরা তাদের দিকে তীক্ষ্ণ শর ছুঁড়তে থাকে। শত্রুসৈন্যের এই দলটি তখন পিছিয়ে যায়।

আমি আমার প্রধান সৈন্যবাহিনীর নায়ক আহমেদি পারওয়ানচিকে বামবাহুর সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য সেইদিকে পাঠিয়ে দিই। দক্ষিণ দিকের যুদ্ধও তেমনি দুর্দম হয়ে উঠেছিল। আমি মহম্মদ গোকুলতাসকে কেন্দ্রের সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে এগিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বলি। ওস্তাদ আলিও সম্মুখ সারি থেকে অনেকবার কামান দাগে ও তার ফলও ভাল হয়।

সেইভাবে গোলন্দাজ মুস্তাফা কেন্দ্রের বামদিক থেকে কামানের গোলা ছুঁড়ে বেশ ভাল কাজ দেখায়। দক্ষিণ ও বাম বাহিনী, কেন্দ্র ও পার্শ্বরক্ষী সৈন্যরা এইভাবে শত্রুসৈন্যদের চারদিকে ঘেরাও করে ফেলে গভীর সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং শত্রুর উপর অনবরত শর নিক্ষেপ করতে থাকে।

শত্রুপক্ষ আমাদের দক্ষিণ ও বামদিকের সৈন্যদের উপর দু' একবার ব্যর্থ আক্রমণ চালায়। আমার সৈন্যরা ধনুক হাতে নিয়ে শর নিক্ষেপ করে তাদের কাবু করে ফেলে। শত্রুপক্ষের কেন্দ্রের বাম ও দক্ষিণ দিকের সৈন্যরা বিপর্যস্ত হয়ে এক জায়গায় ভিড় করে জমায়েত হবার চেষ্টা করলে এমন একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যে তারা আর এগোতেও পারে না বা এমন কোনও পথও খুঁজে পায় না যা দিয়ে তারা পালাতে পারে।

পূর্বাকাশে যখন সবেমাত্র সূর্যের উদয় হয়েছে তখন যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ চলে দুপুর পর্যন্ত—যখন শত্রুসৈন্য সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত আর আমার সহচররা যুদ্ধে জয়ী হয়ে আনন্দে বিহ্বল। সর্বশক্তিমান আল্লার অসীম করুণা এবং অনুগ্রহে এই দুরূহ কাজ কত সহজে হয়ে গেল; শত্রুপক্ষের এই বিপুল বাহিনী একটা দিনের অর্ধেক সময়ের মধ্যে ধূলায় মিশে গেল।

সুলতান ইব্রাহিমের কাছাকাছি যে সৈন্যরা ছিল তাদের মধ্যে পাঁচ ছ' হাজার সৈন্য মৃত অবস্থায় দেখা গেল। যুদ্ধক্ষেত্রের চার পাশে আরও পনেরো ষোল হাজার মৃত সৈন্যের শব পাওয়া গেল। আগ্রায় পৌঁছাবার পর হিন্দুস্থানবাসীদের বিবরণ শুনে জানা যায় যে যুদ্ধক্ষেত্রে পঞ্চাশ ষাট হাজার সৈন্য নিহত হয়েছে। যাহোক, শত্রুসৈন্য পরাস্ত হওয়ার পর পলায়নপর সৈন্যদের অনুসরণ, হত্যা এবং বন্দী করতে থাকি। আমার যে সব সৈন্যরা এগিয়ে গিয়েছিল তারা আমীর ও আফগানদের বন্দী করে নিয়ে আসতে শুরু করে। মাহুতসহ অনেক হাতীও তারা ধরে নিয়ে আসে এবং সেগুলো পেশকোষ কর হিসাবে আমাকে অর্পণ করে।

পলায়নপর শত্রুদের পেছন পেছন কিছুদূর ধাওয়া করবার পর এবং সুলতান ইব্রাহিম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছে ধারণা করে আমার কয়েকজন অতি বিশ্বস্ত অনুচরকে তাঁর সন্ধানের জন্য প্রয়োজন হলে আগ্রা পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আদেশ দিই। ইব্রাহিমের সৈন্য-শিবিরগুলির মধ্য দিয়ে এগিয়ে তাঁর নিজের তাঁবু, আসবাবপত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম পর্যবেক্ষণ করে আমরা সিহাব নদীর তীরে শিবির স্থাপন করি।

ঠিক বিকেলের নমাজের সময় খলিফার ছোট ভাই তাহির তাবেরি

সুলতান ইব্রাহিমের মৃতদেহ অন্যান্য হতাহতের মধ্যে দেখতে পেয়ে তার মাথা কেটে সেই মাথা নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে।

সেইদিনই আমি হুমায়ুন মির্জাকে জিনিসপত্রের ভারি বোঝা সঙ্গে নিয়ে তখনই যাত্রা করে যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে আগ্রায় পৌঁছিয়ে সেখানকার কোষাগারগুলি দখল করতে নির্দেশ দিই। সেই সময় মেহেদি খাজাকেও আদেশ দিই যে তার সমস্ত জিনিসপত্র এখানে ফেলে রেখে দ্রুতগতিতে দিল্লী পৌঁছিয়ে দিল্লী দুর্গের কোষাগার যেন সে অবিলম্বে আটক করে।

পরদিন সকালে মার্চ শুরু করে মাইল দুয়েক এগিয়ে যমুনার তীরে থেমে যাই, কারণ ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। পরে তিনবার সৈন্য-চালনা করে দিল্লীর কাছাকাছি এসে যমুনা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করি।

দিল্লীর সামরিক সমাহর্তার পদ ওয়ালি কিজিলকে প্রদান করি, আর দোস্তকে দিই দিল্লীর দেওয়ানের পদাধিকার। দিল্লীর সমস্ত কোষাগার অবিলম্বে সীলমোহর করতে আদেশ দিই এবং কোষাগারগুলির ভার ঐ দু' জনের ওপর অর্পণ করি।

মৌলানা মামুদ, শেখ জিন এবং আরও কয়েকজন শুক্রবারের নমাজ পড়তে দিল্লীতে যায়। আমার নামে নমাজ পড়ে তারা ফকির ও ভিক্ষুকদের কিছু অর্থ বিতরণ করে ফিরে আসে।

কয়েকদিন পর আগ্রার প্রান্তভাগে অবস্থিত সুলেমানের প্রাসাদে আসি। এই জায়গা আগ্রার দুর্গ থেকে অনেকটা দূর হওয়ায় আমি পরের দিন সকালে সেখান থেকে চলে এসে জালাল খাঁ প্রাসাদে থাকবার ব্যবস্থা করি। আগ্রা দুর্গের লোকজনরা নানা অজুহাত দেখিয়ে হুমায়ুনকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। যদিও সে আমার আসার অনেক আগেই এখানে পৌঁছেছিল। হুমায়ুন যখন দেখে যে এই সব লোকের ওপর আধিপত্য করার কোনও লোক নেই এবং তারা যাতে ধনরত্ন লুঠ করে পালাতে না পারে—তখন তাদের কিছু না বলে সে এমন সব জায়গায় সৈন্য মোতায়েন করে যাতে দুর্গ থেকে কেউ পালাতে না পারে।

গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমজিৎ একজন হিন্দু। হিন্দু রাজারা এই রাজ্য একশ' বছরের ওপর শাসন করে এসেছে। যে যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিম পরাজিত হয় সেই যুদ্ধেই বিক্রমজিতকে নরকে পাঠানো হয়। বিক্রমজিতের পরিবারবর্গ এবং তার গোষ্ঠীর সর্দাররা তখন আগ্রাতেই ছিল। হুমায়ুন আগ্রায় পৌঁছানোর পরই বিক্রমজিতের লোকজন পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু

হুমায়ুন যে সব লোককে সতর্ক নজর রাখার জন্য নিযুক্ত করেছিল তারা তাদের আটক করে। কিন্তু হুমায়ুন তাদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করারি আদেশ দেয়নি। তারা স্বেচ্ছায় হুমায়ুনকে সৌহার্দ্যের প্রস্তাব জানিয়ে অনেকগুলি রত্ন ও দামী পাথর উপহার দেয়। এই সব রত্নের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ হীরক ছিল—যার নাম কোহিনুর। সুলতান আলাউদ্দিন এই বহুমূল্য হীরক সংগ্রহ করেছিলেন। এটা এমন মূল্যবান যে একজন হীরার জহুরি এর দাম ঠিক করেছিলেন—পৃথিবীতে দৈনিক যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তার অর্ধেক পরিমাণ অর্থ। এর ওজন প্রায় তিন শ' কুড়ি রতি। আমি আগ্রায় পৌঁছালে হুমায়ুন আমাকে সেই হীরক উপঢৌকন দেয় এবং আমিও আবার সেটাকে তাকেই উপহার স্বরূপ প্রত্যর্পণ করি।

দুর্গে যে সমস্ত উচ্চ পদাধিকারী কর্মচারী ছিল তাদের মধ্যে মালিক দাদ কেরানি একজন। সে জালিয়াতির জন্য অভিযুক্ত হয় এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। মালিক দাদ কেরানিকে দোষী সাব্যস্ত করলে তার সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার জন্য অনেক মধ্যস্থ ব্যক্তির কাছ থাকে অনুরোধ আসতে থাকে। আগু পিছু বিবেচনা করতেই পাঁচ ছ' দিন কেটে যায়। তারপর মধ্যস্থদের অভিপ্রায়ানুসারে আমি তাকে মার্জনা করি। শুধু মার্জনাই নয়—তাকে আমি অনেক অনুগ্রহ প্রদর্শন করি। তার অনুগত ব্যক্তিদেরও তাদের সমস্ত সম্পত্তি দখলে রাখবার অনুমতি দিই। সাত লক্ষ পরিমাণ কর আদায়ী একটি জেলা ইব্রাহিমের মাতার ভরণ-পোষণের জন্য অর্পণ করি। তাঁর আমীরদেরও কয়েকটি জেলার ভার দেওয়া হয়। আগ্রা থেকে মাইল খানেক দূরে তাঁর থাকবার স্থান ঠিক করে দিই। সেখানে তিনি তাঁর সমস্ত আসবাবপত্র নিয়ে চলে যান।

রজব মাসের আঠাশে তারিখ বৃহস্পতিবার বৈকালিক নমাজের সময় আমি আগ্রাতে প্রবেশ করি। সুলতান ইব্রাহিমের প্রাসাদেই আমার থাকার ব্যবস্থা হয়। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি কাবুল জয় করি, সেই সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই এই আশা পোষণ করে এসেছি যে হিন্দুস্থান আমি জয় করবোই করবো। কিন্তু কখনও কখনও আমার আমীরদের অসদাচরণ—কারণ আমার ভারত জয়ের অভিলাষ তাদের মনঃপূত ছিল না—এবং কখনও কখনও আমার ভাইদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও বিরুদ্ধতা আমাকে এই দেশ জয় করার জন্য অভিযান চালানো থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে। ফলে হিন্দুস্থানের প্রদেশগুলি এতদিন আমার আক্রমণের

হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। অবশেষে এই সব বাধা দূর হলো। এখন ছোট বড়, ধনী নির্ধন, সাধারণ এমন কেউ নেই যে আমার এই উদ্যমের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করবার সাহস রাখে।

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে এক সৈন্যদল গঠন করে ঝড়ের গতিতে বাজুর দখল করি এবং সেখানকার দুর্গরক্ষীদের তরবারির আঘাতে শিরশ্ছেদ করি। তারপর আমি 'বাহ্‌রে'র দিকে অগ্রসর হই। এখানে আমি লুণ্ঠতরাজ ও [illegible]া নিবারণ করি। এখানে অধিবাসীদের ওপর জিনিসপত্রে ও নগদ অর্থে চার হাজার টাকার পরিমাণ কর ধার্য করি। সেই অর্থ ও জিনিসপত্র আমার সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করে কাবুলে ফিরে আসি। সেই সময় থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাত আট বৎসর হিন্দুস্থান জয়ের ব্যাপারে আমার সমগ্র ইচ্ছা ও কল্পনা কার্যতঃ নিয়োগ করার ব্যাপারে বহুল পরিমাণে অগ্রসর হয়েছি এবং পাঁচ বার আমার সৈন্যদের অধিনায়করূপে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেছি। পঞ্চম বারে মহান্ আল্লা তাঁর অপার করুণা আমার উপর বর্ষণ করেছেন। তাঁরই ইচ্ছায় ও অনুগ্রহে সুলতান ইব্রাহিমের মত পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাস্ত করে শক্তিশালী হিন্দুস্থান জয় করে তার অধীশ্বর হবার যোগ্যতা লাভ করেছি।

হিন্দুস্থানের সম্রাট সুলতান ইব্রাহিমের পক্ষে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অর্থ-সঙ্গতি দিয়ে ইচ্ছা করলে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঁচ লক্ষ সৈন্য নিযুক্ত করা অসম্ভব ছিল না। সেই সময় পূর্ব-প্রান্তের কয়েকটি আমীরও বিদ্রোহ করেছিল। তাঁর পদাতিক সৈন্যসংখ্যা ছিল আনুমানিক এক লক্ষ। তাঁর নিজের ও আমীরদের হাতীর সংখ্যাও ছিল হাজার খানেক। এই রকম অবস্থাতেও এবং শত্রুপক্ষ এতদূর ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও আমি আল্লার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখেও আমার চিরজন্মের শত্রু উজবেকদের—যারা আমার বিরুদ্ধে লক্ষাধিক সৈন্য সমাবেশ করেছিল—পশ্চাতে ফেলে রেখে এগিয়ে এসেছিলাম প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান ইব্রাহিমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে—যিনি ছিলেন অসংখ্য সেনার অধিনায়ক ও এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। দৈব অনুগ্রহের ওপর আমার অকুণ্ঠ নির্ভরতার জন্য সর্বশক্তিমান্ মহান আল্লা আমাকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখেননি। তাঁরই কৃপায় আমি পরাক্রমশালী শত্রুকে পরাজিত করে এই বিশাল হিন্দুস্থান জয় করার গৌরব লাভ করেছি। এই কৃতকার্যতা আমার নিজ শক্তিতে হয়েছে কিংবা আমার এই সৌভাগ্য আমার নিজের চেষ্টায় লাভ করেছি একথা আমি কখনই মনে করি না। আল্লার অপার করুণা ও অনুগ্রহের জন্যই এই গৌরব ও সৌভাগ্য লাভ করেছি।

বাবর নামায় ভারত কথা

শচীন্দ্রলাল রায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা — ৬

এই লেখকের লেখা

জহর ও অমৃত
নেশার ঘোরে
দাবী দাওয়া
গোয়ে৷
রক্তের সম্বন্ধ
কমল বন
বাবরের আত্মকথা
জাহাঙ্গীর নামা (যন্ত্রস্থ

ভূমিকা

জহিরউদ্দিন বাবর নিঃসন্দেহে তাঁর সমকালের একজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ। এসিয়া মহাদেশে নানা রাজ্যের সিংহাসন যাঁরা অলঙ্কৃত করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনি একজন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধানতম সম্পদশালী এবং প্রভূত ক্ষমতাশালী রাজ্যে এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্টাতার চরিত্রে রাজনীতিবেত্তা ও অধিনায়কত্বের মহান গুণ একত্রে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। বাবর এই উভয়ক্ষেত্রেই আদর্শ স্থানীয় বিশিষ্ট গুণের অধিকারী ছিলেন।

যদি এসিয়া মহাদেশের ইতিহাস পক্ষপাতহীন ভাবে আলোচনা করা যায় তাহলে এমন কোনও রাজপুরুষের সন্ধান মিলবে না যিনি বাবরের অপেক্ষা যোগ্যতায় উচ্চশ্রেণীর বলে গণ্য হতে পারেন। চেন্‌গিজ খাঁ ও তাইমুরের শক্তি তাঁদের জাঁক জমকপূর্ণ দেশ জয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য সেই দেশজয় বাবরের দেশজয় অপেক্ষা বেশী চমকপ্রদ। কিন্তু তাঁর মত উচ্চাঙ্গের মননশীলতা, সৌভাগ্যে ও দুর্ভাগ্যে অচঞ্চল মানসিকতা ও ধৈর্য্য, সদা প্রফুল্ল মনোভাব, পুরুষোচিত গুণাবলী, জ্ঞানার্জ্জনের দিকে আগ্রহ, বিদ্যাচর্চ্চা, সঙ্গীতানুরাগ উদ্যান রচনায় উৎসাহ ইত্যাদি গুণ একাধারে এসিয়া মহাদেশের অন্য কোনও রাজ পুরুষের মধ্যে দেখা যায় না।

বাবর তাঁর আত্মচরিত লিখেছিলেন তুর্কি ভাষায়। এর অনুবাদ হয় ফারসি ভাষায়। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই অদ্ভুত আত্মচরিতের অনুবাদ হয়েছে।'

পানিপথের যুদ্ধ পর্যন্ত বাবরনামার বঙ্গানুবাদ 'বাবরের আত্মকথা' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। পানিপথের যুদ্ধের পর থেকে 'বাবরনামার' অনুবাদ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হলো। সত্যই এটি তাঁর ভারত কথা। কিরূপ পর্যাবেক্ষণ শক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন এই গ্রন্থে তার প্রমান পাওয়া যায়।

হিন্দুস্থানের দোষগুণ তিনি নিজে উপলব্ধি করে তাঁর আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। সব চেয়ে বড় কথা, তাঁর নিজের দোষগুণ ও অকপটে ব্যক্ত-

করেছেন। তিনি মদ্যপ ছিলেন। আল্লার নামে শফৎ নিয়ে তিনি সুরাপান ত্যাগ করেছিলেন। মাঝে মাঝে মদ্য পানের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠতো তিনি তা অকপটে স্বীকার করেছেন। কিন্তু অদম্য মনের জোরে তিনি নিজেকে দমন করে রাখতে পেরেছিলেন।

তিনি ছিলেন উদ্যান রসিক। ভারত জয়ের পর নানাস্থানে তিনি উদ্যান রচনা করেছিলেন। নতুন গাছ তিনি আনিয়েছিলেন ভারতের বাইরে থেকে। তিনি আঙ্গুর ও খরমুজের চাষ প্রথম আরম্ভ করেন তাঁর উদ্যানে। তারপর থেকেই এই ফল ভারতে উৎপন্ন হচ্ছে। ভারতবাসী তার ফল ভোগ করছে।

বাবর জীবন পঞ্জী

১৪৮৩—১৪ই ফেব্রুয়ারি—বাবরের জন্ম।

১৪৮৮—পাঁচবৎসর বয়সে সমরকন্দে গমন। সুলতান আমেদ (আলাচা) খাঁয়ের কন্যা আয়েষার সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির।

১৪৯৪—জুন—পিতা ওমর সেখ মির্জ্জার মৃত্যুর পর ফারগাণার রাজ সিংহাসন লাভ।

১৪৯৫—আমেদ মির্জ্জার হাত থেকে আসফারা ও খুজেন্দ পুনরুদ্ধার।

১৪৯৭—মে—সমরকন্দের বিরুদ্ধে অভিযান।—নভেম্বর—সমরকন্দ অধিকার। ১০০ দিন সমরকন্দ বাসের পর তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে তামবল কর্ত্তৃক অধিকৃত ফারগাণা পুনরুদ্ধারের জন্য যাত্রা। খুজেন্দ ভিন্ন আর সমস্ত স্থান অধিকার চ্যুত। আইলাকের মেষ পালকদের মধ্যে ঘোরা।

১৪৯৮—আলিদোস্তের বাবরকে মার্ঘিনান প্রতর্পন।

১৪৯৯—জুন—বাবরের ফারগাণা উদ্ধার। আয়েষার সঙ্গে বিবাহ।

১৫০০—বাবরকে সন্ধিচুক্তিতে সাক্ষর করতে বাধ্য করে ফারেগাণা বিভাগ ও ভ্রাতা জাহাঙ্গির মির্জ্জার অংশ লাভ।

১৫০০—জুন—তারখান পরিবারের সমরকন্দ পুনরুদ্ধারের জন্য বাবরকে আমন্ত্রণ। উজবেগ নেতা সেবানির বাধা দান।

১৫০০—নভেম্বর—উজবেগদের পরাজিত করে সমরকন্দ জয়।

১৫০১—মে—সের-ই-পুলের যুদ্ধে সেবানি কর্ত্তৃক বাবরের পরাজয়।

১৫০১—জুলাই—বাবরের প্রথম সন্তান-কন্যার সমরকন্দে জন্ম ও এক মাস পর মৃত্যু।

১৫০১—মে—নভেম্বর—সমরকন্দ দুর্গ সেবানি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ।

১৫০১—ডিসেম্বর—বাবরের সমরকন্দ দুর্গত্যাগ।

১৫০২—জানুয়ারি-মে—গৃহহারা বাবরের কয়েকজন অনুচর সহ পার্ব্বত্য অঞ্চলে ভ্রমন।

১৫০২—জুন—তাসকেন্দে মাতুল মহম্মদ খাঁর আশ্রয় গ্রহণ। সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা।

১৫০২—জুলাই—খানদের সাহচর্য্যে আন্দেজানে তাম্বলকে আক্রমণ। উশ উজকেন্দ এবং মার্ঘিনান জয় করে বড় খাঁয়ের ছোট ভাইকে দান। তামবলের ভাই বেজিদের বাবরকে আখ্‌সিতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ।

৫০১৩—জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি—খান ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক বাবর পরিত্যক্ত এবং তাম্বল কর্ত্তৃক আক্রান্ত। আন্দেজানে খানদের নিকট পলায়ন।

১৫০০—জুন—আখসিতে সেবানি কর্ত্তৃক খানদের পরাজয়। বাবরের ফারগাণার দক্ষিণে পাহাড়ে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন।

১৫০৪—জুন—বাবরের ভাই জাহাঙ্গির ও নাসির, তাঁর মা ও অন্যান্য পরিজনদের সঙ্গে খোরাসানের পথে যাত্রা—পথ পরিবর্ত্তন—কাবুলের উদ্দেশ্যে গমন।

১৫০৪—অক্টোবর—কাবুল অধিকার।

১৫০৫—জানুয়ারি—মে—খাইবার গিরি-সঙ্কট অতিক্রম করে কোহাট অভিযান। সিন্ধুনদ তটে আগমন—গজনি অধিকার। আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য উপজাতির বিরুদ্ধে অভিযান।

১৫০৬—জুন—স-সৈন্য কাবুল ত্যাগ করে হিরাটের সুলতান হোসেনকে সাহায্যের জন্য সেবানি উজবেগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা।

১৫০৬—অক্টোবর—৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করে সুলতান হোসেনের পুত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ—খোরাসানের রাজধানী হিরাটে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান।

১৫০৬—২৪শে ডিসেম্বর—হিরাট ত্যাগকরে কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য যাত্রা—বরফের ভিতর দিয়ে বিভীষিকাময় পথ চলা।

১৫০৭—কাবুলে উপস্থিতি—সাবেগ ও মুকিমের হাত থেকে কান্দাহার উদ্ধার। কাবুলে মোগল বিদ্রোহ।

১৫০৭—১৫১০—কাবুলে উপস্থিতি ও শাসন পরিচালনায় ব্যস্ত—খান মিজ্জর পত্র প্রাপ্তি—পারশ্যের সাফাইদ শাসকের সাহায্যে সমরকন্দ জয়ের সঙ্কল্প।

১৫১১— উজবেগদের সঙ্গে যুদ্ধ।

১৫১১—অক্টোবর—পুনরায় সমরকন্দের রাজসিংহাসন লাভ।

১৫১২—মে— শেষবারের মত সমরকন্দ ত্যাগ।

১৫১২—নভেম্বর—গজ্‌দিভানে উজবেগদের সঙ্গে যুদ্ধ—বাবরের পরাজয়—হিসারে পলায়ন—কুন্দজে আশ্রয় গ্রহণ।

১৫১৩ অথবা ১৫১৪ (প্রথমদিকে)—কাবুলে প্রত্যাবর্তন।

১৫১৯— ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান—বাজুর দুর্গ জয়।

১৫১৯—১৫২৬—পাঁচবার ভারত আক্রমণ—কাবুল রাজ্য সংগঠন—গজনির মোগল বিদ্রোহ দমন—সোয়াৎ ও বাজুর জয়।

১৫১৯—১৭ই ফেব্রুয়ারি—সিন্ধুনদ অতিক্রম—ভিরা এবং ঝিলাম ও চেনাবের মধ্যবর্তী দেশের বশ্যতা লাভ—কাবুলে ফেরার পথে গক্করদের প্রধান সহর অধিকার।

১৫২০— হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযান—গক্কর উপজাতিদের আক্রমণ—ভিবাব বিদ্রোহ দমন—শিয়ালকোটে উপস্থিতি—পরলোক গত খান মির্জার স্থলে হুমায়ুনকে বাদাকসানের শাসক নিযুক্ত।

১৫২২— শা' বেগের বাবরকে কান্দাহার সমর্পণ।

১৫২৪— ভারতে চতুর্থ অভিযান—লাহোর ও পাঞ্জাবের অধিকার লাভ।

১৫২৫— জ্বর ও রক্তামাশায় পীড়িত।

১৫২৫—নভেম্বর—ভারতে পঞ্চম অভিযান—পাঞ্জাবে শান্তি রক্ষা—দিল্লী অভিমুখে যাত্রা।

১৫২৬—২১ শে এপ্রিল—পাণিপথের যুদ্ধ—ইব্রাহিম লোদির পরাজয়—দিল্লী ও আগ্রা অধিকার।

১৫২৭—১৬ই মার্চ—খানুয়ার যুদ্ধ—রাণা সঙ্গের পরাজয়—গাজি পদবী গ্রহণ।

১৫২৮—২০ শে জানুয়ারি—চান্দেরি দুর্গ জয়।

১৫২৮-১৫৩০—হিন্দুস্থানে শান্তি স্থাপন—উত্তর ভারতের বশ্যতা।

১৫৩০—২৬ শে ডিসেম্বর—আগ্রায় বাবরের মৃত্যু।

বাবর নামায় ভারত কথা

[বাবর ১৫১৯-২৬ সালের মধ্যে পাঁচবার ভারত আক্রমণ করেন। ১৫২৬ সাল ২১ শে এপ্রিল তিনি পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। পাণি পথের যুদ্ধে জয়লাভই ভারত জয়ের সূচনা। বাবরের আত্মকথায় এই অভিযানের বিশদ বর্ণনা আছে। জয়লাভের পর তাঁর

আত্ম কথায় লিখেছেন—'দৈব অনুগ্রহের ওপর আমার অকুণ্ঠ নির্ভরতার জন্য সর্ব্বশক্তিমান মহান আল্লা আমাকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখেন নি। তাঁরই কৃপায় আমি পরাক্রমশালী শত্রুকে পরাজিত করে এই বিশাল হিন্দুস্থান জয় করার গৌরব লাভ করেছি। এই কৃতকার্য্যতা আমার নিজ শক্তিতে হয়েছে কিংবা আমার এই সৌভাগ্য আমার নিজের চেষ্টায় লাভ করেছি এরূপ আমি কখনই মনে করি না। আল্লার অপার করুণা ও অনুগ্রহের জন্যই এই গৌরব ও সৌভাগ্য লাভ করেছি।'

নিজেকে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে সমতালে তার ভারতকথা। লেখা চলেছে। পাণিপথের যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়ার পরই তাঁর আত্মকথায় হিন্দুস্থানের বিবরণ দিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে 'বাবরনামায় ভারত কথার' সূচনা এখান থেকেই।]

হিন্দুস্থানের বিবরণ

হিন্দুস্থান একটি ঘনবসতিপূর্ণ সমৃদ্ধশালী বিশাল দেশ। পূর্ব্ব, দক্ষিণ • এমন কি পশ্চিমদিকেও ঘিরে আছে সমুদ্র। উত্তরে সুউচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী যা হিন্দুকুশ, কাফেরিস্থান ও কাশ্মীরকে সংযুক্ত করেছে। উত্তর-পশ্চিমে কাবুল, গজনি ও কান্দাহার। সমগ্র হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী। সাহাবুদ্দিন ঘোরির মৃত্যুর পর (১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ) সুলতান ফিরোজ সার রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত (১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) হিন্দুস্থানের অধিকাংশই দিল্লীর সুলতানদের শাসনাধীনে ছিল।

আমার হিন্দুস্থান জয়ের সময় এই দেশ পাঁচজন মুসলমান বাদশাহের এবং দুইজন বিধর্ম্মীর শাসনাধীন ছিল। তাঁরা সকলেই স্বাধীন শাসক বলে বিখ্যাত ছিলেন। পার্ব্বত্য ও অরণ্য প্রদেশগুলিতে আরও অনেক রহিস্ ও রাজা ছিলেন, তবে তাঁদের বিশেষ কোনও খ্যাতি ছিল না।

(১) ভারতের রাজধানী দিল্লী আফগান সুলতানের দখলে ছিল। তাঁরা ভিরা থেকে বেহার পর্য্যন্ত দেশ শাসন করতেন। তাঁদের রাজত্বের পূর্ব্বে জৌনপুর সুলতান হোসেন সারকির অধীন ছিল। তাঁদের বংশকে হিন্দুস্থানে 'পুরবী' বংশ বলা হতো। তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষরা সুলতান ফিরোজ সা এবং তুঘলক সুলতানদের পেয়ালা বরদার ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তারা জেনিপুরে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে ওঠে। সেই সময় সৈয়দ বংশের সুলতাম আলাউদ্দিন (ওরফে আলম খাঁ) দিল্লীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দিল্লী অধিকার করার পর তাইমুর বেগ আলাউদ্দিনের পূর্ব্ব পুরুষের হাতে দিল্লী সমর্পণ করে চলে যান। সুলতান

ভুলাল লোদি এবং তাঁর পুত্র সেকেন্দার জৌনপুর রাজধানী ও দিল্লী রাজধানী অধিকার করার পর এই দুইটাকে একত্রিত করে একই রাজ্যরূপে শাসন করতে থাকেন (১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

(২) সুলতান মহম্মদ মুজাফফর গুজরাটের শাসক ছিলেন। সুলতান ইব্রাহিমের পরাজয়ের কিছুদিন পূর্ব্বেই তিনি এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান। তিনি আইনজ্ঞ এবং জ্ঞানান্বেষী ছিলেন এবং অনবরত কোরাণ নকল করতেন। তাঁর বংশকে এখানকার জনসাধারণ 'তঙ্ক' নামে অভিহিত করতো। তাঁর পূর্ব্বপুরুষরাও সুলতান ফিরোজ সা এবং অন্যান্য তুঘলক সুলতানদের সুরা পরিবেশকরূপে কাজ করতো। ফিরোজ খাঁর মৃত্যুর পর তারা গুজরাট অধিকার করে।

(৩) দাক্ষিণাত্যে বাহমণি সাম্রাজ্য। কিন্তু সেখানে এখন কোনও স্বাধীন রাজা ছিল না। তাদের পরাক্রমশালী বেগরা এই দেশের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে যে যার পছন্দমত টুকরো টুকরো করে ভাগ করে নিয়েছে।

(৪) মালওয়া প্রদেশের রাজা ছিলেন সুলতান মামুদ। এখানকার লোকেরা এ দেশকে মাণ্ডুও বলতো। তাঁর বংশকে বলা হয খিলিজি (তুর্ক)। রাণা সঙ্গ সুলতান মামুদকে পরাজিত করে' তাঁর রাজ্যের বেশীরভাগই অধিকার করে নেন। খিলিজি বংশও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। সুলতান মামুদের পূর্ব্বপুরুষরাও নিশ্চয় ফিরোজ শার অধীনে কাজ করতো। তাঁর মৃত্যুর পর তারা মালওয়া অধিকার করে।

(৫) নসরৎ সা এই সময়ে বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। তাঁর পিতাও বাংলার রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সৈয়দ সুলতান আলাউদ্দিন। বাংলা দেশের একটি বিশেষ রীতি এই যে, রাজসিংহাসন অধিকার করাটা উত্তরাধিকারত্বের উপর খুব কমই নির্ভর করে। রাজার জন্য অবশ্য একটি রাজসিংহাসন স্থির আছে। অনুরূপভাবে এক একজন আমিরের জন্যও পৃথক পৃথক আসন ও পদ নির্দ্ধারিত থাকে। এই রাজসিংহাসন এবং পদগুলিই বাংলার জনসাধারণের ভক্তি ও আনুগত্য আকর্ষণ করে। এইসব পদাধিকারীদের জন্য একদল অনুগত অনুচর, ভৃত্য এবং কর্ম্মচারীর গোষ্ঠি নির্দ্দিষ্ট থাকে। রাজা এই সব পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে কাউকে বরখাস্ত এবং তার স্থলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করলে তার স্থলাধিষ্ঠিত ব্যক্তিই এইসব ভৃত্য পরিচালকদের আনুগত্য লাভ করে। শুধু তাই নয় এই নিয়ম রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির প্রতিও প্রযুক্ত

হয়। যদি কোনও রাজাকে হত্যা করে কেউ রাজসিংহাসনে বসতে সফলকাম হয় তাহলে তাকে সকলেই তৎক্ষণাৎ রাজা বলে মেনে নেয়। সমস্ত আমির, মন্ত্রী, সৈন্য, প্রজাসাধারণ সঙ্গে সঙ্গেই তার বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাকেই পূর্ব্বাধিকারীর স্থলাভিষিক্ত বলে স্বীকার করে এবং সর্বপ্রকারে তাদের আনুগত্য জ্ঞাপন করে তার আদেশ অকুণ্ঠভাবে পালন করতে উৎসুক হয়। বাংলার অধিবাসীরা বলে থাকে—আমরা রাজসিংহাসনের প্রতি অনুরক্ত ও বিশ্বাসী। যে কেউ সিংহাসনে বসবেন আমরা তাঁরই অনুগত ও বাধ্য থাকবো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে নসরৎ সার পিতার বাংলার রাজতক্তে বসবার আগে একজন আবিসিনীয়াবাসী পূর্ব্বতন রাজাকে হত্যা করে নিজে বাংলার রাজ সিংহাসন অধিকার করে এবং কিছু সময় এই রাজ্যের শাসন পরিচালনা করে। সুলতান আলাউদ্দিন এই আবিসিনীয়াবাসীকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে বসেন এবং তাঁকেই বাংলার অধীশ্বর বলে জনসাধারণ স্বীকার করে নেয়। তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য তাঁর পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রেই সিংহাসন লাভ করেছে এবং এখনও রাজত্ব করছে।

বঙ্গদেশে আর ত্রকটি চলতি প্রথা আছে। এখানে কোনও রাজা যদি পূর্ব্বাধিকারীর সঞ্চিত ধনসম্পদ খরচ করে নিঃশেষ করে ফেলে কিংবা মজুদ অর্থ কমিয়েও ফেলে, তাহ'লে সেটা তার ঘৃণ্য নীচ কাজ বলে গণ্য করা হয়। প্রত্যেক রাজারই সিংহাসন অধিকার করার পর তার নিজের আমলে পৃথকভাবে ধন সঞ্চয় করতে হয়। এইভাবে ধনসম্পদবৃদ্ধি করা রাজার পক্ষে অতীব সম্মানজনক এবং মহিমা-ব্যঞ্জক কার্য্য বলে এখানকার জনসাধারণ মনে করে।

আর একটি প্রথাও এখানে চলিত আছে। পুরাকাল থেকেই এই নিয়ম বলবৎ যে প্রত্যেক বিভাগ—যেমন কোষাগার, আস্তাবল এবং রাজকীয় অন্যান্য দপ্তরের খরচ নির্ব্বাহের জন্য আলাদা আলাদা জেলা নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই নির্দ্দিষ্ট জেলার আয় থেকে এই সব দপ্তরের ব্যয় নির্ব্বাহ করতে হয়, অন্য কোনও তহবিল থেকে করবার নিয়ম নাই।

উপরে উল্লিখিত পাঁচজন মুসলমান রাজা হিন্দুস্থানে বিশেষ সম্মানের পাত্র। তাঁরা বহু সৈন্য এবং বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। বিধর্ম্মী রাজাদের মধ্যে বিজয় নগরের রাজা—তাঁর রাজ্যের আয়তন এবং সৈন্য-সংখ্যার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে সব চেয়ে বড়।

দ্বিতীয় হচ্ছে রাণা সঙ্গ—যিনি তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে নিজের শৌর্য্য

বীর্য্য এবং তরবারির জোরে পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নিজের দেশ চিতোর। মাণ্ডু সুলতানদের অধঃপতনের সময় তাদের অনেক অধীনস্থ প্রদেশ যেমন রন্তম্ভার, সারংপুর, ভিলসান এবং চান্দেরি রাণাসঙ্গ অধিকার করে নেন। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে আমি চান্দেরি বিধ্বস্ত করি এবং আল্লার দয়ায় কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধেই অধিকার করে নিই। রাণা সঙ্গের বিশ্বস্ত এবং ক্ষমতাবান অনুচর মেদিনী রায় এখানকার শাসক ছিল। এখানেই আমরা বিধর্ম্মীদের হত্যালীলায় মেতে উঠি। সে সম্বন্ধে পরে বলা হবে। যে স্থান বিধর্ম্মীদের সঙ্গে শক্রতার ক্ষেত্র ছিল সেই জায়গায় ইসলাম ধর্ম্মের ইমারত গড়ে ওঠে।

বিশাল হিন্দুস্থানে বিভিন্ন জায়গায় অনেক রহিস ব্যক্তি ও রাজা আছে। তাদের কেউ কেউ মুসলমান শাসনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, আবার কেউ কেউ কেন্দ্রস্থল থেকে অনেক দূরে থাকায় অথবা তাদের দেশ সুরক্ষিত হওয়ায় মুসলমান আধিপত্য স্বীকার করতে চায় না।

হিন্দুস্থানে ঋতু একটি-তুইটি-তিনটি। চতুর্থ বলতে আর কিছু নাই। এই দেশটা অদ্ভুত। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে এ দেশ সম্পূর্ণ পৃথক বলে মনে হয়। এর পর্ব্বত, নদী, বন, মরুভূমি, এর নগর, শস্যক্ষেত্র, এর পশুপক্ষী, গাছপালা, এর অধিবাসী আর তাদের ভাষা, এর বৃষ্টি এবং আবহাওয়া সবই ভিন্ন রকমের। কাবুলের অধীনস্থ কয়েকটি গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশের সঙ্গে এখানকার কিছু কিছু বিষয়ে মিল আছে, কিন্তু অন্য সব দেশের সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নাই। একবার সিন্ধু নদ পার হয়ে এপারে এলেই দেখা যাবে এখানকার মাটি, জল, গাছ, পাহাড়, জনসমাজ, যাযাবর—সকলেরই মরজি আর রীতিনীতি হিন্দুস্থানের পন্থানুযায়ীই চলেছে।

সিন্ধু নদ পূব দিক থেকে পার হয়ে আসার পর উত্তরের পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি দেশ দেখা যায়। এই দেশগুলি কাশ্মীরেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন যদিও এদের মধ্যে অনেকগুলি—যেমন পাকলি এবং সামাং কাশ্মীরের আধিপত্য মানে না। কাশ্মীরের বাহিরে অগণিত লোক, যাযাবর জাতি, পরগণা ও কৃষি-ক্ষেত্র আছে এই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে। বঙ্গদেশেই হোক কিংবা মহাসাগরের তটভূমি পর্য্যন্তই হোক, কোথায়ও অগণিত জনসংখ্যার বিরাম নাই। এই মানবগোষ্ঠির চলমান মিছিলের মধ্যে কেউই আমাদের অনুসন্ধান ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতে পারে নাই কারা এইসব পর্ব্বতে বাস করে। এইটুকু মাত্র বলে যে এই পাহাড়িয়াদের 'কাছ' বলা হয়। এটা আমি লক্ষ্য করেছি

যে হিন্দুস্থানীরা 'শ' কে 'ছ' বলে উচ্চারণ করে। পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে কাশ্মীর একটি সম্ভ্রান্ত জনপদ, অন্য কোনও নাম ওরা শোনেনি। হয়তো হিন্দুস্থানীরা সব জায়গাকেই 'কাছ্‌মির' বলে থাকে এবং সেই জন্য এই সব পার্ব্বত্য জাতিদের 'কাছ' বলে অভিহিত করে। পাহাড়ী লোকেরা কস্তুরি, জাফরাণ, সীসা ও তামার ব্যবসা করে।

হিন্দুরা এই পর্ব্বত শ্রেণীকে 'সোওয়ালাখ' (শিবালক) পর্ব্বত বলে। হিন্দুর ভাষায় সোওয়ালাখ অর্থ এক লাখ ও তার এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১,২৫,০০০। সুতরাং এখানকার একলাখ পঁচিশ হাজার পাহাড় নিয়ে 'সোওয়ালাখ' পর্ব্বত বলা হয়েছে এটা অনুমান করা চলে। এইসব পর্ব্বতে তুষার গলে না—অবিকৃত থাকে। দূর—যেমন লাহোর, সিরহিন্দ ও সম্বল থেকে পর্ব্বতের শুভ্র তুষার দৃষ্টি গোচর হয়। কাবুলের দিকের পর্ব্বত শ্রেণীকে হিন্দুকুশ বলা হয় যা কাবুল থেকে পূর্ব্বাভিমুখী হয়ে দক্ষিণ দিকে একটু বেঁকে হিন্দুস্থানে এসেছে। হিন্দুস্থানের দেশগুলি এর দক্ষিণ দিকে। তিব্বত এই পর্ব্বত শ্রেণীর উত্তরে। তিব্বতের অজ্ঞাত জাতিকেও 'কাছ' বলা হয়।

এই সব পর্ব্বত হিন্দুস্থানের অনেক নদীর উৎস স্থল। পর্ব্বত থেকে নেমে এসে হিন্দুস্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সিরহিন্দের উত্তর দিক থেকে ছয়টি নদীর উৎপত্তি হয়েছে—যথা সিন্ধু, বহত (ঝিলাম), চেনাব, রাবি, বিহাঁ এবং শতদ্রু। এই কয়টি নদীই মূলতানে এসে মিলেছে, তারপর সিন্ধু এই একক নামে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে নানা দেশের মধ্য দিয়ে এসে সমুদ্রে মিশেছে।

এই ছয়টি নদী ছাড়াও আরও নদী আছে—যেমন যমুনা, গঙ্গা, রহবা (রাপ্তি), গোমতি, গগর, সিরু, গণ্ডক এবং আরও অনেক। এই সমস্ত নদীই গঙ্গায় এসে মিশেছে, তারপর এই নামে পূর্ব দিকে এগিয়ে বঙ্গদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে এসে মিশেছে। এই সব নদীর উৎপত্তিস্থল 'সোওয়ালাখ' (শিবালক)।

হিন্দুকুশ পর্ব্বত থেকেও অনেক নদীর উৎপত্তি—যেমন চম্বল, বনাস, বিতাই এবং সোন। এই সব পর্ব্বতে বরফ নাই। এই নদী গুলো গঙ্গায় এসে মিশেছে।

হিন্দুস্থানের আর একটি পর্ব্বত শ্রেণী আরাবল্লী পর্ব্বত উত্তর দক্ষিণে বরাবর গিয়েছে। দিল্লী প্রদেশে একটি ছোট পাহাড়ের আকারে এর আরম্ভ। এই

পাহাড়ের উপর ফিরোজ সার প্রাসাদ ছিল—নাম 'জাহান-নামা'। এখান থেকে দিল্লীর কাছ পর্য্যন্ত দেখা যায় এখানে ওখানে ছড়ানো বিক্ষিপ্ত নীচু নীচু পাহাড়। মিওয়াৎ ছাড়িয়ে এই পাহাড় শ্রেণী বিয়ানা প্রদেশে প্রবেশ করেছে। শিক্রি, বারি, ঢুলপুর পাহাড়গুলি এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। গোয়ালিয়রের পাহাড়গুলি যদিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় না তবে বাস্তবিক পক্ষে ওগুলি ঐ শ্রেণীরই প্রশাখা। এই রকম প্রশাখা হচ্ছে রন্তম্ভোর, চিতোর, চান্দেরি এবং মাণ্ডুর পাহাড়গুলি। কোনও কোনও জায়গায় মূল শাখা থেকে এগুলি সাত আট ক্রোশ তফাৎ। পাহাড়গুলি খুবই নীচু, কর্কশ, পাথুরে এবং জঙ্গলে ভর্ত্তি। এখানে কখনই তুষারপাত হয় না। হিন্দুস্থানের অনেক নদীর জনক এই পাহাড়গুলি।

সেচের ব্যবস্থা—হিন্দুস্থানের বেশীর ভাগ অংশই সমতল ভূমি। যদিও এখানে অনেক জনপদ এবং কৃষিক্ষেত্র আছে—কিন্তু সেচের জন্য কোনও খাল নাই। নদী এবং কোনও কোনও জায়গায় বদ্ধ জলাশয়ের ওপর সেচ ব্যবস্থা নির্ভরশীল। এমন অনেক সহর আছে যেখানে খাল কেটে জল আনা যায় অনায়াসে, কিন্তু সে রকম কোনও ব্যবস্থা করা হয় না। এইভাবে সেচ ব্যবস্থা না করার হয়তো অনেক অর্থ আছে—একটা বোধ হয় এই যে শস্য চাষ অথবা উদ্যান রচনার জন্য এখানে সেচের জলের প্রয়োজন হয় না। হেমন্তকালীন শস্য বৃষ্টির জলেই জন্মে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে বসন্তকালীন শস্য বৃষ্টির জল না পেলেও হয়ে থাকে। ছোট ছোট চারা গাছে বালতিতে কিংবা চরকি কলে জল দেওয়া হয়। দুই তিন বছর চারা গাছগুলিতে প্রতিদিনই জল দিতে হয়—তারপর অবশ্য আর প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি সবজি গাছে অনবরত জল সিঞ্চন দরকার।

লাহোর, দিবলপুর এবং কাছাকাছি জয়গায় কৃষকরা চাকার সাহায্যে ক্ষেতে জল দেয়। তারা দড়ি দিয়ে দুইটি বৃত্ত তৈয়ারী করে কূপের গভীরতার মাপে। এই বৃত্ত দুইটির মাঝখানে কাষ্ঠ খণ্ড ফেলে তার ওপর জল তোলার কলসী শক্ত করে বাঁধে। কুয়োর চাকার ওপর দড়িগুলো সমেত কলসী বাঁধা কাঠ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই চাকার অক্ষের একদিকে দ্বিতীয় একটি চাকা বসানো থাকে। আর তারই কাছাকাছি আর একটি চাকা থাকে যার অক্ষ উপরের দিকে খাড়া। এই শেষের চাকাটি বলদের গলার দড়ির সংলগ্ন। বলদ দড়িতে টান দিলে শেষোক্ত চাকাটির দাঁতগুলো দ্বিতীয় চাকার সঙ্গে আটকে যায়।

বলদের টানে জলভরতি কলসীগুলি ওপরে ওঠার পর কুয়োর পাশে রাখা লম্বা সরু পাত্রে সেই জল গড়িয়ে পড়ে। এইখান থেকে জল নিয়ে ক্ষেতে দেওয়া হয়।

আগ্রা, চন্দওয়ার, বিয়ানি এবং তার পাশাপাশি জায়গায় কৃষকরা বালতি করে ক্ষেতে জল দেয়। এটা একটা কষ্টসাধ্য জঘন্য ব্যবস্থা। কুয়োর ধারে সাঁড়াশির মত করে আড়াআড়ি ভাবে কাঠ পোঁতা হয়। মধ্যে থাকে একটা চরখি। একটা লম্বা দড়ির একপাশে একটা বড় বালতি বাঁধা হয় এবং দড়িটি চাকার মধ্যে বসানো হয়। দড়ির অন্য পাশ বলদের গলার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। একজন লোক বলদ চালায় ও আর একজন লোক জল ভরতি বালতি উঠলে জল ঢেলে নেয়। যতবারই বলদ দড়ির সাহায্যে কূপ থেকে বালতি তোলে সেই লম্বা দড়ি বলদের চলার পথে মাটিতে হেঁচড়াতে থাকে এবং সেটা আবার কুয়োর মধ্যে প্রবেশ করার আগে মূত্র ও গোময়ে মাখামাখি হয়ে দূষিত হয়। কোনও কোনও শস্যক্ষেত্রে অনেক সময় মানুষই বারংবার ঘড়া ঘড়া জল বয়ে নিয়ে ক্ষেতে জল দেয়।

—২—

হিন্দুস্থানের অন্যান্য বিবরণ

হিন্দুস্থানের নগর বা পল্লী—কোনওটাতেই মন আকর্ষণ করার মত কিছু নাই: সহর ও ফাঁকা জমি সব একরকমের—একঘেয়ে। উদ্যানের চরেপাশে কোনও বেড়া নাই। অধিকাংশই সজীবতাহীন সমতল ভূমি। বর্ষাকালে বৃষ্টির ধারায় কোনোও কোনও নদী ও স্রোতস্বতীর তীর প্লাবিত হয়ে নানাস্থানে গভীর নালার সৃষ্টি করে। এমন হয় যে সেগুলি পার হয়ে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া কষ্টকর হয়। সমতলভূমির অনেকাংশ কাঁটা ও জঙ্গলে ভরা। এই সব সুন্দর সুরক্ষিত জায়গায় পরগণায় যে সব লোক থাকে তারা বিদ্রোহী হয়ে রাজকর দেয় না।

এখানে ওখানে নদী ও বদ্ধ জলাশয় ছাড়া কোনও খাল নালা নাই। ব্যাপারটা এই যে সহর অথবা পল্লীর লোক কূপের জল—না হয় পুষ্করিণীতে বর্ষায় যে জল জমা হয় সেই জলের ওপর নির্ভর করে।

হিন্দুস্থানে ছোট বড় গ্রাম অথবা সহর একমুহূর্তে জনশূন্য—আবার এক মুহূর্তে

ভরতি হয়ে যেতে পারে। একটা বড় সহরের বাসিন্দারা যারা সেখানে অনেকদিন থেকে বাস করছে তারা যদি সহর ছেড়ে পালিয়ে যায়, তারা এমনভাবে সেটা করে যে তাদের কোনও চিহ্ন বা নিশানা সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে তাদের যদি এমন কোনও জায়গায় উপর দৃষ্টি পড়ে যে সেখানে তারা বাস করতে ইচ্ছুক, তাহলে তাদের জলের খাল খনন ও বাঁধ তৈরীর কোনও প্রয়োজন হয় না—কারণ তাদের খাদ্যশস্য বৃষ্টির জলেই জন্মায়।

হিন্দুস্থানের জনসংখ্যা এমন বিপুল যে যেখানেই তারা বাসস্থান ঠিক করে সেখানেই পালে পালে লোক এসে হাজির হয়। তারা হয়তো একটা পুষ্করিণী খনন করে নেয়। তাদের বাড়ী তৈরীরও হাঙ্গামা নাই। ছাউনির ঘাস, বাঁশ ও কাঠ অনেক পাওয়া যায়। তাই দিয়ে অসংখ্য কুটির তৈরী হয়ে যায় এবং সোজাসুজি একটা গাঁ বা সহর গড়ে ওঠে।

হিন্দুস্থানের পশু

হিন্দুস্থানের যে জন্তুকে হাতী বলা হয় তার অনেক বিশেষত্ব। কাল্পি প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে এদের বাস। বুনোহাতীর সংখ্যাই উত্তরোত্তর বাড়তির দিকে দেখা যায়—যদি আরও পূর্ব্বদিকে কেউ যায়। এখান থেকে হাতী ধরা হয়। কারা এবং মানিকপুরের ত্রিশ চল্লিশটি গ্রামের লোক হাতী ধরার কাজ করে। তারা কত হাতী ধরলো তার হিসাব সরকারকে দিতে হয়। হাতি বিশালকায় জন্তু এবং খুবই বুদ্ধিমান। যদি কেউ তাকে কিছু বলে তাহলে সে সব বুঝতে পারে। যদি তাকে কিছু করবার জন্য হুকুম করা হয় তাহলে সে সেই হুকুম পালন করে। এর আকার অনুসারে মূল্য। হাতীকে মাপজোক করে মূল্য স্থির করার রেওয়াজ আছে। হাতী যত বড় তার মূল্যও তদনুপাতে বেশী। জনশ্রুতি এই যে কোনও কোনও দ্বীপে হাতীর উচ্চতা দশ 'কারি' (এক রকমের মাপ), কিন্তু এই দেশে চার পাঁচ 'কারির' বেশী উচু হাতী চোখে পড়ে না। হাতী শুঁড় দিয়ে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে। যদি এর শুঁড় না থাকে তাহলে বাঁচতে পারে না। ওপরের চোয়াল থেকে বড় বড় দাঁত শুঁড়ের দুই পাশ দিয়ে বেরিয়েছে। দেওয়াল কিংবা গাছের সঙ্গে সেই দাঁত লাগিয়ে হাতী ওগুলো উপড়ে ফেলতে পারে। এই দাঁত দিয়েই হাতী যুদ্ধ কিংবা যে সব কঠিন কাজ তাকে করতে হয় তা করে থাকে।

এর দাঁতকে গজদন্ত বলে। হিন্দুস্থানীরা হাতীর দাঁতকে খুব মূল্যবান মনে করে। হাতীর চুল নাই। যে সৈন্যদলের সঙ্গে হাতী থাকে তাদের খুবই ভরসা। হাতীর অনেক প্রয়োজনীয় গুণ আছে—যেমন, বিশাল নদী সাঁতার দিয়ে পার হওয়া, বড় ভারি মাল বহন করা। যে কামান বা ভারী অস্ত্রশস্ত্রবাহী শকটগুলি টানতে চার পাঁচশ লোকের দরকার সেগুলো তিন চারটে হাতী টানতে পারে। একটা হাতি এমন পরিমাণ শস্য খায় যা পনেরোটা উট খেতে পারে।

হিন্দুস্থানের আর এক জন্তু—গণ্ডার, এরও শরীর প্রকাণ্ড। আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত আছে যে একটা গণ্ডার তার শিং দিয়ে একটা হাতীকে উপরে তুলতে পারে। কিন্তু এরূপ ধারণার সম্ভবত কোনও মূল্য নাই। গণ্ডারের নাকের উপর একটা শিং উঁচু দিকে এক বিঘত খাড়া—দুই বিঘত উঁচু গণ্ডারের শিং আমার চোখে পড়েনি। যাই হোক, একটা বড় শিং দিয়ে আমি একটা পানপাত্র, একটা পাশা খেলার ঘুঁটি ফেলার বাক্স তৈরী করেও তিন চার আঙ্গুল পরিমাণ শিং-এর অংশ অবশিষ্ট ছিল। গণ্ডারের চামড়া খুব পুরু। কোনও জোরালো ধনুকের জ্যা বগল পর্য্যন্ত সজোরে টেনে যদি তীর নিক্ষেপ করা যায় এবং যদি এই তীর চামড়ায় বিদ্ধও হয় তাহলে তিনি চার আঙ্গুলের মত একটা ক্ষত হতে পারে। এখানকার অনেকে অবশ্য বলে থাকে যে, গণ্ডারের দেহের কোনও স্থানে এমন চামড়া আছে যখানে তীর বিদ্ধ হলে আরও গভীরে যেতে পারে। গণ্ডারের কাঁধের হাড়ের দুই পাশে এবং দুই উরুতে এমন চামড়ার ভাঁজ আছে যা দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন কাপড়ের টুকরো ঝলঝল করে নড়ছে। গণ্ডারের সাদৃশ্য অন্য সব পশুর চেয়ে ঘোড়ার সঙ্গে বেশী। ঘোড়ার যেমন পেট বড় গণ্ডারেরও তাই। ঘোড়ার সামনের পা যেমন অস্থিময় গণ্ডারেরও সেইরকম। হাতীর চেয়ে গণ্ডার বেশী হিংস্র। হাতীকে পোষ মানিয়ে বাধ্য করা যায়, গণ্ডারকে সে রকম করা কঠিন। পারসাওয়ার ও হাসনাঘরের জঙ্গলে এবং সিন্ধু নদ ও মেহেরার মধ্যের জঙ্গলে প্রচুর সংখ্যায় গণ্ডার দেখা যায়। হিন্দুস্থানে সারু নদীর আশে পাশে অনেক গণ্ডার দেখা যায়। হিন্দুস্থানে অভিযানের সময় পারসাওয়ার ও হাসনাঘরের জঙ্গলে আমি প্রয়াই গণ্ডার শিকার করেছি। এরা শিং দিয়ে খুব জোরে গুতোতে পারে, যার ফলে আমার শিকারের সময় অনেক লোক এবং ঘোড়া আহত হয়েছে। একবার শিকারের সময় মকসুদ নামে একজন যুবকের ঘোড়াকে শিং

দিয়ে এমন গুতোয় যে একটা বর্শার ফলার সমান ভীষণ ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সেই ঘটনার পর থেকে যুবকের নাম হয়ে যায় গণ্ডার মকসুদ।

আর একটি জন্তু হচ্ছে বুনো মোষ। সাধারণ গৃহপালিত মোষের চেয়ে এর দেহ বড়। এর শিং সাধারণ মোষের মতই। এরা অত্যন্ত সাংঘাতিক ও হিংস্র।

আর এক রকমের জন্তু নীল-গৌ (গাই)। উচ্চতায় এরা প্রায় ঘোড়ার সমান। ঘোড়ার চেয়ে এরা কিছু শীর্ণ; পুরুষ-গৌ নীলাভ, সেই জন্যই এদের নীল গৌ বলা হয়। এর দুটো ছোট ছোট শিং এবং ঘাড়ের ওপর চুল আছে। ঘাড়ের নীচের দিকে খুব ঘন চুলের গোছা, যা দেখতে অনেকটা পাহাড়ি গাইয়ের চুলের গোছার মত। এর লেজ ষাঁড়ের মত। স্ত্রী-গৌদের গায়ের রং গওয়া-জেন্ হরিণের মত। স্ত্রী-গৌদের শিং নাই, ঘাড়ের নীচে চুলও নাই। পুরুষ-গৌয়ের চেয়ে স্ত্রী-গৌয়ের শরীর কিছু মোটা সোটা।

আর এক জন্তুর নাম—কোটা-পইচে অর্থাৎ খাটোপা শূকর হরিণ। এরা আয়তনে অনেকটা শ্বেত হরিণের সমান। এদের সামনের পা দুটো ও উরু ছোট এবং সেইজন্যই এর নাম হয়েছে খাটো পা শূকর হরিণ। শৃঙ্গি হরিণের মত অতটা না হলেও এদেরও শিং শাখা-প্রশাখা যুক্ত। পুরুষ হরিণের মত এরাও শিং এর খোলস ছাড়ে। এই জাতীয় হরিণ ভাল দৌড়াতে পারে না। সেই জন্য জঙ্গল ছেড়ে আসতে চায় না।

আর এক জাতের হরিণ আছে যার পিঠ কালো। পেটের রং সাদা, শিং খুব লম্বা ও বাঁকা। হিন্দুস্থানীরা এই জাতের হরিণকে বলে—'কাল হরে।' কাল হরে কথাটার অর্থ সম্ভবতঃ কালা হরিণ অর্থাৎ কাল রঙের হরিণ। কালা হরিণ থেকেই কালহরে হওয়া সম্ভব। পোষা কালহরে হরিণের সাহায্যে এখানকার লোক বুনো হরিণ ধরে। কালহরের শিং এ তারা গোলাকার জাল বেঁধে দেয় এবং একটা ফুটবলের চেয়েও বড় পাথর পেছনের একটা পায়ের সঙ্গে বেঁধে রাখে। তার অর্থ এই যে তার সাহায্যে অন্য হরিণ ধরা পড়লে সে যেন দূরে চলে না যেতে পারে। কোনও বুনো হরিণ দেখা গেলে পোষা হরিণটাকে তার সম্মুখে আনা হয়। সে শিং উচিয়ে ঢু মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে বুনোটার দিকে এগিয়ে যায়। এই জাতের হরিণ লড়াই করতে ভাল বাসে এবং শিং দিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ধাওয়া করে। দুই পক্ষ যখন পরস্পরকে শিং দিয়ে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করে তখন একবার পিছিয়ে একবার এগিয়ে

যাওয়ার সময় যে জালটা পোষা হরিণের শিং এ বাঁধা থাকে সেই জালে বুনো হরিণের শিং জড়িয়ে যায়। যদিও বুনো হরিণটা পালিয়ে যাওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করতে থাকে—কিন্তু পোষা হরিণটা মোটেই পালানোর কোনও উদ্যম দেখায় না। তা ছাড়া, পায়ে পাথর বাঁধা থাকার জন্য তার গতিও বাধা প্রাপ্ত হয় এবং সেই কারণে বুনোটার পালান কঠিন হয়ে পড়ে। এই ভাবে অনেক বুনো হরিণ ধরা পড়ে এবং পরে তাদের পোষ মানানো হয়। এই পদ্ধতি ছাড়াও জাল দিয়ে ঘিরেও অনেক হরিণ ধরা হয়ে থাকে। এখানকার লোকেরা হরিণ ধরে পোষ মানিয়ে নিজেদের ঘরে বসে হরিণের লড়াই দেখে। হরিণের লড়াই দেখতে খুব ভাল লাগে।

হিন্দুস্থানের পর্ব্বতের ধারে ধারে আর এক রকমের ছোট জাতের হরিণ দেখা যায়। এদের শরীরের আয়তন এক বছর বয়সের ভেড়ার সমান।

আর এক জাতের হরিণের নাম গৌ-গিনি। এরা এদেশের ছোট জাতের গরুর মত, আর আমাদের দেশের বড় জাতের ভেড়ার মত। এর মাংস খুব নরম ও সুস্বাদু।

আর একজাতের জন্তু আছে যাদের হিন্দুস্থানীরা বাঁদর বলে। বাঁদরের অনেক রকম—জাত। এক রকমের বাঁদর আমাদের দেশে নিয়ে যেতে দেখা যায়। বাজিকররা এদের দিয়ে নানা রকমের খেলা দেখায়। নূরদরার পার্ব্বত্য প্রদেশে, খাইবারের নিকটবর্ত্তী সফিদ কো'য় পাহাড়ের প্রান্তদেশে, এবং সেখান থেকে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত বাঁদর দেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের খুব ওপরে এরা থাকে না। এর গায়ের চুল পীতাভ, মুখ সাদা এবং লেজ খুব লম্বা হয়। আর এক রকমের জাত হিন্দুস্থানে দেখা যায়, যেগুলো বাজুর, সাওয়াদ বা তার কাছাকাছি জায়গায় চোখে পড়ে না। আমাদের দেশে যে বাঁদর নিয়ে যাওয়া হয় তার চেয়ে এগুলো অনেক বড়। এর লেজ খুব লম্বা চুল সাদাটে এবং মুখ গভীর কালো। হিন্দুস্থানের পাহাড়ে জঙ্গলে এদের দেখা যায়। আর এক জাত আছে যাদের চুল, মুখ ও শরীর সবই কালো।

নেউল আর একরকমের জন্তু। 'কিশ'-এর চেয়ে এগুলো আকারে ছোট। এরা গাছে চড়ে। অনেকে এর নাম বলে মুস-ই-খুরমা (তালগাছের ইঁদুর)। এগুলো দেখানাকি সৌভাগ্যরচিহ্ন।

ইঁদুর জাতের আর এক রকম প্রাণী আছে যাদের গাচ্‌রি (কাঠ বেড়াল)

বলা হয়। এরা প্রায় সব সময়েই গাছে থাকে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এরা গাছ থেকে ওঠা-নামা করে।

হিন্দুস্থানের পাখী

ময়ূর—এর রং অতি চমৎকার। এর গঠন-সৌন্দর্য্য এর রংয়ের মত নয়। ময়ূর আকারে হয়তো সারস পাখীর মত হতে পারে, কিন্তু অতটা লম্বা নয়। ময়ূরীদের রংয়ের বাহার নাই। ময়ূরের মাথায় রামধনুর রং। গ্রীবায় সুন্দর নীল ও বেগুনি রংয়ের সমাবেশ। পিঠের ওপরের চক্রগুলি ছোট ছোট, কিন্তু যত নীচে নেমে এসেছে সেগুলো ক্রমশঃ তত বড় হয়ে উঠেছে। তবে রংয়ের বাহার পুচ্ছের শেষ পর্য্যন্ত একই রকমের। কোনও কোনও ময়ূর পুচ্ছ মেললে তার মাপ মানুষ দুই হাত বিস্তার করলে যতটা হয় ততটা। এর চিত্রিত পুচ্ছের নীচে অন্য পাখীর মত একটা সাধারণ ছোট লেজ আছে। এই ছোট লেজের পালকের প্রান্তগুলি লাল রংয়ের। বাজুর, সাওয়াদ এবং তারও নীচের দেশ-গুলিতে ময়ূর দেখা যায়, কিন্তু কুনার কিংবা লামঘানাতে অথবা তার উপরের দেশগুলিতে ময়ূর দেখা যায় না। ফেজেণ্ট পাখীর চেয়েও ময়ূরের ওড়ার শক্তি কম। দুই একবারের বেশী ছোট রকমের ওড়াও এদের সাধ্যে কুলায় না। ওড়বার ক্ষমতা সীমিত থাকায় এরা পাহাড়ে ও জঙ্গলেই ঘুরে বেড়ায়। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার—যে জঙ্গলে শেয়াল বেশী সেখানে ময়ূরও ঘুরে বেড়ায় বেশী। শেয়ালরা এই সব ময়ূরের কতই না ক্ষতি করতে পারে যেখানে তাদের লেজ মানুষের দুই হাতের মত লম্বা। ইমাম আবু হানিফার মতে ময়ূরের মাংস অনুমোদিত খাদ্য। এর মাংস অনেকটা তিতিরের মাংসের মত এবং খেতেও বিস্বাদ নয়। তবে উটের মাংস খেতে যেমন রুচি হয় না, এর মাংসও অনেকটা সেইরকম অরুচিকর।

তোতা—এই পাখী বাজুর এবং তার নীচের দেশগুলিতেও চোখে পড়ে। গ্রীষ্মকালে যখন তুঁত ফল পাকে, তখন এদের সিংনাহার এবং লামঘানাতেও দেখা যায়। অন্য সময় এরা এখানে থাকে না। এই পাখী নানারকমের জাতের আছে—আর এক জাতের আছে যেগুলো এই দেশ থেকে আমাদের দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। এই পাখীকে কথা বলতে শেখানো হয়। এদের বলে জঙ্গলি তোতা। বাজুর, সাওয়াদ এবং এর নিকটবর্ত্তী দেশে প্রচুর তোতা পাখী দেখা

যায়—এমন কি এদের পাঁচ ছয় হাজারের উড়ন্ত ঝাঁকও চোখে পড়ে। জঙ্গলি তোতা এবং আর একরকমের তোতার কথা যা সর্ব্ব প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে শুধু দেহের আয়তনের দিক দিয়ে। পালকের রং কিন্তু হুবহু এক। আর এক রকমের জাত আছে যেগুলো জঙ্গলি তোতার চেয়েও ছোট। এদের মাথা লাল রংয়ের এবং ডানার ওপরের অংশও লাল। এর পুচ্ছের প্রান্তভাগ দশ আঙ্গুল চওড়া এবং উজ্জ্বল রং বিশিষ্ট। এই জাতের কোনও কোনও পাখীর মাথা রামধনু রংয়ের। এগুলো কথা বলতে শেখে না। এ দেশের লোকেরা এদের বলে—কাশ্মীরী তোতা।

আর এক জাতের তোতা আছে তারাও জঙ্গলি তোতার চেয়ে আকৃতিতে ছোট। এর চক্ষু কালো এবং গ্রীবায় কালো রংয়ের বন্ধনী। এর ডানা লাল রংয়ের। এরা খুব সুন্দর কথা বলতে শেখে। আমাদের ধারণা ছিল যে তোতা কিংবা সারককে (ময়না) যে কথা বলতে শেখানো হয় শুধু সেইগুলিই বলতে পারে অন্য কোনও বুলি তাদের মগজে আসে না। একবার আমার একজন বিশ্বাসী ভৃত্য—তার নাম আবুল কাশেম জানোয়ার—আমাকে এক অদ্ভুত কথা শোনায়। কথা বলতে পারে এমন একটা তোতার খাঁচা নিশ্চয়ই কাপড়ে ঘেরা ছিল। সে হঠাৎ বলে ওঠে—কাপড়ের ঢাকনি খুলে দাও, আমার দম আটকে আসছে। যে এই কথা আমাকে জানায় ·তাকে বিশ্বাস করা না করা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। তবে নিজের কানে না শুনলে একথা বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন।

আর এক জাতের তোতা আছে যাদের রং গাঢ় লাল। অন্য রংয়েরও এ জাতের পাখী আছে কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না—সেই জন্য তাদের বর্ণনা দিতে পারলাম না। যাহোক, এ জাতের পাখী রংয়ে ও আকৃতিতে খুবই সুন্দর। এদের কথা বলতে শেখানো হয়। কিন্তু দোষ হচ্ছে যে এদের গলার স্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ—ঠিক তামার থালায় ভাঙ্গা চিনা মাটির বাসন টেনে নিয়ে গেলে যেমন শব্দ হয় অনেকটা সেইরকম।

সারক (ময়না)—এই পাখী লামঘানাত ও তার নীচের দেশ হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র প্রচুর দেখা যায়। এ পাখীও নানা ধরণের হয়। লামঘানাতে এই জাতের যে পাখী অসংখ্য দেখা যায় তার মাথা কালো এবং ডানাগুলো দাগ-বিশিষ্ট। তুর্কির 'চুখুর চিক্' পাখীর চেয়ে এরা আকৃতিতে বড় এবং মোট। এদের কথা বলতে শেখানো হয়।

গিঙাওয়ালি নামে আর এক জাতের ময়না বঙ্গদেশ থেকে আনা হয়। এরা আকারে সারকদের চেয়ে বড়। এর চঞ্চু ও পা পীতবর্ণের এবং প্রত্যেক কানে পীতবর্ণের চামড়ার ঝুলি আছে যা দেখতে কুশ্রী। এ পাখী খুব পরিষ্কার কথা বলতে পারে।

আর এক রকমের সারক আছে যার শরীর অপেক্ষাকৃত শীর্ণ এবং তার চোখের চার ধারে লালরংয়ের রেখা আছে। এ গুলো কথা বলতে পারে না। লোকে এগুলোকে বলে-বুনো সারক।

যখন আমি ৯৩৪ হিজরি সনে গঙ্গার ওপর সেতু তৈরী করে গঙ্গা পার হয়ে শত্রুদের বিতাড়িত করি সেই সময় লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যার কাছাকাছি জায়গায় একরকম সারক প্রথম দেখি—যার বুক সাদা, মাথা নানা রংয়ের এবং পিঠ কালো। এই জাতের পাখী কথা বলতে পারে না।

লুজ্ আর এক রকমের পাখী। আরবিতে এই পাখীকে 'বু-কালামুন' (গিরগিটি জাতীয়) বলে। কারণ-এর মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত, পায়রার মাথার মত পাঁচ ছয় রকমের রং আছে যা অনবরত বদলায়। কাবুল দেশের নিগার-অ' পর্ব্বতে এবং তার নীচু দিকের পাহাড়ে এই পাখী দেখা যায়, ওপরের দিকে দেখা যায় না। এই পাখী সম্বন্ধে অদ্ভুত কথা শোনা যায়। যখন এই পাখী শীতের প্রারম্ভে পাহাড়ের প্রান্তে এসে নামতে থাকে এবং তখন যদি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ওপর এসে পড়ে তাহলে আর উড়ে যেতে পারেনা এবং এই সময় তারা ধরা পড়ে। আল্লা জানেন-এই কথার মধ্যে সত্য কতখানি। এই পাখীর মাংস খুবই সুস্বাদু।

দুররাজ (তিতির)—এ পাখী শুধু হিন্দুস্থানেরই বিশেষত্ব নয়। দক্ষিণ আফগানিস্থানেও এ পাখী দেখা যায়। তবে এর কয়েকটি জাত হিন্দুস্থানেই দেখা যায়। তার সম্বন্ধেই বলা হবে। দুররাজের আকার কিক্লিকের মত। পুং তিতিরের পিঠের রং স্ত্রী-ফেজেণ্টের পিঠের রং এর মত। এর গ্রীবা ও বুক কালো—তাতে সাদা রংয়ের ফুটকি। লাল রংয়ের রেখা দুই চোখের দুই পাশ দিয়ে নেমে এসেছে। এর বুলি হচ্ছে শির দিরাম-সাকরাক। (অর্থ—আমার দুধও আছে চিনিও আছে)। শির কথাটা এরা আস্তে এবং দিরাম্ সাকরাক শব্দ জোরে পরিষ্কার ভাবে উচ্চারণ করে। আস্তারাবাদের তিতির 'বাল-মিমি তুতিলার (অর্থ আমাকে ধরে ফেলেছে শীগ্‌গির এস) বলে চেঁচায়। আরব

দেশের তিতিরের বুলি নাকি—'বিল শকর তদম অল মিয়াম' (অর্থ, চিনি থাকলেই স্ফূর্তির অভাব হয় না)।

স্ত্রী-তিতিরের গায়ের রং ফেজেণ্ট শাবকের মত। এই পাখী নিগরঅ'র নীচের দেশেও দেখা যায়।

আর এক রকমের জাত আছে যাকে 'কানিয়াল' বলা হয়। আকৃতিতে এরা উপরি উল্লিখিত জাতেরই মত। এর কণ্ঠস্বর কিকলিক পাখীর মত কিন্তু স্বর তার চেয়ে তীক্ষ্ণ। এ জাতের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে রংয়ের কোনও তফাৎ নাই। এই পাখী পরা-শাওয়ার, হাস্‌নাঘর এবং তার নীচের দেশগুলোতে দেখা যায়, কিন্তু ওপরের দিকে নয়।

ফুল পাইকার (সম্ভবতঃ এ পাখী ধূসর রংয়ের তিতির)—এর আকৃতি কবজ্‌ ই-তুরি পাখীর মত। এর চেহারার সঙ্গে গোবর-গাদার মোরগের সাদৃশ্য আছে। এর রং মুরগীর মত কপাল থেকে বুক পর্য্যন্ত এর রং উজ্জ্বল লাল। এ পাখী হিন্দুস্থানের পার্ব্বত্য দেশেই দেখা যায়।

মুরগে-এ-সারা (বনমুরগী)—এই পাখীর সঙ্গে গৃহপালিত মুরগীর তফাৎ এই যে এরা ফেজেণ্ট পাখীর মত উড়তে পারে। গৃহপালিত মোরগের মত এরা নানা বর্ণের নয়। বাজুরের পার্ব্বত্য দেশে এবং তার নীচের দিকের দেশে এ পাখী দেখা যায় কিন্তু উপরের দিকে দেখা যায় না।

চেল্‌সি—এই পাখীও ফুল পাইকারের মত। কিন্তু ফুল পাইকারের রং বেশী সুন্দর। বাজুরের পার্ব্বত্য দেশে এ পাখী দেখা যায়।

শ্যাম—এরা আকারে সাধারণ মোরগের মত। গায়ের রং নানা রকমের। এ পাখীও বাজুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে দেখা যায়।

বুদিনে —(তিতির জাতীয় পাখী)—এই পাখী হিন্দুস্থানের বৈশিষ্ট্য নয় তবে চারপাঁচ রকমের এই জাতীয় পাখী হিন্দুস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এই পাখীর এক রকমের জাত আমাদের দেশেও যেতে দেখা যায়। তবে সেগুলো সাধারণ বুদিনের চেয়ে দেখতে বড়। আর এক রকমের জাত আছে সেগুলো আমাদের দেশে যে ধরণের পাখী দেখা যায় তার চেয়ে ছোট। এর ডানা ও লেজের রং রক্তাভ। চির পাখীর মত বুদিনের উড়ন ভঙ্গী।

এছাড়া এই জাতীর আর এক রকমের পাখী আছে। সেগুলোও আমাদের দেশে যে পাখী যায় তার চেয়ে আকারে ছোট। এর বুকের এবং গলার রং

সাধারণত কালো। আর এক জাত আছে যে গুলো কদাচিৎ কাবুলে যায়। এগুলো আকারে 'কারচে' পাখীর চেয়ে বড়। কাবুলিরা এ পাখীকে কুরাতু বলে।

খরচাৎ (পারসা)—এ পাখীর আকার তুাক দেশের তুখ্‌তাক পাখীর মত একে হিন্দুস্থানের তুখ্‌তাক পাখীও বলা যায়। এর মাংস সুস্বাদু। কোনও কোনও পাখীর পা এবং কোনও কোনও পাখীর ডানা খেতে ভাল। মোটের উপর এই পাখীর দেহের সমস্ত অংশের মাংসই উপাদেয়।

চারজ্‌ (পারসী)—তুঘদিরি পাখীর চেয়ে এ পাখী আকারে ছোট। পুং-জাতীয় পাখী তুঘদিরি পাখীর মত, তবে এর বুক কালো। স্ত্রী-জাতীয় পাখীর রং একই রকমের।

বাঘ্‌রি-কারা (পাহাড়ি পায়রা)—পশ্চিমের বাঘ্‌রিকারা পাখীর চেয়ে হিন্দুস্থানের এই পাখী আকারে ছোট ও রোগা এবং স্বরও তীক্ষ্ণ।

দিং—জলে এবং নদীর তীরে যে সব পাখী দেখা যায় তার মধ্যে দিং একটি। এরা ওজনে খুব ভারী, এর প্রতিটি ডানা মানুষের মত লম্বা। এর মাথায় কিংবা গলার কোনও লোম নাই। একটা থলের মত জিনিষ এর গলা থেকে ঝোলে। এর পিঠ কালো, বুক সাদা। এই জাতের পাখী মাঝে মাঝে কাবুলেও যায়। এক বছর এই পাখী একটা ধরে আমার কাছে নিয়ে আসে। পাখীটা খুব পোষ মেনেছিল। এর দিকে খাদ্য ছুঁড়ে দিলে ঠোঁটের ফাঁকে সেটা লুফে নেয়, কোনও সময়েই বিফল হতো না। একবার ছয়টা নাল লাগানো জুতা এবং আর একবার সাদা মোরগ পাখা ও লোম সহ আস্ত গিলে ফেলে।

সারস—হিন্দুস্থানবাসী তুর্কিরা একে বলে তিওয়া তার্ণা (উট সারস)। দিং এর চেয়ে এ পাখী আকৃতিতে ছোট হতে পারে কিন্তু গলা লম্বা। এর মাথা লাল। লোকে এই পাখী বাড়ীতে রাখে। এরা খুব পোষ মানে।

মানেক (মাণিক জোড়)—এ পাখীর উচ্চতা সারস পাখীর মত কিন্তু আকারে ক্ষীণ। মাণিক জোড় এক রকমের সারস পাখী বলেই বোধ হয়। সারস পাখীর চেয়ে এর ঠোঁট বড় এবং রং কালো। এর মাথা মসৃণ ও চকচকে, গলা সাদা এবং ডানা নানা রংয়ের। এর পালকের প্রান্ত ও গোড়ার অংশ সাদা এবং মধ্য ভাগ কালো।

ল্যাগ্‌ল্যাগ্‌—এ পাখীও একজাতীয় সারস। এর গলা সাদা, দেহের অন্যান্য অংশ কালো। এ পাখী আমাদের দেশেও দেখা যায় কিন্তু তারা

আকারে ছোট। কোনও কোনও হিন্দুস্থানী এ পাখীকে ইয়েক রং (এক রং ? বলে।

আর এক জাতের সারস আছে যার গায়ের রং ও আকার ঠিক আমাদের দেশের এই জাতীয় পাখীর মত। তবে এর ঠোঁট একটু বেশী কালো এবং ওজনেও ল্যাগল্যাগের চেয়ে কম ভারি।

আর এক রকমেব পাখী আছে যা দেখতে ধূসর রংয়ের বক ও ল্যাগল্যাগের মত। কিন্তু এর চঞ্চু বকের চেয়ে লম্বা এবং শরীর ল্যাগল্যাগের চেয়ে ছোট।

বড়বুজাক—এই পাখীর দেহের ওজন তুর্কির 'কার' পাখীর মত। এর ডানার নীচের দিকে সাদা। এর গলার স্বর খুব জোরালো।

সাদা বুজার—এর মাথা আর ঠোঁট কালো। আমাদের দেশে এই রকমের যে পাখী দেখা যায় তারা অনেক বড়, কিন্তু হিন্দুস্থানের বুজাকের চেয়ে দেখতে ছোট।

ঘরম্ পাই—(হাঁস জাতীয় যার চঞ্চুতে ফুটকি দাগ আছে)—এগুলো বুনো হাঁসের চেয়ে বড়। এই জাতের স্ত্রী ও পুরুষ একই রংয়ের। এই পাখী হাসনাঘরে ওরা লামঘানাতে যায়। এর মাংস খুব সুস্বাদু।

সা-মুরগ্—এই পাখী রাজহাঁসের চেয়ে ছোট। চঞ্চুর ওপরটা স্ফীত ও পিঠের রং কালো। এর মাংস খেতে খুবই উপাদেয়।

আলা কুর-ঘে (ম্যাগ্ পাই)-আমাদের দেশের এই জাতের পাখীর চেয়ে এরা আকারে ছোট। এর গলায় সাদা রংয়ের দাগ আছে।

আর এক জাতের পাখী আছে যাদের সাথে দাঁড়কাকের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। লামঘানাতে এই পাখীকেও বুনো মুরগী বলা হয়। এর মাথা আর বুক কালো, ডানা ও লেজ লাল ও চোখের রং গভীর রক্তবর্ণ। দুর্ব্বল বলে এই পাখী ভাল উড়তে পারে না। সেইজন্য এরা বন জঙ্গল ছেড়ে বাইরে আসেনা। এই জন্যই এদের বুনো মুরগী বলা হয়।

বাদুড়—অনেকে এদের চাম-গিধর অর্থাৎ উড়ন্ত. শেয়াল বলে। এরা আকারে প্যাঁচার সমান এবং মাথাটা পশু শাবকের মত। গাছের শাখা ধরে মাথা নীচু করে এরা ঝুলতে ঝুলতে বিশ্রাম করে। এ দৃশ্য দেখতে অদ্ভুত।

আ—আকে (আরবী)— হিন্দুস্থানে এই জাতীয় পাখীকে মিতা বলে। দেশে সাধারণ আ-আকে পাখীর চেয়ে এগুলো ছোট। আরব দেশের আ-আকে

পাখীর রং সাদা ও কালোয় মেশানো, আর হিন্দুস্থানের এই জাতের পাখীর রং ধূসর ও কালো।

কারচে—এ পাখী দোয়েলের মত দেখতে কিন্তু আকারে এর চেয়ে বড়। এর রং আগাগোড়া কালো।

আর এক রকমের ছোট পাখী আছে যা আকারে তুর্কিদেশের সাগুলাক পাখীর মত। এর রং সুন্দর লাল, তবে ডানায় কালো দাগ আছে।

কুইল (কোয়েল-কোকিল)—এ পাখী আকারে প্রায় কাকের মত কিন্তু অনেক রোগা। এর কণ্ঠে গান আছে যেজন্য এই পাখীকে হিন্দুস্থানের বুলবুল বলা হয়। হিন্দুস্থানের এই পাখীর সম্মান আমাদের দেশের বুলবুলের মত। এরা ঘন বৃক্ষপূর্ণ উদ্যানে থাকে।

আরব দেশের শিকার-রাক পাখীর মত এ দেশেও এক রকমের পাখী আছে। এই পাখী গাছ আঁকড়িয়ে থাকে। এদের বলা হয় কাঠ-ঠোকরা।

হিন্দুস্থানের জলজন্তু

জলজন্তুর মধ্যে একটি হচ্ছে কুমির। স্থির জলে এদের বাস। এরা মানুষ —এমন কি মোষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। কুমিরের এক রকমের জাত আছে যাকে বলে সিপ্‌সার। হিন্দুস্থানের সব নদীতেই এরা ঘুরে বেড়ায়। একটাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেটা লম্বায় ছিল চার পাঁচ গজ। কোনও কোনটা এর চেয়ে বড় হয়। এর মুখ ও নাক ওপরের দিকে আধ গজ লম্বা। কুমিরের নীচ ও ওপরের চোয়ালে অনেকগুলি ছোট দাঁতের সারি। এরা জল থেকে উঠে এসে জলের ধারে ঘুমায়।

আর একরকমের জলজন্তু—শুশুক। হিন্দুস্থানের সমস্ত নদীতেই এদের দেখা যায়। এরা ঝাঁকি মেরে জল থেকে মাথা তুলে আবার জলে ডুব দেয়—তখন আর এক লেজ ছাড়া দেহের কোনও অংশই দেখা যায় না। এর চোয়ালও অনেকটা কুমিরের চোয়ালের মত। এর চোয়াল লম্বা এবং দাঁতের সারিও ঐ একই রকম। কিন্তু অন্য বিষয়ে এর শরীর ও মাথা মাছেরই মত। যখন এরা খেলা করে তখন এদের ভিস্তির মশকের মত দেখায়। সারু নদীতে যে সব শুশুক আছে তারা জলে খেলার সময় লাফিয়ে সমস্ত শরীরটাই জলের ওপরে তুলতে পারে। এরা মাছের মতই জল ছেড়ে থাকতে পারে না।

ঘড়িয়াল আর এক রকমের জলজন্তু। আমার অনেক সৈন্যই সারু নদীতে

এই জলজন্তু দেখেছিল। এরাও মানুষ ধরে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। যে সময় আমরা সারুনদীর ওপরে ছিলাম সেই সময় দুই একজন ক্রীতদাস বালককে ঘড়িয়াল জলের তলে টেনে নিয়ে যায়। এই জায়গায় দূর থেকে ঘড়িয়াল দেখেছিলাম, কিন্তু এর সম্পূর্ণ চেহারা আমার নজরে পড়েনি।

এক রকমের মাছ হচ্ছে—ক'কে। এর দুই কানের সমান্তরালে দুটো হার—যা লম্বায় তিন আঙুল পরিমাণ। এই মাছ ধরা পড়লে যখন হাড় দুটো নাড়ে তখন এক রকম শব্দ বের হতে থাকে। এর জন্যই নাকি এর নাম হয়েছে ক'কে।

হিন্দুস্থানের মাছ খেতে সুস্বাদু। এদের খুব অল্পই ছোট ছোট কাঁটা আছে। এরা অদ্ভুত চটপটে। একবার জাল ফেলে নদীর এ পাশ ও পাশ ছেঁকে ফেলা হয়। অনেক মাছ জালে ধরা পড়ে। জালের দুই পাশ আধগজ পরিমাণ উঁচু করে তোলা হলো। তখন অনেক মাছ একের পর এক গজখানেক জালের ওপর দিয়ে লাফিয়ে উঠে ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। এ ছাড়া হিন্দুস্থানে এমন অনেক ছোট ছোট মাছ আছে যারা কোনও জোর শব্দ—এমন কি পদধ্বনি শুনলেও জলের ওপর এক দেড় গজ লাফিয়ে ওঠে।

হিন্দুস্থানের ব্যাং দেখবার মত। যদিও এগুলো আমাদের দেশের ব্যাং এর জাতেরই মত, কিন্তু জলের ওপর ছয় সাত গজ দৌড়িয়ে যেতে পারে।

হিন্দুস্থানের ফল

আম্বে (আম) হিন্দুস্থানের বিশেষ ফলের মধ্যে প্রধান। প্রসিদ্ধ কবি খাজা খসরু বলেছেন—

'হে আম্রসুন্দরী, তুমি উদ্যানের শোভা
হিন্দুস্থানের ফলের মধ্যে তুমিই মনোলোভা।

যে আম ভাল জাতের সেগুলো খুব সুস্বাদু। হরেক রকমের আমই লোকে খায়, তবে সবই ভাল নয়। এদেশের লোক কাঁচা আম পেড়ে বাড়ীতে রেখে পাকায়। কাঁচা আমের টক খেতে ভাল এবং এ দিয়ে সুন্দর আচার তৈরী হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে হিন্দুস্থানে এইটিই সব চেয়ে ভাল ফল। এর গাছ খুব বড় হয় এবং একটা গাছে অনেক ফল ধরে। অনেকে আমের এমন প্রশংসা করে যে একমাত্র খরমুজা ছাড়া আর কোনও ফলেরই আমের সঙ্গে তুলনা হয় না। আম এতটা প্রশংসার যোগ্য কিনা আমার সন্দেহ আছে।

আম দুই রকম ভাবে খাওয়া হয়। একরকম আম এখানকার লোকেরা হাত দিয়ে টিপে টিপে নরম করে নিয়ে এর একপাশে ছেঁদা করে সেইখানে মুখ লাগিয়ে রস চুষে নেয়। আর একরকমের আম কার্দি পিচের মত ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে তবে খায়। এর ছাল দেখতে অনেকটা পিচের মত। বাংলা ও গুজরাটের আম খেতে খুব সুন্দর।

কলা—এখানকার আর একটা ফল—কলা। আরবদেশের লোকেরা একে বলে মেজি। এর গাছ খুব বড় হয় না। সত্যি কথা বলতে গেলে কলা গাছ বৃক্ষ পর্যায়েরও নয়। এক রকম সবজি জাতীয় উদ্ভিদ। কলার পাতা লম্বায় প্রায় দুই গজ। চওড়ায় গজ খানেক। কলা গাছের মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডের মত একটা নব পল্লব বেরিয়ে আসে। কলার মুকুল (মোচা) এই পল্লব থেকে ঝুলে পড়ে। কলার মোচা যেন একটা ভেড়ার হৃৎপিণ্ড। যখন এই মোচা এক একটা খোলস ছাড়ে তখন ছয় সাতটা ফুলের সারি বের হয়। এই ভাবে খোলস ছাড়তে শেষ পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ কলার সারি দেখা দেয়। প্রথমে যা থাকে ফুল, ক্রমে পুষ্ট হয়ে কলার আকার ধারণ করে নয়ন গোচর হয়। কলার দুইটি গুণ—প্রথমতঃ এই ফল অনায়সেই ছাড়ানো যায়, দ্বিতীয়তঃ এর কোনও বীচি নাই এবং খেতে মোলায়েম। বেগুনের চেয়ে কলা লম্বা ও সরু। কলা খেতে খুব মিষ্টি নয়, কিন্তু বাংলা দেশের কলা খুব মিষ্টি। কলা গাছ দেখতে খুব সুন্দর। এর পাতা বেশ চওড়া এবং রং উজ্জ্বল সবুজ।

মহুয়া—একে গুলচিকান বলা হয়। এ গাছ খুব ঝাঁকড়া হয়। হিন্দুস্থানীরা তাদের ঘর সাধারণতঃ এই গাছের তক্তা দিয়ে তৈরী করে। মহুয়ার ফল থেকে এক রকমের মদ হয়। হিন্দুস্থানীরা এই ফুল শুকনো করে কিস্‌মিসের মত খায়। এই থেকেই মদ তৈরী হয়। কিসমিসের সাথে এর খুব সাদৃশ্য আছে। এর গন্ধ ভাল নয়, খেতে খুব সুস্বাদু নয়। মহুয়ার গাছ বুনো ধরণের। মহুয়া ফল খেতেও সুবিধার নয়। এর বীচি আকারে বড়। খোসা পাতলা। বীচির শাঁস থেকে এক রকমের তেল তৈরী হয়।

আম্বলি—এই ফল এক জাতের হিন্দুস্থানী খেজুর। এর ছোট ছোট পাতা খাঁজকাটা ঠিক জায়ফল গাছের পাতার মত। তবে এই গাছের পাতা অপেক্ষাকৃত ছোট। এই গাছ খুব সুন্দর এবং বহুল-পরিমাণে ছায়া দান করে। গাছও খুব বড় হয় এবং বন জঙ্গলে অসংখ্য জন্মে।

কিরণি—এই ফলের গাছ সাধারণতঃ গুজরাটে দেখা যায়। এই গাছ ঝাকড়া না হলেও ছোট আকারের নয়। এর ফল পীত বর্ণের, কুলের চেয়ে আকারে ছোট ও স্বাদে আঙ্গুরের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। তবে খাওয়ার পর শেষে একটা খারাপ স্বাদ রেখে যায়। তাহলেও এ ফল ভাল এবং খাওয়াও চলে। এর বীচির খোসা পাতলা।

জামান (জাম)—এর গাছের পাতা উইলো গাছের পাতার মত, তবে একটু বেশী সরু এবং সবুজ। মোটের ওপর এ গাছ দেখতে খুব সুন্দর। এই গাছের ফল কালো আঙ্গুলের মত দেখায়। কিন্তু এতে অম্লস্বাদ বেশী, খেতেও অত সুস্বাদু নয়।

কারমেরিক (কামরাঙ্গা) এই ফলের পাঁচটি ধার। আকারে পিচের মত, লম্বায় চার পাঁচ আঙ্গুলের সমান। পাকলে এর রং পীত বর্ণের হয়। এই ফলের কোনও বীচি নাই। কাঁচা গাছ থেকে তুললে খেতে বেশ তেতো। কিন্তু ভাল ভাবে পাকলে এর বেশ মিষ্ট সুগন্ধি অম্ল স্বাদ।

কাঢাইল (কাঁঠাল)—এই ফল দেখতে খারাপ, গন্ধও ভাল নয়। দেখায় যেন ভেড়ার ভরা পেটের মত। খেতে মিষ্টি, কিন্তু বিস্বাদ জনক। এর ভেতরের বীচি হেজেল গাছের বাদামের মত। এই বীচির সাথে খেজুর, বীচির সাদৃশ্য আছে, যদিও কাঁঠালের বীচি অনেকটা গোলাকার এবং খেজুরের বীচির মত শক্ত নয়। কাঁঠালের বীচিও লোকে খায়। কাঁঠালে খুব আঠা আছে। এই আঠার জন্য কাঁঠাল খাওয়ার আগে অনেকে মুখে (হাতে ও) তেল মেখে নেয়। কাঁঠাল কেবল গাছের শাখা ও কাণ্ডতেই ফলে না, গাছের মূলের কাছেও ফলে। কাঁঠাল গাছ দেখলে মনে হবে যেন চারদিকে ভেড়ার পেট ঝুলছে।

বাধিল্—এই ফল আকারে আপেলের মত। খুব খারাপ গন্ধ না হলেও এ ফল রসহীন ও বিস্বাদ।

বইর—পারস্য দেশে এর নাম বুনার। এ ফল নানা রকমের হয়। আলুচের (কুল) চেয়ে এ ফল কিছু লম্বা। একরমের জাত আছে যা আকারে এবং দেখতেও হুসেনি আঙ্গুরের মত। কিন্তু এ জাতের ফল কদাচিৎ খেতে ভাল হয়। আমি এক রকম জাতের বইর দেখেছিলাম যা খেতে খুব ভাল। বৃষ ও মিথুন রাশির স্থিতি কালে এই গাছের পাতা ঝরে পড়ে। কর্কট সিংহ রাশির স্থিতি কালে অর্থাৎ বর্ষার ঋতুতে নতুন পাতা গজায়। তখন গাছ সজীব ও প্রাণবন্ত হয়। কুম্ভ ও মীন রাশির অবস্থান কালে এর ফল পাকে।

করেন্দা—আমাদের দেশের 'জিকে' গাছের মত এ গাছ ঝুপসি হয়। জিকে পাহাড়ি দেশে জন্মে, কিন্তু করেন্দা জন্মে সমতল ভূমিতে। এই ফলের গন্ধ 'মারমেনজানের' মত, কিন্তু তার চেয়ে বেশী মিষ্ট তবে রস কম।

পানিয়ালা—এই ফল কুলের চেয়ে বড় এবং লাল আপেলের মত দেখায়। খেতে অম্লস্বাদ কিন্তু সুস্বাদু। ডালিমের গাছের চেয়ে এ গাছ বড় হয়, এবং এর পাতা বাদাম গাছের পাতার মত, তবে কিছু ছোট।

গুলের—গাছের গুঁড়িতে এই ফল ধরে। দেখতে ডুমুরের মত। ফল বিস্বাদ।

আমলে (আমলা)—এই ফলের পাঁচটা খাঁজ। না-ফোটা তুলোর সুটির মত এই ফল দেখতে। খেতে কটু। এই ফলের আচার তৈরী করলে খেতে মন্দ হয় না এবং উপকারিও বটে। গাছ দেখতে সুন্দর, পাতা ছোট ছোট।

চিরঞ্জি—এই গাছ পাহাড়ে জন্মে। ফলের শাঁস খুব সুস্বাদু। অনেকটা ওয়ালনাট ও বাদামের শাঁসের মত। পেস্তার চেয়েও এ ফল ছোট ও গোল। মিষ্টান্নে এর ব্যবহার আছে।

খেজুর—হিন্দুস্থানে এর বিশেষত্ব নাই। তবে এ ফল আমাদের দেশে নাই, এজন্য এর কথা লিখছি। লামঘানাতেও খেজুর গাছ দেখা যায়। খেজুর গাছের সমস্ত শাখা এক জায়গা থেকে বেরোয় অর্থাৎ গাছের মাথার দিক থেকে। শাখার দুই দিকেই ওপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত পাতা গজায়। গাছের গুঁড়ি অমসৃণ, রং বিশ্রী। খেজুর ফল আঙ্গুর গুচ্ছের মত, কিন্তু আকারে অনেকটা বড়। এখানকার লোক বলে উদ্ভিদ জগতের মধ্যে এক খেজুর গাছেরই প্রাণী জগতের সঙ্গে দুই বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। একটা হচ্ছে কোনও প্রাণীর মাথা কেটে ফেল্লে যেমন সে মরে, তেমনি খেজুর গাছের মাথা কাটলে এ গাছও বাঁচে না। আর একটা বিষয় হচ্ছে—যেমন কোনও পুরুষ সংসর্গ না হলে স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না তেমনি যদি পুরুষ খেজুর গাছের ডাল এনে স্ত্রীখেজুর গাছের ওপর না নাড়া দেওয়া হয় অর্থাৎ এই ভাবে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ না হয় তাহলে গাছে ফল ধরেনা। এ কথা কতদূর সত্য তা অবশ্য আমি বলতে পারবো না। খেজুর গাছের মাথার দিকটাকে মুথা বলে। সেই জায়গা থেকেই শাখা ও পাতা বের হয়। যখন পাতা সমেত পাখা বাড়তে থাকে তখন পাতা ক্রমশঃ বেশী সবুজ হতে থাকে। সাদা রংয়ের এই খেজুরের মুথা খেতে মিষ্টি। এর স্বাদের সঙ্গে অনেকটা আখরোটের স্বাদের সাদৃশ্য আছে। খেজুরের মাথার দিকে এখানকার

লোকেরা একটা ক্ষতের সৃষ্টি করে' সেই ছিদ্রের মধ্যে খেজুরের পাতা এমন ভাবে ঢুকিয়ে দেয় যে ভেতর থেকে যে রস নির্গত হয় তার সবটাই এর পাতা দিয়ে চুঁইয়ে পড়ে। মাটির হাঁড়ি গাছের সঙ্গে বেঁধে তার মুখে ঐ পাতাটা পূরে দেয় যাতে সব রসটা ঐ পাত্রে জমা হতে পারে। এই রস টাটকা খেলে বেশ মিষ্টি লাগে। যদি তিন চার দিন পর খাওয়া যায় তাহলে এতে মদের মত নেশা হয়। একবার যখন আমি চম্বল নদীর তীরে বারি সহরে (ঢোলপুর রাজ্যের একটি সহর) পর্যবেক্ষণের জন্য গিয়েছিলাম সেই সময় আমাদের গমন পথে একটি উপত্যকায় এমন কতকগুলো লোক দেখতে পেয়েছিলাম যারা খেজুর গাছের রস দিয়ে মদ তৈরী করে। অমরা এই মদ অনেকটা পান করেছিলাম, কিন্তু আমাদের কারও কোনও রকম মাতলামির ভাব হয়নি। সম্ভবত খুব বেশী পরিমাণে না খেলে কিছুই হয়না—কারণ এর মাদক গুণ খুবই অল্প।

নারগিল (নারিকেল)—আরববাসীরা বলে নাবগিল আর হিন্দুস্থানীরা বিশ্রী উচ্চারণ করে বলে নালির (হিন্দুস্থানে এর চলতি নাম নাড়িয়াল)। নারিকেলের খুলি দিয়ে কালো রংএর চাম্‌চে তৈরী হয়। ঘিচেক নামে এক রকম বাদ্যযন্ত্রের (গিটার জাতীয়) খোল বড় নারিকেলের খুলি দিয়ে তৈরী হয়। নারিকেল গাছ অনেকটা খেজুর গাছের মত, কিন্তু এর পাতা খেজুর গাছের পাতার চেয়ে বড়, সংখ্যায় বেশী ও অনেক বেশী উজ্জ্বল রংয়ের। আখরোটের যেমন বাহিরের খোসা সবজে নারিকেলের ও তাই, তবে নারিকেলের ওপরের খোসা তন্তুময় পদার্থের। নারকেলের খোসা ছাড়িয়ে যে দড়ি তৈরী হয় তা দিয়ে জাহাজ অথবা নদীতে যে সব নৌকা চলে সেগুলো তীরে বাঁধার কাজ হয়। নারিকেলের দড়ি দিয়ে নৌকার পাটাতনের তক্তার জোড়ও বাঁধা হয়। ওপরের খোসা ছাড়িয়ে নিলে এর খুলির এক পাশে তিনটি ছিদ্রের মত দেখা যায় যা একটা ত্রিভুজের মত। দুইটি ছিদ্র শক্ত ভাবে বন্ধ. কিন্তু আর একটা বন্ধ থাকলেও নরম এবং একটু কষ্ট করে জোরে চাপ দিলে সেটা ফুটো হয়ে যায়। নারকেলের মধ্যে শাস হওয়ার আগে জলে পূর্ণ থাকে। সেই জলই ছেঁদায় মুখ লাগিয়ে এখানকার লোকেরা পান করে। এ কথাও বলা যায় যে নারকেলের শাসই গলিত অবস্থায় জলের আকারে থাকে।

তাল—তাল গছের শাখাও মাথার দিক থেকে বের হয়। খেজুর গাছে পাত্র বেঁধে যেমন রস আহরণ করা হয় তাল গাছ থেকেও সেই একই ভাবে রস সংগ্রহ করে এখানকার লোকেরা পান করে। তালের রসকে এরা 'তাড়ী' বলে।

খেজুরের রসের চেয়ে তালের রসের মাদকতা বেশী। তালের শাখার ওপরের দিকে এক কি দেড় গজের মধ্যে কোনও পাতা থাকে না। তারপর ত্রিশ চল্লিশটি পাতা এক সঙ্গে শাখার নীচ দিকে বের হয়, দেখতে ঠিক হাতের ছড়ানো আঙুল গুলোর মত। এই পাতা গজ খানেক লম্বা। হিন্দুস্থানীরা তাল পাতা কাগজের মত ব্যবহার করে। এই তাল পাতাতেই পুথি লেখে। এই দেশবাসীরা যখন কানে ধাতু নির্ম্মিত মাকড়ি পরে না, তখন তারা দুই কানের বড় বড় ছিদ্রের মধ্যে তালপাতার তৈরী মাকড়ি গুজে রাখে। তাল পাতার তৈরী এই জাতীয় আভরণ বাজারে বিক্রয় হয়। তাল গাছের গুঁড়ি খেজুর গাছের গুঁড়ির চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দর এবং মসৃণ।

নারাং [কমলা]—নারাং ছাড়াও অনেক জাতের কমলা এখানে দেখা যায় লামঘানাতে, বাজুর ও সাওয়াদেও ভাল কমলা পাওয়া যায় এবং প্রচুর ফলে। লামঘানার কমলা আকারে ছোট কিন্তু খুব রসালো এবং তৃষ্ণা নিবারণের পক্ষে খুব উপাদেয়। এর গন্ধ মিষ্ট, স্পর্শে নরম এবং দেখতে সজীব। খোরাসানের কমলার সঙ্গে এ কমলার তুলনা হয় না। এর কমনীয়তা এমন যে লামঘানা থেকে কাবুলে নিয়ে যেতে—যার দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন মাইল—রাস্তাতেই এই কমলা নষ্ট হয়ে যায়। আস্তারাবাদের কমলাও সমরকন্দে নিয়ে যাওয়া হয় —যার দূরত্ব প্রায় এগারশ মাইল—কিন্তু তার খোসা পুরু এবং রস কম হওয়ায় মোটেই তেমন ক্ষতি হয় না। বাজুরের কমলার আকার লেবুর মত। এগুলো খুব রসালো, কিন্তু অন্য জায়গার কমলার চেয়ে অম্লস্বাদ বেশী। খাজা কালান আমাকে একবার বলেছিল যে বাজুরে এই জাতীয় কমলা লেবুর একটা গাছের ফল পাড়িয়ে গুণে দেখেছিল যে সেই গাছের ফলের সংখ্যাই সাত হাজার। আমার মনে হয় নারাং কথাটা আরবি নারাঞ্জু কথারই অপভ্রংশ। বাজুর ও সাওয়াদের অধিবাসীরা নারাঞ্জুকে নারাং বলে।

লেবু (বিহি)—লেবু এদেশে প্রচুর ফলে। আকারে মুরগীর ডিমের মত। গঠনেও প্রায় ঐ রকম। কেউ বিষদুষ্ট হলে অর্থাৎ কারও দেহে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পেলে লেবু গরম জলে সিদ্ধ করে তার আঁস খেলে বিষের ক্রিয়া দূর হয়।

তুরাঙ—কমলার মতই আর এক রকমের লেবু—নাম তুরাঙ (কলম্বী লেবু)। বাজুর ও সাওয়াদের লোকেরা একে বলে বালেং। এই লেবুর খোসা দিয়ে মোরব্বা তৈরী করলে তাকে বলা হয়—বালেং মোরব্বা। কলম্বী লেবুকে হিন্দুস্থানীরা বলে—বাজুরি। এই লেবু দুই জাতের হয়। এক জাতের লেবু পানসে,

অল্প মিষ্ট স্বাদ। খেতে মোটেই ভাল নয়, তবে এর খোসায় মোরব্বা তৈরী হয়। লামঘানাতের লেবু এই ধরণের। হিন্দুস্থান ও বাজুরের কলম্বী লেবু অম্লস্বাদের, কিন্তু এর সরবৎ হয় খুব সুস্বাদু ও আরামদায়ক। কলম্বী লেবু আকারে খরমুজের মত। এর ওপরের ছাল কর্কশ ও কোঁচকানো। এর প্রান্তভাগ সরু ও সুঁচালো। এই ফলের রং গাঢ় পীতবর্ণের। গাছের গুঁড়ি মোটা নয়। গাছ ছোট ছোট কিন্তু ঝাঁকড়া। কমলা লেবুর গাছের পাতার চেয়ে এর পাতা বড়।

সানতারা—এও এক রকমের কমলা লেবু। চেহারা ও বর্ণে কলম্বী-লেবুর মত, তবে এই ফলের ত্বক মসৃণ। মোটেই খসখসে নয়। ক্ষুদ্রাকারের কলম্বী লেবুর চেয়েও এগুলো ছোট। এর গাছ বেশ বড় হয়, প্রায় খুবানি গাছের মত। গাছের পাতা নারেঙের পাতার মত। এই লেবুর মিষ্ট-অম্ল স্বাদ। এর সরবৎ খেতে খুব ভাল এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। লেবুর মতই এই ফল পাকস্থলীকে ঠাণ্ডা রাখে এবং কলম্বী লেবুর মত অম্লুত্তেজক নয়।

কমলা জাতীয় আর এক ধরণের লেবু আছে যা দেখতে বড়। হিন্দুস্থানীরা একে বলে—কিল্ কিল্ লেবু। এর আকার হাঁসের ডিমের মত, কিন্তু দুই প্রান্ত ডিমের মত ছুচলো নয়। সান্তারার মতই এর ত্বক মসৃণ। এ লেবুতে রস খুব বেশী।

জামিরি (জম্বুরা, বাতাবি লেবু]—এর গঠন কমলার মত, কিন্তু রং গাঢ় পীতবর্ণ। এর গন্ধ কমলা লেবুর মত হলেও এ কমলালেবু নয়। এর স্বাদ—মিষ্ট-অম্ল।

সাদা ফল [মুসুম্বি ?]—এও এক রকম কমলাজাতীয় ফল, আকারে ন্যাসপাতির মত, খেতে মিষ্ট, কিন্তু কমলার মত ন্যক্কারজনক মিষ্ট নয়।

অম্রৎ ফল—এ ফলও কমলা জাতীয়। [তুর্কি ভাষায় লিখিত আত্মচরিতের কপিতে সম্রাট হুমায়ুনের নিম্নলিখিত মন্তব্য লেখা আছে যা ফারসী ভাষার কোনও অনুবাদে দেখা যায় নি। মন্তব্যটি এই—পরলোকগত বর্তমানে স্বর্গবাসী মহান সম্রাট—খোদা তাঁর গৌরব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। অম্রত ফল সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট রকম পর্য্যবেক্ষণ করেন নি। তিনি বলেছেন—এই ফল মিষ্ট হলেও স্বাদে পান্‌সে এবং এর সঙ্গে কমলা লেবুর তুলনা করেছেন ও এই ফল তাঁর ভাল লাগেনি বলেছেন। তিনি বরাবরই কমলা লেবু পছন্দ করতেন না। অম্রত ফলের মৃদু অম্ল-মিষ্ট স্বাদের জন্য এখানকার সকলেই এই ফলকে কমলালেবুর মত বলতো। এই সময়ে বিশেষ করে যখন তিনি প্রথমবার হিন্দুস্থানে আসেন, তখন

তাঁর সুরাপান করার অভ্যাস ছিল। সেই জন্য তিনি কোনও মিষ্ট রসের জিনিষ পছন্দ করতেন না। আম্রত ফল সত্যই খেতে চমৎকার। এর রস উগ্র মিষ্ট না হলেও খেতে খুব ভাল। পরবর্ত্তীকালে আমরা এই ফলের প্রকৃতি ও উৎকর্ষ আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। অপক্ক অবস্থায় এই ফলের অম্লস্বাদ কমলা লেবুর মত। এই অম্লস্বাদ পাকস্থলী সহ্য করতে পারেনা। কিন্তু যখন ক্রমে ক্রমে এই ফল পাকে তখন খুব মিষ্টি হয়]।

বঙ্গদেশেও এই জাতীয় দুই রকম অম্লগন্ধী ফল আছে আম্রত ফলের উৎকর্ষতার সঙ্গে যার তুলনা হতে পারে।—এর একটির নাম কামলা (কমলা) —যা আকারে নারাং এর সমান। অনেকে একে বড় লেবু বলে কিন্তু লেবুর চেয়েও এ ফল ভাল। এ ফল দেখতে জমকালো নয় এবং আকারেও বড় নয়। আরও এক জাতের ফল হচ্ছে সানতারা। এগুলোর আকার কিছু বড় কিন্তু অম্ল নয় এবং আম্রত ফলের ন্যায় বিস্বাদও নয়—তবে খুব মিষ্টও নয়। সত্যিই সান্‌তারার মত ভাল ফল দুর্লভ। এ ফলের আকার সুন্দর এবং খাদ্য হিসাবে স্বাস্থ্য প্রদ। এই ফল পাওয়া গেলে লোকে এ ফল ছেড়ে অন্য ফলের কথা মনে করে না এবং খেতেও আকাঙ্খা করে না। এর খোসা হাত দিয়ে ছাড়ানো যায়। যত গুলিই তুমি খাওনা কেন তোমার তৃপ্তি মিটবে না। তোমার মন আরও চাইবে। এই ফলের রসে হাত ময়লা হয় না। ভেতরের কোমলাংশ থেকে সহজেই এর কোয়া ছাড়িয়ে নেওয়া যায়। আহারের পর এই ফল খাওয়া চলে। এই জাতের সান্‌তারা খুব কমই পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের স্বর্ণগ্রাম নামে এক পল্লীতে এই ফল ফলে এবং স্বর্ণগ্রামেরও বিশেষ এক জায়গার মাটিতে এই বিশেষ গুণসম্পন্ন ফলের গাছ দেখা যায়। মোটের ওপর এই শ্রেণীর নানা ফলের মধ্যে বাংলার সান্‌তারার মত উপাদেয় আর কোনও ফল নাই—এমন কি অন্য কোনও ফলের সাথেও বাস্তবিক পক্ষে এর তুলনা হয় না।

কিরণে—এও কমলা জাতীয় ফল। আকারে কিলকিল লেবুর মত এবং অম্ল স্বাদবিশিষ্ট।

আমিলবিদ্—এ ফলও কমলা জাতীয়। আমি এই ফল প্রথম দেখি বর্ত্তমান বৎসরে—ভারতে আগমনের তিন বৎসর পর ১৫২৯ সালে। (সম্ভবতঃ বাবর তাঁর আত্মকথার এই অধ্যায় এই বৎসর লেখেন।) এখানকার লোকেরা বলে—যদি এই ফলের গায়ে সূচ বেঁধানো হয় তাহলে সমস্ত ফলটাই গলে যায়। এই ফলের অম্ল গুণ খুব বেশী অথবা অন্য কোনও বিশেষ গুণের আধিক্যের জন্য সম্ভবতঃ এই রকম হয়ে থাকে। এর অম্লভাব অনেকটা কমলা এবং লেবুর মত।

হিন্দুস্থানের ফুল

হিন্দুস্থানে অনেক রকম ফুল আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে—

জাগুন (জবা ?)—হিন্দুস্থানীদের অনেকে আবার এই ফুলকে বলে গুরহাল। যে গুল্মের ওপর এই ফুল হয় সেটা লম্বা। রক্ত গোলাপের ঝোপের চেয়ে এর ঝোপ বড় হয়। এই ফুলের রং ডালিমের রংয়ের চেয়েও গভীর লাল। আকারে এই ফুল প্রায় রক্ত গোলাপের সমান। রক্ত গোলাপের কুঁড়ি একবারেই ফুটে ওঠে, কিন্তু জাগুন ফুল ধীরে ধীরে পাঁপড়ি মেলে। প্রথমে কোরকের দিক একটু উন্মীলিত হয়ে মধ্যের হৃদপিণ্ড দৃষ্টি গোচর হয়, তারপর ক্রমশঃ গোটা ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। যদিও এই ফুলের অন্তর ও বহিরভাগ একই ফুলের অংশ, তবুও দেখে মনে হয় যেন আলাদা। কারণ, এই ফুলের মধ্য দিয়ে একটা সরু শুঁড়ের মত বেরিয়ে আসে যা লম্বায় প্রায় এক বিঘতের মত এবং এই বৃন্ত ঘিরে পাঁপড়িগুলো ফুটতে থাকে যা অপূর্ব্ব দেখায়। প্রস্ফুটিত ফুলের বর্ণ উজ্জ্বল। তবে এ ঔজ্জল্য বেশী সময় থাকেনা, এক দিনেই মলিন হয়ে যায়। বর্ষাকালের চার মাস এই ফুল গাছ আলো করে থাকে। অবশ্য বার মাসই এই ফুল ফোটে, তবে বর্ষাকালের মত অজস্র নয়।

কানির (করবি ?)—এই ফুল সাদা ও লাল দুই রংয়েরই হয়। পীচের ফুলের মত এই ফুলের পাঁচটি পাঁপড়ি। লাল রংয়ের কানির দেখতে ঠিক পীচ ফুলের মত, তবে চোদ্দ পনরোটা কানির ফুল এর জায়গাতেই ফোটে তাই দূর থেকে মনে হয় যেন একটা বড় ফুল। এই ফুল গাছের ঝোপ জাগুন গাছের ঝোপের চেয়ে বড়। লাল কানিরের গন্ধ মৃদু হলেও ভাল। এই ফুলও বর্ষাকালে তিন চার মাস অজস্র ফোটে। অবশ্য বছরের অধিকাংশ সময়ই এই ফুল দেখা যায়।

কেওরা—এই ফুলের গন্ধ খুব মিষ্টি। আরববাসীরা এই ফুলকে বলে—'কাব্রি'। কস্তুরি ফুলের দোষ এই যে তা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। কিন্তু এই ফুল অনেকদিন টাটকা থাকে—সেইজন্য একে ভিজে কস্তুরি ফুলও বলা যায়। এই ফুলের আকৃতি এক বিশেষ ধরণের। কস্তুরি ফুল আকারে এক দেড় বিঘত, কখনও কখনও দুই বিঘত ও দেখা যায়। এই ফুলের পাতা ঘেরু (এক জাতীয় গোলাপ) ফুলের মত লম্বা। গোলাপ কুঁড়ির মত এই ফুলেও কাঁটা আছে। এই ফুল ফুটতে যখন দেরী থাকে তখন এর বাইরের পাঁপড়ি থাকে সবুজ, আর ভেতরের পাঁপড়ি সাদা ও নরম। পাঁপড়িগুলির মধ্যে একটি স্তবক মনে

হয় যেন ফুলের হৃদপিণ্ড। এর গন্ধ সত্যিই খুব মধুর। এই ফুল দেখতে মনে হয় যেন একটা ছোটখাট ফুটন্ত ঝোপ, যার গুড়ি যেন এখনও বড় হয়নি। ফুলের পাতা বেশ চওড়া এবং কণ্টকময়। গাছের গুঁড়ি দেখতে সামঞ্জস্যহীন। গুঁড়ি থেকে একটা ডাঁটা ওঠে, সেই ডাঁটায় ফুল ফোটে।

চামেলি—এ ফুল আমাদের দেশের জুঁই ফুলের চেয়ে বড়, গন্ধও তীব্রতর।

হিন্দুস্থানের ঋতু

অন্য দেশে চারটি ঋতু—কিন্তু হিন্দুস্থানে তিনটি। বছরের চারমাস বর্ষা ও চারমাস শীত। নয়া চাঁদ থেকে এর মাস সুরু হয়। প্রতি তিন বছর অন্তর এরা বর্ষা ঋতুর সঙ্গে এক মাস যোগ করে, আবার তার তিন বছর অন্তর একমাস যোগ করে শীত ঋতুর সঙ্গে এবং তার তিন বছর পর একমাস যোগ করে গ্রীষ্ম ঋতুর সঙ্গে। এদের ঋতু গণনার পদ্ধতি এই। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় হচ্ছে গ্রীষ্ম ঋতুর মাস অর্থাৎ মীন, মেষ, বৃষ, ও মিথুন রাশির মাস। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক হচ্ছে বর্ষা ঋতুর মাস অর্থাৎ কর্কট, সিংহ, কন্যা ও তুলা রাশির মাস। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন হচ্ছে শীত ঋতুর মাস অর্থাৎ বৃশ্চিক, ধনু, মকর ও কুম্ভ রাশির মাস। হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা যদিও এক একটা ঋতু চারমাস করে ধরে, কিন্তু যে দুই মাসে সেই ঋতুর প্রাবল্য বেশী সেই মাস দুইটিকেই সেই ঋতুর মাস অর্থাৎ গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতের মাস বলে থাকে। গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ দুই মাস—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়কে অন্য দুইমাস থেকে পৃথক করে নিয়ে বলে গ্রীষ্মকাল, বর্ষা ঋতুর প্রথম দুই মাস অর্থাৎ শ্রাবণ ও ভাদ্রকে বলে বর্ষাকাল। শীত ঋতুর মাঝের দুই মাস অর্থাৎ পৌষ ও মাঘ মাসকে বলে শীতকাল। এই নিয়মে এখানকার ঋতু প্রকৃতপক্ষে ছয়টি।

হিন্দুস্থানের সপ্তাহ

হিন্দুস্থানীরা সপ্তাহের সাতটি দিনের নামকরণ করেছে—শনিচর (শনিবার) এতোয়ার (রবিবার), সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার।

সময়-বিভাগ

আমাদের দেশের 'কিচা গুন্দুজ' (তুর্কি) কথার মত এখানেও 'দিনরাত' এই কথা চলতি। আমাদের দেশের মত এখানকার দিনরাতও চব্বিশ ভাগে বিভক্ত—এক একভাগ এক এক ঘণ্টা আবার ৬০ ভাগে বিভক্ত—প্রত্যেক ভাগ

এক মিনিট অর্থাৎ গোটা দিনরাত ১৪৪০ মিনিটের সমষ্টি। হিন্দুস্থানীরা দিন-রাতকে ৬০ ভাগেও ভাগ করে থাকে—এক এক ভাগ হচ্ছে এক এক ঘড়ি। তারা আবার রাতকে চার ভাগে এবং দিনকে চারভাগে ভাগ করে—এক এক প্রহর, ফারসিতে যাকে বলে 'পাস্'। আমাদের দেশেও প্রহর ও প্রহরী (পাস্ উ-পাস্বান) আছে কিন্তু তাদের বিবরণ আলাদা। হিন্দুস্থানের অনেক সহরে প্রহর ঘোষণার জন্য 'ঘড়িয়ালি' (ঘড়ি পেটানোর লোক) নিযুক্ত করা হয়। দুই ইঞ্চি পুরু একখানা বড় পিতলের থালার মত পাত্র যাকে বলা হয় 'ঘড়িয়াল' —সেটাকে উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। সময় ঠিক করার জন্য এদের আর একটা পাত্র থাকে যার তলায় ফুটো। সেই পাত্রটি জলে বসিয়ে রাখলে এক ঘড়িতে অর্থাৎ ২৪ মিনিটে পূর্ণ হয়ে যায়। 'ঘড়িয়লিরা' এই পাত্র জলে বসিয়ে রাখে এবং যতক্ষণ না এ পাত্র পূর্ণ হয় ততক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা এক ফুটো পাত্র জলে রাখে। যখন এই পাত্র প্রথম পূর্ণ হয় তখন ছোট একটা কাঠের মুগুর দিয়ে ঝুলানো ঘড়িতে একবার আঘাত করে। দ্বিতীয়বার যখন এই পাত্র পূর্ণ হয়—তখন ঘড়িতে আঘাত করে দুইবার, এই ভাবে যতক্ষণ না সেই প্রহর শেষ হয় ততক্ষণ চলতে থাকে। এক প্রহর-শেষ হওয়ার পর তারা খুব দ্রুত কয়েকটি ঘা মারে ঘড়িতে —তারপর একটু থেমে যদি প্রথম প্রহর শেষ হয় তাহলে একটা, দ্বিতীয় প্রহর হলে দুইটা, তিন প্রহর অতীত হলে তিনটা এবং চতুর্থ প্রহর অতিবাহিত হলে চারট ঘা মারে। দিনের চার প্রহর শেষ হয়ে রাতের প্রহর আরম্ভ হলেও একই ভাবে সময় নির্দেশ করা হয়। এখানকার নিয়ম ছিল এই যে প্রহর শেষ হলে তবেই সেই প্রহরের সঙ্কেত জানানো হতো। কিন্তু তাতে অসুবিধা ছিল এই যে রাতে যে সব লোক ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে ঘড়ি পেটার শব্দ শুনতো এবং ঘড়িতে তিন বা চারবার আঘাতের শব্দ শুনলে তাদের বোঝবার পক্ষে অসুবিধে হতো—যে এটা রাতের কোন প্রহরের ঘন্টা দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রহরের। আমি সেইজন্য নির্দেশ দিই যে রাত্রে কিংবা মেঘলা দিনে ঘড়ির সঙ্কেত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরের সঙ্কেতও জানাতে হবে—যেমন প্রথম নৈশ প্রহরের তিন ঘড়ি বাজানোর পর ঘড়িয়ালিদের একটু থেমে সেই প্রহরের সঙ্কেত বাজাতে হবে যাতে লোকে বুঝতে পারে যে এই তিনঘড়ি হচ্ছে প্রথম নৈশ প্রহরের। অনুরূপ-ভাবে তৃতীয় নৈশ প্রহরের চার ঘড়ি বাজানোর পর একটু থেমে তৃতীয় প্রহরের সঙ্কেত ধ্বনি করতে হবে যাতে লোকে বুঝতে পারে যে তৃতীয় নৈশ প্রহরের, চার

ঘড়ি বাজলো। এই নিয়মের ফল খুব ভাল হয়। কেউ রাতে জেগে উঠে ঘড়ি পেটা শুনলে বুঝতে পারে কোন প্রহরের কত ঘড়ি বাজছে।

আবার, এখানকার লোকেরা এক ঘড়িকে ৬০ ভাগে ভাগ করে। এক এক ভাগকে বলে পল। (তালিকা এইরূপ—৬০ বিপল=১ পল, ৬০ পল=১ ঘড়ি (২৪ মিনিট), ৬০ ঘড়ি বা আট প্রহর=এক দিন রাত)। এই নিয়মে দিন ও রাত ৩৬০০ পলের সমষ্টি। (পল সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মন্তব্য—এখানকার লোকে বলে—চোখের পাতা ৬০ বার বন্ধ করতে ও খুলতে যেটুকু সময় লাগে সেই সময়টুকু হবে পল অর্থাৎ এইভাবে ২,১৬,০০০ বার চোখের পাতা বন্ধ করলে ও খুললে হয় এক দিনরাত। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এক পল সময়ে আটবার 'কুল হুয়া আল্লা' ও 'বিসমিল্লা' অর্থাৎ দিনরাতে এইভাবে ২৮,০০০ আবৃত্তি করা যায়।

পরিমাপ পদ্ধতি

হিন্দুস্থানে সুশৃঙ্খল পরিমাপের নিয়ম আছে। যথা—৮ রতি=এক মাসা, ৪ মাসা=১ টাক=৩২ রতি, ৫ মাসা=১ মিশকাল=৪০ রতি, ১২ মাসা=১ তোলা=৯৬ রতি, ১৪ তোলা=১ সের।

সর্ব্বত্রই এই মাপ চলতি—৪০ সের=১ মানবন ১২ মানবন=১ মানি। ১০০ মানির ওজনকে এরা বলে মিনাসা।

মুক্তা ও জহরতের মাপ হয় টাক দিয়ে।

গণন পদ্ধতি

হিন্দুস্থানের গণনার পদ্ধতিও খুব ভাল। এরা ১০০০০০ কে বলে এক লাখ। ১০০ লাখকে এক কোটি। একশ কোটিকে এক অর্ব্বুদ। একশ অর্ব্বুদকে এক কুর্ব। ১০০ কুর্বকে ১ নীল। ১০০ নীলকে এক পদম্ (পদ্ম)। ১০০ পদমকে এক সাং [শঙ্খ?]। এই রকম উচ্চ গণনা সংখ্যাতেই প্রমাণিত হয় যে হিন্দুস্থানে কিরূপ ঐশ্বর্যশালী।

হিন্দুস্থানের অধিবাসী

এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই বিধর্ম্মী। এই বিধর্ম্মীদের হিন্দু বলা হয়। অধিকাংশ হিন্দুই মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে। এখানকার সমস্ত কারুশিল্পী, মজুর ও কর্ম্মচারী হিন্দু। আমাদের দেশের যারা অরণ্যে বাস করে অথবা

যাযাবর, তাদেরই উপজাতীয় নাম আছে। কিন্তু এখানে যাদের কৃষিজমি আছে এবং পল্লীতে স্থায়ী বাস তাদের জাতের নাম আছে (সম্ভবতঃ হিন্দু বর্ণাশ্রম সমাজের জাতের নাম)। আবার এখানকার প্রত্যেক কারিগর তাদের পূর্ব্ব পুরুষের বৃত্তি অবলম্বন করে সংসার চালায়।

হিন্দুস্থানের দোষবিচার

হিন্দুস্থানে এমন কোনও আনন্দ দায়ক ব্যাপার নাই যার প্রশংসা করা যেতে পারে। এখানকার অধিবাসীরা মোটেই সুশ্রী নয়। তাদের আকর্ষণীয় কোনও সামাজিক সখ্য ভাব নাই, পরস্পর বন্ধুর মত মেলা মেশার অভ্যাস নাই, অথবা একতা বদ্ধ হয়ে আনন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার রীতি নাই। তাদের না আছে কোনও বিষয়ে প্রতিভা, না আছে মনের স্থৈর্য্য, না আছে ব্যবহার শিষ্টতা, না আছে দয়া অথবা বন্ধুপ্রীতি। তাদের না আছে নব নব যান্ত্রিক উদ্ভাবনের ক্ষমতা, না আছে হস্ত শিল্পের সাধনা এবং কাজে তার প্রতিফলন, না আছে স্থাপত্য শিল্পের জ্ঞান ও নৈপুণ্য। তাদের ভাল ঘোড়া নাই, খাওয়ার ভাল মাংস নাই। আঙ্গুর কিংবা খরমুজ নাই কোনও ভাল ফল নাই। বরফ নাই, শীতল জল নাই, তাদের বাজারে ভাল খাদ্য ও রুটি নাই। কোনও স্নানশালা অথবা উচ্চ শিক্ষায়তন নাই, আলোর জন্য মোমবাতি নাই।

মোমবাতি অথবা মশালের স্থান অধিকার করে আছে একদল নোংরা লোক —যাদের বাঁ হাতে ধরা থাকে একটা ছোট তেপায়া কাঠের পাত্র, তার এক কোণায় মোমবাতির মাথার দিকের মত একটা জিনিষ বসানো—তাতে বুড়ো আঙ্গুলের মত মোটা একটা পলতে। তাদের ডান হাতে থাকে একটা লাউয়ের খোল তার নীচে একটা ছোট ছ্যাদা, সেই ছ্যাদার ভিতর একটা সরু সুতো। সেই সুতোর মধ্যে দিয়ে টপ টপ করে তেল ঝরে পড়ে বাঁ হাতে ধরা পাত্রের পল্‌তের ওপর, যখনই সেই পলতেয় তেলের দরকার হয়। এখানকার ধনী লোক এই রকম একশ, দুশ বাতিওয়ালা রাখে। প্রদীপ আর মোমবাতির পরিবর্ত্তে ব্যবস্থা হিন্দুস্থানে এই প্রকার। এখানকার শাসক ও আমিরদের যদি রাতে কাজ থাকে এবং আলোর দরকার হয়—তা হলে এই সব নোংরা বাতি-ওয়ালা এই ধরণের বাতি নিয়ে তাদের গা ঘেঁসে দাঁড়ায়।

এখানে নদী এবং হ্রদ ছাড়াও কতকগুলো খাদ ও গর্ত্ত আছে, যাতে জল পাওয়া যায়। এদের উদ্যমে এবং প্রসাদে জল নিয়ে আসার জন্য কোনও

নালার ব্যবস্থা নাই। এদের বসত বাড়ী শ্রীহীন, তাতে হাওয়া খেলেনা এবং কোনও রকম শৃঙ্খলা বা সামঞ্জস্য নাই।

এখানকার কৃষক এবং দরিদ্র লোকেরা প্রায় নগ্ন অবস্থায় থাকে। ল্যাঙ্গট নামে একটা জিনিস যা দিয়ে তারা লজ্জা নিবারণ করে সেটা দুই বিঘত পরিমাণ একটা ন্যাকড়া যা নাভির নীচে দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়। আর একটা ন্যাকড়ার ফালি তার সঙ্গে জুড়ে দুই উরুর মাঝ দিয়ে পেছনের দিকে টেনে তুলে কোমরের বাঁধনের সঙ্গে আটকে রাখে। স্ত্রীলোকেরা ও একটা কাপড় কোমরে বাঁধে, যার অর্দ্ধেকটা থাকে কোমরে বেন্ দেওয়া—আর অর্দ্ধেকটা মাথার ওপর ফেলা।

হিন্দুস্থানের বৈশিষ্ট্য

হিন্দুস্থানের বিশেষ গুণ এই যে দেশটা বিশাল এবং এখানে সোনা-রূপার প্রাচুর্য্য খুব বেশী। বর্ষাকালে এখানকার আবহাওয়া চমৎকার। সে সময় কোনও কোনও দিন পনরো এমন কি কুড়িবার পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয়। বর্ষা ঋতুতে এমনভাবে প্লাবন নেমে আসে যে নদী পূর্ণ হয়ে যায় এবং যেখানে অন্য সময় জল থাকে না সে সব জায়গাও জলে পূর্ণ হয়ে যায়। মাটি ক্রমাগত বৃষ্টির জলে ভিজে ওঠায় আবহাওয়া হয়ে ওঠে তৃপ্তিকর। এই সময়কার শীতোষ্ণ আরাম-দায়ক কোমল তাপ মাত্রার সত্যই তুলনা হয় না। কিন্তু এর দোষ এই যে হাওয়ায় একটা ভিজে স্যাঁৎসেতে ভাব থাকে। বর্ষাকালে আমাদের দেশের ধনুক দিয়ে তীর নিক্ষেপ করা যায় না। তীর ধনুক অকেজো হয়ে পড়ে। শুধু তীর ধনুকই নয়—বর্ম্ম, বই, পোষাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র সব তাতেই এই স্যাঁৎসেঁতে ভাবের মন্দ প্রভাব দেখা যায়। এখানকার বাড়ীঘরও মজবুতভাবে তৈরি না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ষা ঋতুর মত শীত ও গ্রীষ্মেও ভাল আবহাওয়া পাওয়া যায়। কিন্তু যখন উত্তুরে হাওয়া বয় তখন সেই হাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে ধূলোমাটি উড়তে থাকে। বর্ষা ঋতুর সূচনার কিছুদিন আগে পাঁচ ছয় বার এই রকম হাওয়া প্রবল বেগে বইতে থাকে। সেই সময় এমন ধূলো বালি উড়তে থাকে যে কাছের লোককেও চোখে দেখা যায় না। এখানকার লোকেরা একে বলে আঁধি। গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্য্য যখন বৃষ এবং মিথুন রাশিতে, সেই সময় এখানে তাপ বৃদ্ধি হয়—কিন্তু এমন গরম তখন হয়না যে অসহ্য হয়ে ওঠে। বাল্‌খ এবং কান্দাহারের গরমের সঙ্গে এই গরমের তুলনা হয় না। এখানকার গরম ঐ দেশগুলির গরমের অর্দ্ধেকও নয়।

হিন্দুস্থানের আর একটি সুবিধা হচ্ছে এই যে এখানে প্রতিটি কাজ ও ব্যবসায়ের জন্য প্রচুর লোক পাওয়া যায়। প্রত্যেক কাজ এবং চাকুরির জন্য সব সময়েই এক এক দল লোক প্রস্তুত হয়ে থাকে—যাদের পূর্ব্বপুরুষরা সেই কাজ বা ব্যবসা পুরুষানুক্রমে করে এসেছে। মোল্লা সেরিফ উদ্দিন আলি ভেজদির তাঁর জাফর নামায় এক অদ্ভুত কথা লিখেছেন। যখন তাইমুর বেগ পাথরের মসজিদ তৈরী করেন তখন আজির বাইজান, হিন্দুস্থান ও অন্যান্য নানা দেশ থেকে তিনি পাথর কাটার জন্য মজুর নিয়ে আসেন এবং দৈনিক দুই'শ মজুর এই মসজিদ তৈরীর কাজে খাটে। একমাত্র আগ্রতেই আমার প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য সেই জায়গা থেকেই দৈনিক ছয়শ আশি জন মজুর নিযুক্ত করি। আগ্রা, সিক্রি, বিয়ানা, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র এবং কোয়েলে (আলিগড়) আমার কাজের জন্য দৈনিক এক হাজার চারশ একানব্বই জন পাথর কাটার লোক নিযুক্ত হয়। এই ভাবে অন্য কাজ ও ব্যবসার জন্য অসংখ্য কর্ম্ম-দক্ষ লোক হিন্দুস্থানে পাওয়া যায়।

রাজস্ব

বেরুহে থেকে বেহার পর্য্যন্ত দেশগুলি আমার সাম্রাজ্যর অধীনে আসায় [বেহার বাবরের অধিকারে আসে ১৫২৯ সালে] সাম্রাজ্যের রাজস্ব দাঁড়ায় ৫২ কোটি টাকা। আট, নয় কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ী কতকগুলি পরগণা সেখানকায় রাজা ও রহিস্‌রা বহুকাল থেকে ভোগ করে থাকেন সম্রাটের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের জন্য।

*　　　*　　　*

রজব মাসের ২৯ শে তারিখ শনিবার আমি কোষাগারের অর্থ পরীক্ষা করে ধন বিতরণ করতে আরম্ভ করি। কোষাগার থেকে সত্তর লক্ষ টাকা হুমায়ুনকে দিই। এ ছাড়া তাকে দিই একটা প্রাসাদ যার আসবারপত্রের কোনও তালিকা করা হয়নি। কোনও কোনও আমিরকে দশলক্ষ টাকা, কাউকে বা আট লক্ষ, সাত লক্ষ বা ছয় লক্ষ টাকা দান করি। আফগান, হাজরাস, আরব, বেলুচি এবং অন্যান্য দেশের লোক যারা আমার সৈন্যদলে ছিল তাদের পদমর্য্যাদাও গুণানুসারে কোষাগার থেকে অর্থদান করি। প্রত্যেক ব্যবসায়ী, প্রত্যেক বিদ্বান ব্যক্তি এক কথায় প্রতিটি লোক যারা আমার সঙ্গে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল তাদের এমন অর্থ উপহার দিই যা তাদের, সৌভাগ্যের

দ্যোতক বলেই গণ্য করা যেতে পারে। কাবুলের অধিবাসীদের উৎসাহদানের জন্য নারী ও পুরুষ, স্বাধীন ও ক্রীতদাস, শিশু কিংবা বৃদ্ধ প্রত্যেককে দান স্বরূপ একটি করে মুদ্রা পাঠিয়ে দিই।

আমি যখন আগ্রায় আসি তখন গ্রীষ্ম ঋতু। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে এখানকার সমস্ত অধিবাসী পালিয়ে যায়। সেইজন্য এখানে কোনও খাদ্য শস্য কিংবা পশু-খাদ্য খুঁজে পাওয়া যায় না—যা দিয়ে আমাদের কিংবা অশ্বদের আহারের ব্যবস্থা হতে পারে। গ্রামগুলিও আমাদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণার জন্য বিদ্রোহী হয়ে চুরিডাকাতি সুরু করে দেয়। রাস্তায় চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোষাগারের অর্থ বিলি করার পর এমন অর্থ ছিল না যাতে উপযুক্ত লোক পাঠিয়ে নানা পরগণা এবং বিশিষ্ট জায়গাগুলি রক্ষা করতে পারি। এ বছর এমন অসাধারণ গরম যে তাপ অসহ্য হয়ে উঠেছে। মরুভূমিতে লু লেগে যেমন লোক মারা পড়ে তেম্নি অনেক লোক সর্দি-গরমিতে মরতে লাগলো।

এই সব কারণে আমার দলের যে সব বেগ এবং বাছাই করা অনুচর মনের বল হারিয়ে ফেলে তাদের সংখ্যা নগণ্য নয়। তারা হিন্দুস্থান ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরী হতে লাগল। বয়স্ক বেগরা যারা সত্যই সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ কেবল তারাই যদি এইরূপ অভিপ্রায় জানাতো তাতে সত্যই কিছু দোষের ছিল না। কারণ তাদের এইরূপ ভাবপ্রবণতা প্রকাশ পেলে আমার নিজস্ব বুদ্ধির ওপর আমার এমন আস্থা আছে যে সেই বুদ্ধির দ্বারা বিচার বিবেচনা করে তাদের মতামতের ঔচিত্য অনৌচিত্য সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারতাম। কিন্তু তাদের একই কাহিনী নানাভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে বারংবার আবৃত্তি করে এমন লোককে শোনানো হচ্ছে—যে লোক নিজের চোখেই সমস্ত ব্যাপার দেখছে এবং যে নিজেই সে ব্যাপারে বিবেচনা করে একটা ধীরস্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। এটা কি রকমের শালীনতা যে সৈন্যদলের শেষ সেনাটি পর্য্যন্ত এই রকম বুদ্ধিহীন কাঁচা রকমের মতবাদ প্রকাশ করতে পারে? এটা বিশেষ লক্ষণীয় যে যখন আমি কাবুল থেকে যাত্রা করি শেষবারের মত, তখন নীচু থাকের অনেক লোককেও সম্মানজনক বেগের পদবীতে উন্নীত করে এই ধারণা করেছিলাম যে তারা আমাকে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করবে এবং আমি যদি জলে কিংবা আগুনে প্রবেশ করার পথই বেছে নিই তাহলে তারাও আমাকে অকুণ্ঠচিত্তে সেই পথেই অনুসরণ করবে এবং আমি যে পথে অগ্রসর হব তারাও সন্তুষ্টচিত্তে সেই পথেই এগিয়ে

আসবে। এটা আমার কখনই কল্পনায় আসেনি যে তারাই আমার কার্য্যের জন্য জবাব দিহি করবে এবং যারা আমার যে সব কার্য্যে ও অভিপ্রায়ে সম্মিলিত-ভাবে সভার ও মন্ত্রণা পরিষদে সমর্থন জানিয়েছিল তারাই এখন বেঁকে দাঁড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধতার কথা ঘোষণা করবে। কাবুল থেকে বেরিয়ে আসার পর ইব্রাহিমকে যুদ্ধে পরাজিত করে আগ্রা দখল করার সময় পর্য্যন্ত খাজা কিলান প্রশংসা-জনক ব্যবহার করেছে। সে সর্ব্বদা বীরের মত কাজ করেছে এবং বীরের মতই তার মতামত ব্যক্ত করেছে। কিন্তু আগ্রা দখল করার কয়েক দিনের মধ্যেই তার সমস্ত মতামতের আমুল পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। সকলের চেয়ে খাজা কিলানই এখন ফিরে যাওয়ার সঙ্কল্পে স্থির হয়ে রইলো।

আমার সৈন্যদলের মধ্যে ফিসফিসানি শুনতে পেয়ে আমার সমস্ত বেগকে পরামর্শ সভায় উপস্থিত হতে ডাকলাম। আমি তাদের বল্লাম যে যুদ্ধ জয় এবং সাম্রাজ্য স্থাপনের মত কাজ অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সেনাদল ছাড়া হয় না। রাজা এবং অভিজাত শ্রেণীর কোনও অস্তিত্ব থাকতে পারে না—যদি প্রজা বা অধীনস্থ প্রদেশ না থাকে। অনেক বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায়, অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে, দীর্ঘ কষ্টকর পথ অতিক্রম করে, নানাভাবে সৈন্য সংগ্রহ করে নিজেকে এবং আমার সৈন্যদলকে নানা ঘোরতর বিপদের অবস্থার মধ্যে চালিয়ে নিয়ে যুদ্ধ এবং রক্তপাতের ফলে আল্লার অসীম অনুগ্রহে পরাক্রমশালী শত্রুকে পরাজিত করে আমি অসংখ্য প্রদেশ ও রাজ্য জয় করেছি এবং সেগুলো এখন অধিকার করে আছি। এখন এমন কি ব্যাপার ঘটে গেল, এমন কি দুঃখকষ্ট আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে যে যে রাজ্য আমরা নিজেদের শক্তিক্ষয় করে জয় করেছি সেই বিজিত রাজ্য বিনা কারণে পরিত্যাগ করে হতাশা এবং অস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আবার কাবুলে ফিরে যাব? যে কেউ আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করে সে যেন কখনই এমন প্রস্তাব আমার কাছে উত্থাপন না করে। যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকে যে কিছুতেই এখানে থাকবার কথা মেনে নিতে ও এখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করতে ইচ্ছুক নয় সে চলে যাক। আমার এই যুক্তি-সঙ্গত এবং নিরপেক্ষ প্রস্তাব শোনার পর বাধ্য হয়েই অনিচ্ছা সত্বেও অসন্তুষ্ট সৈন্যদল তাদের রাজদ্রোহকর প্রস্তাব ত্যাগ করলো। খাজা কিলান থাকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ঠিক হলো যে তার অধীনে অনেক সৈন্য থাকায় সে কাবুলের জন্য আমার উপহারগুলি পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। কাবুল ও গজনিতে আমার সৈন্য

সংখ্যা খুব অল্প থাকায় আমি তাকে এই নির্দেশ দিই যে এই জায়গাগুলো যেন ঠিকভাবে সুরক্ষিত থাকে এবং যেন খাদ্যসম্ভারের কোনও অপ্রতুল না হয়। গজনির শাসন ভার আমি তার উপর অর্পণ করি—যার রাজস্ব বাৎসরিক তিন লক্ষ মুদ্রা। খাজা কিলান হিন্দুস্থানের প্রতি এমন বিরূপ হয়ে উঠেছিল যে তার যাওয়ার সময় দিল্লীর কতকগুলি বাড়ীর দেওয়ালে এই কবিতাটি লিখে রেখে যায় :—

(তুর্কিতে)

'নিরাপদে যদি সিন্ধু
হাতে পারি পার।
এইমুখো আর কভু
হবো নাকো আর।
হিন্দে ফিরিতে যদি
পুনঃ ইচ্ছা হয়।
লজ্জায় আমার যেন
মাথা কাটা যায়।'

যখন আমি হিন্দুস্থানে সশরীরে বর্ত্তমান তখন এরূপ একটি কবিতা রচনা করে প্রকাশ করা প্রত্যক্ষভাবে অসৌজন্যের লক্ষণ। আমাকে ত্যাগ করে যাওয়ার সঙ্কল্প আমার ক্ষোভের কারণ হয়েছিল—কিন্তু তার এই আচরণ তার অপরাধ দ্বিগুণ করে দিল। আমি কোনও রকমে প্রস্তুত না হয়েই তাড়াতাড়ি একটি কবিতা লিখে তার কাছে পাঠিয়ে দিই।

(তুর্কিতে)

'বাবর! আল্লার অসীম দয়া তোমার উপর।
হও নতশির শত শত বার উদ্দেশ্যে তাঁহার।
সিন্ধ, হিন্দ, আরও রাজ্য, যিনি করেছেন দান,
গ্রীষ্মের অসহ্য তাপে তাঁর দয়া হবে কি বিস্মরণ?'
গরমে অস্থির হয়ে ভাব যদি শীতল স্থানের কথা,
ভাব একবার গজনির অসহ্য শীত তুষারের ব্যথা।'

সাওয়াল উৎসবের কয়েক দিন ধরে সুবৃহৎ হল ঘরে একটা বড় রকমের ভোজের আয়োজন হয়। সুতরাং ইব্রাহিমের নিজস্ব প্রাসাদের মধ্যস্থলে অর্দ্ধ-গোলাকার ছাদের নীচে চার দিকে পাথরের স্তম্ভশ্রেণীযুক্ত এই বিশাল কক্ষে এই উপলক্ষে

স্বর্ণখচিত শাল, কোমর বন্ধ সহ তরবারি এবং সোনার জিন সহ ঘোড়া আমি হুমায়ুনকে উপহার দিই। চিন্ তাইমুর ও মহম্মদ সুলতানকে স্বর্ণখচিত শাল, কোমর বন্ধ সহ তরবারি এবং ছোরা দিই। অন্যান্য বেগ ও কর্ম্মচারীদেরও পদমর্য্যাদানুযায়ী দেওয়া হয় কোমর বন্ধ সহ তরবারি, ছোরা এবং সম্মান জনক পোষাক। মোটের উপর সেদিন একটি জিন সহ ঘোড়া, কোমরবন্ধ সহ দুই জোড়া তরবারি, মিনা করা ২৫ টি ছোরা, বহুমূল্য পাথর খচিত দুইখানি ছোরা এবং আঠাশটি পোষাক উপহার দেওয়া হয়। এই ভোজের দিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল। এই দিন তেরবার বৃষ্টিপাত হয়। যারা বাইরে বসেছিল তারা সম্পূর্ণ ভাবে ভিজে যায়।

আমার প্রায়ই মনে হয় যে হিন্দুস্থানের প্রধান অসুবিধা হচ্ছে কৃত্রিম জলাধারের অভাব। সঙ্কল্প করলাম—যে জায়গা আমি বাস করবার জন্য নির্ব্বাচন করছি সেখানেই কৃত্রিম জলাশয়, জল আনবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সুপরিকল্পিত আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্র তৈরীর বন্দোবস্ত করব। আমার আগ্রায় আসার কয়েকদিন পরই স্থান নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্য নিয়ে যমুনা পার হয়ে যাই এবং ঐ দিকটা পরীক্ষা করে দেখতে থাকি যে জায়গাটা উদ্যান রচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র কিনা। কিন্তু সমস্ত জায়গাই এমন কুশ্রী ও ন্যক্কারজনক যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আবার যমুনা পার হয়ে ফিরে আসি। সৌন্দর্য্যের অভাব এবং দেশের অসন্তোষজনক পরি প্রেক্ষিতে আমার উদ্যান রচনার কল্পনাকে ত্যাগ করতে হলো। কিন্তু আগ্রার কাছাকাছি কোনওরূপে একটা উপযুক্ত স্থান খুঁজে না পাওয়ায় যে জায়গা পাওয়া যাচ্ছে, তারই সদ্ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা।

প্রথমে একটি বড় ইঁদারা খনন করে স্নানাগারে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করি। তারপর যে ভূমিখণ্ডে তেঁতুল গাছ এবং আট কোণ বিশিষ্ট জলাশয় আছে সেইখানে কাজ সুরু করি। জলাশয়টি আরও বড় করে তার পাড় ভালভাবে বাঁধিয়ে ফেলা হয়। তারপর পাথরের প্রাসাদের সম্মুখের বড় দরবার হল এবং পুষ্করিণীটির সংস্কার করি। অন্তঃপুরের কক্ষগুলির সম্মুখের বাগান এবং সেই কক্ষগুলিও সুসংস্কৃত করা হয়। এইভাবে কাজ করতে করতে হিন্দুস্থানী রীতি অনুযায়ী যে সব প্রাসাদ ও উদ্যান অপরিচ্ছন্ন ও শৃঙ্খলাবিহীন ছিল, সেগুলো যথা সাধ্য নিয়ম মাফিক কায়দায় সজ্জিত করা হলো। কোণায় কোণায় উদ্যান রচনা করলাম। প্রতিটি বাগানে গোলাপ ও নার্সিসাস গাছ রোপণ করা হলো। কেয়ারি করে মুখোমুখি এই গাছগুলো রোপণ করা হলো।

হিন্দুস্থানে তিনটি জিনিষ আমার বিরক্তি উৎপাদন করছে—এক গরম, দুই ঝোড়ো হাওয়া, তিন ধুলো। গ্রীষ্মকালে গরম হাওয়া এমন প্রবল হয় যে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কারও ক্ষমতায় কুলোয় না।

স্নানাগারে যেখানে স্নানের জল রাখার টব অথবা চৌবাচ্চা থাকে, সেগুলো পাথরের তৈরী। জলাধার শ্বেতপাথরের এবং এই কক্ষের আর সব যেমন মেঝে ও ছাদ লালপাথরের তৈরী। আমার অন্যসব অনুচর যারা নদীর ধারে জমি সংগ্রহ করেছিল, তারা সেখানে উদ্যান রচনা এবং পুষ্করিণী খনন করে। তারা চরখি তৈরী করে নদী থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে। হিন্দুস্থানের লোক যারা এই রকম ভাবে সাজানো কোনও জায়গা পূর্ব্বে কখনও দেখেনি এবং কি পদ্ধতিতে জায়গাগুলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলা যায় তার কোনও ধারণা নাই—তারা যমুনা তীরের এই দিকটায় নতুন তৈরী প্রসাদ ও বাগান দেখে বিস্মিত হয়ে এই জায়গায় নামকরণ করে—'কাবুল'।

আগ্রা দুর্গের ভিতরে প্রসাদ ও দুর্গ প্রকারের মাঝে একটা খালি জায়গা ছিল। আমি এই জায়গায় কুড়ি ফুট চতুষ্কোণ একটা কূপ খনন করার নির্দ্দেশ দিই। হিন্দুস্থানী ভাষায় এই রকম বড় কূপ যাতে নামার সিঁড়ি আছে তাকে ওয়েন বলে। এখানে উদ্যান-রচনা করার আগেই এই কূপ খনন করা আরম্ভ হয়। বর্ষাকালে যখন মজুররা এই কূপ খননের কাজে ব্যস্ত তখন কয়েকবার মাটির ধ্বস নেমে তারা মাটির নীচে চাপা পড়ে। রাণা সঙ্গর সঙ্গে আমার ধর্ম্ম-যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমি এই কূপ খননের কাজ শেষ করতে আদেশ দিই—ফলে একটি মনোরম ওয়েন তৈরী হয়ে যায়। এই ওয়েনের মধ্যে তিনতলা একটি বাড়ী তৈরী করা হয়। নীচ তলাতে তিনটি খোলা কক্ষ। কূপের মধ্য দিয়ে এখানে যাওয়া যায়। সারি সারি সিঁড়ি বেয়ে নামবার পর তিনটি পৃথক পৃথক কক্ষে প্রবেশ করার পথ দেখা যাবে। একটি কক্ষ অপরটির চেয়ে তিন সিঁড়ি পরিমাণ উঁচু। সব শেষের কক্ষ থেকে আর কয়েকটি সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। যে ঋতুতে কুয়োর জল কমে আসে তখন সেই সিঁড়ি দিয়ে আরও নীচে কুয়োর জলে নামা যায়। বর্ষাকালে যখন জল ওপরে ওঠে, নীচ তলার সব চেয়ে উঁচু ঘরটার ওপর পর্য্যন্ত জল আসে। দোতলায় বাঁকা পাথরের তৈরী একটি কক্ষ এবং নিকটেই আর একটি গম্বুজওয়ালা ঘর যেখানে বলদরা চাকা ঘুরিয়ে জল তোলে। ওয়েনের ওপরের প্রান্ত থেকে অর্থাৎ কুয়োর ওপর থেকে পাঁচ ছয়টি সিঁড়ির নীচে দিয়ে এই কক্ষের প্রত্যেক দিকে যাওয়ার জন্য আর এক

প্রস্থ করে সিঁড়ি গিয়েছে। এই কক্ষের প্রবেশ পথের বিপরীত দিকের দেওয়ালে এই বাড়ী নির্ম্মাণের তারিখ একটা পাথরে খোদাই করা আছে দেখা যায়। এই কূপের পাশেই আর একটা গর্ত্ত এমনভাবে খনন করা হয়েছে যে তার তলদেশ কূপের মাঝামাঝি গভীরতার চেয়ে কিছু উঁচু। পূর্ব্বে উল্লিখিত গম্বুজ ঘরে বলদগুলো জল তোলার জন্য যে চাকা ঘোরাচ্ছে, সেই জল পাশের গর্ত্তটায় পড়ছে। এই শেষোক্ত গর্ত্ত থেকে আর একটি চাকার সাহায্যে দুর্গ প্রাচীরের সমান উঁচু জায়গায় জল তুলে উঁচু বাগানগুলিতে সেই জল ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে জায়গায় কূপের সিঁড়ি ওপরে উঠে এসেছে, সেই খানটায় একটা পাথরের ঘর তৈরী করা হয়েছে। কূপের চারি দিকের বেষ্টনীর বাইরে পাথর দিয়ে একটি মসজিদও নির্ম্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু এটা খুব খারাপভাবে হিন্দুস্থানের রীতি অনুসারে তৈরী।

১৫২৬ সালের ঘটানবলী

মহরম মাসে বেগ উইস্ ফারুকের জন্মের সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হলো। যদিও আগেই একজন পত্রবাহক পদব্রজে এই সংবাদ নিয়ে আমার কাছে এসেছিল, তবুও বেগ উইস্ এই মাসে সেই সুসংবাদ তার নিজমুখে আমাকে শোনানোর জন্য হাজির হলো। সাওয়াল মাসের ২৩শে তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যায় তার জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় ফারুক।

বিয়ানা এবং আরও কয়েকটি জায়গায় গোলাবর্ষণ করার উদ্দেশ্যে ওস্তাদ আলি কুলিকে একটি বড় কামান নির্ম্মাণ করতে নির্দেশ দিই। কারণ, এই দেশগুলো তখনও আমার বশ্যতা স্বীকার করেনি। কতকগুলো হাফর ও আরও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করে নিয়ে সে আমার কাছে লোক পাঠিয়ে জানান যে কামান তৈরীর সব সরঞ্জাম ঠিক করা হয়েছে। ওস্তাদ আলি কি ভাবে কামান ঢালাই করে আমরা দেখতে গেলাম। যে জায়গায় কামান ঢালাই করা হবে তার চারিদিকে আটটি হাফর ও আরও সাজসরঞ্জাম রক্ষিত আছে। প্রত্যেক হাফরের নীচে এক একটি নালী—যে নালীটা কামান ঢালাই এর ছাঁচ পর্য্যন্ত গিয়েছে। আমার পৌঁছানোর পরই তারা বিভিন্ন হাফরের গর্ত্ত খুলে ফেলে। উত্তপ্ত তরল ধাতু সেই সব নালীর মধ্য দিয়ে ছাঁচের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলো। কিছুক্ষণ এইভাবে চলবার পর নানা হাফরের মধ্য দিয়ে সেই তরল ধাতুর প্রবাহে কামানের ছাঁচ সম্পূর্ণ পূর্ণ হওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে গেল।

হাফর অথবা গলিত ধাতুর সম্বন্ধে বোধহয় কোনও রকম অসতর্কতা ঘটেছিল। ওস্তাদ আলি কুলি খুবই অনুতপ্ত হয়ে পড়লো। এমন কি সে ছাঁচের মধ্যে গলিত ধাতুর ভিতর ঝাপিয়ে পড়তেও উদ্যত হলো। তার লজ্জা দূর করার জন্য তাকে আমরা উৎসাহিত করতে লাগলাম এবং তাকে একটা সম্মানসূচক পোষাক দিলাম। দুই দিন পর সেই ছাঁচ ঠাণ্ডা হলে ছাঁচের আবরণ খুলে ফেলা হয়। ওস্তাদ আলি খুবই আনন্দিত হয়ে আমার কাছে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দেয় যে কামানের যে কক্ষে গোলা পোরা হয় তাতে কোনও দোষ নাই এবং বারুদের কক্ষটা ও ঠিক ভাবে তৈরী করে ফেলা হয়েছে। গোলার কক্ষটি উঁচু করে তুলে সেটাকে ঠিক করে নিতে সে কয়েক জনকে কাজে লাগায় এবং নিজে বারুদ কক্ষটির কাজ শেষ করার ভার নেয়।

হুমায়ুনের কাছ থেকে ফতে খাঁর ভার নিয়ে মেহিদ খাজা তাকে আমার দরবারে নিয়ে আসে। ফতে খাঁকে আমি সাদর অভ্যর্থনা জানাই। তার পিতার রাজ্য এবং তার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করে তাকে অর্পণ করি যার মূল্য চল্লিশ লক্ষ টাকা। হিন্দুস্থানে যে সব আমির খুব বেশী অনুগ্রহভাজন,—তাদের নানা উপাধি দেওয়ার রীতি আছে। এই রকম উপাধির একটি হচ্ছে—'আজিম'। হুমায়ুন ছাড়া এই উপাধি আর কারও লাভ করা সঙ্গত নয় মনে করে আমি এই নামের উপাধি বাতিল করে দিই।

সফর মাসের ২০শে তারিখ বুধবার তেঁতুল গাছের পাশে পুষ্করিণীর তীরে চাঁদোয়া খাটানো হয়। সেখানে একটি ভোজের আয়োজন করে ফতে খাঁকে নিমন্ত্রণ করি। তাকে সুরাপান করিয়ে একটি পাগড়ি এবং মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সম্মান সূচক একটি সম্পূর্ণ পোষাক উপহার দিই। তাকে অনুগ্রহ দেখিয়ে এবং সম্মানে ভূষিত করে নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য বিদায় দিই। ঠিক হয় যে তার পুত্র মামুদ খাঁ আমার দরবারে থাকবে।

এই বছরের রবিউল আওয়াল মাসের ১৬ই তারিখ শুক্রবার একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। ব্যাপারটি এই। সেই হতভাগ্য মহিলা—ইব্রাহিমের মা শুনতে পেয়েছিল যে আমি হিন্দুস্থানের পাচকদের তৈরী খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে থাকি। তিন চার মাস আগে যখন হিন্দুস্থানের খাদ্য রন্ধন ও তা আহার করার ব্যবস্থা হয়ে উঠলো না, তখন আমার ইচ্ছা হলো যে ইব্রাহিমের বাবুর্চিদের এখানে ডেকে আনা হোক। পঞ্চাশ কি ষাট জন বাবুর্চির মধ্যে চার জনকে নির্বাচন করে

কাজে নিযুক্ত করা হলো। ঐ মহিলা এই কথা জানতে পেরে একজন লোককে পাঠিয়ে খাদ্য পরীক্ষক আমেদকে ডেকে আনে। একজন ক্রীতদাসীর হাতে কাগজে মোড়া এক আউন্স পরিমাণ বিষের গুঁড়া ঐ খাদ্য পরীক্ষকের হাতে দিতে বলে। আমেদ সেই বিষ আমার একজন বাবুর্চির হাতে দেয়। সে তখন বাবুর্চিখানার কাজ করছিল। তাকে এই প্রলোভন দেওয়া হয় যে কাজ হাসিল করতে পারলে তাকে চারটি জেলা পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হবে। সে যেন এই বিষের গুঁড়া যে কোনও উপায়ে আমার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে দেয়। ইব্রাহিমের মা আর একটি ক্রীতদাসীকে সেই প্রথমা ক্রীতদাসীর পিছু পিছু পাঠায়—যার হাতে আমাকে দেওয়ার জন্য বিষ পাঠানো হয়—এইটি দেখবার জন্য যে সেই বিষ সত্যই আমেদের হাতে পৌঁছে কিনা। ভাগ্য ভাল যে সেই বিষ রান্নার পাত্রে ফেলা হয় না—ফেলা হয় থালার ওপর। রসুইয়ের পাত্রে বিষ না ফেলার কারণ এই যে আমার খাদ্য পরীক্ষকদের ওপর এমন নির্দেশ দেওয়া ছিল যে হিন্দুস্থানী পাচকদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং যখন রান্না হবে সেই রান্নার পাত্র থেকেই খাদ্য পরীক্ষা করতে হবে। যখন রান্না করা মাংস প্লেটে ঢালা হয় তখন আমার নির্বোধ অন্য খাদ্য পরীক্ষকরা অন্যমনস্ক ছিল। আমেদ সেই সুযোগে বিষের গুঁড়োর অর্দ্ধেকটা একটা প্লেটে কয়েকটা পাতলা রুটির ওপর ছড়িয়ে তার ওপর মাখন-ভাজা মাংস রাখে। যদি বিষের গুঁড়ো ভাজা মাংসের উপর অথবা রান্নাব পাত্রে ছড়িয়ে দিত তাহলে আরও গুরুতর অবস্থা দাঁড়াতো। কিন্তু মনের স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলার জন্য অর্দ্ধেকের বেশী বিষই উনুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

শুক্রবার অপরাহ্নের নামাজের পর ওরা আমার খানা সাজায়। আমি খর-গোশের মাংস খেতে খুব ভালবাসি। এই মাংস কিছু খাই তার সঙ্গে অনেকটা গাজর-ভাজা। আমি তখনও বিস্বাদজনক কিছু বুঝিতে পারিনি। আমি দুই এক টুকরো শুক্‌নো ঝলসানো মাংস খাই। সেইটি খাবার পর আমি বমি বমি ভাব অনুভব করি। আগের দিনেও এই রকম পোড়া মাংসের একটা অংশ খেয়ে আমার কেমন বিস্বাদ লেগেছিল। ঐ রকমই আমার মনে হচ্ছে বমি বমি ভাবটার ব্যাখ্যা এ ভাবেই করেছিলাম। আবার আমার বমির ভাব হতে থাকে। খাবার প্লেট সম্মুখে থাকতেই আমার পেট এমন গুলিয়ে যায় যে দুই তিন বার প্রায় বমি করে ফেলবো বলে মনে হয়। শেষে কিছুতেই বমির ভাব দমন করিতে না পেরে বাইরে যাই। বাইরে আসবার পথেই আমার বুক

ধর ফড় করে ওঠে এবং যেতে যেতেই মনে হলো বমি করে ফেলবো। বাইরে আসার পরই অনেকটা বমি হয়ে গেল।

আগে কখনও খাদ্য গ্রহণ করার পর বমি করিনি। এমন কি মদ খাওয়ার পরও এমন কখনও হয়না। আমার মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয়। আমি পাচকদের আটক করে রাখবার জন্য আদেশ দিই। একটা কুকুরকে ঐ খাবার খাইয়ে তাকে বন্ধ করে রাখার জন্য হুকুম করি। পরদিন সকাল বেলা প্রথম প্রহরের পর কুকুরটা পীড়িত হয়ে পড়ে। তার পেটটা ফুলে ওঠে এবং খুব অসুস্থ হয়ে পাড়ছে বলে বোধ হয়। তার দিকে ঢিল ছুঁড়লে এবং নানা ভাবে উত্যক্ত করলেও তাকে শোয়া অবস্থা থেকে দাঁড় করানো গেল না। দুপুর পর্য্যন্ত কুকুরটা এই অবস্থায় ছিল তার পর সে উঠে দাঁড়ালো এবং সুস্থ হয়ে উঠলো। দুইজন যুবকও এই খাদ্যের কিছু কিছু খেয়েছিল। পরদিন সকালে তারাও খুব বমি করতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন খুবই অসুস্থ পড়ে। যাহোক তারা দুইজনেই শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায়।

বিপদের ঝঞ্ঝা আমার উপর
দিয়ে বয়ে গেল।
নিরাপত্তা ফিরে পেলাম শেষে,
প্রাণ রক্ষা হলো।
মহান আল্লা করিলেন
নবজীবন দান।
পর পার হতে ফিরে এলাম,
পেলাম নব প্রাণ।
যেন মাতৃগর্ভ হতে আবার
আমার জন্ম হলো।'

* * *

'আমি ভেঙ্গে পড়েছিলাম।
আমি মরে গিয়েছিলাম।
তবুও আবার ফিরে পেলাম জীবন।
মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তরণ—
এই নতুন করে পাওয়া প্রাণ
সবই ঈশ্বরের দান, ভুলিনি কখন।

মহম্মদ বকসিকে পাচকদের নজরবন্দী করে রেখে তাদের জেরা করতে আদেশ দিই। অবশেষে, তারা সমস্ত ব্যাপারই প্রকাশ করে যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

সোমবার দরবার দিনে আমি সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, প্রধান প্রধান লোক, বেগ এবং উজিরদের দরবার কক্ষে আসবার জন্য নির্দেশ দিই। দুইজন পাচক এবং দুইজন স্ত্রীলোককে দরবার কক্ষে আনিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তারা ব্যাপারটির খুঁটি নাটি বিষয় সবই প্রকাশ করে বলে। খাদ্য পরীক্ষককে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলার জন্য হুকুম দিই। পাচকদের জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। একজন স্ত্রীলোককে হাতীর পায়ের তলায় নিক্ষেপ করে পিষে মেরে ফেলার এবং আর একজনকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য নির্দ্দেশ দিই। ইব্রাহিমের মাকে বন্দীশালায় রাখার জন্য আদেশ জারি করি। সে নিশ্চয়ই তার গুরুতর অপরাধের জন্য আল্লার দরবারে উপযুক্ত শাস্তি পাবে।

শনিবারে আমি শুধু দুধপান করি। সুরায় কিছু 'মাখতুম' ফুল মিলিয়ে ঘেঁটে নিয়ে সেটাও পান করি। আল্লার অসীম দয়ায় আমার পীড়ার আর কোনও চিহ্ন রইলো না! আমি আগে কখনও ধারণা করতে পারিনি যে জীবন এমন মধুময় বস্তু।—কবি বলেছেন—

'মৃত্যুর দুয়ারে আসে যেই জন,
জীবনের মূল্য বোঝে সে তখন।'

এই ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলির কথা যখনই আমার স্মৃতিপথে উদিত হয় তখনই মনে হয় যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বো। আল্লার করুণা আমাকে নবজীবন দান করেছে। কেমন করে আমার রসনা এই কৃতজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করবে? আমার বিতৃষ্ণার ভাব দূর করে ফেলবো মনস্থ করে যা যা ঘটেছিল তার প্রত্যেকটি ঘটনা লিখে রেখেছি। যদিও ঘটনাগুলি বীভৎস এবং মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার উপযুক্ত নয় তবুও সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অনুগ্রহে সুখের দিনগুলি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি সুখ ও সমুজ্জ্বল স্বাস্থ্য নিয়ে দিন অতিবাহিত করছি।

[বাবর এই সময় দিল্লীর রাজা হয়ে বসেছিলেন—তাঁকে কোনও ক্রমেই হিন্দুস্থানের সম্রাট বলা চলে না। পানিপথের যুদ্ধে তিনি আফগানদের শক্তি চূর্ণ করতে পেরেছিলেন। তাঁকে রাজপুতদের প্রধান হিন্দুরাজা রাণা সঙ্গর সাথে এখন যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। হিন্দুস্থানের যোদ্ধা জাতির মধ্যে

রাজপুতরা সব চেয়ে যুদ্ধকুশলী। বাবরের সমস্ত অভিযান এ পর্য্যন্ত তাঁর স্বধর্মী মুসলমানদের বিরুদ্ধে চালিত হয়েছে। এখনই সর্ব্ব প্রথম তিনি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে যাচ্ছেন। এর নামই জেহাদ—অর্থাৎ ধর্ম্মীয় যুদ্ধ। রাজপুত জাতি বীর, অধ্যবসায়শীল। যুদ্ধে ও রক্তপাতে নির্ভীক। জাতীয়তা বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে তারা তাদের শিবিরের বীরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের সম্মান রক্ষার জন্য সব সময়েই প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তাদের অসমসাহসিকতা ও বীর্য্যবত্তার কথা ও তাদের সৈন্য সংখ্যার বিপুলতার কথা শুনে বাবরের সৈন্যরা বেশ কিছু আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।]

যে কামান ওস্তাদ আলি কুলি তৈরী করেছিল, ঢালাই করবার সময় যার গোলা-কক্ষ অক্ষত আছে জানা গিয়েছিল এবং যার বারুদ-কক্ষ পরে ঠিকমত ঢালাই করে কাজের উপযুক্ত করা হয়েছিল—যার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—সেই কামান দিয়ে কিভাবে ওস্তাদ আলি গোলা বর্ষণ করে তা দেখবার জন্য রবিবারে সেখানে যাই। কামান থেকে কতদূর গোলা নিক্ষিপ্ত হতে পারে সেইটা দেখার উদ্দেশ্য ছিল। অপরাহ্নের নমাজের কাছাকাছি সময় কামানটি দাগা হয়। দেখা গেল—এর গোলা একহাজার দু'শ পদক্ষেপ পরিমিত জায়গা দূরে গিয়ে পড়েছে।

প্রথম জেমাদি মাসের ৯ই তারিখে বিধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করার জন্য যাত্রা সুরু করি। সহরের উপকণ্ঠ পেরিয়ে সমতল ক্ষেত্রে তাঁবু ফেলে তিন চার দিন সৈন্য সংগ্রহ করতে এবং তাদের যথারীতি উপদেশ দিতে অপেক্ষা করি। হিন্দুস্থানের লোকেদের উপর আমার বিশেষ আস্থা না থাকায় আমি তাদের এলোমেলো ভাবে নানাদিক ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানোর জন্য আমিরদের নিযুক্ত করি।

এই জায়গাতেই সংবাদ আসে যে রাণা সঙ্গ তার প্রায় সমস্ত সৈন্য নিয়ে বিয়ানার কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। আমার যে সৈন্যদল আগে পাঠিয়েছি তারা দুর্গে পৌছাতে পারেনি এমন কি দুর্গের লোকেদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ স্থাপন করতেও পারেনি। বিয়ানার দুর্গরক্ষী সৈন্যগণ দুর্গ থেকে অনেক দূর অসতর্ক ভাবে এগিয়ে যায়। শত্রুপক্ষ অকস্মাৎ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সম্পূভাবে পরাস্ত করে।

আমার মনে হলো, এখন যে রকম অবস্থা তাতে কাছাকাছি জায়গার মধ্যে শিবির স্থাপন করার মত উপযুক্ত স্থান হবে সিক্রি—সেখানে পর্য্যাপ্ত জল পাওয়া

যাবে। কিন্তু এও হতে পারে যে বিধর্ম্মীরা সেখানে জলের উৎসগুলি অধিকার করে সেখানেই শিবির ফেলবে। সেইজন্য আমি সৈন্যদের বুদ্ধ সাজে সাজিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলাম।

কয়েকজন বেগকে অগ্রগামী সৈন্যদলের পালা ক্রমে ভার নিয়ে এগিয়ে যেতে এবং শত্রুপক্ষের কার্য্যকলাপের সন্ধান নিতে নির্দ্দেশ দিই। যেদিন এই কাজের ভার আবদুল আজিজের ওপর পরে, সে কোনও রকম সাবধানতা অবিলম্বন না করেই সিক্রির দশমাইলের মধ্যে এগিয়ে যায়। বিধর্ম্মী সৈন্যদল যখন এগিয়ে আসছিল তখন তাদের আব্দুল অজিজের বুদ্ধিহীন বিশৃঙ্খল ভাবে এগিয়ে আসার ব্যাপারটা নজরে পড়লো। যখন তারা জানতে পারে তখন তাদের পক্ষের চার পাঁচ হাজার সৈন্য ধেয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আব্দুল আজিজের সঙ্গে এক হাজার কি দেড় হাজার সৈন্য ছিল। শত্রুসৈন্যের অবস্থান ও তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে বিবেচনা না করেই তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। ঠিক প্রথম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি সৈন্য বন্দী হয়ে যায় এবং তাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। আমার কাছে অনবরত দূত আসতে থাকে এই সংবাদ নিয়ে যে শত্রু আমাদের কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তখনই প্রস্তুত হয়ে নিলাম। ঘোড়াদের যুদ্ধসজ্জা পরাণো হলো। তারপরই ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলাম। গোলন্দাজদের কামান নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলাম। দুই মাইল অগ্রসর হওয়ার পরই দেখা গেল শত্রুসৈন্য পিছিয়ে পড়েছে।

বাঁ দিকে একটা বড় পুষ্করিণী দেখতে পেয়ে জলের সুবিধার জন্য সেখানেই শিবির স্থাপন করি। কামানগুলো সম্মুখ দিকে রেখে সেগুলো একটার সাথে একটা শিকল দিয়ে বাঁধা হয়। প্রতি দুইটি কামানের মধ্যে ষোলো ফুট জায়গা ফাঁক রাখা হয়। মুস্তাফা রুমি রুমি-রীতি অনুসারে কামানগুলো সাজিয়ে ফেলে। কামান পরিচালনা ব্যাপারে সে অত্যন্ত দক্ষ, বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ। ওস্তাদ আলি কুলি তার প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ হওয়ায় আমি তাকে হুমায়ুনের সঙ্গে দক্ষিণ দিকে থাকতে বলি। যে সব জায়গায় কামান ছিলনা সেখানে হিন্দুস্থানি পথ পরিষ্কার ও কোদাল চালক সৈন্যদের গড়খাই খননের কাজে নিযুক্ত করি।

বিধর্ম্মী সৈন্যদের সাহসিকতা, আকস্মিক অগ্রগতি, বিয়ানাতে তাদের কৃতকার্য্যতা এবং শা'মনসুর ও আর যারা বিয়ানা থেকে এসেছিল তাদের মুখ থেকে শোনা শত্রুপক্ষের অসীম সাহসের উচ্চ প্রসংসা—এই সব মিলিয়ে আমার

সৈন্যদের ভীতির সঞ্চারের কারণ হয়। আব্দুল আজিজের পরাজয়ে সেই ভীতি চরমে ওঠে। আমার সৈন্যদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে এবং বাহ্যতঃ আমার অবস্থান ঘাটি সুদৃঢ় করতে কাষ্ঠ নির্ম্মিত কতকগুলি তেপায়ার মত জিনিস তৈরী করা হয়। এক একটি তেপায়া ষোল ফুট দূর দূর বসিয়ে ষাঁড়ের চামড়ায় পাকানো দড়ি দিয়ে বেঁধে শক্ত করতে নির্দ্দেশ দিই। যন্ত্রপাতি ও আসবাব তৈয়ারী করতে কুড়ি পঁচিশ দিন কেটে গেল।

এই সময়ে কাবুল থেকে পাঁচশ' লোক এখানে পৌঁছে গেল। মহম্মদ সেরিয়া নামে একজন সয়তান-স্বভাবের জ্যোতিষী তাদের সঙ্গে আসে। বাবা দোস্ত সুচি যাকে সুরা আনার জন্য কাবুলে পাঠানো হয় সে গজনির কয়েক রকমের উৎকৃষ্ট সুরা তিন সারি উটের পিঠে চাপিয়ে ঐ দলের সঙ্গেই এখানে আসে। যখন অতীতের ঘটনা এবং অসময়োচিত আজগুবি সংবাদ ছড়ানোর জন্য আমরা সৈন্যরা ভয়ে ও আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছে সেই সময় দুষ্টবুদ্ধি মহম্মদ সেরিয়া কোথায় আমাকে সাহায্য করবে তা না করে সে যাকেই শিবিরে পাচ্ছে তাকেই বলে বেড়াচ্ছে যে এই সময়টা পশ্চিম দিকে মঙ্গল গ্রহ বর্ত্তমান, সে জন্য যে কেউ তার বিপরীত দিক থেকে যুদ্ধ চালাবে তারা পরাস্ত হবে। যারা এই সয়তান জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করলো তারাই আরও হতাশ হয়ে পড়লো। তার এই মূর্খের মত ভবিষ্যদ্বাণীতে কর্ণপাত না করে আমি এইরকম অবস্থায় যে সমস্ত সাবধনতা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাই করতে অগ্রসর হলাম এবং আমার সৈন্যগণ যাতে মনোবল ফিরে পেয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়তে পারে তেমন অবস্থা সৃষ্টির উদ্যমে লেগে গেলাম।

জেমাদি-উল আওয়াল মাসের ২৩ শে তারিখ সোমবার অশ্বারোহণ করে সৈন্যদলের অবস্থান ঘাটি পরিদর্শনের জন্য বেড়িয়ে পড়ি। ঘোড়ার পিঠে থাকার সময় আমার মনে এইরূপ আত্মসমালোচনা গভীর ভাবে চলতে থাকে যে—আমি বারংবার যেবিষয়ে চিন্তা করেছি অর্থাৎ কোনওনিষিদ্ধ কাজ করলে সক্রিয় ভাবে অনুতপ্ত হবো এইরূপ মনোভাবের কিছু মাত্র অস্তিত্ব এখনও আমার মনের মধ্যে রয়েছে কিনা। আমি নিজের মনেই বলতে লাগলাম ঃ—

'হে মোর আত্মা!
পাপের আনন্দে রহিবে মগন
আর কত দিন?

কর অনুতাপ, অনুতাপ কভু
নহে স্বাদহীন।
বল, পাপে কতদূর কলুষিত হয়েছে
তোমার মন ?
নিরাশায় ডুবে পাপের আনন্দে
মজেছ যখন !
বল, কতটা জীবন এই ভাবে তুমি
নিঃশেষ করেছ ?
কতদিন, বল কতদিন, ইন্দ্রিয়ের
দাস হয়ে আছ ?

*   *   *   *

'ধর্ম্মযুদ্ধ যুঝিবার তরে হয়েছ বাহির।
দেখেছ মৃত্যুর দৃশ্য—যে পথ তোমার মুক্তির।
আত্মাকে রক্ষার হেতু প্রাণ ডালি দেয় যেই জন,
একথা তো তুমি জানো, সেই লভে অনন্ত জীবন।
নিষিদ্ধ ভোগেচ্ছা থেকে দূরে যাক,
পাপ হতে নিজের জীবন মুক্ত রাখ।
এইভাবে চিন্তা করে মনে মনে করিলাম পণ,
লোভ থেকে দূরে সরে' সুরাপান করিব বর্জ্জন।'

সোনা ও রূপার পান পাত্র, পেয়ালা, আরও যে সব পাত্রে সুরাপান বৈঠকে সুরা পরিবেশন করা হয় সেগুলি আনিয়ে ভেঙ্গে ফেলার জন্য আদেশ দিই। আমার নিজের মনকে পবিত্র করার জন্য সুরাপানের অভ্যাস ত্যাগ করার সঙ্কল্প করি। সোনা ও রূপার পান পাত্রের টুকরা গুলি দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করার জন্য নির্দ্দেশ দান করি। আমার অনুতাপের প্রায়শ্চিত্তে প্রথম যে ব্যক্তি যোগ দেয় তার নাম আসাস্। সে আমার মতই প্রতিজ্ঞা করে যে দাড়ি কাটবে না, দাড়ি রাখবে। সেই রাত্রে এবং পরদিন অনেক আমির সভাসদ, সৈন্য এবং এমনও আরও কয়েকজন যারা চাকুরি করেনা সংখ্যায় প্রায় তিনশ জন তারা নিজেদের সংস্কারের শপথ গ্রহণ করে। যে সুরা আমাদের কাছে ছিল তা মাটিতে ঢেলে ফেলা হয়। আমি হুকুম দিই—যে সুরা বাবা দোস্ত

নিয়ে আসছে তাতে নূন ছড়িয়ে ভিনিগার তৈরী করা হোক। যেখানে মদ ঢেলে ফেলা হয় সেখানে একটা পাথরে বাঁধাই ইঁদারা খনন এবং তার কাছেই দানসত্র তৈরী করা হয়। আগেই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে যদি আমি বিধর্ম্মী রাণা সঙ্গকে' পরাজিত করতে পারি তা হলে দলিলের ওপর যে কর ধার্য্য আছে মুসলমানদের সে কর রেহাই দেব। যখন আমি প্রায়শ্চিত্তের শপথ গ্রহণ করি সেই সময় মহম্মদ সারবান এই কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি বলি—তুমি আমাকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঠিক করেছ। আমার সমগ্র রাজ্যে দলিলের ওপর ধার্য্য কর তুলে দিলাম। মুসলমানরাই এই কর থেকে রেহাই পাবে। আমার কার্য্যাধ্যক্ষদের ডেকে উপরোক্ত ঘটনা দুইটির বিবরণ লিপিবদ্ধ করে আমার ফর্ম্মান সমগ্র সাম্রাজের মধ্যে বিলি করতে আদেশ দিই।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি কোনও কোনও কারণে আমার অধীনস্থ ছোট বড় সব শ্রেণীর মধ্যেই সাধারণ ভাবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন একটা লোকও ছিলনা যে সাহসের সঙ্গে কথা বলতে পারে অথবা বলিষ্ঠ ভাবে মত প্রকাশ করতে পারে। উজিররা—যাদের কাজ হচ্ছে সৎ পরামর্শ দেওয়া এবং আমিররা যাদের কাজ হচ্ছে রাজ্যের ধন সম্পত্তি ভোগ করে আমাকে যথা সময়ে সাহায্য করা—তারা কেউই বীরের মত কথা বলছিল না এবং তাদের পরামর্শে ও হাবভাবে মোটেই সাহসিকতার চিহ্ন ছিল না। আমার এই অভিযানের সমস্ত সময়েই একমাত্র খলিফাই প্রশংসনীয় আচরণের পরিচয় দিয়েছিল এবং সমস্ত ব্যাপারেই শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেছিল। আমার সৈন্যদের সর্ব্বময় হতাশার ভাব এবং মনোবলের অভাব দেখে আমি অবশেষে একটা মতলব ঠিক করি। সমস্ত আমির ও কর্ম্মচারীদের সমবেত করে তাদের সম্বোধন করে বলি 'অভিজাত ভদ্রব্যক্তি ও সৈন্যগণ! প্রত্যেক মানুষকেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে মরতে হবে। আমরা সবাই এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে। একমাত্র ঈশ্বরই অপরিবর্ত্তনীয় ও চিরজীবী। জীবনের মহোৎসবে যে কেউ আসুক না কেন এই উৎসব সমাপ্তির পর তাকে মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হবে। এই নশ্বর সরাইখানায় যেই এসে পৌছক না কেন তাকে এই দুঃখের আবাস পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে হবে। তাহলে অগৌরবের বোঝা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সম্মানের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করাই কি কাম্য নয়?

'খ্যাতি নিয়ে যদি মারা যাই
সেই হবে আনন্দ অপার।
খ্যাতিটা আমারই থাক,
মৃত্যু নিক শরীর আমার।

মহান আল্লা আমাদের প্রতি প্রসন্ন। এমন অবস্থায় তিনি আমাদের ফেলেছেন যে যদি রণক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করি তা হলে আমরা শহিদের সম্মান লাভ করবো। যদি আমরা বেঁচে যাই তাহলে আল্লার কাজ সুসম্পন্ন করায় জয়ের গৌরবে উচ্চশির হবো। সেইজন্য এসো আমরা প্রত্যেক পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করে এই শপথ বাক্য উচ্চারণ করি যে আমরা কেউ এই যুদ্ধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার কথা চিন্তা করবো না। যতক্ষণ প্রাণ আমাদের দেহ থেকে বেরিয়ে না যায় ততক্ষণ এই যুদ্ধক্ষেত্র এবং নরমেধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব না।

প্রভু, ভৃত্য, ছোট, বড় সকলেই আগ্রহভরে পবিত্র কোরাণ হাতে তুলে নিয়ে আমি যে ভাবে বল্লাম সেই ভাবে শপথ করলো। আমার মতলব আশ্চর্য সুন্দর ভাবে সফল হ'লো। সেই সাফল্য দূরে, নিকটে, বন্ধু বা শত্রু সর্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল।

১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

শেষ জেমাদি মাসের ১৩ই তারিখ শনিবার কামানগুলি টেনে নিয়ে এবং সৈন্যব্যূহের দক্ষিণ, বাম এবং কেন্দ্র যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে যে ভূমি আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলাম সেইখানে সৈন্যগণ পৌঁছে গেল। অনেক তাঁবু আগেই খাটানো হয়েছিল। আরও তাঁবু খাটানোর জন্য আমার সৈন্যরা যখন তোড়জোড় করছিল তখন সংবাদ এলো যে শত্রুসৈন্য দেখা যাচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে আদেশ দিই যে প্রত্যেক সৈন্য কালবিলম্ব না করে নিজ নিজ জায়গায় উপস্থিত হোক এবং কামানগুলি ও সৈন্যশ্রেণী সঠিকভাবে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করুক।

আমার যুদ্ধজয়ের ফতেনামা যা সেখ জইন্ লিপিবদ্ধ করেছে যাতে ইসলামের সৈন্যরা কি ভাবে বিধর্ম্মীদের অগণিত সৈন্যের সম্মিলিত যুদ্ধসজ্জার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে—সেইটিই কোনওরূপ পরিবর্ত্তন না করে আমার আত্ম-চরিতে সংযুক্ত করে দিলাম।

সেখ জইনের ফতে নামা

মুখবন্ধ—হে মহান আল্লা, তুমি বিশ্বাসীদের রক্ষক, তোমার অনুচরদের সহায়ক, ধর্ম্মযুদ্ধের সৈনিকদের সমর্থক, বিধর্ম্মী শত্রুদের ধ্বংসকারক।

হে মহান আল্লা, ইসলামধর্ম্মের স্তম্ভ যারা, তুমি তাদের মর্য্যাদাদান-কারী, যারা বিশ্বাসী তাদের তুমি সাহায্যকারী, পৌত্তলিকদের তুমি ধ্বংসকারী। বিদ্রোহী শত্রুদের তুমি পর্য্যুদস্তকারী, যারা অন্ধকারের জীব তাদের তুমি নিধনকারী।

হে জগতের প্রভু, পৃথিবীর সমস্ত ভূমি তোমারই। তোমার আশীর্ব্বাদ তোমার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মানব মহম্মদের উপর বর্ষিত হোক যিনি গাজিদের প্রভু এবং বিশ্বাসীদের সমর্থক—আর তোমার করুণা বর্ষিত হোক তাঁর পথাবলম্বনকারীদের ওপর শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত, যাঁরা ঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।

আল্লার কাছ থেকে উপর্য্যুপরি পাওয়া দানগুলির জন্য তাঁর স্তুতি করার এবং বারংবার তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর কারণস্বরূপ হয়। এরই ফলে আবার লাভ করা যায় তাঁরই করুণা। কারণ, ভগবানের একটি করুণার দানের জন্য তাঁর জয়গান তাঁর প্রাপ্য এবং তারপরই আবার তাঁর করুণা ফিরে আসে। কিন্তু সেই সর্ব্বশক্তিমানের পরিপূর্ণ-ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত। প্রবলপরাক্রান্ত মানুষও ভগবানের প্রতি বাধ্যবাধকতা যথাযথভাবে পালন করার বিষয়ে অসহায়। প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে তাঁর দয়ার জন্য যথাযথ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা অসম্ভব, যদিও তার চেয়ে আর কোনও জিনিষই বড় নয় এই পৃথিবীতে। পরাক্রান্ত বিধর্ম্মীদের পরাজিত করা এবং অতুল ধনসম্পদশালী, নীতিহীন অবিশ্বাসীদের রাজ্য জয় করে নেওয়ার ব্যাপারটির মত জাগতিক আর কোনও ব্যাপারই পবিত্রতর নয়। বিচার-শীল ব্যক্তির চোখে ভগবানের এই আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা আর কিছুই বড় নয়। আল্লা মহান! তাঁর এই মহৎ আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহের জন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ। এই আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য শিশুকাল থেকে এ পর্য্যন্ত ঠিক পথে চালিত একটি মন (বাবর) সক্রিয় ছিল। জগতের রাজা যিনি, যিনি তাঁর করুণা, প্রার্থনার অপেক্ষা না করেই বর্ষণ করেন, তিনি তাঁর করুণার বাক্সের চাবিকাঠিটি জয়ী নবাবের (বাবর) হাতে তুলে দিয়েছেন —যাতে বিজয়ী বীরপুরুষদের নাম মহান গাজিদের নামের সঙ্গে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে যায়। বিজয়ী সৈন্যদের সাহায্যে ইসলামের ধর্ম্মনিশান সর্ব্বোচ্চ শিখরে গাঁথা হয়ে গেল। এই সৌভাগ্যের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

রাণা সঙ্গ এবং তাঁর সহচরগণ

ইসলাম ধর্ম্ম রক্ষক আমাদের সেনারা জয়ের আলোকে হিন্দুস্থান আলোকিত করেছে—যার বাণী পূর্ব্ব পূর্ব্ব লিপিতেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দৈব-অনুগ্রহে ইসলামের পতাকা দিল্লী, আগ্রা, জৌনপুর, খারিদ, বেহার ইত্যাদি প্রদেশে উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে এবং সেই স্থানগুলির বিধর্ম্মী ও মুসলিম অনেক সর্দারই আমাদের সৈন্যদের প্রধান্য স্বীকার করে আমাদের সৌভাগ্যবান নবাবের বশ্যতা আন্তরিকভাবে স্বীকার করেছে। কিন্তু বিধর্ম্মী রাণা সঙ্গ যদিও প্রথমে আনুগত্যের ভাব দেখিয়েছিল কিন্তু পরে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে বিধর্ম্মীদের প্রধান হয়ে দাঁড়ালো। সয়তানের মত মাথা পেছনে হেলিয়ে এই অভিশপ্ত বিধর্ম্মী এক বিপুল সৈন্যদল গঠন করলো। এইভাবে এক দঙ্গল ছোটলোকের ভিড় একত্রিত হলো—যাদের কারও গলায় সোনার হার, কারো গলায় সুতো (উপবীত), কারো কোমরে বিরক্তিকর বিধর্ম্মীর চিহ্ন।

সাম্রাজ্যের সূর্য্য হিন্দুস্থানে উদয় হওয়ার এবং সাহানসার খিলা-ফতের (বাবর) আলো ছড়িয়ে পড়ার পূর্ব্বে এই অভিশপ্ত বিধর্ম্মীর (সঙ্গ) কর্তৃত্ব—যে তার শেষ বিচারের দিনে একজন বন্ধুও পাবেনা—এমন ছিল যে বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর—যেমন দিল্লীর সুলতান, গুজরাট ও মাণ্ডুর সুলতানরা কেউই অন্যান্য বিধর্ম্মীদের সাহায্য ভিন্ন এর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতেন না। প্রত্যেকেই এবং সকলেই তাকে তোষামোদ করেছে এবং তার মতে সায় দিয়ে এসেছে। তবে উঁচুদরের রাজারা এবং রহিস্‌রা ও শাসক ও সেনাপতিরা যারা এই যুদ্ধে এখন তার আদেশ মেনে নিয়েছে এবং তার সঙ্গী হয়েছে তারা কিন্তু এই যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেনি এবং এর প্রতি মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না। বিধর্ম্মীদের নিশাণ ইসলামের অধিকার ভুক্ত রাজ্যের দুইশ' সহরে উড়েছে—যেখানে মসজিদ এবং পবিত্র স্থান কলুষিত হয়েছে ও যেখান থেকে বিশ্বাসী মুসলমানদের স্ত্রীপুত্রকন্যাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হিন্দুদের গণনানুসারে এক লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ী রাজ্যে একশ' অশ্বা-রোহী, এক কোটি রাজস্ব আদায়ী রাজ্যে দশ হাজার অশ্বারোহী এবং রাণা সঙ্গর অধীনস্থ দশকোটি টাকা রাজস্ব আদায়ী রাজ্যে এক লক্ষ অশ্বা-রোহী সৈন্য থাকা উচিত। অনেক প্রসিদ্ধ বিধর্ম্মী যারা এতদিন পর্য্যন্ত তার কোনও সাহায্য করেনি—তারা শুধু ইসলামধর্ম্মবিদ্বেষী বলেই সঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। কলঙ্কিত পতাকাধারী দশ জনের যাদের

ভাগ্যে আছে নির্ম্মম শাস্তি ভোগ—তাদের ছিল অনেক জনবল, প্রভূত সৈন্য এবং বিস্তৃত রাজ্য।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় সালাবুদ্দিন (খুব সম্ভব ইনি ছিলেন হিন্দু রাজপুত থেকে ধর্ম্মান্তরিত মুসলমান—যাঁরা হিন্দু নাম ছিল—সিলহাদি, যাঁর কথা বাবর লিখেছেন। তাঁর পুত্র রাণা সঙ্গর কন্যাকে বিবাহ করে। তাঁর জায়গির ছিল রেসিন ও সারংপুর। তিনি খানুয়ার যুদ্ধে দলত্যাগ করে বাবরের সঙ্গে যোগ দেন।)—যাঁর রাজ্যে ছিল ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, বাজরের রাওয়াল উদয় সিংএর ছিল বারো হাজার, মিওয়াতের হাসান খাঁর ছিল বারো হাজার, ইদরের বারমলের ছিল চার হাজার, নর-পৎ হারার ছিল সাত হাজার, কাচের সাতরইয়ের ছয় হাজার, ধরম দেওয়ের ছিল চার হাজার, বীর সিং দেওয়ের ছিল চার হাজার এবং সিকেন্দারের পুত্র মহম্মদ খাঁয়ের—যদিও কোনও জিলা বা পরগণা ছিল না তবুও সে, দশহাজার অশ্বারোহী সংগ্রহ করেছিল আধিপত্য লাভের আশায়।

হিন্দুস্থানের গণনার রীতি অনুযায়ী সর্ব্বসমেত দুইলক্ষ এক হাজার সৈন্য সমবেত হয়ে তাদের নিজেদেরই পরিত্রাণের আশা ছিন্ন করেছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে সেই উদ্ধত বিধর্ম্মী—যে কুসংস্কারে অন্ধ ও অন্তরে দয়ামায়া শূন্য—অন্যান্য দুর্ভাগা ও নরকের যাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইসলাম—অনুগামীদের এবং আল্লার সৃষ্ট মানবের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং যার শিরে আল্লার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই বর্ষিত হচ্ছে এমন যে মহম্মদ তাঁর অনুশাসনের ভিত্তি ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল। রাজকীয় সৈন্যদের নায়কগণ ভগবানের অভিসম্পাত রূপে সেই এক চক্ষু দজ্জালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের এই কথার সত্যতা ভালভাবে বুঝিয়ে দিল যে যখন দুর্ভাগ্য আসে তখন চোখে অন্ধ হয় এবং এই সত্য তাদের চোখের ওপর ভাসতে লাগলো যে—কেউ যদি সত্য ধর্ম্মের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে তার নিজের আত্মরই উন্নতি সাধন করে। ধর্ম্মের নীতির প্রতি অনুগত্য দেখিয়ে তারা অবিশ্বাসী ও ভণ্ডদের বিরুদ্ধে জেহাদ সুরু করলো।

শেষ জেমাদি মাসের ১৩ই তারিখ শনিবার (২৭সে মার্চ, ১৫২৭) যে তারিখটি আল্লার আশীর্ব্বাদে পূত হয়ে আছে। ইসলামের সৈন্যগণ বিয়ানা রাজ্যের অধীনস্থ খানুয়ার একটি পাহাড়ের ধারে শিবির স্থাপন করে। সেখান থেকে শত্রুসৈন্য দুই ক্রোশ দূরে অবস্থান করছিল। মহম্মদের ধর্ম্মের শত্রু অভিশপ্ত বিধর্ম্মীরা ইসলামীয় সৈন্য সমাবেশের সংবাদ পেয়ে তাদের হতভাগ্য সৈন্যদের সজ্জিত করে পর্বত সদৃশ দৈত্যের মত আকৃতির হস্তীদের ওপর অশেষ আস্থা স্থাপন করে

এগিয়ে আসতে লাগলো যেমন করে হস্তী যূথের অধিনায়ক ইসলামের পবিত্র ভূমি কাবাকে ধ্বংস করতে এগিয়ে এসেছিল।

[এই কথা গুলির ইঙ্গিত এই।—এ্যাবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান ইউমেনের রাজা আব্‌রাহা মহম্মদের জন্মসনে তাঁর সৈন্য ও হস্তীযূথ নিয়ে মক্কার কাবা ধ্বংস করতে অগ্রসর হয়। মক্কাবাসীরা এই বিপুল সৈন্য বাহিনী দেখে নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে পলায়ন করে কারণ তাদের নগর এবং ধর্ম্মস্থান রক্ষা করার ক্ষমতা ছিলনা। কিন্তু ভগবান এই দুইটিরই রক্ষার ভার নেন। কারণ, আবরাহা যখন মক্কার নিকট উপস্থিত হয়ে এই নগরীতে প্রবেশ করার আয়োজন করছেন সেই সময় যে বৃহদাকার হস্তীতে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন—যার নাম ছিল মামুদ—সে সহরের আরও নিকটে যেতে অস্বীকার করলো। যখনই তাকে সহরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল—তখনই সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ছিল। কিন্তু তাকে বিপরীত দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুখ ঘুরিয়ে নিলেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ জোরেই চলতে সুরু করছিল। যখন এই ব্যপার চলছে তখন দেখা গেল এক বিশাল ঝাক পাখী সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে এলো তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনটি পাথর—একটি তাদের চঞ্চুতে, আর দুইটি তাদের প্রত্যেক পায়ে। এই পাথর গুলো তারা আবরাহার প্রত্যেকটি লোকের মাথায় ফেললো এবং সেই পাথরের আঘাতে প্রত্যেকটি লোকই মারা গেল যারা অবশিষ্ট ছিল তারাও বন্যার প্লাবনে ও মহামারিতে ধ্বংস হলো। শুধু একাকী আবরাহা সেনায়াতে পৌছাতে পারে এবং সেখানেই মারা যায়।]

'সেই মৃত্যু সন্ধ্যায়, হস্তী বলে বলীয়ান
আবরাহের ছিল যে ভরসা,
গজ বাহিনীর পরে' কলঙ্কিত হিন্দুগণ
একই ভাবে করেছিল আশা।
অমানিশার চেয়েও অন্ধকার,
ঘৃণ্য, কলুষিত,
নক্ষত্রের চেয়েও সংখ্যায় অধিক,
অগণিত।
আগুনের শিখার মত? না—না—
ধোঁয়ার মত

মেঘ মুক্ত আকাশের নীচে তারা
হলো উপনীত।
তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো,
তারা দ্বন্দে আহ্বান জানালো।
পিপীলিকা শ্রেণীর মত
দক্ষিণ ও বামদিক থেকে
হাজার হাজার অশ্বারোহী
ও পদাতিক নির্গত হলো।'

তারা যুদ্ধ করার ইচ্ছায় আমদের সৈন্য শিবিরের দিকে এগিয়ে গেল। ইসলামের পবিত্র যোদ্ধাগণ, যারা শৌর্য্যের উদ্যানে সতেজ বৃক্ষ—শ্রেণীবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এলো, যেন সারিবদ্ধ পাইন গাছ তাদের মাথা আকাশের দিকে উঁচু করে তুলে এগিয়ে আসছে। আল্লার কাজে যে সব সেবক নিযুক্ত তাদের অন্তরে যেমন সদাই উজ্জলপ্রভা বিদ্যমান, তেমনি তাদের উচ্চশিরে পরিহিত শিরস্ত্রাণের ঔজ্জল্য। এই সৈনিক শ্রেণী যেন আলেকজেন্ডারের লোহার দেওয়াল। মুসলিম ধর্ম প্রবর্ত্তকের আইনানুযয়ী তারা ঋজু, দৃঢ় এবং বলবান-যেন তারা সুগঠিত একটি অট্টালিকা। 'যারা ভগবানের নির্দেশে কাজ করে তারা নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করে'—এই নীতিবাক্য অনুযায়ী তারা সৌভাগ্য শালী এবং কৃতকার্য্য হয়েছিল।

সৈন্যব্যূহ মধ্যে কেউ ছিল না ভীরু,
সাহানশার পণের মত তারা ছিল শক্ত,
ইসলাম ধর্ম্মের তারা সবাই ছিল ভক্ত।
ভয়ে কারও বুক করেনি দুরু দুরু।
তাদের পতাকা যেন আকাশ
ছুঁয়ে গেল।
তাদের জয়ে আল্লার নিশ্চিত,
জয় হলো।'

খুব সাবধানে এবং বিজ্ঞোচিত ভাবে রুমের নিয়মানুযায়ী গোলন্দাজ ব্যহিনীকে কামানের গাড়ীগুলির কাছে দাঁড় করানো হলো। আমাদের সম্মুখভাবে পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ কামানের গাড়ীগুলি। বস্তুতঃ ইসলামের সৈন্য এমনভাবে সজ্জিত হয়ে দাঁড়ালো যে তাদের দৃঢ় চিত্ততা ও বুদ্ধির দীপ্তি দেখে যেন সমগ্র আকাশ

তাদের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। সৈন্য সজ্জার আয়োজন ও সংগঠনে নিজামউদ্দিন কঠোর পরিশ্রম করেছিল এবং সৌভাগ্যের দ্যোতক তার উত্তম সম্রাটের বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল বিচারে যথারীতি স্বীকৃতি পেয়েছিল।

সৈন্যব্যূহের কেন্দ্রস্থলের সেনাপতিগণ

কেন্দ্রস্থলে ছিলেন স্বয়ং সম্রাট। কেন্দ্রের দক্ষিণ দিকে ছিলেন—বিখ্যাত, নিষ্ঠাবান ভ্রাতা (সম্বন্ধে ইনি বাবরের মামাতো ভাই), সৌভাগ্যের প্রিয় সহচর, যাঁর কৃপা সব সময়েই প্রার্থনা করা হয় সেই আল্লার সুদৃষ্টি যাঁর উপর নিবদ্ধ, অনুগৃহীত চিন তাইমুর সুলতান; মহান আল্লার সম্রাটের পুত্রস্থানীয় (এঁর পিতা তাইমুর বংশের এবং বাবরের জ্ঞাতি ভাই। এঁদের সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন আবু সৈয়দ মির্জ্জা। এঁর বয়স ছিল তেরো বছর এবং সা'বেগমের উত্তরাধিকার সূত্রে বাদাকসানের সা') প্রসিদ্ধ সুলেমান সা; পবিত্রতার ধারক, সৎপথপ্রদর্শক খাজা কামালুদ্দিন দোস্ত-ই-খন্দ; সুলতানদের বিশ্বাসী, ঘনিষ্ঠ সহচর, সহযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কামানুদ্দিন ইউনুস-ই আলি; রাজকর্ম্মচারিদের স্তম্ভ, অপকট সুহৃদ, ধর্ম্মবিশ্বাসে মহিমান্বিত জালালুদ্দিন দরবেশ-ই মহম্মদ সারবান্; রাজকর্ম্মচারিদের আর এক স্তম্ভ, অমাত্য-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবিশ্বাসে বলীয়ান—নিজামুদ্দিন দরবেশ-ই-সারবান; রাজকর্মচারিদের আর দুইটি স্তম্ভ—বিশ্বাসী গ্রন্থাগারিক সাহাবুদ্দিন আবদাল্লা ও দ্বার পালদের কর্ত্তা নিজামুদ্দিন দোস্ত।

কেন্দ্রের বাম দিকে ও নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করছিলেন—সাম্রাজ্যে শক্তির উৎস সম্রাটের মিত্র ও বিশেষ অনুগ্রহভাজন সুলতান বাহালুল লোদির পুত্র সুলতান আলাউদ্দিন আলম খাঁ; মহান সম্রাটের অন্তরঙ্গ, মৌলভি-শ্রেষ্ঠ, মনুষ্য জাতির সাহায্যকারী ইসলাম ধর্ম্মের স্তম্ভ খাওয়াসের সেখ জইন্ (সেখ নিজেই নিজের গুণ ব্যাখ্যা করছেন যেন তিনি নিজকে অন্যের চোখ দিয়ে দেখাচ্ছেন। তাঁর গুণাবলীর সায় দিয়ে গিয়েছেন); অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কামালুদ্দিন মহবুব আলি, রাজ-অনুচরদিগের আর এক বিরাটপুরুষ পরলোকগত কুজ আমেদের ভ্রাতা নিজামুদ্দিন তারদি বেগ; উপরোক্ত মৃত কুজের পুত্র সের আফগান; মহান ব্যক্তিদের মধ্যেও মহান পরাক্রমশালী আরাইস খাঁ; মন্ত্রী শ্রেষ্ঠ খাজা কামালুদ্দিন লুসেনি এবং সম্রাট দরবারের আরও কয়েকজন পার্শ্বচর।

দক্ষিণ বাহুর সেনানায়কগণ

দক্ষিণ বাহুতে আছেন—মাননীয়, ভাগ্যবান, যার দেহে আছে ভাবী সাম্রটত্বের চিহ্ন, খিলাফতের গগনে যিনি সফলতার সূর্য্য, যিনি ক্রীতদাস ও স্বাধীন সবারই প্রশংসিত সম্রাটপুত্র মহম্মদ হুমায়ুন বাহাদুর। এই মহান সম্রাটপুত্রের ডান দিকে আছেন কাসেম-ই-হুসেনি সুলতান যিনি আভিজাত্যে রাজার মত এবং যিনি অনুগ্রহ-বিতরণকারী সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। আর আছেন অভিজাতকুলের স্তম্ভস্বরূপ আমের-ই-ইউসুফ অঘটাকচি; সম্রাটের বিশ্বাসভাজন অমাত্যকুলতিলক জালালুদ্দিন হিন্দ বেগ কাচিন; সম্রাটের বিশ্বাসী ও আনুগত্যে ত্রুটিহীন জালালুদ্দিন খসরু কুকুলদাস; সম্রাটের আস্থাভাজন—কোয়ায়ুম বেগ অর্দুসা; রাজকীয় কর্মচারীদের স্তম্ভ, আন্তরিকতায় কলুষহীন, কোষাধ্যক্ষ ওয়ালি কারা কাজি; অমাত্যদের মধ্যে আর এক স্তম্ভ সিস্তানের নিজামুদ্দিন পিরকুলি; সভাসদগণের স্তম্ভ বাদাকসানের খাজা কামালুদ্দিন পালওয়ান, রাজকীয় ভৃত্যদের শাস্তর্ষানীয় আবুল সরকার; অভিজাতদের স্তম্ভ, অমাত্যদের মধ্যে বিশেষ গুণী, ইরাক দেশ থেকে আগত দত সুলেমান আকা এবং সিস্তানের দূত হুসেন আকা।

জয়ের মুকুট যাঁর শিরে সেই অশেষ সৌভাগ্যবান সম্রাট পুত্রের বামদিকে আছেন মহানকুলোদ্ভব সৈয়দ মুর্ত্তজা আলির বংশধর মির হামা; অমাত্য-কুলের স্তম্ভ আন্তরিকতায়পূর্ণ সামসউদ্দিন মহম্মদ কুকুল দাস এবং নিজামুদ্দিন খোবাদ্গি আসাদ জানদার।

দক্ষিণ দিকে আছেন—হিন্দুস্থানের আমিরদের মধ্যে, সাম্রাজ্যের স্তম্ভ, খাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খাঁ—দিলওয়ার খাঁ (দৌলত খাঁর পুত্র) এবং অভিজাতদের আর এক স্তম্ভ, সেখেদের মধ্যে সেখ—সেখ গুরান। এঁরা দুইজন তাঁদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন।

বামবাহুর সেনায়কগণ

ইসলামের সৈন্যবাহিনীর বাম বাহুতে মর্য্যাদাসম্পন্ন অনেকে ছিলেন। যেমন মহান বংশের প্রতিভূ, শক্তিমানদের আশ্রয় তা' হা' এবং ইয়াসিনের বংশের গৌরব, শ্রেষ্ঠ দেবদূতের (মহম্মদের) বংশধারার আদর্শ সৈয়দ মার্ষি খাজা, মহিমময়, ভাগ্যবান, সম্রাটের বিশেষসম্মানভাজন ভ্রাতা মহম্মদসুলতান মির্জ্জা; রাজ-পরিবারের তুল্য মর্য্যাদা-সম্পন্ন মেহেদি সুলতানের পুত্র আদিল সুলতান; সম্রাটের অতিবিশ্বাসী ও আস্থাভাজন অশ্বশালার অধ্যক্ষ আবদুল আজিজ;

বন্ধুত্বে অকপট, সম্রাটের আস্থাভাজন সামসউদ্দিন মহম্মদআলি জং জং ; রাজ অমাত্যদের স্তম্ভ, আন্তরিকতায় ত্রুটিহীন, জালালুদ্দিন সা হুসেন ইয়ারগি মোগল এবং নিজামুদ্দিন জান্-ই মহম্মদ বেগ আটাকা।

হিন্দুস্থানের আমিরদের মধ্যে এই বিভাগে ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিনের অল্পবয়স্ক পুত্রদ্বয়—কামাল খাঁ ও জামাল খাঁ ; অমাত্যশ্রেষ্ঠ ফর্মালের আলি খাঁ, সেখ জাদ এবং অভিজাতদের স্তম্ভ বিয়ানার নিজাম খাঁ।

পার্শ্বরক্ষী সৈন্যদল

পার্শ্বরক্ষী দলের দক্ষিণ ভাগ চালনার জন্য পারিবারিক ব্যবস্থাপন বিভাগের কর্ম্মচারীদের মধ্যে অতি-বিশ্বাসী তার-দিক্ এবং বাবা কাস্‌কার ভাই মালিক কাসিম অবস্থান করছিলেন একদল মোগল সৈন্য নিয়ে। এই দলের বাম ভাগ চালনার জন্য একদল নিপুণ সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন বিশ্বস্ত সর্দার মুমিন আটাকা ও রুস্তম তুর্কমান।

রাজকীয় অনুচরদের অবলম্বন, আনুগত্যে ত্রুটিহীন, সভাসদগণের মধ্যমণি নিজামুদ্দিন সুলতান মহম্মদ বকসি ইসলামের গাজি সৈন্যদের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে সম্রাটের আদেশ গ্রহণ করতে গেলেন। তিনি নানা দিকে সেনাবিভাগের কর্ম্মচারী ও দূত প্রেরণ করলেন—মহান সুলতান ও আমিরদের নিকট কি ভাবেসম্রাটের আদেশানুযায়ী সৈন্য পরিচালনা করতে হবে। আদেশ ছিল যে সেনানায়কগণ তাদের নিক নিজ ঘাঁটিতে স্থান গ্রহণ করলে তাঁরা অন্য কোনও আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত সেই স্থান কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবেন না এবং আদেশ না পেলে যুদ্ধ করবার জন্য বাহু বিস্তার করবেন না।

যুদ্ধ

উপরোক্ত দিনের এক প্রহর অতিবাহিত হওয়ার পর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যদল পরস্পর অভিমুখে এগিয়ে আসতেই যুদ্ধ আরম্ভ হলো। যে ভাবে আলো অন্ধকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তেমনিভাবে দুই দলের কেন্দ্রভাগ পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। দক্ষিণ ও বাম বাহুর সৈন্যদের মধ্যে এমন প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল যে সেই যুদ্ধের দাপটে পৃথিবীর মাটি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো এবং আকাশ তুমুল ঝন্ ঝন্ শব্দে পূর্ণ হয়ে গেল।

হতভাগা বিধর্ম্মী সৈন্যদলের বামবাহু ধর্ম্ম বিশ্বাসে বলীয়ান সৈন্যদের দক্ষিণ বাহুর দিকে অগ্রসর হয়ে খসরু কুকুলদাস ও বাবা কাস্‌কার ভাই মালিক

কাসিমের সৈন্যদলের ওপর আক্রমণ শুরু করলো। অশেষ মহিমান্বিত, অতি ন্যায়বান ভ্রাতা চিন্ তাইমুর সুলতান আদেশানুসারে তাদের দলবৃদ্ধি করতে এগিয়ে গেলেন এবং সাহসের সঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে বিধর্ম্মী সৈন্যদের পশ্চাৎ-ভাগে হাটিয়ে দিলেন। এই কৃতকার্য্যতার জন্য তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হলো।

এ যুগের বিস্ময় গোলন্দাজবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় মুস্তাফা তাঁর দল নিয়ে দক্ষিণ ব্যূহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছিলেন। সেই খানে ছিলেন সম্রাটের গৌরবদীপ্ত পুত্র হুমায়ুন বাহাদুর—যিনি ন্যায়বান এবং সৌভাগ্যশালী, বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন, কিছু করা না করার ব্যপারে যাঁর আদেশ অমোঘ—সেই পরাক্রান্ত সম্রাটের যিনি বিশেষ প্রীতিভাজন।

মুস্তাফা কামান-শকট গুলি সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে বিধর্ম্মী সৈন্য শ্রেণী ছত্র ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে কামানের গোলা বর্ষন সুরু করলেন।

যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে মহান্ ভ্রাতা কাসিম-ই-হুসেন সুলতান ও রাজ-অনুচরদের স্তম্ভদ্বয় নিজামুদ্দিন আমেদই-ই-ইউসুফ ও কুয়ায়াম বেগ আদেশানু সারে তাদের সাহায্যের জন্য ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হলেন। যেমন দলের পর দল বিধর্ম্মী সৈন্য তাদের দলকে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল তেমনি ভাবে আমারাও আমাদের পক্ষ থেকে সম্রাটের বিশ্বাসভাজন, ধর্ম্মের গৌরবে-গৌরবান্বিত হিন্দুবেগ এবং তাঁর পশ্চাতে অভিজাতদের স্তম্ভ মহম্মদ কুকুলদাস ও খাজাগি আসাদ জানদার এবং তাঁদের পশ্চাতে দরবারের আস্থাভাজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরশীল, গোপনীয় কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের প্রধান ইউনুস-ই-আলি ও অভিজাতদের আর এক স্তম্ভ, বন্ধুত্বে যিনি খাঁটি, সা মনুসুর বুরলাস এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের শীর্ষস্থানীয়, বিশ্বস্ততায় পবিত্র গ্রন্থাগারিক আবদুল্লা এবং তাঁদের পরে অভিজাতদের অবলম্বন দ্বাররক্ষীদের কর্ত্তা দোস্ত এবং খোজাকারীকদের সর্দ্দার খলিলকে পাঠানো হলো।

বিধর্ম্মী সৈন্যদের দক্ষিণবাহু ইসলাম সৈন্যদলের বাম বাহুর উপর বারং বার উন্মত্তের মত আক্রমন করতে লাগলো। মুক্তি যাদের করতলগত সেই ধর্ম্মযুদ্ধের সৈনিকদের ওপর তারা ভীষণভাবে আপতিত হলো কিন্তু প্রত্যেকবারেই জয়ী যোদ্ধাদের শরবিদ্ধ হয়ে তারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো। তারা ক্রমশঃ চিরমৃত্যুর আবাস নরকে যাওয়ার পথে নামতে লাগলো—যেখানে তাদের আগুনে দগ্ধ হওয়ার জন্য নিক্ষিপ্ত হতে হবে

এবং সেই নরকেই হবে তাদের নিরানন্দ নিবাস। কৃষ্ণকায় বিধর্মীদের সৈন্য ব্যূহের পাশ্চাৎভাগে অভিজাতদের মধ্যে বিশ্বাসভাজন মুমিন আতাকা ও রুস্তম তুর্কমান উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের সাহায্য করবার জন্য সম্রাটের অধীনস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি সিংহাসনের নিকটতম সেই আস্থাভাজন সুলতান নিজামুদ্দিন আলি খলিফার কর্মচারী খাজা মামুদ ও আলি আতাকাকে পাঠনো হলো।

মহান ভ্রাতা মহম্মদ সুলতান মির্জ্জা, রাজমহিমার প্রতিভূ আদিল সুলতান এবং সম্রাটের বিশ্বাসভাজন, মাধুর্য্যে মধুর, মহম্মদ আলি জং জং এবং রাজঅনুচরদের স্তম্ভ সা হোসেন ইয়ারগি মোগল যুদ্ধ করার জন্য নিজ নিজ স্থানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেন। তাঁদের সাহায্যের জন্য মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ খাজা কামালুদ্দিনকে একদল সৈন্যসহ পাঠানো হলো।

প্রত্যেকটি ধর্ম্মযোদ্ধার উৎসাহের সীমা ছিলনা। তারা আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলো এই নীতি বাক্য সপ্রমাণ করতে যে—প্রার্থনীয় জিনিষের মধ্যে একটি লাভ হবে—হয় জয় নয় ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যু। যদি মৃত্যু হয় তাহলে এ জীবনে ধর্ম্মে অনুরাগ প্রদর্শনের এই তো সুযোগ যাতে ধর্ম্মেরই নিশান তুলে ধরা হবে মৃত্যুকে বরণ করে।

সজ্ঘর্ষ ও যুদ্ধ দীর্ঘ সময় স্থায়ী হচ্ছে দেখতে পেয়ে অলঙ্ঘনীয় আদেশ জারী করা হলো যে—রাজকীয় সৈন্যদল যারা সবাই তুল্য বীর্য্যবান এবং যারা শৃঙ্খলিত ব্যাঘ্রের ন্যায় কামানবাহী শকটের পশ্চাতে অবস্থান করছে—তারা এগিয়ে এসে গোলান্দাজবাহিনীকে মধ্যবর্ত্তী স্থলে রেখে কেন্দ্রের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বের সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ সুরু করুক। যেমন পূর্ব্ব আকাশ ভেদ করে ঊষার উদয় হয় তেমনি ভাবে শকটগুলির পশ্চাৎভাগ থেকে তাদের আবির্ভাব হলো। ঊষার রক্তিম অলোকছটা যেমন আকাশের তল থেকে ছিটকিয়ে এসে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি ভাবে সেই হতভাগ্য বিধর্ম্মীদের রক্তবর্ণ রুধির ধারা রণক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়লো। এ যুগের বিস্ময় ওস্তাদ আলি কুলি তাঁর কামান নিয়ে কেন্দ্রস্থলের সম্মুখ ভাগ অবস্থান করছিলেন। সম্মুখস্থ লৌহ নির্ম্মিত দুর্গের ন্যায় হস্তিবাহিনী এবং বর্ম্মপরিহিত বিধর্ম্মীদের ওপর তিনি বৃহদাকার প্রস্তর গোলা নিক্ষেপ করে অসীম বীরত্বের কাজ করেছিলেন। তুলাদণ্ডে যদি গোলাগুলি ওজন করা যায় তা সেই ওজনের চেয়ে তাঁর পুণ্য কর্মের ওজন বেশী হবে। এই গোলাগুলি যদি তলার দিকে প্রশস্ত এবং উচ্চশীর্ষ পাহাড়ের গায়ে নিক্ষেপ

করা হতো তা হলে সেই পাহাড়টা পেঁজাতুলোর মত হয়ে যেতো। মজবুত দুর্গের মত লৌহবর্ম্মপরিহিত বিধর্ম্মীদের ওপর ওস্তাদ আলি কুলি এমন ভাবে প্রস্তর গোলা নিক্ষেপ করছিলেন এবং কামান ও বন্দুক থেকে গোলা ও গুলি এমন ভাবে ছোঁড়া হচ্ছিল সে বিধর্ম্মীদের বর্ম্মপরিহিত অনেক দেহ ধ্বংস হয়ে গেল। কেন্দ্রস্থলের বন্দুকধারী সৈন্যগণ আদেশানুসারে শকটগুলির পেছন থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেকেই বিধর্ম্মীদের মৃত্যু-বিষের স্বাদ বুঝিয়ে দিল। সম্মুখের সেনাদল সর্ব্বাপেক্ষা বিপদসঙ্কুল স্থানে উপস্থিত হয়ে বুঝিয়ে দিল যে তারা অরণ্যের ব্যাঘ্রের মত সাহসী এবং তাদের নাম যারা বীরত্বের কাজে অগ্রণী, তাদের নামের সঙ্গে উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত হয়ে থাকবে।

ঠিক এই সময় মহিমান্বিত সম্রাটের আদেশ হলো—কেন্দ্রস্থলে কামানবাহী শকটগুলি অগ্রসর হোক। সম্রাট স্বয়ং—যাঁর ডান হাতের মুঠোয় জয় ও সৌভাগ্য এবং বাম হাতে যশ ও অধিকার--বিধর্ম্মী সৈন্যের দিকে অগ্রসর হলেন। বিজয়ী সৈন্যগণ চার দিক থেকে তাঁকে অনুসরণ করলো। দেখে মনে হলো -যেন চলন্ত সৈন্যসমুদ্র এবং সেই সমুদ্রে প্রবল ঢেউ উঠছে। এই সমুদ্রের কুমিরগুলির শৌর্য্য ও বীরত্বও তাদের দৃঢ়তায় প্রকাশ পেলো। আকাশ ধুলিকণায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। রণক্ষেত্রে যে ধুলিমেঘের সৃষ্টি হলো তার মধ্যে তরবারির ঝলকানি দেখে মনে হতে লাগলো যেন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যেমন আয়নার পেছন দিক দিয়ে মুখ দেখা যায় না তেমনি ধূলিজালের মধ্য দিয়েও সূর্য্যের মুখও দেখা যাচ্ছিল না। আঘাতকারী এবং আঘাতপ্রাপ্ত, জয়ী এবং পরাজিত এক সঙ্গে মিশে গেল এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যও আর ধরা গেল না। সময়ের যাদুকর এমন একটি রাত্রির আকাশের সৃষ্টি করলো যার একমাত্র গ্রহ হলো তীর এবং স্থির নক্ষত্রমণ্ডলী হলো দৃঢ় সংবদ্ধ সৈন্যব্যূহ।

'সেই যুদ্ধের দিনে, জগৎ ধাত্রী মৎস্য
রক্ত স্রোতে ভেসে গেল।
প্রশস্ত রণক্ষেত্রে, অশ্ব ক্ষুরাঘাতে,
ধূলি মেঘ সৃষ্টি হলো।
সেই ধূলি মেঘে আকাশের চাঁদ
একেবারে ঢাকা পড়লো।
যেন একটি পৃথিবী আকাশে উঠে,
আর এক স্বর্গ গড়লো।'

(বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে মুসলমান মত-বাদে মৎস্য পৃথিবীর ধারক। এই কবিতায় সেই মৎস্যের উল্লেখ। যুদ্ধের ভীষণতা দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্ণনা করার জন্য বলা হয়েছে—যেন পৃথিবীর সাতটি ভূখণ্ডের মধ্যে একটি আকাশে উঠে গিয়ে সপ্তম স্বর্গের স্থলে অষ্টম স্বর্গে পরিণত হয়েছে। এই কবিতাটি ফার্দোসির সাহানামা থেকে গৃহীত)।

যে সময়ে পবিত্র ধর্ম্মযুদ্ধের সৈনিকরা অবলীলাক্রমে তাদের জীবন উৎসর্গ করছিল সেই মূহূর্ত্তেই এই গোপন বাণী তাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হচ্ছিল— লজ্জা করো না, দুঃখও করো না। বিশ্বাস করো। এই সব অবিশ্বাসীদের অনেক ওপরে তোমাদের মহিমা প্রচারিত হবে। সেই অভ্রান্ত সংবাদবাহীর নিকট তারা এই আনন্দময় বাণী শুনতে পেল—সাহায্য পৌঁচেছে আল্লার কাছ থেকে। দ্রুত যুদ্ধ জয় হবে। প্রকৃত বিশ্বাসীদের কাছে এই শুভ বার্ত্তা পৌঁছে দাও।' তারপর তারা আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো। তাদের কানে পয়গম্বরদের প্রশংসাবাণী প্রবেশ করলো। আল্লার দরবারের ফিরিস্তা (দেবদূত) তাদের মস্তকের চতুর্দ্দিকে পতঙ্গের মত ঘুরতে লাগলো। প্রথম ও দ্বিতীয় নমাজের দধ্যবর্ত্তী সময়ে এমন যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠ্‌লো যে সেই আগুনের শিখার নিশান যেন আকাশ স্পর্শ করলো। ইসলামের সৈন্যদের দক্ষিণ ও বাম ভাগ হতভাগা বিধর্ম্মী সৈন্যদের বাম ও দক্ষিণ বাহুর সৈন্যদের তাড়া করে তাদের কেন্দ্রস্থলের সৈন্যদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে একাকার করে ফেললো।

ইসলামের যোদ্ধাদের জয়ের এবং ধর্ম্মের নিশান উড্ডীন হওয়ার চিহ্নগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখে অভিশপ্ত বিধর্ম্মীরা এবং শয়তান অবিশ্বাসীরা এক ঘণ্টার মত সময় হতবুদ্ধির মত নিশ্চল হয়ে রইলো। তারপর তারা মরিয়া হয়ে আমাদের কেন্দ্রস্থলের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাম পার্শ্বের ওপর তাদের আক্রমণের বেগ গুরুতর হলো এবং সেইদিকে তারা অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেল। কিন্তু ধর্ম্মযোদ্ধাগণ যাদের মন সৎকাজের পুরস্কার পাওয়ার দিকে নিস্তব্ধ তাদের তীর বিধর্ম্মীদের প্রত্যেক বক্ষে বিদ্ধ করতে লাগলো। বিধর্ম্মীদের ভাগ্য এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন যে তাদের পতন হলো। এইরূপ অবস্থায় সুখী সম্রাটের ভাগ্যক্ষেত্রে 'জয় এবং সৌভাগ্যের মলয় বাতাস বইতে লাগলো এবং তাঁর কাছে এই শুভ সংবাদ বহন করে নিয়ে এলো। (সত্যই প্রত্যক্ষ জয়দান করা হয়েছে) সেই সুন্দরী রমণী—জয় যাঁর নাম—যাঁর কুঞ্চিত কেশদাম স্বয়ং ঈশ্বর সজ্জিত করেন তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন।

যে সৌভাগ্য অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিল, সে আবরণ খুলে গেল এবং তা বাস্তবে পরিণত হলো।

কুযুক্তিপরায়ণ হিন্দুরা তাদের ধ্বংসজনক অবস্থার কথা উপলব্ধি করে বাতাসের মুখে যেমন পেঁজা তুলো উড়ে যায় এবং পতঙ্গরা ভেসে যায় সেই ভাবে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হলো অনেকে আহত হয়ে পালিয়ে গেল কিন্তু অবশেষে কাক-শকুনির খাদ্যে পরিণত হলো। মৃত ব্যক্তিদের দেহ দিয়ে স্তূপ এবং মাথা দিয়ে স্তম্ভ রচিত হলো।

মৃতের তালিকার মধ্যে মেওয়াতের হাসান খাঁকে পাওয়া গেল—গোলার মুখে যার মৃত্যু হয়েছে। উপজাতিদের অনেক একগুঁয়ে সর্দার এইভাবে তীরের কিংবা গোলার মুখে শেষনিঃশ্বাস ফেলতে বাধ্য হয়েছে। তার মধ্যে আছে বাজরের (উদয়পুর) রাজা রাওয়াল উদয় সিং, ডুংগারপুরের শাসক—যার অশ্বসংখ্যা বারো হাজার, চার হাজার অশ্বের মালিক রায় চন্দ্রবান চৌহান, চান্দেরির রাজা ভূপত রাও—যার অশ্বসংখ্যা ছয় হাজার, মাণিক চাঁদ চৌহান এবং দিলপৎ রাও যাদের প্রত্যেকের ছিল চার হাজার অশ্ব, গাঙ্গু, করমসিং ও দানকুশি যাদের প্রত্যেকের ছিল তিন হাজার অশ্ব এবং আরও অনেকে যারা ছিল দল ও জাতির নেতা ও দুর্দ্ধর্ষ সর্দার। এরা সকলেই নরকের পথে যাত্রা করলো, মাটির পৃথিবী থেকে নরকের গর্ত্তে বাস করার জন্য। যেমন নরক পূর্ণ থাকে, সেইরূপ শত্রুরাজ্যের রাস্তাগুলি হত ও আহতদের দেহে পূর্ণ হয়ে গেল। ছোট ছোট মাটির গর্ত্তগুলি দুষ্কৃতিকারীদের দেহে ভরতি—যাদের আত্মা নরকের প্রভুর হাতে সমর্পিত হয়েছে। যেদিকেই ইসলামের সৈন্য ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হয়েছে সেখানেই কোনও না কোনও মৃতদেহ তাদের চোখে পড়েছে। ইসলামের সুবিখ্যাত সৈন্যদল শত্রুসৈন্যের পিছন পিছন যে দিকেই ধাওয়া করেছে তারা লক্ষ্য করেছে যে অগণিত ভূপতিত শত্রু দেহে ভূমি এমন আবৃত যে—পা ফেলার স্থান নাই।

'হস্তীযূথ-প্রভুর সেনাদলের মত
যারা পাথরের ঘায়ে হয়েছিল হত।
এই হীন ঘৃণ্য হিন্দুর দলও
কামানের গোলায় ধরাশায়ী হলো।
তাদের শব দিয়ে হলো পাহাড় গড়া,
পাহাড়ের ঝরণা, তাদের রক্ত ধারা।

আমাদের নিপুণ সেনার তীরের ভয়ে,
মাঠে পহোড়ে অনেকে গেল পালিয়ে।'

তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। আল্লার আদেশই পালনীয়। এখন তাঁরই মহিমা কীর্ত্তন কর—যিনি সবই শুনতে পান। সবখানেই যিনি বিরাজিত। জয় এসেছে একমাত্র তাঁরই কাছ থেকে যিনি পরম শক্তিমান এবং জ্ঞানী। (জমাদি-উল সানি মাসের ২৫শে তারিখ ৯৩৩ হিজারি সন—২২শে মার্চ, ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত)।

যুদ্ধজয়ের বর্ণনার পর আত্মকথার পুনরারম্ভ

শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করার পর আমরা দ্রুত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে একের পর এক তাদের ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে ফেলা হলো। আমাদের শিবির থেকে রাণা সঙ্গর শিবিরের দূরত্ব প্রায় ক্রোশ দুই হবে। তার শিবিরে পৌঁছিয়ে তাকে অনুসরণ করার জন্য মহম্মদ আবদুল আজিজকে এবং আরও কয়েক জনকে পাঠানো হলো। কিন্তু তাদের কাজে হয়তো শিথিলতা ছিল। (সেই কারণেই রাণা সঙ্গ পালাতে পেরেছিল। এই বছরেই রাণা মারা যায়। সন্দেহ হয় তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়)। এ ব্যাপারে আমার নিজেরই যাওয়া উচিত ছিল। অন্যের উপর নির্ভর করে এই গুরুভার অর্পণ করা ঠিক হয়নি। এই বিধর্ম্মীর শিবির থেকে ক্রোশ খানেক অগ্রসর হয়ে আমি ফিরে এলাম—কারণ দিনের আলো নিভে এসেছে। আমাদের শিবিরে যখন ফিরে আসি তখন রাতের নমাজের সময়।

এই যুদ্ধ জয়ের পর আমার রাজকীয় পদবীগুলির মধ্যে 'গাজি' এই উপাধিটাও যোগ করি। আমার-এই জয়ের সরকারি বিবরণে রাজকীয় উপাধিগুলি লেখার পর এই কবিতাটিও লিখে রাখি।

(তুর্কিতে) 'নিজ ধর্ম্ম ভাল বেসে মরুভূমিতে ঘুরেছি।
বিধর্ম্মী হিন্দুদের শত্রু বলে ভেবেছি।
শহীদ হইব আমি আশা ছিল তাই।
আল্লার দয়ায় হলাম গাজি, আর খেদ নাই।'

মহম্মদ সেরিফ—সেই জ্যোতিষী যার বিকৃত ও রাজ-দ্রোহকর আচরণের কথা পূর্ব্বেই বলেছি—সে আমার জয়ের জন্য সম্বর্দ্ধনা জানাতে এলো। আমি তাকে গালাগালির স্রোতে ভাসিয়ে দিলাম। এই ভাবে আমার রাগটা যখন পড়ে এলো এবং মনটাও হালকা হলো তখন সে পৌত্তলিকের মত আচরণ

বিশিষ্ট বিকৃত স্বভাব। অত্যন্ত আত্ম-কেন্দ্রিক এবং অকথ্য দুর্মুখ হলেও সে আমার পুরাতন ভৃত্য বিবেচনা করে উপহারস্বরূপ চার হাজার টাকা দিয়ে তাকে বরখাস্ত করি। আদেশ দিই যেন সে আমার রাজ্য অবিলম্বে ত্যাগ করে চলে যায়।

পরদিনও আমাদের শিবিরেই থেকে যাই। মহম্মদ আলি জং জং, সেখ গুরণ ও বর্ম্মরক্ষক আবদুল মালিকের সঙ্গে বিপুল সৈন্যবাহিনী দিয়ে বিদ্রোহী ইলিয়াস খাঁকে দমন করার জন্য পাঠানো হলো। সে গঙ্গা ও যমুনা এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কোয়েল নিজের অধিকারে এনে কিচিক আলিকে বন্দী করে। আমার সৈন্যদল অগ্রসর হলে তার দলের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কয়েকদিন পর তাকেও বন্দী করে আগ্রায় পাঠানো হয়। সেখানে তার জীবন্ত ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়।

আদেশ দেওয়া হলো যে বিধর্ম্মীদের শির দিয়ে একটি জয় স্তম্ভ তৈরী করে যে পাহাড় ও আমাদের শিবিরের মাঝখানে এই যুদ্ধ হয় সেই ছোট পাহাড়ের ওপর সেই স্তম্ভ খাড়া করা হোক।

সেই স্থান ত্যাগ করে দুইরাত্রি মধ্যপথে বিশ্রাম করে আমরা ২০শে মার্চ রবিবার বিয়ানায় পৌঁছাই। বিধর্ম্মী এবং ধর্ম্মত্যাগীদের অগণিত মৃতদেহ— যারা যুদ্ধে হত হয়েছে—বিয়ানা পর্য্যন্ত,—শুধু বিয়ানা নয়—আলওয়ার ও মেওয়াৎ পর্য্যন্ত ছড়ানো ছিল।

শিবিরে ফিরবার পর আমি তুর্কি ও হিন্দুস্থানের আমিরদের আহ্বান জানাই এই আলোচনা করবার জন্য যে এই সময় রাণা সঙ্গর দেশে অভিযান চালানো উচিত হবে কিনা। কিন্তু পানীয় জলের স্বল্পতা এবং পথে অতিরিক্ত গরম ভোগ করতে হবে এই জন্য প্রস্তাব পরিত্যক্ত হলো।

মেওয়াৎ প্রদেশ দিল্লী থেকে বেশী দূর নয়। এর রাজস্ব তিন চার কোটি টাকার মত। হাসান খাঁ মেওয়াতি এই দেশের শাসনভার তার পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছিল—যারা এই রাজ্য বংশপরম্পরায় একাদিক্রমে দুই এক শতাব্দী শাসন করেছে। দিল্লী-সুলতানদের অধীন হলেও তাদের বশ্যতা নাম মাত্র ছিল। হিন্দুস্থানের সুলতানরা তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির জন্যই হোক কিংবা সুবিধার অভাবেই হোক অথবা এই স্থানের পার্ব্বত্য প্রকৃতির জন্যই হোক কখনও মেওয়াৎকে সম্পূর্ণ বশে আনতে পারেন নি। এই দেশে শৃঙ্খলা স্থাপন না করতে পেরে তাঁরা যেটুকু বশ্যতা তাদের কাছ থেকে

পেয়েছিলেন—তাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। আমিও হিন্দুস্থান জয়ের পর সুলতানদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হাসান খাঁকে বিশেষ ভাবে অনুগ্রহ দেখাই। কিন্তু এই অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বাসী ব্যক্তির ভালবাসা ছিল বিধর্মীদের প্রতি। অনুগ্রহ এবং প্রসিদ্ধি দান করে আমি তার প্রতি যে সদায় ব্যবহার করেছি তা উপেক্ষা করে সে ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহের নেতা হয়ে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা আগেই বলা হয়েছে। বিধর্মীদের দেশে সৈন্য চালনা করার ইচ্ছা পরিত্যক্ত হওয়ায় আমি মেও-য়াৎকে বশীভূত করার জন্য মনস্থ করলাম। চারবার সৈন্য চালনা করে অগ্রসর হওয়ার পর পঞ্চমবার সৈন্য চালনা করে এই প্রদেশের রাজধানী আলোয়ার দুর্গ থেকে ছয় ক্রোশ দূরে মানস্ নদীর তীরে শিবির স্থাপন করি। হাসান খাঁর পূর্ব্বপুরুষদের রাজধানী ছিল তিজারায়। যে বৎসর আমি হিন্দুস্থান আক্রমণ করে পাহাড় খাঁকে পরাস্ত করার পর লাহোর এবং দেবলপুর অধিকার করি (১৫২৪) সেইসময় আমার সৈন্যদের অগ্রগতিতে আতঙ্কিত হয়ে হাসান খাঁ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করতে আরম্ভ করে।

করমচাঁদ নামে হাসান খাঁর একজন প্রধান কর্ম্মচারী যে হাসান খাঁর পুত্র যখন আগ্রা দুর্গে বন্দী ছিল তখন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সেই হাসান খাঁর পুত্রের তরফ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আসে। আবদুল রহিম শাখা-ওয়েলকে তার সঙ্গে দিয়ে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিই। হাসান খাঁর পুত্রকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিই যে তার কোনও ভয় নাই এবং তার নিরাপত্তার সম্বন্ধেও আশ্বাস দান করি। তারা দুই জনই হাসান খাঁর পুত্র নাহির খাঁকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে। তাকে আবার অনুগ্রহ দেখিয়ে ভরণপোষণের জন্য কয়েক লক্ষ টাকার আদায়ী পরগণা দান করি।

আমি খসরু গোকুলতাসকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মত পরগণা এবং আলোয়ারের শাসন ভার প্রদান করি। কারণ আমার ধারণা ছিল যে যুদ্ধে ভালভাবে তার কার্য্য সম্পন্ন করেছে। কিন্তু সে তার দুর্ভাগ্যবশতঃ মেজাজ দেখিয়ে আমার এই দান গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। আমি পরে জানতে পারি—যে কাজের জন্য তাকে পুরস্কৃত করতে যাচ্ছিলাম সে কাজ সে করেনি। করেছিল চিন্ তাইমুর সুলতান। সুলতানকে মেওয়াতের রাজধানী তিজারা নগর এবং সেই সঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি প্রদান করি। তার্দিকাকে—যে রাণা সঙ্গর সঙ্গে যুদ্ধে দক্ষিণ-দিকের পার্শ্বে-রক্ষী সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিল এবং যে অন্য সকলের চেয়ে যুদ্ধে অধিকতর পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিল তাকে

আলোয়ার দুর্গের ভার দিয়ে পনরো লক্ষ টাকার সংস্থান করে দিই। আলোয়ার কোষাগারের ধনসম্পত্তি হুমায়ুনকে প্রদান করি।

রজব মাসের ১লা তারিখ উপরোক্ত শিবির থেকে রওনা হয়ে আলোয়রের দুই ক্রোশের মধ্যে পৌঁছে যাই। তারপর আলোয়ার দুর্গ দেখতে যাই এবং সে রাত্রি সেখানেই অবস্থান করি। পরের দিন শিবিরে ফিরে আসি।

রাণা সঙ্গর সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ছোট ও বড় সকলেই যখন শপথ গ্রহণ করে তখন তাদের বলেছিলাম যে যুদ্ধ জয়ের পর যারা হিন্দুস্থান ত্যাগ করে চলে যেতে ইচ্ছা করবে তাদের ছুটি দেওয়া হবে। হুমায়ুনের সৈন্য-দলের অধিকাংশই বাদাকৃসানের অধিবাসী। তারা কোনও সময়ই এক মাস কি দুই মাসের বেশী সময় সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়ে কাবুল ছেড়ে থাকেনি। যুদ্ধের পূর্ব্বেও তাদের মধ্যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল। এই সব কারণে এবং তা ছাড়া কাবুল সৈন্যশূন্য আছে দেখে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, তাদের সঙ্গে নিয়ে হুমায়ুন কাবুলে ফিরে যাবে।

এই সিদ্ধান্ত করার পর রজব মাসের ৯ই তারিখ বৃহস্পতিবার আলোয়ার থেকে যাত্রা করে মানস নদীর তীরে পৌঁছিয়ে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করি।

মেহেদি খাজাও অনেক অস্বস্তি ভোগ করছিল। তাকেও কাবুলে যাওয়ার জন্য ছুটি দেওয়া হয়। বিয়ানার সামরিক সমাহর্ত্তার পদে ফটক-রক্ষীদের প্রধান পরিচালক দোস্তকে নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব্বে এটোয়ার ভার মেহেদি খাজাকে দেওয়ার কথা ছিল। কুতুব খাঁ এইস্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর মেহেদি খাজার পুত্রকে তার পিতার স্থলে এইখানে পাঠানো হয়।

কাবুলে ফিরে যাওয়ার জন্য হুমায়ুনকে ছুটি দিয়ে এই জায়গায় দুই তিন দিন অবস্থান করি। বার্ত্তাবাহক মুমিণ আলিকে যুদ্ধ জয়ের বিবরণ সহ (ফতেনামা) কাবুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

রাণা সঙ্গ সংগ্রাম আরম্ভ করার সময় হিন্দুস্থান ও আফগানিস্থানের বেশীর ভাগই আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তাদের পরগণা ও জেলাগুলো পুনর্দখল করে নেয়—একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সুলতান মহম্মদ দুলদাই কনৌজ রাজ্য ত্যাগ করে আমার কাছে এসেছিল। সে আর সেখানে ফিরে যেতে ইচ্ছুক হলো না—সেটা তার ভয়ের জন্য হোক অথবা দুর্নামের জন্যই হোক। কনৌজের ত্রিশ লক্ষ টাকা রাজস্বের পরিবর্ত্তে তাকে পনরো লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ী শিরহিন্দের ভার দেওয়া হলো এবং

ত্রিশ লক্ষ টাকার কনৌজের শাসনভার মহম্মদ সুলতান মির্জ্জাকে অর্পণ করা হলো। কাসিম-ই-হুসেনকে বাদায়ুন দেওয়া হয়।

রাণা সঙ্গর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের সময় বিবন্ লুকনুর (রামপুর রাজ্যের সাহাবাদের পুরাতন নাম) অবরোধ করে। তার বিরুদ্ধে অভিযান চালনার জন্য কাসিম-ই-হুসেনকে পাঠানো হয়। তার সঙ্গে যায়—মহম্মদ সুলতান মির্জ্জা, তুর্কি-স্থানের আমিরদের মধ্যে বাবা কাসকা মালিক কাসিম তার ভাইদের আর তার অধীনস্থ মোগল সৈন্য সঙ্গে নিয়ে, বল্লম অস্ত্র ক্ষেপণে পারদর্শী আবুল মহম্মদ মুয়াদ তার পিতার এবং হুসেন খাঁ দরিয়াখানের দলবল নিয়ে, মহম্মদ তুলদাইযের সৈন্যদল, হিন্দুস্তানের আমিরদের মধ্যে আলি খাঁ ফরমুলা, মালিক দাদ কারনানি, সেখ মহম্মদ এবং তাহার খান খানি জাহান।

এই সৈন্যদল যখন গঙ্গানদী পার হওয়া আরম্ভ করে, সেই কথা জানতে পেরে বিবন্ সমস্ত কিছুর মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। আমাদের সৈন্যরা তার পিছন পিছন খয়রাবাদ পর্য্যন্ত ধাওয়া করে তারপর ফিরে আসে।

আগেই ধন-সম্পদ বিভাগের কাজ শেষ হয়েছিল। কিন্তু বিধর্মীদের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধে লিপ্ত থাকায় প্রদেশগুলির শাসনের ব্যবস্থা করার সময় পাইনি। পৌত্তিলিকদের সঙ্গে যুদ্ধের ঝামেলা মেটার পর আমি বিভিন্ন প্রদেশ এবং জেলা-গুলির শাসনভার কার কার ওপর দেওয়া হবে সেটা ঠিক করার সময় পাই। বর্ষাকাল ঘনিয়ে আসছে দেখে আমি প্রত্যেককে নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে তাদের যুদ্ধের সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র ঠিক করে রাখতে এবং বর্ষা শেষ হলে আমার সঙ্গে পুনরায় যোগ দেওযার জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দ্দেশ দিই।

এই সময় আমার কাছে সংবাদ আসে যে হুমায়ুন দিল্লিতে ফিরে গিয়ে কতকগুলি বাড়ীতে যেখানে সঞ্চিত ধন ছিল সেই বাড়ী খুলে জোর করে অর্থ দখল করেছে। তার এই রকম বিসদৃশ আচরণের কথা কখনও ধারণা করি নাই। এতে আমি মনে বিষম আঘাত পাই। কড়া চিঠি লিখে তার কাছে পাঠিয়ে দিই।

আমি তারদি বেগকে দরবেশের জীবন থেকে ফিরিয়ে এনে সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলি। এইভাবে সে বহু বৎসর সেবা করেছে। আবার দরবেশ-জীবনে ফিরে যাওয়ার তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হলো। সে আমার কাছে বিদায় প্রার্থনা করলো। ছুটি মঞ্জুর করে কোষাগার থেকে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে তাকে কামরানের কাছে দূত হিসাবে পাঠানো হলো।

গত বৎসর যারা এখান থেকে চলে গিয়েছে তাদের মনোভাবটা কতকটা প্রকাশ করে আমি একটুকরো কবিতা লিখেছিলাম। সেইটি মোল্লা আলিখাঁর নামে তারদি বেগের মারফৎ তরে কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

'হায়রে!

'হিন্দুস্থান ত্যাগ করি'
তোমরা তো গিয়েছ চলিয়া!
এ দেশের ব্যথার স্মৃতি
এখনও কি যাওনি ভুলিয়া?
সেথাকার মনোরম পরিবেশ
তোমাদের করেছিল আকুল,
ক্ষিপ্রপদে হিন্দুস্থান করি' ত্যাগ
তোমরা তাই গিয়েছ কাবুল।
যেসুখের সন্ধান তরে
সেখানে গিয়েছ।
ঘরোয়া আরাম সুখ শান্তি
নিশ্চয় লভেছ।
এত দুঃখ, এত ব্যথা
হেথায় যদিও সয়েছি,
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
মোরা এখনও বেঁচে আছি।
অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যথা,
শারীরিক কষ্ট দুঃখ
এবে করেছ অতিক্রম।
জেনে রেখো একই ভাবে
আমরাও লভিয়াছি সুখ
এতটুকু নহে ব্যতিক্রম।'

আমার এগারো বছরের বয়স থেকে কখনও একই জায়গায় দুইবার রমজান উৎসব দেখি নাই। গত বৎসর আমি রমজান উৎসবের সময় আগ্রায় ছিলাম। এই প্রথা বজায় রাখার জন্য ১০ই তারিখ রবিবার রাত্রে রমজান উৎসব পালন করার জন্য সিক্রিতে আসি। যুদ্ধ জয়ের স্মারক সূচক উদ্যানের উত্তর পূর্ব্ব কোণে

একটি পাথরের উঁচু মঞ্চ তৈয়ারী করা হয়। তার উপর কয়েকটি বড় তাঁবু খাটিয়ে সেখানে উৎসব উদ্‌যাপন করি। যে রাত্রে আমরা আগ্রা ত্যাগ করি, সেই রাত্রেই মির আলি চলে যায়। সে তাস খেলতে ভালবাসতো। সে কতকগুলি তাস চেয়ে পাঠায়। আমি তা পাঠিয়ে দিই।

৫ই জেল্‌কদ, শনিবার আমি অসুখে পড়ি। অসুখ সতেরো দিন ধরে চলেছিল।

এই সময়টা নানা লোকে সেখ বেজিদের সম্বন্ধে নানা কথা বলছিল। সুলতান কুলি তুর্ককে তার কাছে পাঠিয়ে বলা হয় যে কুড়ি দিনের মধ্যে সে যেন আমার সামনে হাজির হয়।

জেলহজ্জ মাসের ২রা তারিখ শুক্রবার থেকে আমি কোরণের একটি অধ্যায় একচল্লিশ বার পড়তে আরম্ভ করি। আমি এই সময় এই কবিতাটি লিখি।

বলবো কি তার আঁখির কথা ?
অথবা ভুরু তার ?
আগুনের মত গায়ের রং
কিংবা কণ্ঠস্বর ?
তার দেহ সৌষ্ঠবের কথা
না তার গণ্ডদেশ ?
তার চুলের বাহার
না তার কটিদেশ ?

২রা জেলহজ্জ আমি আবার অসুখে পড়ি। অসুখে নয় দিন ভুগলাম।

২০শে জেলহজ্জ আমরা অশ্বারোহণে কুল ও সম্বলের দিকে প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি।

মহরম মাসের ১লা তারিখ শনিবার আমরা কুলে (আলিগড়) এসে পৌঁছাই। হুমায়ুন দরবেশ-ই-আলি এবং ইউসুফ-ই-আলিকে সম্বলে রেখে যায়। তারা একটা নদী পার হয়ে কুতুব সেরওয়ানি এবং চল্লিশজন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করে এবং অনেক লোককে হত্যা করে। তারা কয়েকটি নরমুণ্ড ও একটি হাতী আমাদের কাছে কুল-এ পাঠিয়ে দেয়। তখন আমরা সেখানে ছিলাম। কুল-এ দুই দিন কাটানোর পর সেখ গুরাণের আমন্ত্রণে তার বাড়ীতে আসি। সেখানে সে তার আতিথ্যে আমাদের পরিতৃপ্ত করে এবং আমাদের সামনে উপহার দ্রব্য রাখে।

বুধবার দিন আমরা গঙ্গা নদী পার হয়ে সম্বল এলাকায় একটা গ্রামে রাতটা কাটাই। বৃহস্পতিবার আমরা সম্বলে অবতরণ করি। সেখানে দুইদিন থাকবার পর শনিবারে চলে আসি।

রবিবার আমরা সিকেন্দারায় রাও শিরওয়ানির ভবনে পৌঁছাই। সে আমাদের আহারের আয়োজন করে ও নিজেই খাদ্য পরিবেশন করে। যখন আমরা ভোরে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ি তখন এমন ভাবটা দেখাই যেন আমি সকলকে পিছনে ফেলে একাই চলে যাব। আমি দ্রুত কদমে আগ্রার এক ক্রোশের মধ্যে একাই এসে পৌঁছাই। সেখানেই আমার সঙ্গীরা আমাকে ধরে ফেলে। মধ্যাহ্নে সালাতের সময় আমরা আগ্রা পৌঁছে যাই।

মহরম মাসের ১৬ই তারিখ আমার আবার জ্বর এবং শারীরিক যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। পঁচিশ ছাব্বিশ দিন এই জ্বর ঘুরে ঘুরে আসে। আমি ওষুধ খেতে থাকি এবং কিছু আরাম পাই। এই সময়টা পিপাসায় ও অনিদ্রায় খুবই কষ্ট পাই।

আমরা অসুখের সময় দুই একটি চতুষ্পদী কবিতা রচনা করি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই :—

'দিনের বেলায় ভুগি প্রবল জ্বরে
নিশীথে যায় আঁখির নিদ্ দূরে।
যন্ত্রণা আর সহিষ্ণুতা পাশাপাশি রহে।
একটা যদি কমতে থাকে আর একটি বাড়ে।

সফর মাসের ২৮শে তারিখ শনিবার আমার দুই পিসিমা ফকর-ই-জাহান বেগম ও খাদিজা-সুলতান-বেগম সিকান্দারায় আসেন। আমি কিছুদূর এগিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসি।

রবিবার ওস্তাদ আলি কুলি একটি বড় কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করে। গোলাটি অনেকদূর পর্যন্ত যায় বটে, কিন্তু কামানটি চুরমার হয়ে যায়। তার এক এক টুকরার ধাক্কায় কয়েকজন আহত হত হয় এবং আটজন মারা যায়।

প্রথম রবিয়ল মাসের ৭ই তারিখ সোমবার সিক্রি পরিদর্শনের জন্য অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়ি। হ্রদের মাঝখানে একটি আট কোণা মঞ্চ তৈরী করার আদেশ দিয়েছিলাম। দেখলাম সেটা তৈরী হয়েছে। মঞ্চের ওপর চাঁদোয়া খাটিয়ে সেখানে একটা নেশার আসর বসানোর ব্যবস্থা করি।

সিক্রি থেকে ফেরার পর প্রথম রবিয়াল মাসের ১৪ই তারিখ সোমবার রাত্রে

চান্দেরির বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ করার জন্য রওনা হই। তিন ক্রোশ যাওয়ার পর জলসিরে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করি। সেখানে লোকদের যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত করে রবিয়াল মাসের ১৭ই তারিখ (ডিসেম্বর ১২ই) বৃহস্পতিবার পুনরায় সৈন্য চালনা করে আনওয়ারে এসে নামি। আমি নদী পথে নৌকায় আনওয়ার ত্যাগ করি এবং চান্দওয়ার ছাড়িয়ে নৌকা থেকে নামি।

কদম কদম এগিয়ে গিয়ে আমরা ২৮শে তারিখ সোমবার কানওয়ারে প্রবেশ পথের কাছাকাছি অবতরণ করি।

রবিয়স সানি মাসের ২রা তারিখ বৃহস্পতিবার আমি নদী পার হই। নদীর এপারেই হোক আর ওপারেই হোক সমস্ত সৈন্য পার হতে চার পাঁচ দিন দেরী হয়ে যায়। এই কয়েকদিন আমরা নৌকায় ঘুরে বেড়াই এবং মোদক খাই। কানওয়ারে যাওয়ার পথ চম্বল নদীর দুই এক ক্রোশ উজানে। শুক্রবার আমি একটি নৌকায় চড়ে এ রাস্তায় এসে পৌঁছাই এবং শিবিরে উপস্থিত হই।
যদিও সেখ বেজিদ শত্রুতাচরণ করছে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবুও তার অসদাচরণে এবং কার্য্যে একটা অনুমান হচ্ছিল যে তার হয়তো শত্রুতা করার মতলব আছে। এই জন্য সৈন্যদলের মধ্য থেকে মহম্মদ আলি জংজংকে নির্ব্বাচিত করে তাকে কনোজ থেকে মহম্মদ সুলতান, মির্জ্জা এবং সেখানকার আমির ও সুলতানদের যেমন—কাসিম-ই-হোসেন সুলতান, বেয়াকুব সুলতান, মালিক কাসিম কুকি, বল্লমধারী আবদুল মহম্মদ ও মিমুচুর খাঁ আর তাদের ছোট বড় ভাইরা এবং দরিয়া খামিসকে আনার জন্য পাঠানো হলো যাতে তারা এক সঙ্গে বিদ্রোহী আফগানের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। উপদেশ দেওয়া হলো যে তারা যেন প্রথমে সেখ বেজিদকে তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। যদি সে দ্বিরুক্তি না করে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়, তাহলে যেন তাকে সঙ্গে নেওয়া হয়। তা যদি না করে তাহলে যেন তাকে দূরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। মহম্মদ আলি কয়েকটি হাতি চাওয়ায় দশটি হাতি তার সঙ্গে দেওয়া হয়। তাকে যাত্রা করার অনুমতি দেওয়ার পর বাবাচুরাকেও তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়।

১৫২৮ সনের ঘটনাবলী

চান্দেরি যাত্রার বিবরণ

কানার থেকে দুই মাইল নৌকা যোগে যাই। ১লা জানুয়ারি, রবিয়ল মাসের ৮ই তারিখ বুধবার কালপির এক ক্রোশের মধ্যে অবতরণ করি। শিবিরে বাবা

কুলি আমাকে সম্বর্দ্ধনা করতে আসে। সে খলিল সুলতানের পুত্র। খলিল সুলতান সৈয়দ খানের ছোট সহোদর ভাই। গত বৎসর সে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে আসে, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়ে আন্দারআব সীমান্ত থেকে ফিরে আসে। যখন সে খাস্‌ঘরের কাছাকাছি আসে, সেই সময় সৈয়দ খান হায়দার মহম্মদকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য পাঠিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

পরদিন অর্থাৎ ২রা জানুয়ারি আমরা আলমখাঁর বাড়ী কুলপিতে আসি। আমাদের জন্য সে হিন্দুস্থানি খাদ্যের আয়োজন করে এবং নানা উপহার দ্রব্য দেয়।

১১ই জানুয়ারি আমরা কান্দিরে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামি।

১২ই জানুয়ারি রবিবার চিন তাইমুর সুলতানকে ছয় সাত হাজার সৈন্যের অধিনায়ক করে চান্দেরির বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রগামী দল হিসাবে পাঠিয়ে দিই। তার সঙ্গে যায় বেগ বাকি মিংবাসি (এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক), কুজবেগের ভাই তারদি বেগ, খাদ্য-পরীক্ষক আসিক বেগ, মোল্লা আহাক, মুসিম জুলদাই এবং হিন্দুস্থানি বেগদের মধ্যে সেখ গুরণ।

১৭ই জানুয়ারি শুক্রবার (দ্বিতীয় রবিয়ল মাসের ২৪শে তারিখ) আমরা কাচোয়ার নিকটে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করি। এখানকার অধিবাসিদের উৎসাহিত করে বদরউদ্দিনের পুত্রকে এই জায়গার শাসন ভার অর্পণ করি।

এই স্থানের দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে পাহাড়গুলির মধ্যে আড়াআড়িভাবে বাঁধ তৈরী করে একটি বড় গোলাকায় হ্রদের সৃষ্টি করা হয়েছে যার আয়তন প্রায় দশ বারো বর্গ মাইলের মত। এই হ্রদ কাচোয়াকে তিন দিকে ঘিরে আছে। উত্তর পশ্চিম দিকে খানিকটা জায়গা শুকনো রাখা হয়। সেখানেই কাচোয়ার প্রবেশের ফটক। হ্রদের ওপর অগণিত ছোট ছোট নৌকা—যাতে তিন চার জন লোক ধরে। যদি এখানকার লোককে কোনও কারণে পালাতে হয় তাহলে নৌকায় চড়েই যেতে হয়। কাচোয়ায় পৌছানোর আগেও দুইটি হ্রদ দেখা যায়—সেগুলো কাচোয়ার হ্রদের চেয়ে ছোট এবং এই হ্রদ দুটিও পাহাড়গুলির মধ্যে আড়াআড়ি ভাবে বাঁধ দিয়ে তৈরী হয়েছে।

কাচোয়ায় আমাদের একদিন অপেক্ষা করতে হয়। কারণ এইখানে কয়েকজন কর্ম্মক্ষম ওভারসিয়ার ও মাটি কাটার লোকদের রাস্তা সমতল করা ও জঙ্গল পরিষ্কারের জন্য নিযুক্ত করা হয়। কাচোয়া এবং চান্দেরির মধ্যে

স্থানগুলি জঙ্গলাকীর্ণ। ১৯শে জানুয়ারি আমরা কাচোয়া ত্যাগ করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একরাত্রি বিশ্রাম করি তারপর বুরহানপুর অতিক্রম করে চান্দেরি থেকে ছয় মাইল দূরে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করি।

চান্দেরি দুর্গ একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। তার নীচে সহর এবং বহির্দুর্গ। তারও নীচে সমতল রাস্তা—যার উপর দিয়ে গাড়ী চলাচল করে। যখন আমরা বুরহানপুর ত্যাগ করি সেই সময় (২০ই জানুয়ারি) গাড়ী চলাচলের সুবিধার জন্য চন্দেরির দুই মাইল নীচর রাস্তা দিয়ে যাই।

২১শে জানুয়ারি-একটা রাত বিশ্রামের পর আমরা অগ্রসর হয়ে বাজাত খাঁয়ের পুকুরের পারের ওপর দ্বিতীয় রবিয়ল মাসের ২৮শে তারিখ মঙ্গলবার এসে পৌছাই।

২২শে জানুয়ারি—প্রত্যুষে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে দেওয়াল-ঘেরা সহরের চারিদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ, বামে, মধ্যস্থলে ঘাটি স্থাপন করি। ওস্তাদ আলি কুলি প্রস্তর গোলা নিক্ষেপের জন্য একটি জায়গা নির্ব্বাচিত করে। মজুর ও ওভারসিয়ারদের সেই নির্ব্বাচিত স্থান উঁচু করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়—যার ওপর কামান স্থাপন করা হবে। সমস্ত সৈন্যদলকে দুর্গ অধিকার করার জন্য যন্ত্রপাতি, মই ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত থাকতে আদেশ করা হয়।

পূর্ব্বে চান্দেরি মাণ্ডু সুলতানদের অধীনে ছিল। যখন সুলতান নাসিরুদ্দিন মারা যান (তিনি ১৫০০-১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মালওয়ার শাসক ছিলেন) তাঁর এক পুত্র সুলতান মামুদ যিনি এখন মাণ্ডুর শাসক তিনি এর পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডের উপর অধিকার স্থাপন করেন, এবং আর এক পুত্র চান্দেরি দখল ক'রে সেকেন্দার লোদির অধীনস্থভাবে সেখানে থাকেন। সেকেন্দার লোদিও মহম্মদ সাহের পক্ষাবলম্বন করে তাঁর সাহায্যের জন্য বিপাল সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। মহম্মদ সা সুলতান সেকেন্দারের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। তিনি আমেদ সা নামে এক নাবালক পুত্র রেখে সুলতান ইব্রাহিমের রাজত্বকালে মারা যান। সুলতান ইব্রাহিম আমেদ সাকে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর একজন নিজের লোককে চান্দেরির শাসক নিযুক্ত করেন। যে সময় রাণা সঙ্গ সুলতান ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করে এবং ইব্রাহিমের অধীনস্থ বেগরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে—সেই সময় চান্দেরি রাণার হাতে যায় এবং রাণা চান্দেরির শাসন ভার মেদিনী রায়ের ওপর অর্পণ করে। রাণার বিশ্বাসভাজন এই বিধর্ম্মী মেদিনী রায় চার পাঁচ হাজার বিধর্ম্মীর সঙ্গে এইখানে ছিল।

জানা গিয়েছিল যে মেদিনীরায় এবং আরাইস খাঁয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে। সেইজন্য শেষোক্ত ব্যাক্তিকে সেখ গুরণকে সঙ্গে দিয়ে মেদিনী রায়ের নিকট অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শনের প্রস্তাব দিয়ে পাঠানো হয়। তার নিকট এই প্রস্তাব করা হয় যে, চান্দেরির পরিবর্ত্তে তাকে সামসাবাদের (সংযুক্ত প্রদেশে) শাসন ভার দেওয়া হবে। কিন্তু মেদিনী রায়ের দুই একজন বিশ্বস্ত অনুচর এই আপোষ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করে—যার ফলে কোনও মীমাংসার সম্ভাবনা দেখা যায় না। হয়তো মেদিনী রায়ও এই আপোষ প্রস্তাবে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, অথবা তার দুর্গ অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং অজেয় এই ভ্রান্তি গর্ব্বে সে স্ফীত হয়ে উঠেছিল।

প্রথম জুমাদা মাসের ৬ই তারিখ (২৮শে জানুয়ারি) মঙ্গলবার আমরা খাঁয়ের পুষ্করিণীর তীর থেকে চান্দেরি দুর্গ আক্রমণের জন্য সৈন্য চালনা করি। দুর্গের নিকট একটি পুষ্করিণীর পাশে এসে ভূমিতে অবতরণ করি।

এই দিনই সকালে মাটিতে পা দেওয়ার পরই খলিফা দুই একটি চিঠি নিয়ে আসে। তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে—পূব দিকে যে সৈন্য পাঠানো হয়েছিল তারা অবিবেচকের মত যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছে এবং লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করে কনোজে গিয়েছে। বুঝলাম এই পরাজয়ের সংবাদে খলিফা অত্যন্ত বিচলিত ও শঙ্কিত হয়েছে। তার মনের ভাব বুঝে আমি বল্লাম ভয়ের বা অস্থির হওয়ার মত কোনও কারণ ঘটেনি। আল্লার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই সম্পন্ন হয় না এবং যা তিনি আগের থেকে ঠিক করে রেখেছেন তা ঘটবেই। এখন চান্দেরির ব্যাপারটার দিকে মনোযোগ দেওয়া আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য। যে সব কথা আমাদের বলা হলো—সে কথা আর যেন উচ্চারিত না হয়। আগে আমরা দুর্গ আক্রমণ করবো। এই কাজ শেষ হলে দেখা যাবে সামনেতে কি আছে।

চান্দেরি দুর্গ অবরোধের সূচনা

শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেছে। তারা বহির্দুর্গে এক এক দলে দুই তিন জন লোককে রেখেছে সতর্কতার জন্য। সেই রাত্রে আমাদের পক্ষের লোক চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল। শত্রুপক্ষের অল্প কয়েকজন লোক যারা বহির্দুর্গে ছিল তারা যুদ্ধ করেনি, তারা দুর্গের ভিতর পালিয়ে যায়।

প্রথম জুমাদা মাসের ৭ই তারিখ বুধবার (২৯শে জানুয়ারি) আমার সৈন্যদের অস্ত্রসজ্জিত হতে আদেশ দিয়ে তাদের নিজ নিজ ঘাটিতে উপস্থিত থেকে শত্রুপক্ষকে যুদ্ধে নামবার প্ররোচনা দিয়ে নিজ নিজ স্থান থেকে আক্রমণ

সুরু করতে বলে আমি যুদ্ধ-ডঙ্কা ও পতাকা নিয়ে অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়ি।

পুরাদমে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে আমি যুদ্ধ-ডঙ্কা ও পতাকা ফেলে রেখে ওস্তাদ আলিকুলির প্রস্তর গোলা নিক্ষেপ দেখার আমোদ উপভোগ করতে সেই দিকে চলে আসি। এই গোলা নিক্ষেপে কোন ফল লাভ হলো না, কারণ কামান ঠিক জায়গায় বসানোর স্থান পাওয়া যায়নি। তাছাড়া দুর্গ দেওয়াল আগা গোড়া পাথরে তৈরী থাকায় খুবই মজবুত ছিল।

চন্দেরি দুর্গ পাহাড়ের উপর অবস্থিত, একথা আগেই বলা হয়েছে। এই পাহাড়ের একপাশে নীচ দিয়ে দুই দেওয়াল ঘেরা রাস্তা (দুতাহি) গিয়েছে জলাশয় পর্য্যন্ত। আমাদের আক্রমণ চালানোর এই একটি প্রধান স্থান। এই জায়গাটি আমার দক্ষিণ ও বাম দিকের এবং কেন্দ্রের রাজকীয় সৈন্যদের প্রধান ঘাটি বলে স্থির করা হয়েছিল। যদিও প্রত্যেক দিক থেকেই আক্রমণ সুরু হয়েছিল তবুও বেশী ধাক্কা এইখানেই সহ্য করতে হয়েছিল। আমাদের সাহসী সৈন্যরা পৃষ্টপ্রদর্শন করেনি. যতই না বিধর্ম্মীরা এদের ওপর প্রস্তর এবং জ্বলন্ত আগুন নিক্ষেপ করুক। অবশেষে সা মহম্মদ ইয়ুজ বেগি 'দুতাহি' প্রাচীর —যেখানে বহির্দুর্গের দেওয়াল ছুঁয়েছে-সেই প্রাচীরের উপর উঠে দাঁড়ালো। আমার সাহসী সৈন্যেরাও দলে দলে নানা স্থানে গিয়ে হাজির হলো এবং এই ভাবে 'দুতাহি' দখল হয়ে গেল। এই সব ঘটনা ঘটে গেলেও বিধর্ম্মীরা কোনও বাধা দিল না। যখন আমাদের দলের লোক দুর্গ প্রাচীরের ওপব ভিড় করলো তারা দ্রুত পালিয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা বেরিয়ে এলো সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে এবং যুদ্ধ আরম্ভ করে আমাদের অনেক সৈন্যকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য করলো। তারা দুর্গ প্রাচীরের ওপর দিয়েই তাদের তাড়িয়ে এনে কতক লোককে কেটে হত্যা করলো। তারা কেন প্রাচীর থেকে সহসা প্রথমে সরে গিয়েছিল, তার কারণ হয়তো এই যে—পরাজিত হতে হবে এই আশঙ্কায় মরিয়া হয়ে যারা জীবন উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা করে তারাও হয়তো তাই করেছিল। তারা দুর্গের ভিতর গিয়ে সমস্ত মহিলা ও সুন্দরীদের হত্যা করে তারপরে নিজেদেরও মৃত্যু বরণ করতে হবে এই কথা ভেবে নিয়ে নগ্ন দেহে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে আসে। আমাদের লোকেরা নিজ নিজ ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে তাদের প্রত্যেককে আক্রমণ করে তাদের প্রাচীরের ওপর থেকে বিতাড়িত করলে তাদের মধ্যে দুই তিন শ' লোক মেদিনী রায়ের আবাসে প্রবেশ করে এবং

সেখানে তারা প্রায় সকলেই পরস্পরকে এই ভাবে হত্যা করে। একজন তরবারি হাতে নিয়ে দাঁড়ায়, আর অন্যান্যরা তরবারির আঘাতের জন্য আগ্রহ করে গলা বাড়িয়ে দেয়। এইভাবে তাদের অনেকেই নরকে গমন করে।

আল্লার দয়ায় এই প্রসিদ্ধ দুর্গটি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমার দখলে চলে আসে। কোনও রণবাদ্য বাজলো না। কোনও পতাকা উড়লো না। কোনও গুরুতর হাতাহাতি সংগ্রামও হলো না। বিধর্মীদের শির দিয়ে একটি স্তম্ভ তৈরী করে চান্দেরির উত্তর পশ্চিম দিকের পাহাড়ে স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হলো। এই শত্রু দুর্গ জয় করার তারিখ পাওয়া গেল এই কথাগুলির মধ্যে 'ফথ-ই-ইদর-উল-হব' (৯৩৪)। আমি তখন এই কবিতাটি রচনা করি।

'শত্রুর আবাস ছিল—চান্দিরি,
বিধর্মীতে পূর্ণ ছিল—এই পুরী।
যুদ্ধ জয়ে এই দুর্গ অধিকারে এলো,
'ফথ-ই-ইদর-উল হব' জয়ের তারিখ হলো।'

চান্দেরি জায়গাটি বেশ ভাল, কারণ এর ধারে কাছে কয়েকটি জলাশয় আছে। দুর্গটি একটি পাহাড়ের ওপর। দুর্গের ভিতরে কঠিন পাথর খোদাই করা একটি জলাধার। 'দুতাহির' (দুই দেওয়ালে ঘেরা পথ) প্রান্তভাগে যেখানে আক্রমণ চালিয়ে আমরা দুর্গ অধিকার করি, একটি বড় জলাশয় আছে। চান্দেরির ছোট বড় সমস্ত বাড়ী পাথরে তৈরী। ধনীদের বাড়ী সযত্নে খোদাই করা পাথর দিয়ে আর নিম্নশ্রেণীর লোকদের বাড়ীর পাথর অমন সুন্দর করে কাটা নয়। বাড়ীগুলির ছাতও মাটির টালির পরিবর্তে পাথরের চাপড়া দিয়ে ঢাকা। দুর্গের সামনে তিনটি বড় পুষ্করিণী। এগুলি পূর্ব্বতন শাসকরা আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে উঁচু জমির ওপর তৈরি করেছিল। এখান থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে বেতওয়া নামে একটি ছোট্ট নদী আছে। হিন্দুস্থানে এই নদীর জল অত্যন্ত সুপেয় বলে খ্যাতি আছে। এই নদীটি সত্যই বেশ সুন্দর। নদীর জলের তলে খণ্ড খণ্ড পাথর আছে—যা দিয়ে ঘর তৈরী করা যায়। চান্দেরি আগ্রার দক্ষিণ দিকে হাঁটা পথে নব্বই ক্রোশ দূরে। চান্দেরি উত্তর অক্ষাংশের পঁচিশ ডিগ্রিতে অবস্থিত।

প্রথম জুমাদা মাসের ৮ই তারিখ বৃহস্পতিবার (৩০শে জানুয়ারি) আমরা দুর্গের চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে মোল্লা খাঁয়ের পুষ্করিণীর ধারে এসে ঘোড়া থেকে নামি। চান্দেরি অভিযানে আমার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল যে, চান্দেরি জয়ের

পর আমরা বিধর্ম্মী অধ্যুষিত ভূমি রায় সিং, ভিলসাই এবং সারংপুর অভিযানে যাব। এইগুলি বিধর্ম্মী সালা উদ্দির অধীনস্ত রাজ্য। এইগুলি জয়ের পর রাণা সঙ্গর বিরুদ্ধে চিতোরের দিকে অগ্রসর হওয়ারও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত খারাপ সংবাদ আসায় বেগদের আহ্বান করে তাদের সঙ্গে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যই প্রথমে ব্যবস্থা করা উচিত। সুলতান নাসিরুদ্দিনের পৌত্র আমেদ সাকে চান্দেরির ভার অর্পণ করা হলো—সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিল্লীর কোষাগারে সরাসরি পাঠাতে হবে। মোল্লা আসকারকে সৈন্য বিভাগের অধিনায়ক করে তাকে দুই তিন হাজার তুর্কি ও হিন্দুস্থানি ফৌজ দিয়ে তার সেনাবল বৃদ্ধির জন্য বলা হলো।

এখানকার কাজ সমাপ্ত করে মোল্লা খাঁর পুষ্করিণীর ধার থেকে প্রথম জুমাদা মাসের ১১ তারিখ রবিবার উত্তর দিকে ফিরবার ইচ্ছা নিয়ে রওনা হলাম ও বুরহানপুর নদীর তীরে এসে থামলাম।

এই রবিবারেই ইয়াকুব খাজা ও জাফর খাজাকে কাল্পি থেকে নৌকা কানারের রাস্তার কাছে আনার জন্য বন্দির থেকে পাঠানো হলো।

এই মাসের ২৪শে তারিখ শনিবার কানারের পথের ধারে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামি। তারপর সৈন্যদলকে নদী পার হতে আদেশ দেওয়া হয়।

এই সময় সংবাদ আসে যে সৈন্যদলকে আগে পাঠানো হয় তারা কনোজও ত্যাগ করেছে এবং রাপরিতে এসেছে। শত্রুপক্ষের একটি সুদৃঢ় দল সামসাবাদও অধিকার করেছে যদিও আবুল মহম্মদ নিশ্চয়ই এ স্থান সুরক্ষিত করেছিল। সৈন্যদলের নদী পার হতে প্রায় তিন চারদিন দেরী হয়ে গেল। নদী পার হওয়া শেষ হলেই আমরা কনোজের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হই এবং একদল সাহসী সৈন্যকে শত্রুপক্ষের সংবাদ আনার জন্য আগেই পাঠিয়ে দিই। কনোজ থেকে কিছু দূরে যখন আমরা পৌঁছাই তখন সংবাদ পাওয়া গেল যে আমাদের সংবাদ সংগ্রহকারী দলের কালো ছায়া দেখেই মারুফের পুত্র পালিয়ে দূরে চলে যায়। বিচন, বেজিদ ও মারুফ আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে গঙ্গা পার হয়ে কনোজের বিপরীত দিকে পূর্ব্ব তীরে আমাদের রাস্তা বন্ধ করবে বলে ঘাঁটি স্থাপন করে।

শেষ জুমাদা মাসের ৬ই তারিখ বৃহস্পতিবার আমরা কনোজ অতিক্রম করে গঙ্গা নদীর পশ্চিম পারে এসে অবতরণ করি। আমাদের কয়েকজন সাহসী

লোক নদীর উজান ও ভাটিতে যাতায়াত করে জোর করে ত্রিশ চল্লিশটি নৌকা নিয়ে আসে। ভেলা প্রস্তুতকারক, মির মহম্মদকে একটি সাঁকো তৈরী করার উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করতে এবং সাঁকোর জন্য জিনিষপত্র সংগ্রহ করতে পাঠানো হয়। সে একটি স্থান নির্ব্বাচন করে ফিরে আসে। স্থানটি আমাদের শিবির থেকে মাইল খানেক দূরে। উৎসাহী ওভারসিয়ারদের সেতু তৈরীর কাজে নিযুক্ত করা হয়। ওস্তাদ আলি কুলি তার কামান যেখানে সেতু তৈরী হবে তারই কাছাকাছি জায়গায় স্থাপন করে গোলা নিক্ষেপের কাজে উৎসাহী হয়ে উঠলো।

বাবা সুলতান ও দরবেশ সুলতান দশ পনেরো জন লোককে সঙ্গে নিয়ে সান্ধ্য নমাজের সময় নৌকায় পার হয়ে যায়। তাদের এভাবে যাওয়ার কোনও উদ্দেশ্যই ছিলনা। তারা সেখানে যুদ্ধ কিংবা আর কিছুই না করে পুনরায় ফিরে আসে। তাদের নদী পার হওয়ার জন্য আমি তিরস্কার করি। মালিক কাসিম মজিদ এবং অল্প সংখ্যক লোক দুই একবার নৌকায় ওপারে যায় এবং সেখানে শত্রুর দলের সঙ্গে সজ্ঘর্ষে প্রশংসাজনক কাজ করে। যেখানে সেতু তৈরী হচ্ছিল তারই নীচে নদীর মধ্য চর ভূমিতে একটি ছোট কামান স্থাপন করে গোলা বর্ষণ সুরু করা হয়। সেতুর চেয়েও উঁচু আত্মরক্ষার জন্য একটি মাটির বাঁধ তৈরী করে তার আড়াল থেকে গোলন্দাজগণ নিশানা করে কামান চালাচ্ছিল। অবশেষে মালিক কাসিম কয়েকজন অনুচর সহ শত্রুপক্ষের একটি দলকে পরাস্ত করে বিশ্বাসের আতিশয্যে তাদের হত্যা করতে করতে তাদের শিবির পর্য্যন্ত অনুসরণ করে। শত্রুরা অত্যন্ত দ্রুতবেগে একটি হাতি নিয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে এসে তাকে আক্রমণ করে। তার সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে' তাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসে নৌকায় চড়তে বাধ্য করে। কিন্তু নৌকায় চড়ে পালাবার আগেই হাতী এসে সেই নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এই ঘটনায় মালিক কাসিম মারা যায়। যে কয়দিন সেতু তৈরী হচ্ছিল, ওস্তাদ আলি কুলি খুব সুষ্ঠু ভাবে তার কামান চালায়। প্রথম দিনে আটবার, দ্বিতীয় দিনে ষোলোবার, তারপর তিন চার দিন সে এই ভাবেই গোলা চালিয়ে যায়। যে কামান সে চালাচ্ছিল—তার নাম দিগ্‌গজি অর্থাৎ বিজয়ী কামান। এটা সেই কামান যে কামান বিধর্ম্মী সঙ্গর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। সেই জন্যই কামানের ঐ নামকরণ করা হয়েছিল। এর চেয়েও আরও একটি বড় কামান স্থাপন করা হয়ে ছিল কিন্তু সেটা প্রথমেই আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেটে

যায়! গোলন্দাজগণ গোলা বর্ষণের কাজ পারদর্শিতার সঙ্গে চালাতে থাকে। অন্যান্যদের সঙ্গে তারা সম্রাটের দুইজন ক্রীতদাস যারা কাজ করছিল এবং ঘোড়া সহ কয়েকজন পথিককেও বধ করে।

সেতু নির্ম্মাণের কাজ প্রায় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি দ্বিতীয় জুমাদা মাসের ১৯শে তারিখ বুধবার (১১ই মার্চ), সেতুর অপর প্রান্তে এসে শিবির স্থাপনের জন্য তৈরী হই। আফগানরা গঙ্গার ওপর আমাদের সেতু তৈরী করার চেষ্টাকে একটা কৌতুককর ব্যাপার বলে মনে করে এবং এটাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। ১১ই মার্চ বুধবার সেতু নির্ম্মাণের কাজ শেষ হলে আমাদের কিছু পদাতিক ও লাহোরি সৈন্য সেতুপার হয়ে এলে শত্রুদের সঙ্গে একটা ছোটখাটো সঙ্ঘর্ষ হয়। শুক্রবার আমার নিজস্ব শিবিরের সৈন্য, আমার বাছাই করা সৈন্য এবং পদাতিক সৈন্য নদী পার হয়ে আসে। আফগানরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অশ্বারোহণ করে হাতী নিয়ে অগ্রসর হয়ে আমার সৈন্যদের আক্রমণ করে। এক সময় তারা আমার বাম ভাগের সৈন্যদের মনে যুদ্ধ জয় করছে এরূপ একটা ধারণা জন্মিয়ে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু কেন্দ্রের এবং দক্ষিণ দিকের সৈন্যরা অবিচলিতভাবে তাদের ঘাঁটিতে অবস্থান করে এবং অবশেষে তারা শত্রু সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে বিতাড়িত করে। দুইজন প্রচণ্ড আবেগের বশে চালিত হয়ে দলছাড়া হয়ে এগিয়ে যায়। তাদের এক জনকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে শত্রুপক্ষ সেই স্থানেই বধ করে। আর একজন এবং তার ঘোড়াটিও দেহের নানাস্থানে আঘাত পায়। এই ঘোড়াটি ছিল দুর্বল ও রুগ্ন। কোনও রকমে উদ্ধার পেয়ে নিজ ঘাটির মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েই মাটিতে পড়ে যায়।

সেইদিন সাত আটটি দেহচ্যুত শির আমার কাছে আনা হয়। শত্রুপক্ষের অনেকেই তীরে এবং বন্দুকের গুলিতে আহত হয়। অপরাহ্ন নমাজের সময় পর্য্যন্ত সঙ্ঘর্ষ প্রবলভাবে চলতে থাকে। সারা রাত্রি ধরে সেতুর উপর দিয়ে যারা নদীর অপর পারে ছিল তাদের নিয়ে আসা হয়। যদি সেই শুক্রবার সন্ধ্যায় আমার অবশিষ্ট সৈন্যকে এপারে আনা যেত তাহলে হয়তো শত্রুপক্ষের সকলকেই আমাদের হাতে পড়তে হতো। কিন্তু আমার মনে এই খেয়াল চেপেছিল যে—গত বৎসর নববর্ষের দিনে আমি সিক্রি থেকে সঙ্গর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলাম—সে দিনটা ছিল মঙ্গলবার এবং আমার শত্রুকে শনিবার দিন পরাভূত করি। এই বৎসরও ঠিক নববর্ষের দিনই এই শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করায়

জন্য যাত্রা করি—সে দিন ছিল বুধবার। যদি তাদের রবিবারে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারি তাহলে এই দুই যুদ্ধের ব্যাপারে দিন হিসাবে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য থাকবে। সেই জন্যই আমি সৈন্য চালনা করতে বিলম্ব করেছিলাম।

১৪ই মার্চ শনিবার শত্রুপক্ষ কোনও সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয় নাই। তারা দূরে শ্রেণীবদ্ধভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অবস্থান করছিল। সেই দিনই গোলন্দাজ বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার এবং পরদিন সকালেই সৈন্য দলকে সেতু পার হওয়ার আদেশ দিই। প্রভাতী ডঙ্কা বাজার সময় অগ্রগামী প্রহরীদের কাছ থেকে সংবাদ এলো যে শত্রুরা পালিয়েছে। আমি চিন্ তাইমুর সুলতানকে শত্রুপক্ষের সন্ধানের জন্য সৈন্য দলের পুরোভাগে যেতে আদেশ করি এবং মহম্মদ আলি জং জং, হুসেনুদ্দিন আলি খলিফা, মুজিব আলি খলিফা, কোকি বাবা কাস্কে, দোস্ত মহম্মদ বাবা কাস্কে এবং কিজিলকে তার সঙ্গে দিয়ে তাদের এই নির্দেশ দিই— যেন তারা শত্রুপক্ষের পিছনে ধাওয়া করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলে এবং আমার এই আদেশ যেন তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

সকাল বেলার নমাজের সময় আমিও পার হয়ে আসি। নদীর ভাটিতে যেখানে জল কম, এমন একটা জায়গার সন্ধান করে সেখান দিয়ে উটগুলোকে পার করে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়। রবিবার দিন বেঙ্গারমনের এক ক্রোশ দূরে একটা জলাশয়ের ধারে শিবির ফেলি। শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে যে দলকে পাঠাই, তারা মোটেই তাদের কাজে সফল হতে পারে না। তারাও এই জায়গাতেই এসে থেমেছিল এবং সেই দিনই (রবিবার) দুপুরের নমাজের সময় সেখান থেকে আবার যাত্রা করি। পরদিন সকালে বেঙ্গারমনের সম্মুখে একটা পুকুরের পাড়ে এসে শিবির স্থাপন করি। সেই দিনই আমার মাতুল ছোটখাঁয়ের পুত্র তুখ্‌তে বুঘা সুলতান আমার সঙ্গে দেখা করে। শেষ জুমাদা মাসের ২৯শে তারিখ শনিবার (২১শে মার্চ) আমি লক্ষ্মৌ পৌঁছাই এবং স্থানটি পর্য্যবেক্ষণ করে গোমতি নদী পার হয়ে শিবির স্থাপন করি। *সেই দিনই গোমতি নদীতে স্নান করি। জানিনা, কি কারণে, আমার কানে জল ঢোকার জন্যই হোক, না হয় ঠাণ্ডা লাগার জন্যই হোক আমার ডান কানে শুনতে পাচ্ছিলাম না—যদিও সেটা খুব কষ্ট দেয়নি।

আমরা তখনও অযোধ্যা থেকে কিছুদূরে ছিলাম (অযোধ্যা নগরী গোগরা নদীর দক্ষিণ তীরে, গোগরা ও সরযূ নদীর সঙ্গম স্থানের কিছু ভাটিতে অবস্থিত)। সেই সময় চিন্ তাইমুর সুলতানের নিকট থেকে একটা দূত এই

বার্ত্তা নিয়ে আসে যে শত্রুরা সরযূ নদীর অপর তীরে শিবির স্থাপন করেছে এবং সে তার সৈন্যদল পুষ্ট করার জন্য আরও সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছে। তার সাহায্যের জন্য কেন্দ্র ভাগের সৈন্যদের মধ্যে কাজাকের অধিনায়কত্বে এক হাজার বাছাই করা সৈন্য পাঠাই। রজব মাসের ৭ই তারিখ শনিবার (২৮শে মার্চ) গোগরা ও সরযূর সঙ্গমস্থলে অযোধ্যার দুই তিন ক্রোশ ওপরের দিকে শিবির স্থাপন করি। সেই দিন পর্য্যন্ত অযোধ্যার অদূরে সরযূ নদীর অপর পারে সেখ বেজিদ ঘাঁটি করে ছিল। সে আপোষ প্রস্তাব করে সুলতানের কাছে একটা চিঠি লেখে। সুলতান তার কপটতা বুঝতে পেরে মধ্যাহ্নে নমাজের সময় একজন লোককে কাজাকের কাছে পাঠায় তাকে সাহায্য করার জন্য এবং নদীর অপর পারে যাওয়ার জন্য আয়োজন করতে থাকে। কাজাক সাহায্যের জন্য তার সঙ্গে মিলিত হলে তারা কাল বিলম্ব না করে নদী পার হয়ে যায়। অপর পক্ষের পনেরোটি ঘোড়া ও তিন চারটি হাতি ছিল। কিন্তু তারা তাদের ঘাঁটি রক্ষা করতে না পেরে পালাতে শুরু করে। আমার লোকেরা তাদের কয়েকজনকে ধরে মাথা কেটে ফেলে এবং সেই মাথাগুলো আমার কাছে পাঠায়। সুলতান নদী পার হওয়ার পরই বেয়ান্ ফ সুলতান, তারাদ বেগ, কুচ বেগ, বাবা চিরে ও বাকি সাঘাওয়েল নদী পার হয়ে যায়। যারা প্রথমে নদী পার হয় তারা সান্ধ্য নমাজের সময় পর্য্যন্ত সেখ বেজিদের পেছন পেছন ধাওয়া করে। সে সেই সময়ে একটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে বন্দী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। চিন্ তাইমুর সুলতান সেইরাত্রে একটা জলাশয়ের ধারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এবং মধ্যরাত্রে আবার শত্রুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। চল্লিশ ক্রোশ ধাওয়া করার পর সে এক জায়গায় এসে বুঝতে পারে যে শত্রুপক্ষের পরিবার ও অনুচরবর্গ সেখানেই ছিল, কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই দ্রুত বেগে পালিয়েছে। হালকা বাহিনী নানা দলে বিভক্ত হয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়লো। বাকি সাঘাওয়াল এক ডিভিসন সৈন্য নিয়ে অনুসরণ করতে করতে শত্রুপক্ষের কাছা-কাছি এসে তাদের পরিবারবর্গ ও অনুচরদের ধরে ফেলে এবং কয়েকজন আফগানকে বন্দী করে।

অযোধ্যার এবং নিকটবর্ত্তী দেশগুলি শাসনের বিধি ব্যবস্থা করবার জন্য ঐ স্থানে কিছুদিন অবস্থান করি। (অযোধ্যার সাতআট ক্রোশ ওপরের দিকে সরযূ নদীর তীরে একটি বিখ্যাত শিকারের স্থান আছে।) আমি গোগরা ও সরযূ নদী পার হওয়ার উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য মির মহম্মদ জালেকবানকে পাঠাই

এবং সে নদী পার হওয়ার জায়গা স্থির করে আসে। ১২ই তারিখ বৃহস্পতিবার, (২রা এপ্রিল) শিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

[এই বৎসরের অর্থাৎ হিজ্‌রি ৯৩৫ সালের (ইংরাজী ৩রা এপ্রিল থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) আর কোনও ঘটনা কোথাও লিপিবদ্ধ দেখা যায় না। এমন কি ভারতীয় ঐতিহাসিকগণও এ বিষয়ে কোনও রূপ আলোকপাত করতে পারেন নি।]

মহরম মাসের ৩রা তারিখ শুক্রবার (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৫২৮) আসকারি (বাবরের তৃতীয় পুত্র, বয়স ১০ এবং মুলতানের গভর্ণর) এসে পৌঁছায়। তাকে চান্দেরি অভিযানের পূর্ব্বেই মুলতানের ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আগেই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তার সঙ্গে আমার নিজের কক্ষে দেখা করি।

ইউনুস আলির বিশেষ বন্ধু—ঐতিহাসিক খন্দ আমির, হেঁয়ালীকার মৌলনা সাহেব, কানুন বাদক (কানুন—একরকম তারের বাদ্যযন্ত্র) মির ইব্রাহিম অনেক দিন পূর্ব্বেই আমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য হেরি থেকে এসেছেন। পরদিন সকালে তাঁরা আমার সাক্ষাৎ করলেন।

এই মাসের ৫ই তারিখ, রবিবার (সেপ্টম্বর—২০) গোয়ালিয়ার পরিদর্শনের জন্য যমুনা নদী পার হয়ে আগ্রা দুর্গে প্রবেশ করি। সেখানে ফকর-জাহান বেগম ও খাদিজা-বেগমের সঙ্গে দেখা করি। তাঁদের দুই তিন দিনের মধ্যেই কাবুলে যাওয়ার কথা। তাঁদের নিকট বিদায় গ্রহণ করে আমি যাত্রা সুরু করি। মহম্মদ জেমান মির্জা আমার কাছে অনুমতি নিয়ে আগ্রাতেই থেকে যায়। সন্ধ্যায় চার পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে আমি একটি বড়পুকুরের ধারে রাত্রি যাপন করি। পরদিন ভোরের নমাজ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সেরে নিয়ে আবার রওনা হই। দুপুর বেলাটা গাম্বির নদীর তীরে কাটিয়ে সেখানে মধ্যাহ্ন নমাজ সমাপন করে আবার বেরিয়ে পড়ি।

মোল্লা রাফা আমার শারীরিক বলরক্ষার জন্য যে ঔষধ তৈরী করেছিল ও যেটা আমি আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম সেই ওষুধ তালকানে এসে খাই। পথে উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করতে করতে এগুতে হচ্ছিল এবং সেজন্য বিশেষ ক্লান্তি বোধ করছিলাম। আমার শারীরিক গ্লানি দূর করার জন্য মোল্লা রাফার গুঁড়ো ওষুধ খেতে হয়। ওষুধটা খেতে বিস্বাদ এবং বমির ভাব এনে দেয়।

ঢোলপুরের একক্রোশ মধ্যে যে জায়গায় আমি একটি উদ্যান ও প্রাসাদ তৈরীর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম সেটা একটা পাহাড়েরে গায়ে। আমি সেইখানে অপরাহ্ন নমাজের সময় এসে যাই। পাহাড়ের প্রান্তে কালো শক্ত পাথরে ছাওয়া একটা খাড়াই। আমি সেই পাহাড় কেটে সমতল করবার জন্য আদেশ দিয়েছিলাম। একটা শক্ত প্রশস্ত প্রস্তর খণ্ড পাওয়া গেলে তা দিয়ে যদি একটি কক্ষ খোদাই করা সম্ভব হয় তাহলে সেই ভাবে সেইটি করা এবং যদি পাথরের গভীরতা বেশী না হয় তাহলে পাথর কেটে ফেলে সমতল করে সেখানে একটি পুকুর খনন করতে নির্দেশ দিই। পাহাড়ে খুব উঁচু পাথর না পাওয়ার একটা বড় পাথরে ঘর খোদাই করা সম্ভব হলো না। সেইজন্য আমার পাথর খোদাইকার ওস্তাদ সা মহম্মদকে একটি আটকোণা ঢাকা জলাধার—সমতল করা পাথরের পাটাতনের ওপর তৈরী করতে আদেশ দিই। পাথর খোদাইকারদের বিশ্রাম না নিয়ে একটানা এই কাজ করতে বলা হয়। যে জায়গায় আস্ত পাথর খোদাই করে জলাধার নির্ম্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করি, সেখানে অনেকগুলো আম, জাম এবং আরও নানারকমের গাছ আছে। এই গাছগুলোর মাঝখানে দশ হাত লম্বা দশ হাত চওড়া একটি ইঁদারা খনন করতে আদেশ দিই এবং এ কাজ প্রায় শেষ হয়। যে জলাধারের কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে এই ইঁদারা থেকে জল ঢোকানোর ব্যবস্থা করা হয়। এই ইঁদারার উত্তর-পশ্চিম কোণে সুলতান সিকদার একটি উঁচু স্তূপ খাড়া করে তার উপর কয়েকটি ঘর নির্ম্মান করে। স্তূপের মাথায় বর্ষার জল সঞ্চিত হয়ে একটা বড় পুষ্করিণী তৈরী হয়ে যায়। এই পুকুরটি একটি পাহাড়ে ঘেরা এবং পূর্ব্বে একটি উদ্যান। আমি আদেশ দিই যে বিশ্রামের জন্য পুকুরের পূব দিকে আস্ত পাথর কেটে একটা পাটাতন এবং কতকগুলো বসবার আসন যেন তৈরী করা হয়। পশ্চিম দিকে একটি মসজিদ তৈরীরও নির্দেশ দিই।

মঙ্গল ও বুধবার সমস্ত দিন এইসব কাজের তদারক ও নির্দেশ দেওয়ার জন্য এইখানে অবস্থান করি। বৃহস্পতিবার আবার রওনা হয়ে চম্বল নদী পার হই। দুপুরের নমাজের সময়টা আমি নদী তীরেই কাটাই এবং তারপর দুপুর ও বিকেলের নমাজের মাঝামাঝি সময় আবার ঘোড়ায় চড়ে নদী তীর ছেড়ে যাই। সন্ধ্যা ও রাতের নমাজের সময়ের মধ্যে কাওয়ারি নদী পার হয়ে বিশ্রামের জন্য থামি। বৃষ্টিতে নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় ঘোড়াগুলোকে

সাঁতারিয়ে পার করানো হয়। আমরা নৌকোয় পার হই। পরদিন সকালে মহরম মাসের ১০ই তারিখ শুক্রবার ইদ-এ-আসুরা (উপবাসের দিন) উদযাপন করে আবার যাত্রা সুরু করি। দুপুর বেলাটা একটা গ্রাম্য রাস্তার ওপর কাটাই। রাতের নমাজের সময় চারবাগে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামি।

চারবাগ উদ্যানটি গোয়ালিয়রের এক ক্রোশ উত্তরে। গত বৎসর এই উদ্যান রচনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। পরদিন সকালে দুপুরের নমাজের আগেই আবার রওনা হই এবং উঁচু ঢিপির দিকে অগ্রসর হই। (থর্ণটনের গেজেটিয়ারে আছে—এই উঁচু ঢিপিটি উত্তর দিকে মোচার আকারের একটা পাহাড়—আর চার ধার ঘিরে আছে চমৎকার পাথরের অট্টালিকা—যেটা নিঃসন্দেহে একটি হিন্দু-মন্দির)। এই স্থানটি গোয়ালিয়রের উত্তরে। জায়গাটি, মন্দির এবং উপাসনা-গৃহ দেখে আমি 'হাতিপুল' ফটক দিয়ে গোয়ালিয়রে প্রবেশ করি। সেটা মান্‌সিংয়ের প্রসাদ সংলগ্ন। [হাতিয়াপুর—উত্তর পূর্ব্ব দিকের ছয়টি ফটকের মধ্যে একটি। এই ফটক মানসিং (১৪৮৮—১৫২১) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।] সেখান থেকে বিক্রমজিতের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হই। এইখানে রহিমদাদ বাস করতেন। বিকেলের নমাজের সময় আমি এখানে পৌছাই। সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে আমার কানের ব্যথার জন্য একটু আফিং খাই। (ভারতবাসী এবং পারশ্যবাসীদের ধারণা--চাঁদের আলো শীতল। ভারতবাসীদের জ্যোৎস্নাহত হওয়ার বিশেষ ভীতি আছে। তাদের ধারণা আফিং খেলে এর কুফল দূর হয়)।

পরদিন সকালে আফিং খাওয়ার প্রতিক্রিয়া প্রবল হয়। আমি অনেকখানি বমি করে ফেলি। এই অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি মানসিং ও বিক্রমজিতের প্রাসাদগুলি ঘুরে ঘুরে দেখি। এই প্রসাদগুলি বিচ্ছিন্ন ও অবিন্যস্তভাবে নির্ম্মিত হলেও খুবই সুন্দর। প্রসাদগুলি খোদাই করা পাথরে তৈরী। মান্‌সিংয়ের প্রাসাদ অন্য রাজার প্রাসাদের চেয়ে অনেক বেশী উঁচু ও সুন্দর।

মানসিংয়ের প্রাসাদের একটা দেওয়ালের অংশ পূর্ব্বমুখী। এই দেওয়ালটি অবশিষ্ট দেওয়ালের চেয়ে বেশী কারুকার্য্যময়। এর উচ্চতা ৪০।৫০ গজ ও খোদাই পাথরে তৈরী। সম্মুখ ভাগে সাদা চুন বালির আস্তরণ। প্রাসাদটি অনেক জায়গায় চারতলা। নীচের দুইতলা খুব অন্ধকার, কিন্তু কিছুক্ষণ বসবার পর অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে এবং সব জিনিষ পরিষ্কার দেখা যায়। আমি এই সব জায়গা একটা আলো সঙ্গে নিয়ে ঘুরে দেখি। প্রাসাদের একদিকে

পাঁচটি গম্বুজ তামার পাতে মোড়া। দেওয়ালগুলির বহির্ভাগ সবুজ রংয়ের টালি দিয়ে ঢাকা। সমস্ত দিকের প্রাচীরই কলাগাছের ছবি আঁকা টালি দিয়ে সজ্জিত।

পূর্ব দিকের উঁচু বুরুজের নীচেই হাতিপুল। ভারতীয়রা হস্তীকে বলে হাতি, আর পুল মানে ফটক। এই ফটকের বাহিরে একটি হাতির মূর্ত্তি, তার পিঠের ওপর দুইটি মাহুতের মূর্ত্তি। হাতির মূর্ত্তিটি দেখতে ঠিক জীবন্ত হাতির মত। এই জন্যই একে হাতিপুল বলা হয়। মানসিংয়ের চারতলা প্রাসাদের নীচতলার একটি জানালা হাতির মূর্ত্তির নিকটেই; সেই জানালা দিয়ে সরাসরি এই মূর্ত্তি দেখা যায়। উপরতলায় পূর্ব্ববর্ণিত গম্বুজের মত ঐ একই রকমের ছোট গম্বুজ আছে। তিনতলাতে বসবার কক্ষ। চার তলা থেকে নীচের তলাগুলিতে আসা যায়। নীচের তলাটি মাটির নীচে। এই প্রাসাদ নির্ম্মাণে হিন্দুস্থানের সমস্ত উদ্ভাবনী কৌশল ব্যয় করা হয়েছে। এর কক্ষগুলিও অস্বাচ্ছন্দ্যকর নয়।

মানসিংয়ের পুত্র বিক্রমজিতের প্রাসাদ দুর্গের উত্তর দিকে একটি খোলা জমির মাঝখানে। পুত্রের প্রাসাদের কিন্তু পিতার প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা চলে না। প্রাসাদে একটি বড় গম্বুজ, কিন্তু তার নীচে অত্যন্ত অন্ধকার, যদিও কিছুক্ষণ থাকলে চেষ্টা করে কিছু কিছু দেখা যায়। বড় গম্বুজের নীচে একটি ছোট কক্ষ —তাতে কোন দিক থেকেই আলো প্রবেশ করে না। রহিমদাদ যখন বিক্রমজিতের প্রাসাদ তাঁর বাসস্থান ঠিক করেন, সেই সময় এই গম্বুজের ওপর একটি পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন। বিক্রমজিতের প্রাসাদ থেকে তার পিতার প্রাসাদে যাওয়ার জন্য একটি গুপ্ত পথ আছে। সে পথ বাহির দিক থেকে চোখে পড়ে না। এমন কি প্রাসাদে ঢুকলেও কোন্ দিকে সেই গুপ্ত পথ তাও বোঝা যায় না। কতক জায়গা দিয়ে সেই গুপ্ত পথে আলো প্রবেশ করে। এই পথটি সত্যই অসাধারণ।

প্রাসাদগুলো দেখে আমি আবার ঘোড়ায় চড়ে রহিমদাদ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাভবন দেখতে যাই। দুর্গের দক্ষিণে পুকুরের ধারে তিনি যে উদ্যান রচনা করেছিলেন সেটা ঘুরে দেখে আমি অনেক দেরীতে চারবাগে পৌঁছাই। এইখানে আমার অনুচরবর্গ শিবির ফেলেছিল। চারবাগে অনেক রকমের ফুল—বিশেষ করে অসংখ্য মনোরম রক্তকরবী। গোয়ালিয়রের করবী সুন্দর লাল রংয়ের। আমি কয়েকটি লাল করবীর চারা এখান থেকে সংগ্রহ করে আগ্রার উদ্যানে রোপন করি। বাগানের দক্ষিণ দিকের পাহাড়ে একটি প্রকাণ্ড জলাধার। বর্ষার বৃষ্টিপাতে সেই জলাধারে জল জমে। জলাধারের পশ্চিমে একটি উঁচু

(দেব মন্দির। সুলতান সামসুদ্দিন আলতামাস এই মন্দিরের গা ঘেঁষে একটি সুন্দর মসজিদ তৈরী করেছিলেন।) দেব-মন্দিরটি সত্যিই খুব উঁচু। দুর্গ এলাকায় এইটিই সব চেয়ে উঁচু অট্টালিকা। ঢোলপুরের পাহাড় থেকে গোয়ালিয়র দুর্গ এবং এই মন্দির পরিষ্কার দেখা যায়। শোনা যায় এই মন্দির নির্মাণের সমস্ত পাথর বড় পুষ্করিণী খননের সময় সংগ্রহ করা হয়। এই ছোট উদ্যানে স্তম্ভের ওপর নির্মিত একটি দেওয়ালহীন মনোরম বৃহৎ কক্ষ। হিন্দুস্থানের রীতি অনুযায়ী তৈরী ফটকের সামনে বিশেষত্বহীন নীচু দরদালান।

পরদিন সকালে (২৮শে সেপ্টেম্বর) দুপুরের নমাজের সময় গোয়ালিয়রের যে সব জায়গা দেখি নাই তা দেখবার জন্য বের হলাম। মানসিংয়ের দুর্গের বাদিয়ে বুদালগার নামে প্রাসাদটিকে প্রথমে যাই। এই প্রাসাদ দেখে হাতিপুল ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে আদোয়া নামে একটি স্থান দেখতে গেলাম। 'আদোয়া' -দুর্গের পশ্চিম দিকের একটি উপত্যকা। যে প্রাচীরটি পাহাড়ের মাথা ঘিরে টানা হয়েছে, উপত্যকাটি তার বাহিরে হলেও একটির ভিতরে আর একটি এইরূপ দুইটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে উপত্যকার মুখ আবৃত। দেওয়ালগুলির উচ্চতা প্রায় ত্রিশ চল্লিশ গজ। ভিতরের প্রাচীরটি বেশী লম্বা ও উঁচু এবং এর দুই প্রান্ত দুর্গ দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত। এই প্রাচীরের মাঝামাঝি আর একটি নীচু প্রাচীর -কিন্তু সেটা তেমন প্রতিরোধ-ক্ষম নয়। জলাধারের দিকে যাওয়ার জন্য রাস্তার আবরণ হিসাবে এটি তৈরী হয়েছে। রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় একটি কূপ। উপর থেকে জল পর্য্যন্ত দশ পনেরোটি সিঁড়ি। রাস্তাটি বড় দুর্গ প্রাচীর থেকে আরম্ভ হয়ে ছোট প্রাচীরের মাঝামাঝি যে কূপটা আছে তার পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছে। ফটকের উপরে সুলতান সামসুদ্দিনের নাম খোদাই করা প্রস্তর ফলক। বৎসর লেখা আছে—৬৩০। বাহিরের দুর্গপ্রাচীরের নিকট একটি বড় পুকুর। এটা খুব ভাল পুকুর নয়। এর জল প্রায় শুকিয়ে যায়। নল দিয়ে পুকুরের জল দুর্গের মধ্যে নেওয়া যায়। আদোয়া উপত্যকার মাঝামাঝি আরও দুইটি বড় পুষ্করিণী। এখানকার লোকেরা এই দুইটি পুকুরের জলের খুব তারিফ করে। তিন দিকে খাড়া পাহাড়। পাথরের রং বিয়ানার পাথরের মত, যদিও ততটা লাল নয়—কিছু ফিকে। আদোয়ার ধারের পাহাড়ের কঠিন পাথর খোদাই করে ছোট ও বড় অনেক মূর্ত্তি তৈরী করা হয়েছে। পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে বিশ গজ লম্বা একটি বৃহৎ মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি একেবারে নগ্ন -এমন কি জননেন্দ্রিয় ঢাকার জন্যও

কোনও আবরণ নাই। আদোয়া উপত্যকার মধ্যের দুইটি পুষ্করিণীর চারদিকে কুড়ি পঁচিশটা কূপ এরা খনন করেছে। এরা অনেক গাছ ও ফুলের চারাও এখানে রোপন করেছে। এই জল দিয়েই গাছগুলিতে সেচের কাজ করা হয়। আদোয়া মোটেই খারাপ জায়গা নয়, বরং অত্যন্ত মনোরম স্থান। এর সব চেয়ে বড় দোষ হলো চারিদিকের দেবমূর্ত্তি।) (মূর্ত্তিগুলি ধ্বংস করার জন্য আমি আদেশ দিই।) আদোয়া থেকে দুর্গে ফিরে এসে আমি সুলতান পুলে যাই—যার দরজা বিধর্ম্মীদের আমল থেকে বন্ধ আছে। সন্ধ্যা নমাজের পর রহিমদাদের তৈরী উদ্যানে যাই। সেখানেই রাতটা কাটাই।

পরদিন মঙ্গলবার (২৯শে সেপ্টেম্বর) সঙ্গর দ্বিতীয় পুত্র বিক্রমজিতের কাছ থেকে এক পত্রবাহক এখানে আসে। সে আর তার মা পদ্মাবতী তখন রণথম্ভরে ছিল। আমার গোয়ালিয়র যাত্রার পূর্ব্বেই বিক্রমজিতের অতীব বিশ্বাসভাজন আশুক নামে একজন হিন্দু আমার কাছে দূত হিসাবে তার আনুগত্য ও বশ্যতার প্রস্তাব নিয়ে আসে। তার আশা এই যে, সে বাৎসরিক সত্তর লাখ টাকা বৃত্তি হিসাবে আমার কাছ থেকে পাবে। তখন একটি চুক্তি সম্পাদন হয় এবং ঠিক হয় যে সে রণথম্ভর দুর্গ আমাকে ছেড়ে দেবে। তার পরিবর্ত্তে তাকে এমন কতকগুলো পরগণা দেওয়া হবে—যার আয় সত্তর লক্ষ টাকা। এই ব্যবস্থা করে তার দূতকে ফিরে পাঠিয়ে দিই। যখন আমি গোয়ালিয়র পরিদর্শন করতে যাত্রা করি, তখনই তাকে গোয়ালিয়রে তার লোককে পাঠানোর জন্য জানিয়ে দিই। কিন্তু তারা ধার্য্য তারিখের কয়েকদিন পরে এখানে আসে। হিন্দু আশুক পদ্মাবতীর নিকট-আত্মীয়। সে বিক্রমজিতের মা ও বিক্রমজিৎকে সমস্ত কথাই বুঝিয়ে বলে। আশুকের মনোভাব তারা সমর্থন করে। তারা যথারীতি আমার বশ্যতা স্বীকার করে ও আমার প্রজাশ্রেণীর মধ্যে নিজেদের গণ্য করতে রাজি হয়। যখন রাণা সঙ্গ সুলতান মামুদকে পরাজিত ও বন্দী করে (১৫১৯) সেই সময় সুলতানের মাথায় যে মণি মাণিক্যখচিত মুকুট ও সোনার কোমরবন্ধ ছিল তা এই বিধর্ম্মীর হাতে পড়ে। সুলতান মামুদকে মুক্তি দেওয়ার সময় সে দুটি সে নিজে রেখে দেয়। এই জিনিষ দুটি বিক্রমজিতের কাছে ছিল। তার বড় ভাই রতনসেন পিতার উত্তরাধিকারী রূপে রাণা হয় এবং চিতোরের সিংহাসন অধিকার করে। সে তার ছোট ভাইয়ের কাছে লোক পাঠিয়ে এই ইচ্ছা জানায় যে, সে যেন ঐ জিনিষটি তাকে অর্পণ করে। কিন্তু বিক্রমজিত তাতে অস্বীকৃত হয়। যে লোকগুলিকে সে আমার কাছে পাঠায় তাদের সঙ্গে

সেই রাজমুকুট ও সোনার কোমরবন্ধ আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। তার অনুরোধ ছিল যেন রণতামভরের পরিবর্ত্তে তাকে বিয়ানার ভার দেওয়া হয়। আমি তাদের বিয়ানার দাবী প্রত্যাহার করিয়ে নিয়ে রণতামভরের সমতুল্য সামসাবাদ দেওয়া স্থির করি। এই দিনই আমি তাদের সম্মানসূচক পোষাক দান করে এবং নয় দিনের মধ্যে বিয়ানাতে আমার সঙ্গে দেখা করবার দিন ঠিক করে বিদায় দিই।

আমি বাগান থেকে গোয়ালিয়রের দেব মন্দিরগুলি দেখতে যাই। অনেকগুলি মন্দির দুই-তিন-তলা উঁচু। তবে প্রতি তলাই আগেকার রীতি অনুসারে নীচু নীচু। মন্দিরের নীচু অংশগুলিতে পাথরে-খোদাই-করা দেবমূর্ত্তি। চার দিকে অসংখ্য দেব-মন্দির—ঠিক বিদ্যাভবনের কক্ষগুলির মত। সম্মুখে একটি বড় ও উঁচু গম্বুজবিশিষ্ট অট্টালিকা। এর কক্ষগুলি বিদ্যাভবনের ছোট ছোট কুঠুরির কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রত্যেকটি কক্ষের উপর পাথর কেটে তৈরী ছোট গম্বুজ। নীচে পাথরে খোদাই করা মূর্ত্তি। এই সব দেখে আমি গোয়ালিয়রের পশ্চিম ফটক দিয়ে বের হয়ে দুর্গের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে হতে সেখানকার ভূমি পর্য্যবেক্ষণ করে যেখানে রহিমদাদ চারবাগউদ্যান রচনা করেছিল সেইখানে হাতিপুল ফটকের কাছে ঘোড়া থেকে নামি। চারবাগে আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য রহিমদাদ অপেক্ষা করছিল। আমাকে সে উৎকৃষ্ট খানা খাওয়ায়। তারপর নগদে ও জিনিষপত্রে চারলাখ টাকার মত মোটা নজরানা দেয়। এই চারবাগ থেকে রওনা হয়ে অনেক রাত্রে চারবাগের যে অংশে আমার থাকার শিবির ছিল সেখানে পৌছাই।

১৫ই তারিখ বুধবার (৩০শে সেপ্টেম্বর) গোয়ালিয়রের দক্ষিণ-পূর্বে দেড় ক্রোশ দূরে একটি জলপ্রপাত দেখতে যাই। খুব ভোরে শিবির ত্যাগ করে মধ্যাহ্ন নমাজের পরে সেই প্রপাতের কাছে পৌছাই। জলস্রোত এমন যে তার বেগে একটা পেষণ যন্ত্র চালানো যেতে পারে। সাত আট গজ লম্বা একটা খাড়া পাথরের উপর জল ঠেলে উঠছে। প্রপাতের নীচে একটি বড় পুষ্করিণীর সৃষ্টি হয়েছে। আরও উপরের দিকে দেখা যায়, একটি পাথরের উপর জলঝাঁপিয়ে পড়ে নীচে নেমে আসছে। সেই জলস্রোত একটা পাথরের চাঁইয়ের নীচে গড়িয়ে পড়ছে, আর এই জলধারায় নানা জায়গায় পুকুরের সৃষ্টি হয়েছে। জলধারার দুই দিকের ভূমিতে কঠিন পাথরের টুকরো বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে এবং সেগুলো বসবার আসন হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রপাতের

জলধারা কিন্তু সব সময় বয় না। জলপ্রপাতের ওপরের দিকে আমরা বসি এবং মাজুন (এক প্রকারের উত্তেজক মোদক অথবা অরিষ্ট) খাই। তারপর জলধারার উৎস দেখার জন্য আরও উপরে উঠি এবং পরে নেমে আসি। তারপর আমরা একটা উঁচু টিলায় চড়ে সেখানে কিছু সময় কাটাই। সেই সময় বাদ্যযন্ত্রশিল্পীরা বাজনা বাজায়, আর গায়েকরা গান গায়। আমাদের মধ্যে যারা আবলুস গাছ দেখেনি—যে গাছকে এখানকার অধিবাসীরা বলে 'তিন্দু'—তারা এইবার সে গাছ দেখবার সুযোগ পেলো। এই স্থান ত্যাগ করে আমরা পাহাড় থেকে নেমে এলাম—তারপর ঘোড়ায় চড়ে সন্ধ্যে ও রাতের নমাজের মাঝামাঝি সময় একটা জায়গায় নেমে সেইখানে ঘুমিয়ে নিই। পরদিন ভোর ছয়টা বাজতে না বাজতেই আমরা চারবাগে পৌঁছে যাই।

১৭ই তারিখ শুক্রবার (২রা অক্টোবর) সিলাদ্দির জন্মস্থান 'সুখজানে' দেখতে যাই। (সিলাদ্দি—রাইসেনের রাজা ও রাণা সঙ্গর জামাতা। খানুয়ার যুদ্ধে হিন্দু জমায়েতের একজন সদস্য হিসাবে বাবরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।) এই গ্রামের কাছে পাগাড় লেবু ও সীতা-ফলের বাগান আছে। সেই বাগান ঘুরে দেখে আমি রাতের প্রথম প্রহরের মধ্যেই শিবিরে ফিরে আসি।

১৯শে তারিখে রবিবার সূর্যোদয়ের আগেই আমি চারবাগ থেকে যাত্রা করি। কাবেরী নদী পার হয়ে দুপুরের নমাজের সময় থামি। তারপর আবার ঘোড়ায় চড়ি। সূর্য্যাস্তের সময় চম্বল নদী পার হয়ে সন্ধ্যা ও রাতের নমাজের মাঝামাঝি সময়ে ঢোলপুর দুর্গে পৌঁছাই। লণ্ঠনের আলোতে আবুল ফতের তৈরী স্নানাগার দেখি। তারপর বাঁধের কাছে যে জায়গায় নতুন চারবাগ রচনার নির্দেশ দিয়েছিলাম সেইখানে এসে রাত কাটাই। যে সব কাজ করার আমি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলাম সেই সব কাজ পরদিন সকালে দেখি। এই সোমবারেই আমি মাজুন খাওয়ার বৈঠক করি। মঙ্গল ও বুধবারেও এইখানেই থাকি। বুধবার সন্ধ্যায় আমি উপবাস ভঙ্গ করি এবং অল্প কিছু খাই। সিক্রি যাওয়ার জন্য মাঝরাতে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে সেখানে পৌঁছিয়ে শয্যা গ্রহণ করি। আমি লক্ষণ দেখে বুঝলাম যে কানে ঠাণ্ডা লেগেছে। সে রাতে এমন কষ্ট হয়েছিল যে ঘুমোতে পারি নি।

পরদিন ভোরে আমি আবার বেরিয়ে পড়ি। এক প্রহরের মধ্যেই সিক্রিতে যে বাগান তৈরী করেছিলাম সেইখানে পৌঁছে যাই। বাগানের প্রাচীর ও কূপের ভেতরের ঘরের কাজ আমার পছন্দ মত না হওয়ায় এই কাজের ভারপ্রাপ্ত

ওভারসিয়ারদের তিরস্কার করি এবং শাস্তি দিই। অপরাহ্ন এবং সান্ধ্য নমাজের মধ্যবর্তী সময় আমি সিক্রি ত্যাগ করি। মাধাকর অতিক্রম করে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। তারপর পুনরায় যাত্রা সুরু করে রাতের প্রথম প্রহরের মধ্যেই আগ্রা পৌছে যাই। এখানে এসে আমি খাদিজা সুলতান বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ফকর জাহান বেগম এখান থেকে চলে গেলেও ইনি নানা কাজের জন্য এখানে থেকে যান। (এই দুই মহিলা আবুসৈয়দ মির্জার কন্যা এবং বাবরের পিসিমা)। তারপর আমি যমুনা পার হয়ে হাসত-বেহেস্ত উদ্যানে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামি।

সফর মাসের ৫ই তারিখে সোমবার (১৫ই অক্টোবর) আমি বিক্রমজিতের প্রথম দূত এবং যে শেষে আমার কাছে এসেছিল তাদের সঙ্গে বেঢ়ের হিন্দু অধিবাসী দিউরের পুত্র আমার অনেক দিনের কর্মচারী হাবেশিকে পাঠাই বিক্রমজিতের কাছে। সে আমার পক্ষ থেকে রণতামভরের দখল এবং বিক্রমজিতের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবে ও উভয় পক্ষের রীতি অনুযায়ী সন্ধিপত্র সম্পাদন করার ব্যবস্থা করবে। এই কর্মচারীকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সে যেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ওখানকার পরিবেশ ভালভাবে লক্ষ্য করে এবং যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসে। যদি সেই নবীন রাজপুত্র তার শর্তগুলি পালন করে, তাহলে আমিও আল্লার আশীর্বাদে তাকে তার পিতার স্থলে রাণা করে চিতোরের সিংহাসনে বসাব।

এই সময়ে দিল্লী ও আগ্রার খাজাঞ্চিখানায় ইস্কান্দার ও ইব্রাহিমের সঞ্চিত মুদ্রা নিঃশেষ হওয়ায় এবং অবিলম্বে সৈন্যদের জন্য সাজসজ্জা, বন্দুক কামানের জন্য বারুদ এবং গোলন্দাজ সৈন্যদের বেতন দেওয়ার জরুরি প্রয়োজন হওয়ায় আমি সফর মাসের ৮ই তারিখ বৃহস্পতিবার সমস্ত বিভাগে এই আদেশ জারি করি যে, প্রত্যেক লোক যে বার্ষিক কর দেয় তাকে ধার্য্য করের অতিরিক্ত শতকরা ত্রিশ টাকা বেশী দেওয়ানখানায় জমা দিতে হবে এবং এই অতিরিক্ত রাজস্ব সৈন্যসংগ্রহ, যথাযথভাবে সৈন্যদের সাজসজ্জা এবং রসদের জন্য খরচ হবে।

১০ই তারিখ শনিবার সা' কাশিম নামে সুলতান মহম্মদ বকসির একজন পত্র বাহককে—যাকে পূর্ব্বেও আমি খোরাসানবাসীদের নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের আশ্বাস দিয়ে পাঠিয়েছিলাম—তাকেই আবার নিম্নলিখিতভাবে চিঠি দিয়ে হিরাটে পাঠাই। আল্লার দয়ায় আমি হিন্দুস্থানে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বিদ্রোহীদের এবং হিন্দুদের পর্য্যুদস্ত করে জয়ী হয়েছি। পরবর্ত্তী বসন্তকালে আল্লার ইচ্ছা

হলে আমি সশরীরে কাবুলে ফিরে যাব। এই ভাবেই আর একখানি চিঠি আমেদ আফসারকে লিখে পাঠাই। চিঠির এক কোণে আমি নিজের হাতে এই কথা কয়টি লিখে দিই যে—ফেরাদিন কাবুস্নিকে যেন আমার কাছে পাঠানো হয়। (কাবুজ-গিটারের মত বাদ্যযন্ত্র। ফেরাদিন—প্রসিদ্ধ কাবুজ-বাদক)।

সেই দিনই মধ্যাহ্ন নমাজের সময় আমি তরল পারদ সেবন করি। (তরল পারদ অনেকদিন থেকেই ভারতে কোষ্ঠবদ্ধতার ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।)

২১শে তারিখ বুধবারের কামরাণ ও খাজা দোস্তখন্দের চিঠি নিয়ে একজন হিন্দুস্থানি পত্রবাহক আসে। খাজা দোস্তখন্দ জিলহজ্জ মাসের ১০ই তারিখ কাবুলে পৌঁছে এবং হুমায়ুনের সঙ্গে দেখা করতে যাত্রা করে। (এই সময়ে হুমায়ুন বাদাকশানে জাফের দুর্গে এবং কামরাণ গজনিতে ছিল)। কামরাণ একজন লোককে খাজার কাছে পাঠিয়ে তাকে এই অনুরোধ জানায় যে—সে ঐখানেই থাকে, যাতে সে স্বয়ং গিয়ে সে যে সব আদেশ নিয়ে এসেছে তার মুখেই শুনতে পায়। তার অর্থ এই যে সমস্ত সংবাদ তাকে জানানোর পর তাকে তার গন্তব্য স্থলে যেতে দেওয়া হবে। জেলহজ্জ মাসের ১৭ই তারিখ কামরাণ কাবুলে পৌঁছায়। তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করে ২৮শে তারিখ খাজা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাফের দুর্গে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হয়।

পত্রবাহক মারফৎ যে চিঠিগুলি পাই, তাতে এই আনন্দদায়ক সংবাদ ছিল যে পারস্যের রাজা তামাস্ উজবেকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়ে দামঘানে রিনিস্ উজবেক (রিনিশ বাহাদুর খাঁ—ও বেদুল্লা খাঁয়ের নিযুক্ত আস্তারাবাদের শাসক) এবং তার সঙ্গীগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাদের প্রত্যেককে তরবারির আঘাতে নিহত করেছে। সেবানি খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওবেদুল্লা খাঁ কিজলিবাসদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে হেরির অবরোধ তুলে নিয়ে মার্ভে ফিরে যায় ও সমরখন্দ সন্নিকটস্থ দেশগুলিকে তার সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান জানায়। তার আহ্বানে মাওরালনাহারের সুলতানগণ তাকে সাহায্য করার জন্য সেই নগরে যাওয়ার উদ্দেশে যাত্রা করে।

সেই পত্রবাহক আরও সংবাদ নিয়ে আসে যে, হুমায়ুনের ঔরসে ইয়াদগার তাবাইয়ের কন্যা বেগা-বেগমের গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মেছে, আর কামরাণ তার মাতুল সুলতান আলি মির্জ্জার কন্যাকে বিবাহ করেছে।

২৩শে তারিখ, শুক্রবার (৬ই নভেম্বর) আমি এমন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত

হই যে শুক্রবারের নমাজ পড়া মসজিদে শেষ করতে পারিনি। দুপুরের নমাজের সময় আমার লাইব্রেরীতে যাই, কিন্তু তখন এমন অসুস্থতা বোধ করি যে অতি কষ্টে আমার নমাজ শেষ করতে পারি।

দুইদিন পর রবিবার (৮ই নভেম্বর) আমার কম্পনসহ জ্বর হয়। ১০ই নভেম্বর মঙ্গলবার রাতে আমি মনে মনে এই আলোচনা করি যে, মহামান্য খাজা ওবিদের পিতামাতার সম্মানে যে ছোট পুঁথি লেখা আছে তা আমি কবিতায় রূপান্তরিত করবো। মহামান্য খাজার আত্মার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে আমি মনে মনে এই আশা লালন করেছিলাম যে, তিনি হয়তো আমার কবিতা ভালভাবে গ্রহণ করে আমাকে রোগমুক্ত করবেন যেমন তিনি কাসিদের লেখককে করেছিলেন। সেই লেখক তাঁর লেখা 'কাসিদে' তাঁকে উৎসর্গ করলে তিনি তা অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেছিলেন যার ফলে সে পক্ষাঘাত রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আমার এই প্রতিজ্ঞার ফলে আমি একটি কবিতা রচনা করি এবং সেই সন্ধ্যায় তেরোটি দ্বি-পদী কবিতা লিখে ফেলি। প্রতিদিন এই রকম কিছু কিছু দ্বি-পদী কবিতা লিখে যাব এবং তা কখনও দশটার কম হবেনা এই কথা মনে মনে সঙ্কল্প করি। আমি মাত্র একদিন কবিতা লিখতে পারি নি। গত বছর এবং প্রকৃত-পক্ষে পূর্ব্বে যখনই আমি এই পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলাম তখন এই পীড়ার ভোগ একমাস কি চল্লিশদিন চলেছে। কিন্তু আল্লার দয়ায় ১২ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার আমার ব্যাধির প্রকোপ কমে আসে এবং তারপর রোগমুক্ত হই। প্রথম রবিয়ল মাসের ৮ই তারিখ (২১শে নভেম্বর) সেই পুঁথি কবিতায় রূপান্তরিত করা শেষ করি। আমি গড়ে প্রতিদিন বাহান্নটি দ্বি-পদী কবিতা লিখে যাই।

প্রথম রবিয়ল মাসের ৯ই তারিখ রবিবার বেগ মহম্মদ তালাকচি ফিরে এলো। তাকে গত বছর সম্মানসূচক পোষাক ও ঘোড়াসহ হুমায়ুনের কাছে পাঠাই।

এই মাসের ১০ই তারিখ, হুমায়ুনের নিকট থেকে ওয়াইস লাঘারির পুত্র বেগ গিনা এবং বিয়ান সেথ নামে হুমায়ুনের একজন ভৃত্য এই শুভ সংবাদ নিয়ে আসে যে হুমায়ুনের একটি পুত্র সন্তান হয়েছে এবং তার নাম রাখা হয়েছে আলি আমান।

বেগ গিনা রওনা হওয়ার অনেক পরে বিয়ান সেথ হুমায়ুনের কাছে থেকে রওনা হয়। সফর মাসের ৯ই তারিখ (২৩শে অক্টোবর) সে রওনা হয় এবং প্রথম

রবিয়াল মাসের ১০ই তারিখ আগ্রায় পৌঁছে যায়। সে খুব দ্রুত চলে আসে। আরএকবার সে কিলা-ই-জাফর থেকে কান্দাহারে ঠিক এগারো দিন পৌঁছে যায়।

বিয়ান সেখ সাহাজাদা তামাসের ইরাক থেকে সৈন্যচালনা এবং উজবেগদের পরাস্ত করার সংবাদ আনে। এইখানে তার বিবরণ দিচ্ছি। সাহাজাদা তামাস ইরাক থেকে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে রুমির রীতি অনুযায়ী কামান সজ্জিত করে দ্রুত অগ্রসর হন। তিনি বাস্তাম জয় করেন। রিণিশ উজবেগ ও তার দলবলকে দামঘান্সে নিহত করেন। তারপর সেখান থেকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান। কামবার-ই-আলি বেগ কিজিলবাসের অনুচরদের হাতে পরাস্ত হয়ে কিছু লোকজন নিয়ে উস্তাদ খাঁয়ের কাছে যায়। উস্তাদ খাঁ হেরির কাছাকাছি থাকা উচিত নয় মনে করে তাড়াতাড়ি ঘোড়-সোয়ার পাঠিয়ে বাল্‌খ, হিসার, সমরকন্দ এবং তাসখন্দের সুলতানদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে নিজে মার্ভে চলে যায়। তাসখন্দ থেকে বারাক সুলতানের ছোট ছেলে সিনুজুক সুলতান, সমরকন্দ থেকে কুচুম খাঁ ও তাঁর পুত্রদ্বয় আবু সৈয়দ সুলতান এবং পুলাদ সুলতান, এবং পুত্রগণ সহ জানিবেগ সুলতান, হিসার থেকে মিয়াকাল, মাধি সুলতান এবং হামজা সুলতানের পুত্রগণ—বালখ্ থেকে কাটিন কারা সুলতান—সবাই অত্যন্ত দ্রুত মার্ভে এসে সমবেত হন।

তাঁদের কাছে সংবাদ সরবরাহকার'রা এই সংবাদ নিয়ে আসে যে—'উবেদ খাঁ হেরির কাছে অল্প কয়েকজন সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছে'—সাহাজাদা এই কথা শুনে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনতে পান যে সুলতানরা মার্ভে সমবেত হয়েছেন তখন তিনি রদজানে পরিখা খনন করে সেখানেই অবস্থান করছেন। সংবাদবাহীদের কাছে এই কথা শুনে উজবেগরা প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষমতার কথা একেবারে গ্রাহ্য না করে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন—আমরা সুলতান ও খাঁরা মাসাদে অবস্থান করবো। আমাদের মধ্যে কয়েকজন কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে কিজিলবাসের কাছাকাছি এগিয়ে যাব এবং শত্রুপক্ষকে গর্ত থেকে মাথা তুলতে দেব না। যাদুকরদের এই আদেশ দেওয়া হবে যে তারা যেন বৃশ্চিক লগ্নে তাদের যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করে শত্রুপক্ষকে দুর্বল করে ফেলে। সেই সময়েই আমরা শত্রুপক্ষকে পরাজিত করতে পারবো।' এই রকম কথাবার্তা হওয়ার পরই তারা মার্ভে থেকে বেরিয়ে আসে। সাহাজাদা মাসাদ থেকে এগিয়ে এসে জাম্ ও খিরগাদের কাছাকাছি জায়গায় উজবেগদের

মুখোমুখি হন। উজবেগ পক্ষ পরাজিত হয়। যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে বহু সুলতান নিহত হয়।

একটি চিঠিতে লেখা ছিল—"এটা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি যে কুচুম খাঁ ছাড়া আর কোনও সুলতান বেঁচে পালিয়ে আসতে পেরেছে কিনা। এ পর্য্যন্ত এ পক্ষের একজন লোকও ফিরে আসেনি।" যে সব সুলতান হিসারে ছিল তারা সেখান থেকে সরে পড়ে। ইব্রাহিম জানির পুত্র চাতমা—যার প্রকৃত নাম ইসমাইল, সে নিশ্চয়ই এই দুর্গে আছে।

বিয়ান সেখকেই হুমায়ুন ও কামরাণের নামে চিঠি দিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় করি। এই চিঠি এবং আরও অনেকগুলি এই মাসের ১৪ই তারিখ, শুক্রবার (ইংরাজী ২৭শে নভেম্বর) শেষ করে তার হাতে ন্যস্ত করে তাকে বিদায় দেওয়া হয়। সে ১৫ই তারিখ শনিবার আগ্রা ত্যাগ করে চলে যায়।

হুমায়ুনের নিকট লিখিত পত্রের নকল

যাকে আমি সুস্থ দেহে পুনর্ব্বার দেখার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি—সেই হুমায়ুনের প্রতি—

প্রথম রবিয়ল মাসের ১লা তারিখ শনিবার (পূর্ব্বে উল্লেখিত হয়েছে রবিয়ল মাসের ১০ই তারিখ এবং ঐ তারিখই সঠিক) বিয়ান সেখ বেগ বিনাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে পৌঁচেছে এবং যে চিঠিপত্র সে নিয়ে এসেছে তাতেই ওদিককার সমস্ত খবরাখবর জানতে পারলাম। আল্লাকে ধন্যবাদ! তিনি তোমাকে একটি শিশুপুত্র দান করেছেন—যে শিশু আমার কাছে একটি আশ্বাসের বস্তু এবং পরম স্নেহের পাত্র। সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে এবং সেই সঙ্গে আমাকেও আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এইরূপ আনন্দদায়ক বস্তু দান করে চরিতার্থ করুন—এই প্রার্থনা। হে দুই জগতের অধীশ্বর, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক!

তুমি শিশুটির নাম রেখেছে—অল আমান। তুমি যে নাম রেখেছ আল্লার আশীর্ব্বাদ যেন তার ওপর থাকে। তুমি রাজতক্তে বসেছ। সুতরাং তোমার এ কথা নিশ্চয়ই জানা আছে যে জনসাধারণের অনেকেই এই কথাটা উচ্চারণ করে সাধারণতঃ অল-আমান (ঈশ্বর রক্ষিত) বলে, আবার কেউ কেউ উচ্চারণ করে—ইল-আমান (মনুষ্য রক্ষিত)। এ ছাড়া আরও কতকগুলি শব্দ আছে যার আগে 'অল' এই কথাটা যোগ করা হয়। তোমার এই শিশুপুত্রটি যেন তার নামে ও দৈহিক গঠনে সেই মহান সৃষ্টিকর্ত্তার আশীর্ব্বাদ লাভ করে সুখী

ও ভাগ্যবান হয় এবং সেই সর্ব্বশক্তিমানের করুণা তোমার উপর এমন ভাবে বর্ষিত হয় যাতে আমাদের সৌভাগ্যশালী এবং কৃতিত্বপূর্ণ জীবন অনেক বছর ধরে দেখে আমরা সুখী হতে পারি। অবশ্য, সেই সর্ব্বশক্তিমান তাঁর করুণা ও বদান্যতা দ্বারা এমন ভাবে আমাদের ইচ্ছা পূরণ করেছেন যে তার তুলনা কোনও কালেই হয় না।

এই মাসের ১১ই তারিখ মঙ্গলবার আমার কাছে সংবাদ আসে যে বাল্‌খের জনসাধারণ কুরবানকে আমন্ত্রণ করে সেই নগরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমি তখনই পুত্র কামরাণকে এবং কাবুলের বেগদের এই আদেশ পাঠিয়েছি যে তারা যেন তোমার সঙ্গে সংযোগ সাধন করে (হুমায়ুন তখন বাদাকসানে ছিলেন) যাতে তুমি অবস্থানুযায়ী এবং প্রয়োজন মত হিসার, সমরকন্দ অথবা মার্ভের দিকে অগ্রসর হতে পার। আমি এই আশা করছি যে ভগবানের দয়ায় তুমি শত্রুদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে ও তাদের দেশগুলি দখল করে নিয়ে তোমার বন্ধুদের আনন্দের এবং শত্রুদের প্রবল আতঙ্কের কারণ হবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমার এমন সময় এসেছে যখন দুঃখকষ্ট, বিপদের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধে তোমার পরাক্রম প্রদর্শন করতে পারবে। যে অবস্থাই আসুক না প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজের শক্তি কঠোরভাবে চালনা করতে ভুলো না। কারণ, আলস্য ও আরামপ্রিয়তা রাজপুরুষদের পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়।

(ফারশিতে)—

"উচ্চাশা, আলস্যরে কভু
দেয় না প্রশ্রয়।
এ জগৎ তারই, অবিরাম চেষ্টা
যাকে করেছে আশ্রয়।
জ্ঞানী জানে—
সবাই পারে করিতে আরাম
রাজার কাছে শুধু,
আরাম হারাম।"

যদি তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহে শত্রুকে পরাস্ত করে বাল্‌খ ও হিসার দখল করতে পার, তাহলে তোমার লোক হিসারের ভার নেবে এবং কামরাণের লোক বাল্‌খে থাকবে। যদি সর্ব্বশক্তিমান আল্লার দয়ায় সমরকন্দ আমাদের হাতে আসে, তুমি তাহলে ঐ রাজ্যের শাসনভার নিজে গ্রহণ করবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে

আমি ঐ দেশে সাম্রাজ্য গড়ে তুলবো। যদি কামরাণ মনে করে যে বাল্‌খ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য তাহলে আমাকে জানিও। আমি আল্লার দয়ায় নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি থেকে কিছু যোগ করে দিয়ে তার আপত্তি দূর করবো। তুমি জান যে তুমি সব সময় ছয় ভাগ পাও এবং কামরাণ পায় পাঁচ ভাগ। তুমি সর্ব্বদাই এই নিয়ম মনে রেখো এবং সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলো। এ কথাও তুমি মনে রেখো যে সর্ব্বদা তুমি তার সঙ্গে মানিয়ে চলবে। যে বড় হয় তাকে মহানুভবও হতে হয়। আমি আশা করি যে তুমি তার সঙ্গে ভাল সম্বন্ধ রক্ষা করে চলবে। তোমার ভাইয়ের সম্বন্ধে বলা যায় যে সে একজন সৎ যুবক। তোমার প্রাপ্য সম্মান সে তোমাকে দেবে এবং তোমার অনুগত হয়ে থাকবে। এ কথা তাকে সব সময়ই মনে রেখে সতর্ক হয়ে চলতে হবে।

তোমার সঙ্গে আমার কিছু বোঝাপড়ার ব্যাপার আছে। প্রায় দুই তিন বছর তোমার কাছ থেকে কোনও লোকই আমার কাছে আসেনি। পত্রবাহক-রূপে যে লোকটিকে আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম—সে বারো মাসের মধ্যেও আমার কাছে ফিরে আসেনি। মনে রেখো, এই রকম ব্যাপার অবাঞ্ছনীয়।

তুমি অনেক চিঠিতেই অনুযোগ জানিয়েছ যে তুমি তোমার বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছ। এ রকম অনুযোগ একজন রাজপুরুষের পক্ষে অন্যায়। কারণ, কথায় আছে—

(ফারশিতে) 'কাজের শৃঙ্খলে যদি বদ্ধ তুমি
সেই অবস্থার দাস হয়ে থাক।
মনে ভাব যদি তুমি নহে পরাধীন,
তবে চল নিজের খেয়াল মত।'

রাজার অবস্থার মত গুরুতর বন্দীদশা আর নাই। সুতরাং তার পক্ষে অপরিহার্য্য বন্ধু-বিচ্ছেদ নিয়ে অনুযোগ করা অনুচিত।

আমার ইচ্ছানুযায়ী তুমি আমাকে চিঠি লিখে থাক, কিন্তু আমার মনে হয় তুমি চিঠি লেখার পর একবার পড়েও দেখ না। যদি তা করতে তাহলে তোমার নিজের ভুলগুলি তুমি দেখতে পেতে ও সেগুলি শোধরাবার চেষ্টা করতে। তোমার শেষ চিঠির অর্থ উদ্ধার করতে এবং তার মানে বুঝতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। চিঠি এলোমেলো ভাবে লেখা ও দুর্বোধ্য। গদ্যে কে হেঁয়ালি দেখেছে? তোমার বানান মন্দ নয় কিন্তু একেবারে শুদ্ধও

নয়। তোমার চিঠি অবশ্য বোঝা যায় কিন্তু দুরূহ শব্দ ব্যবহারের জন্য কোনও মতেই সহজবোধ্য হয় না। চিঠি লেখায় তোমার উৎকর্ষতার অভাব আছে নিশ্চয়ই। তোমার বিফলতার প্রধান কারণ এই যে, তুমি নিজের বিদ্যাবত্তা জাহির করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠো। ভবিষ্যতে কৃত্রিমতা বর্জন করে স্পষ্ট এবং সরল ভাষায় চিঠি লিখবে। তাতে লেখক ও পাঠক দুয়েরই কষ্ট লাঘব হবে।

তুমি এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে যাত্রা করছো। সেইজন্য সর্ব্বদাই এখন যে সব জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, মহান ব্যক্তিরা তোমার কাছে আছেন, তাঁদের উপদেশ নিয়ে সেই ভাবে নিজেকে চালিত করবে।

যদি তুমি আমার প্রশংসা অর্জন করতে চাও, তাহলে তুমি বাজে লোকের সঙ্গে মিশে সময় নষ্ট করো না, বরং সেই সময়টা যারা তোমার শুভানুধ্যায়ী তাদের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে আলোচনায় ও মেলামেশায় কাটিও। প্রত্যেকদিন দুইবার তোমার ভাই এবং বেগদের তোমার কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিও, তাদের মরজিমত তোমার কাছে হাজির হওয়ার সুযোগ দিও না। তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার পর যে কোনও ব্যাপারেই হোক তুমি যেটা সব চেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে করবে সেই ভাবেই শেষ পর্য্যন্ত কাজ করার সিদ্ধান্ত করবে।

আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে খাজা কালানের সঙ্গে তুমি বিশেষ বিশ্বস্ত আচরণ করবে। তাঁর প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে আমাকে যেমন কাজ করতে দেখেছো সেই ভাবে তুমিও কাজ করে যাবে। আল্লার দয়ায় তোমার চার পাশের দেশগুলি নিয়ে কাজের পীড়াদায়ক দুরূহতা যখন কমে আসবে, তখন আর কামরাণকে তোমার প্রয়োজন হবে না। সে রকম অবস্থা এলে তোমার ভাই বাল্‌খে তার বিশ্বস্ত অনুচরদের রেখে আমার কাছে চলে আসতে পারবে।

যখন কাবুলে ছিলাম তখন অনেক বড় বড় কাজ করেছি এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভও আমার হয়েছে। সেই জন্য ঐ স্থানটিকে আমার সৌভাগ্যের দ্যোতক মনে করে আমার সাম্রাজ্যের অংশ বলে নিরূপণ করেছি। তোমরা কেউ যেন এই দেশটি নিজের দখলে রাখবার জন্য মতলব করো না।

সুলতান উইসের হৃদয় জয় করবার জন্য তুমি তাঁর সঙ্গে বিশেষ ভদ্রব্যবহার করার চেষ্টা করবে। তিনি জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁকে তোমার কাছে কাছে রাখবে ও তাঁর উপদেশ মত কাজ করবে।

সৈন্যদলের শৃঙ্খলা ও তাদের কার্য্যক্ষমতা যাতে সব সময় বজায় থাকে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে।

বিয়ান সেখ সব বিষয়ই আমার কাছে থেকে জেনে গেল। তোমার যদি কিছু জানবার থাকে তার কাছ থেকে মৌখিক জেনে নিতে পারবে।

আমি আবার তোমার সুস্বাস্থ্য আন্তরিক ভাবে কামনা করছি।

(প্রথম রবি মাসের ১০ই তারিখ বৃহস্পতিবার লিখিত)।

এই ভাবেই কামরাণ ও খাজা কালানকে আমি নিজের হাতে চিঠি লিখি।

১৯শে তারিখ বুধবার আমি মির্জ্জা ও সুলতানদের, তুর্কি ও হিন্দুস্থান বেগদের ডেকে পাঠাই। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসা হয় যে, আমি এই বৎসর কোনও না কোনও দিকে সৈন্য চালানা করবে। আমার যাত্রার পূর্ব্বে আসকারি (বাবরের একজন পুত্র) পূর্ব্বপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হয়ে যাবে এবং গঙ্গার ওপারের আমির ও সুলতানরা তাদের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দেবে। তারপর আমি যেরূপ ভাবে অভিযান আরম্ভ করা উপযুক্ত বলে বিবেচনা করবো সেইভাবেই অভিযান সুরু হবে। আমার এই সমস্ত অভিপ্রায় লিখিতভাবে জানিয়ে ২৯শে তারিখ শনিবার গিয়াসউদ্দিন কাচিকে সুলতান জানিদ বিরলাস ও পূর্ব্বপ্রদেশের আমিরদের কাছে পাঠাই ও নির্দ্দেশ দিই যেন তারা একুশদিনের মধ্যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আমি গিয়াসউদ্দিন কাচিকে মৌখিক উপদেশ দিই যেন সে তাদের জানিয়ে দেয় যে আমি আসকারির নিকট অস্ত্রশস্ত্র, কামান এবং যুদ্ধবিশারদ সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র পাঠাবো এবং সেগুলি যুদ্ধ সুরু হওয়ার আগেই ঠিক করা হয়ে যাবে। গঙ্গার অপর পারের সমস্ত আমির ও সুলতানদের আসকারির সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য এবং আল্লার অনুগ্রহে যেদিকে অগ্রসর হওয়া উচিত বলে মনে হবে সেই দিকেই অভিযান করার আদেশ দেওয়া হলো। তাদের আরও জানিয়ে দেওয়া হলো যে ঐ দিকে আমার পক্ষভুক্ত যে সব লোক আছে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করতে হবে যে ঐ দিকে এমন কিছু কাজ আছে কিনা—যার জন্য আমার উপস্থিতি প্রয়োজন হবে। যদি সত্যই প্রয়োজন থাকে তাহলে আমার যে কর্ম্মচারীকে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের আমার সঙ্গে পরামর্শ সভায় মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতে পাঠানো হয়েছে সে ফিরে এলেই ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকলে কালবিলম্ব না করে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করে সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দেব। তবে বাঙ্গালীরা যদি শান্ত থাকে ও বিদ্রোহের মনোভাব

না দেখায় আর যদি সেদিকে এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় যাতে আমার উপস্থিতির নিতান্ত প্রয়োজন হতে পারে তা হলে সে কথা আমাকে যেন তারা জানিয়ে দেয়। তাহলে আমি এখানেই অপেক্ষা করবো এবং আমার সৈন্যদের অন্য কোনও দিকে চালনা করবো। আমার অনুরাগী ও বন্ধুরা আসকারির সঙ্গে যেন অবশ্য অবশ্য পরামর্শ করেন এবং দৈব আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে ঐ দিকে কি ধরণের কাজ সাধারণ ভাবে অনুসরণ করা উচিত তা যেন ঠিক করেন।

প্রথম রবিয়ল মাসের ২৯শে তারিখ শনিবার আস্‌কারিকে মূল্যবান পাথরখচিত ছোরা, কটি-বন্ধন, সম্মানসূচক রাজকীয় পোষাক, একটি পতাকা, ঘোড়ার লেজ, দামামা, তিপচাক্ জাতীয় অশ্ব, দশটি হাতী, কয়েকটি উট ও খচ্চর, রাজজনোচিত সাজ সরঞ্জামসহ তাঁবুর আসবাবপত্র উপহার দিকে তাকে দরবার সভায় সকলের প্রথমে বসার অনুমতি দিই। মোল্ল দাদা আংকেকে এক জোড়া মূল্যবান বোতাম খচিত পাদুকা এবং তাঁর অন্যান্য কর্ম্মচারীকে তিন × নয় (সাতাশটি) ফতুয়া দান করি। (মোগল ও তুর্কিদের নিয়মানুসারে ৩ × ৯ সংখ্যক দ্রব্য উপহার দেওয়া সৌভাগ্যসূচক)।

এই মাসের শেষ দিন রবিবার সুলতান মহম্মদ বকশিসের বাড়ী যাই। তার বাড়ীতে যাওয়ার রাস্তা মূল্যবান গালিচায় ঢাকা ছিল। সে আমাকে উপঢৌকন দেওয়ার আয়োজন করে। জিনিষপত্রে ও অর্থে যে পেশকোশ সে আমাকে প্রদান করে তার মূল্য দুই লাখের ও বেশী। আহার এবং উপঢৌকন নেওয়া শেষ করে আমরা অন্য কক্ষে যাই এবং সেখানে সিদ্ধির সরবৎ পান করি। বেলা তিন প্রহরের সময় আমি সেখান থেকে বেরিয়ে নদী পার হয়ে আমার নিজের প্রসাদকক্ষে চলে আসি।

শেষ রবিয়ল মাসের ৪ তারিখ বৃহস্পতিবার চিকমাক বেগকে আগ্রা থেকে কাবুলের দূরত্ব মাপ করবার জন্য শীলমোহর যুক্ত রাজ আদেশ জারি করি। সেই আদেশে বলা হয় যে প্রতি নয় ক্রোশে একটি করে ছোট গম্বুজ তৈরী করতে হবে, তার মাপ হবে উচ্চতায় বার গজ এবং শীর্ষে থাকবে চন্দ্রাতপ। প্রতি দশ ক্রোশে থাকবে ছয়টি ঘোড়ার ডাকচৌকি। ডাকচৌকির তদারককারি, পত্রবাহক, ঘোড়ার সহিস এবং রসদের জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকবে। আরও আদেশ দেওয়া হয় যে, যদি ডাকচৌকির কাছে সরকারী খাস জমি থাকে তাহলে তারই আয় থেকে বরাদ্দ মাফিক অর্থ জোগান দিতে হবে। যদি

এই ডাকচৌকি কোনও পরগণার মধ্যে হয় তাহলে সেই পরগণার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বরাদ্দ অর্থ সরবরাহ করতে হবে। সেইদিনই চিকমার পাদশাহি আগ্রা ত্যাগ করে। ক্রোশের মাপ কি ভাবে ঠিক করা হয় নীচের কবিতায় তা উল্লেখ করা হলো।

(তুর্কিতে) এক ক্রোশ হয় চার হাজার পদক্ষেপে।
প্রতি পদক্ষেপ জেনে রাখ, দেড় হাত মাপে।
প্রতি হাত হয় ছয় মুষ্টি পরিমাণ।
প্রতি মুষ্টি হয় ছয় ইঞ্চির সমান।
প্রতি ইঞ্চি ছ'টি যবের পরিসর।
এই মাপের কথা জেনে হও তৎপর

একটি মাপের ফিতায় চল্লিশটি পদক্ষেপের পরিমাপের নির্দেশ থাকে। প্রতি পদক্ষেপের মাপ দেড় হাতের সমান, এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এক পদক্ষেপ নয় মুষ্টি পরিসরের সমান। এই মাপের ফিতায় একশ'বার মেপে গেলে এক ক্রোশ হয়।

৬ই তারিখ শনিবার উদ্যানে আমি ভোজের ব্যবস্থা করি। উদ্যানের উত্তরের দিকে একটি আটকোণা পটমণ্ডপে বসবার স্থান হয়। এই মণ্ডপ সম্প্রতি নির্ম্মাণ করা হয় এবং উপরটা শীতলতার জন্য খসখস ঘাসে ঢাকা হয়। আমার দক্ষিণ দিকে পাঁচ ছয় গজ দূরে বুধা সুলতান, আসকারি ও খাজা হুসেনি খলিফা, সমরকন্দ থেকে আগত লোকেরা, খাজার অধীনস্থ লোকজন, কোরাণ পাঠক ও মোল্লারা আসন গ্রহণ করেন। আমার বাঁদিকে পাঁচ ছয় গজ দূরে বসেন— মহম্মদ জেমান মির্জ্জা, আতেকে ইৎসিম সুলতান, সৈয়দ রফি, সৈয়দ রুমি, সেখ আবুল ফতে, সেখ জামালি, সেখ সাহাবুদ্দিন আরব এবং সৈয়দ দাকনি। এই ভোজোৎসবে কিজিলবাস, উজবেক এবং হিন্দু দূতরাও উপস্থিত ছিল। দক্ষিণ দিকে ৭০।৮০ গজ দূরে একটি চাঁদোয়া খাটানো হয় যেখানে কিজিলবাসের দূতদের স্থান দেওয়া হয় এবং আমিরদের মধ্যে ইউনিস আলিকে তাদের পাশে বসবার জন্য নির্ব্বাচিত করা হয়। ঐ একইভাবে বামদিকে উজবেক দূতদের জন্য বসবার স্থান ঠিক করা হয় এবং আমিরদের মধ্যে আবদাল্লাকে তাদের কাছে বসার জন্য নির্ব্বাচিত করা হয়। আহার্য্য পরিবেশন করার আগে সমস্ত খাঁ, সুলতান, উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত লোক এবং আমিররা আমাকে লাল, সাদা এবং কালো

রংয়ের মুদ্রা (স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা), বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য উপঢৌকন দেন। আমার সম্মুখে একটি পশমি গালিচা পেতে দেওয়ার নির্দেশ দিই। তার উপর স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা বর্ষণ হয়। রঙ্গিণ ও সাদা কাপড়ের উপহার, থলিপূর্ণ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পাশে রাখা হয়। আহারের পূর্ব্বে যখন উপঢৌকন দেওয়ার ব্যাপার চলছে তখন সামনের দিকে একটি উচ্চ ভূমিখণ্ডে উট ও হাতীর ভয়ঙ্কর লড়াই দেখানো হয়। ভেড়ার লড়াই এবং পরে পালওয়ানদের মল্লযুদ্ধও চলতে থাকে। যখন আহার্য্য পরিবেশন করা হয় সেই সময় খাজা আবদুল সহিদ, খাজা কালানকে মিহি তুলার সুতায় তৈরী মসলিনের এবং সম্মানসূচক আরও পোষাক উপহার দেওয়া হয়। মোল্লা ফারুক, হাফিজ এবং আরও তিনজন কাপড়ের ঢিলা গাত্রাবরণ পায়। কুচিন খাঁয়ের দূত ও হাসান চালেবির ছোট ভাইকে বহুমূল্য বোতামযুক্ত মসলিনের পরিচ্ছদ এবং নিজ নিজ পদমর্য্যাদানুযায়ী অন্যান্য পোষাক দেওয়া হয়। আবু সৈয়দ সুলতান এবং মেহেরবান খাতুনের দূতগণ ও মেহেরবান খাতুনের পুত্র পুলহাদ খানকে এবং সা হাসানের দূতগণকে বোতামযুক্ত কোর্তা ও মূল্যবান কাপড়ের পরিচ্ছদ দেওয়া হয়। একটি সোনার তালকে রূপোর মাপ দিয়ে এবং একটি রূপোর তালকে সোনার ওজনের মাপ দিয়ে ওজন করা হয়। সেই সোনা ও রূপো দোস্ত খাজা ও কোচিন খাঁর দুই মহান দূত এবং হসেন খাঁ চালেবির ছোট ভাইকে দেওয়া হয়। সোনার তাল ওজনে ছিল পাঁচশ মিসকাল যা কাবুলের প্রচলিত ওজনে এক সের এবং রূপোর তাল ওজনে ছিল 'আড়াইশ' মিশকাল—যা কাবুলের ওজনের আধসের। খাজা মির সুলতানি, তাঁর পুত্রগণ, হাফিজ তাসকেন্দি, মোল্লা ফারুক এবং তাঁর অনুগতগণ, খাজার ভৃত্যগণ ও অন্যান্য দূতরা প্রত্যেকেই সোনা ও রূপার উপহার পায়। মির মহম্মদ জাহেলবান গঙ্গার উপর সেতু তৈরী করার সময় অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখানোর জন্য ভাল পুরস্কারলাভের যোগ্যতা লাভ করে। সে ও অন্যান্য বন্দুকধারী সৈনিক পালওয়ান হাজি মহম্মদ, পালওয়ান বালুল ও ওয়ালি পারশচি প্রত্যেককে ছোরা উপহার দেওয়া হয়। সৈয়দ দাউদ গারমসিরি সোনা ও রূপার উপহার পায়। আমার কন্যা মাসুমার ও পুত্র হিন্দলের ভৃত্যগণ বোতাম-যুক্ত ফতুয়া এবং মূল্যবান কাপড়ের সম্মানসূচক পোষাক পায়। অন্দেজানের যে সব লোক দেশ ছাড়া গৃহ ছাড়া হয়ে আমার সঙ্গে যাযাবর জীবন যাপন করে সুখ, হোসিয়ার ও আরও অনেক জায়গায় ঘুরেছে আমার সেই সব বিশ্বস্ত প্রবীণ ব্যক্তিদিগকে সম্মান সূচক পরিচ্ছদ, ফতুয়া, সোনা, রূপা এবং আরও অনেক

মূল্যবান দ্রব্য দান করি। কুরবান, সেখির ও কামার্দের অধিবাসীদের অনুরূপ ভাবে উপহার দেওয়া হয়।

আহার্য্য পরিবেশন করার সময় হিন্দুস্থানি ভোজবাজিকরদের আনা হয়। তারা তাদের কৌশলপূর্ণ ভোজবাজি দেখায়। যারা ডিগবাজি খেলা দেখায় এবং দড়ির উপর নৃত্য কৌশল দেখায়, তারাও তাদের খেলা দেখাতে থাকে। হিন্দুস্থানী ভেল্কিবাজিকররা এমন কতকগুলি খেলা দেখায় যা আমাদের দেশে কখনও দেখিনি। সেই খেলার একটি এইরূপ:— তারা সাতটি আংটি নিয়ে একটা রাখে কপালের ওপর, দুইটি দুই জানুর ওপর, অবশিষ্ট চারটির দুইটি রাখে দুইটি হাতের আঙ্গুলের ওপর এবং আর দুইটি রাখে পায়ের আঙ্গুলের ওপর। এই সব আংটি তারা একসঙ্গে অবিরাম দ্রুত ঘোরাতে থাকে। আর একটি খেলা এইরূপ:—তারা মাটির ওপর একটা হাত রেখে আর একটা হাত এবং দুই পা উঁচুতে তোলে। এই উত্তোলিত হাত ও পা এমন ভাবে বিস্তার করে যে দেখে মনে হয় যেন পেখম-মেলা ময়ুর। এই অবস্থাতেই তারা হাত ও দুইটি-পায়ের ওপর তিনটি আংটি রেখে অনবরত ঘুর পাক খেতে থাকে।

আমাদের দেশে যারা ডিগবাজির খেলা দেখায় তারা দুইটি কাষ্ঠদণ্ড পায়ে বেঁধে সেই দণ্ডের ওপর ভরদিয়ে হেঁটে বেড়ায়। আর হিন্দুস্থানী ডিগবাজিকররা একটি মাত্র কাষ্ঠদণ্ডকে আশ্রয় করে তাতে পা না বেঁধে হাঁটার কসরত দেখায়। আমাদের দেশে দুইজন ডিগবাজিওয়ালা পরস্পর জড়াজড়ি করে ডিগবাজি খেলা দেখায়। এখানকার হিন্দুস্থানি ডিগবাজিকররা তিন •চারজন পরস্পরকে ধরে থাকে এবং পরস্পর জড়াজড়ি করে বৃত্তের আকারে ডিগবাজির কসরত দেখাতে থাকে। একটি বিশেষ খেলা এরা দেখিয়ে থাকে সেটি এই। একজন একটি ছয় সাত গজ মাপের বাঁশের নীচের দিকটা তার দেহের মাঝখানে খাড়া করে ধরে থাকে, আর অন্য একজন সেই বাঁশ বেয়ে উঠে বাঁশের ওপর খেলা দেখাতে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একজন ছোকরা ডিগবাজিওয়ালা এক বয়স্থ ডিগবাজিকরের মাথার ওপর চড়ে বসে। নীচের লোকটি এ পাশ ও-পাশ নানা কসরত দেখাতে দেখাতে দ্রুত হেঁটে চলে সেই ছোকরাকে মাথায় করে, আর সেই ছোকরাটিও মাথার ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নানা খেলা দেখাতে থাকে। নর্ত্তকীরা এই সময় তাদের নাচ দেখায়। সান্ধ্য নমাজের সময় অনেক স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা ছড়ানো হয়। এই সময় অনেক লোক জমায়েৎ হয়।

খুব হৈ চৈ হতে থাকে। সান্ধ্য ও রাত্রির নমাজের মাঝামাঝি সময়ে আমার কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকে আমার নিকট বসাই। রাত্রির প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়। পরদিন দুপুরের আগে আমি নৌকায় চড়ে হাস্ত-বেহেস্তে যাই।

সোমবার (২১শে ডিসেম্বর) আস্‌কারি এই সহর ত্যাগ করে পূর্ব্বদিকে অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। সে যাওয়ার আগে স্নানাগারে আমার কাছ থেকে বিদায় নেয়।

ঢোলপুরে পুকুর, বাগান ও প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য যে আদেশ দিয়েছিলাম সেগুলো দেখার জন্য মঙ্গলবার (২২শে ডিসেম্বর) যাত্রা করি। আমার উদ্যান-প্রাসাদ থেকে সকালে দুই প্রহর এক ঘড়ির সময় (সকাল সাড়ে নয়টা) আমি অশ্বারোহণ করি এবং রাতের প্রথম প্রহরের পাঁচ ঘড়ির সময়ের (রাত আটটা) পর ঢোলপুর উদ্যানে পৌছাই।

বৃহস্পতিবার ইঁদারা, ছাব্বিশটি নর্দ্দামা, স্তম্ভ ও জলনিকাশী নালা তৈরীর কাজ শেষ হয়। এগুলি কঠিন পাথর কেটে কেটে করা হয়েছে। সেইদিন তৃতীয় প্রহরের সময় (দুপুর থেকে বেলা তিনটার মধ্যে) ইঁদারা থেকে জল তোলার কাজ আরম্ভ হয়। পাথর খোদাইকার মিস্ত্রি এবং অন্যান্য মজুরদের আগ্রার কারিগর ও মজুরদের প্রাপ্য মজুরির হিসাব অনুসারে বকসিস দেওয়া হয়। ইঁদারার জলে যাতে খারাপ স্বাদ না থাকে সেই জন্য চাকা ঘুরিয়ে ইঁদারা থেকে পনরো দিন দিনরাত অনবরত জল তুলে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়।

শুক্রবার সকালে প্রথম প্রহরের এক ঘড়ি সময়ে (পৌনে নয়টা) ঢোলপুর থেকে যাত্রা করি এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঘোড়া থেকে নেমে নদী পার হয়ে আসি।

গিয়াসউদ্দিন কারচিকে জৌনপুর পাঠিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে আসার আদেশ দিয়েছিলাম। সে ১৬ দিন অনুপস্থিত থাকার পর আজ (২৯শে ডিসেম্বর) ফিরে এলো। সুলতান জুনিদ ও তার কর্ম্মচারীরা সেই সময় সৈন্য-সংগ্রহ করে থাণ্ডিদের (উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলার এক মহকুমা) দিকে অগ্রসর হয়। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য গিয়াসউদ্দিনকেও সেই দিকে যেতে হয়, যার ফলে সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে আসতে পারেনি। সুলতান জুনিদ মৌখিক জানায় যে, ভগবানের অসীম দয়ায় ওদিককার ব্যাপার এমন স্বাভাবিক যাতে স্বয়ং সম্রাটের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে না। একজন মির্জ্জা (সম্রাটপুত্র আসকারি) এলে এ দিককার সুলতান, খাঁ ও আমিরদের আহ্বান

করলেই তারা তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। তার বিশ্বাস সবই সন্তোষজনক ভাবে চলবে, সব ব্যবস্থাই ঠিক মত হয়ে যাবে। আমি এই রকম উত্তর সুলতান জুনিদের কাছ থেকে পেলেও মোল্লা মহম্মদ মজহাবের—যাকে বিধর্মী সঙ্গর সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধের পর বঙ্গদেশে রাজদূত হিসাবে পাঠানো হয়েছে এবং যার ফিরে আসার প্রতি দিনই আশা করছি—কাছ থেকে বিশদ বিবরণ না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি।

১৫২৯ সালের ঘটনাবলী

শুক্রবার (১লা জানুয়ারি) আমি সিদ্ধির সরবৎ খাই। কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে যখন আমার গোপন কক্ষে বসেছিলাম সেই সময় মোল্লা মহম্মদ মজহার এসে পৌঁছায়। সন্ধ্যা'য় সে আমার কাছে এসে সেলাম দেয়। আমি একের পর এক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঐ দিকের ব্যাপার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করি। জানতে পারি যে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ বশে আছে এবং সেখানে শান্তি বিরাজ করছে।

শনিবার আমি তুর্কি ও হিন্দুস্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আমার গোপন কক্ষে আহ্বান করি। তাদের সাথে আলোচনা করে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বাঙ্গালীরা যখন দূত পাঠিয়েছে এবং বশ্যতা স্বীকার করে শান্ত হয়ে আছে তখন আমার বঙ্গদেশে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই। আমার বঙ্গদেশে যাওয়ার দরকার না হলে ওদিকে এমন কোনও প্রয়োজন নাই যেখানে গেলে সৈন্যরা আনন্দলাভ করতে পারে। বরং পশ্চিম দিকে এমন অনেক জায়গা আছে যেগুলি নিকটেও বটে, সমৃদ্ধিশালীও বটে।

(তুর্কিতে) 'দেশটা সম্পদশালী'
অধিবাসীও বিধর্ম্মী।
রাস্তাও বেশী নয়।
পূব দেশ অনেক দূরে,
এ দেশটা তো হাতের কাছে।'

অবশেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে আমি পশ্চিম দিকে অভিযান করবো—কারণ এই দিকটাই নিকট। অভিযান সুরু করতে আমি কয়েক দিন বিলম্ব করি। পূব দিকের ব্যাপারটায় একটা নিশ্চিন্ততার ভাব মনে না জাগা পর্য্যন্ত অভিযানে বের হতে দ্বিধা করছিলাম। এইজন্য গিয়াস উদ্দিন কারচিকে আর একবার ঐ দিকে নির্দ্দেশ দিয়ে পাঠাই যে, সে যেন দিন কুড়ির মধ্যে সমস্ত সংবাদ জেনে ফিরে আসে। তার হাতে পূব দিকের আমিরদের নিকট

আমার হাতে লেখা ফর্ম্মান পাঠিয়ে দিই। তাতে এই ইচ্ছা প্রকাশ করি যে ওদিকে গঙ্গার অপর পারের সমস্ত সুলতান, খাঁ এবং আমিররা যেন আসকারির সঙ্গে যোগ দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়। আমি গিয়াসুদ্দিনকে বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ দিই যে ফর্ম্মান বিলি করার পর সে যেন নিজে ঐদিককার সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে তাড়াতাড়ি ধার্য্য সময়ের মধ্যে আমার কাছে ফিরে আসে।

এই সময় মহম্মদ গোকুলতাসের কাছ থেকে এই সংবাদ আমার কাছে পৌছায় যে বেলুচিরা আবার বিদ্রোহ করেছে এবং নানা স্থানে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চিন তাইমুর সুলতানকে এই আদেশ দিয়ে পাঠাই যে সে যেন সিরহিন্দ, সামান ও আর আর নিকটস্থ জায়গার আমিরদের—যেমন আদিল সুলতান, সুলতান মহম্মদ দুলদাই, খসরু গোকুলতাস, মহম্মদ আলি জং জং, দিলওয়ার খাঁ, আহম্মদ ইউসুফ, সা মনসুর বিরলাস, আব্দুল আজিজ, মির আখুর, সৈয়দ আলি, ওয়ালি কিজিলবাস, কিরাচে হালাহিল, আসিথ বেকাওয়েস, সেখ আলি কিতে, গজর খাঁ এবং হাসান আলি সিওয়াদি—সমবেত করে। তারা ছয়মাসের জন্য তাদের সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চিন্ তাইমুরের সঙ্গে যোগ দিয়ে বেলুচিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে এই নির্দ্দেশ দিই। আরও আদেশ দিই যে তারা যেন চিন তাইমুরের নির্দ্দেশমত একত্রে সমবেত হয় এবং তার আদেশ মেনে নিয়ে কাজ করে। আমার এই সব আদেশ জারি করার জন্য আবদুল গোফুরকে বিশেষ পত্রবাহক নিযুক্ত করি। ঠিক হয় যে আমার ফর্ম্মান নিয়ে প্রথমে সে চিন্ তাইমুর সুলতানের কাছে যাবে পরে যে সব আমিরদের নাম ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের কাছে আমার ফর্ম্মানও পৌছে দিয়ে তাদের সসৈন্যে তাইমুর সুলতানের নির্দ্দেশ মত স্থানে সমবেত করার ব্যবস্থা করবে। আবদুল গোফুরকে আদেশ দেওয়া হয় যে, সে নিজে সৈন্যদলের সঙ্গে থাকবে এবং মাঝে মাঝে চিঠি লিখে জানাবে যে কোনও লোক আলস্য ও নিরুৎসাহভাব দেখাচ্ছে কিনা। যদি তা দেখায় তাহলে সেই দোষী ব্যক্তিকে তার পদবী কেড়ে নিয়ে কর্ম্মচ্যুত করা হবে এবং তাকে শাসনভার থেকে মুক্ত করে পরগণা থেকে দূর করে দেওয়া হবে। এই সব আদেশপত্র লিখে আবদুল গোফুরের হাতে দিয়ে এবং মৌখিক আরও উপদেশ দিয়ে তাকে রওনা করে দিই।

রবিবার সকালে (১০ই জানুয়ারী) যমুনা পার হয়ে ঢোলপুরের বাগ-ই

নিলফুরে (কমল উদ্যানে) তৃতীয় প্রহরের শেষাশেষি সময়ে আসি। এই উদ্যানের কাছাকাছি কয়েকজন আমির ও সভাসদ নিজ নিজ ব্যয়ে প্রাসাদ ও উদ্যান নির্ম্মাণ করবে বলে কয়েকখণ্ড জমি নির্ব্বাচন করা হয়। প্রথম জুমাদা মাসের ৩রা তারিখ বৃহস্পতিবার (১৪ই জানুয়ারী) স্নানাগার নির্ম্মাণের জন্য উদ্যানের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে একটি স্থান ঠিক করি। এই উদ্দেশ্যে সেই স্থানটি পরিষ্কার করা হয়। নির্দ্দেশ দিই যে ঐ জায়গায় উঁচু ভিত্তির ওপর ভাল মাল-মশলা দিয়ে স্নানাগার ও স্নানাগারের একটি কক্ষে কুড়ি বর্গফুট পরিমাপে একটি জলাধার নির্ম্মাণ করতে হবে।

সেই দিনই আমি আগ্রা থেকে খালিবে প্রেরিত কাজি জিয়া ও নর সিং দেওয়ের লেখা চিঠি থেকে জানতে পারি যে ইসকান্দারের পুত্র মহম্মদ বেহার অধিকার করেছে। এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি সসৈন্যে অভিযানে বের হওয়ার সঙ্কল্প করি। পরদিন শুক্রবার সকালে ছয় ঘড়ি বেলার সময় (প্রায় সকাল সাড়ে আটটা) অশ্বারোহণে নিলফুর উদ্যান ত্যাগ করে সান্ধ্য নমাজের সময় আগ্রায় পৌঁছাই। পথে মহম্মদ জেমান মির্জার সঙ্গে দেখা হয়। সে ঢোলপুরের দিকে আসছিল। চিন তাইমুর সুলতানও সেই দিনই আগ্রায় পৌঁছায়।

পরদিন শনিবার সকালে আমি আমিরদের পরামর্শ সভায় যোগ দিতে ডেকে পাঠাই। আলোচনা করে ঠিক হয় যে প্রথম জুমাদা মাসের ১০ই তারিখ (২১শে জানুয়ারি) বৃহস্পতিবার আমরা পূর্ব দিকে রওনা হবো। সেই শনিবারেই কাবুল থেকে যে চিঠি আসে তা থেকে জানতে পারি যে—হুমায়ুন ঐ দিকের প্রদেশগুলি থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে সুলতান উইস্‌কে সঙ্গে নিয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সহ সমরকন্দের দিকে অভিযানে বের হয়ে গেছে। সুলতান উইসের ছোট ভাই সা কুলি এগিয়ে গিয়ে হিসারে প্রবেশ করছে। তারমেজ থেকে বেরিয়ে তারমুন মহম্মদ সুলতান কারাদিয়ান অধিকার করেছে এবং আরও সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে। হুমায়ুন কিছু সৈন্য এবং একদল মোগলকে সঙ্গে দিয়ে তুলিক গোকুলতাস ও মির খুর্দকে তার সাহায্যের জন্ম পাঠিয়েছে এবং নিজেও তাদের পিছু পিছু গিয়েছে।

প্রথম জুমাদা মাসের ১০ই তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল তিন ঘড়ির পর (সকাল প্রায় সওয়া সাতটা) পূব দেশের দিকে যাত্রা করি। নৌকায় যমুনা নদী পার হয়ে জলেশিরের কিছু উজানে বাগ-ই জারেফসানে (স্বর্ণবর্ষী উদ্যানে)

আসি। আদেশ দিই যে ঘোড়ার লেজের পতাকা, দামমা, অশ্ব এবং সমস্ত সৈন্য উদ্যানের বিপরীত দিকে নদীর অপর পারে থাকবে। যদি কেউ সম্রাটকে কুর্ণিশ করার জন্য আসতে চায় তাহলেও সে নৌকায় নদী পার হয়ে আসবে।

শনিবারে বঙ্গদেশের রাজদূত ইসমালি মিতা নজরাণা নিয়ে আসে ও হিন্দুস্থানের রীতিঅনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করে। অভিবাদন জানানোর উদ্দেশ্যে একটি তীর নিক্ষিপ্ত হলে যতদূর যায় ততদূরে সে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করবার পরে সরে যায়। তারপর তাকে রীতি অনুযায়ী সম্মান সূচক পোষাক দেওয়ার পর আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের রীতি অনুযায়ী তিনবার নতজানু হয়ে ভূমি স্পর্শ করার পর সে এগিয়ে এসে নসরত সার চিঠি আমাকে দেয়। তারপর যে সব উপঢৌকন সে নিয়ে এসেছিল সে সব দেওয়ার পর বিদায় গ্রহণ করে।

সোমবার (২৫শে জানুয়ারি) খাজা আবদুল হক পৌঁছানোর পর আমি নৌকায় নদী পার হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করি।

মঙ্গলবার (২৬শে জানুয়ারি) হাসান চালেবি আমাকে অভিবাদন জানাতে আসে।

সৈন্য সজ্জার জন্য কয়েকদিন চারবাগে অবস্থান করি।

প্রথম জুমাদা মাসের ১৭ই তারিখ বৃহস্পতিবার (২৮শে জানুয়ারি) সকাল তিনঘড়ির সময় (সওয়া সাতটা) আবার সসৈন্যে যাত্রা সুরু করি। একটি নৌকায় চড়ে আগ্রা থেকে সাত ক্রোশ দূর আনওয়ার গ্রামে পৌঁছে তীরে অবতরণ করি।

রবিবার (৩১শে জানুয়ারি) উজবেক দূতদের বিদায় কালীন দর্শন দি। কুচিম খাঁর দূত আমিন মির্জ্জাকে একটি ছোরা, একটি জমকালো ছুরিসহ কোমরবন্ধ, এবং সত্তর হাজার ক্ষুদ্র রৌপ্য মুদ্রা উপহার স্বরূপ দিই। আবু সৈয়দ সুলতানের কর্মচারী মোল্লা তাঘাইকে এবং মেহেরবান খানুমের ও তার পুত্র পুলাদ সুলতানের ভৃত্যদের তাদের পদমর্য্যাদা অনুযায়ী অর্থ ছাড়াও বোতাম যুক্ত কোর্ত্তা ও মূল্যবান কাপড়ে তৈরী সম্মানসূচক পোষাক দান করি।

পরদিন (১লা ফেব্রুয়ারি) খাজা আবদুল হক বিদায় নিয়ে আগ্রাতে বাস করার জন্য রওনা হন। খাজা ইয়া জিয়ার নাতি খাজা কালান যিনি উজবেকের সুলতান ও খাঁদের দূতের সঙ্গে এসেছিলেন, সমরকন্দে ফিরে যাওয়ার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে বিদায়কালীন দেখা করেন।

হুমায়ুনের পুত্রসন্তান-জন্ম ও কামরাণের বিবাহ এই দুই শুভ ব্যাপারে আমার আনন্দের অভিব্যক্তি স্বরূপ মির্জ্জা তাব্রিজি ও মির্জ্জা বাগ তাঘাইকে এই দুইজন সম্রাটপুত্রের কাছে দশ হাজার সাহ্‌খি উপহার দিয়ে পাঠাই। তারা একটি করে পোষাক ও কোমরবন্ধও নিয়ে যায়, যা আমি নিজে ব্যবহার করতাম। হিন্দালের জন্য মোল্লা বেহিস্তের হাতে একটি মিনা করা ছোরা ও কোমরবন্ধ, একটি রত্নখচিত দোয়াত-দানি, ঝিনুক বসানো কাঠাসন, কোমরবন্ধসহ ঢিলে জামা এবং বাবর লিপির একটি বর্ণমালা পাঠাই। মির্জ্জা বেগ তাঘাইয়ের হাত দিয়ে কামরাণের কাছে হিন্দুস্থানে আসার পর আমি যেসব কবিতার অনুবাদ করেছি ও যে সব মূল কবিতা নিজে লিখেছি তার নকল এবং বাবর লিপিতে লেখা চিঠি পাঠাই।

মঙ্গলবার (২রা ফেব্রুয়ারী) আমার লেখা চিঠিগুলি যারা কাবুলে যাচ্ছে তাদের হাতে দিয়ে বিদায় জানাই। মোল্লা কাসিম, পাথরখোদাইকার ওস্তাদ সা মহম্মদ, মিরেক মির ঘিয়াস, পাথরখোদাইকার মির, সা বাবা বেলদারের (ইঁদারা ও পুকুর খননকারক) সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে আগ্রায় ও ঢোলপুরে যে সব অট্টালিকা নির্ম্মাণ শেষ করতে হবে সে সম্বন্ধে আমার মনের অভিলাষ কি তাদের বুঝিয়ে দিলাম এবং এই সব কাজের ভার তাদের উপর অর্পণ করে তাদের বিদায় দিলাম। প্রথম প্রহরের শেষে (সকাল প্রায় নয়টা) আনোয়ার ত্যাগ করার জন্য অশ্বারোহণ করি ও দুপুরের নমাজের পর চাঁদওয়ারের এক ক্রোশের মধ্যে আবাপুর গ্রামে এসে থামি।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে (৪ঠা ফেব্রুয়ারি) আবদল মালুক কেরেচিকে বিদায় দিই। পারস্যের রাজার দূত হিসাবে হাসান চালেবির সঙ্গী হয়ে তাকে যেতে হবে। চাপুককেও সেইদিন বিদায় দিই। সে উজবেক দূতদের সঙ্গে খাঁ ও সুলতানদের নিকট দৌত্যকার্য্যে যায়।

রাতের চারঘড়ি তখনও অতিবাহিত হয়নি (শেষ রাত্রি ৪ টা) সেই সময় আবাপুর থেকে যাত্রা করি। প্রত্যুষে চান্দওয়ার অতিক্রম করে নৌকোয় চড়ি। রাতের নামাজের কাছাকাছি সময়ে রাবেরির কাছে নৌকো থেকে ডাঙ্গার নামি। ফতেপুরে যে শিবির ফেলা হয়েছিল সেইখানে শিবিরবাসীদের সঙ্গে যোগ দিই। ফতেপুরে একদিন অপেক্ষা করি। শনিবার (৬ই ফেব্রুয়ারী) ভোরের আলো ফুটে উঠতেই স্নান সেরে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠি। রাবেরির কাছাকাছি জায়গায় জনসাধারণের সঙ্গে মসজিদে নমাজ পড়ি। ইমাম ছিলেন—মৌলানা

মহম্মদ ফারাবি। সূর্য্য উদয়ের সময় আমরা রাবেরির বাঁধের নীচে নৌকায় উঠি। এইদিন আল্লার সেবকদের কথায় আমার মনে কিছু শান্তির বারি সিঞ্চন করে। ঝাকনের বিপরীত দিকে তীরে আমাদের নৌকাগুলি টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ঝাকন রাবেরির একটি প্রধান সহর। নৌকাতেই সেই রাতটা কাটাই।

নৌকাগুলি ছাড়বার আদেশ দেওয়া হয় প্রভাতের আলো ফুটবার আগেই। আমি নৌকাতেই সকালের নমাজ পড়ি। নমাজ পড়া শেষ হতেই সুলতান মহম্মদ বকসি পৌঁছে যান। তাঁর সঙ্গে আসে খাজা কালানের ভৃত্য সামসাদিন মহম্মদ। সে কয়েকখানি চিঠি নিয়ে এসেছিল। এই চিঠিগুলি পড়ে এবং পত্রবাহকের মুখেও সংবাদ সংগ্রহ করে কাবুলে যা কিছু ঘটেছে তার বিস্তারিত সংবাদ জানতে পারলাম। মোহাদ খাজাও নৌকাতেই আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়।

মধ্যাহ্নের নমাজের সময় নদীর অপর পারে একটি উদ্যানের কাছে নেমে যমুনায় স্নান করে নমাজ পড়ি। নমাজ শেষ করে আবার আমরা এটোয়ার দিকে আসি এবং গাছের ছায়ায় নদীর বাঁধের ওপর বসে কয়েকজনকে কুস্তির কসরৎ দেখানোর জন্য আদেশ দিই। মোহদি খাবাস যে আহার্য্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করেছিল তা এখানেই পরিবেশন করা হয়। সান্ধ্য নমাজের সময় আমরা নদী পার হই। রাতের নমাজের সময় শিবিরে ফিরি আসি। সৈন্য সংগ্রহ করার জন্য এবং সামসুদ্দিনের হাতে কাবুলে চিঠি পাঠানোর জন্য চিঠি লেখার উদ্দেশ্যে এইখানে দুই তিন দিন অবস্থান করি।

প্রথম জুমেদ মাসের ৩০শে তারিখ বুধবার এটোয়া থেকে রওনা হয়ে আটক্রোশ অতিক্রম করে মুরি ও আদুশায় বিশ্রাম করি। কাবুলে পাঠানোর জন্য যে চিঠিগুলি আগে লেখার সময় পাইনি সেগুলি এই সময় লিখে ফেলি। হুমায়ুনকে লিখি যে দেশের শান্তিভঙ্গকারীদের বিদ্রোহ যদি সম্পূর্ণ দমন না হয়ে থাকে তাহলে সে যেন তস্কর ও লুণ্ঠনকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য অবিলম্বে নিজেই যাত্রা করে। যারা লুঠতরাজের জন্য দায়ী তাদের সায়েস্তা করার জন্য তাকে অবিলম্বে ব্যবস্থা করতে হবে। চিঠিতে এই কথা যোগ করে দিই যে, কাবুল আমারই সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবেই গ্রহণ করেছি। সেইজন্য আমার সন্তানদের মধ্যে কেউ যেন এই দেশের ওপর কোনও দাবী না রাখে। আমি হিন্দালকেও এই আদেশ দিয়ে পাঠাই যে সে যেন আমার দরবারে ফিরে

আসে। কামরাণকে লিখি—সে যেন শিষ্টতার চর্চা করে এবং সম্রাটপুত্রের পদমর্য্যাদানুযায়ী। তার কর্ত্তব্য পালন করে। আমি তাকে লিখি যে মুলতান প্রদেশ তাকেই দান করেছি এবং আরো জানিয়ে দিই যে কাবুল আমার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। তাকে একথাও জানাই যে আমার স্ত্রী ও পরিবারবর্গকে আনার জন্ম ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমার অনেক কিছু তৎকালীন ব্যাপার ও তথ্য খাজা কালানকে যে চিঠি লিখি তাতে পাওয়া যাবে মনে করে সেই চিঠির অবিকল নকল এইখানে যোগ করে দিচ্ছি।

'খাজা কালানের স্বাস্থ্য কামনা করি। সামসাদ্দিন মহম্মদ এটোয়াতে পৌঁছিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেছে। তার কাছ থেকে ঐ দিককার (কাবুল) সমস্ত সংবাদ পাই। আমার পশ্চিমের রাজ্য পরিদর্শন করার যে কি অদম্য ইচ্ছা তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। হিন্দুস্থানের ব্যাপার শেষ পর্য্যন্ত অনেকটা শৃঙ্খলার মধ্যে এসে গিয়েছে। পরম শক্তিমান আল্লার ওপর আমার অখণ্ড বিশ্বাস। তাঁর অসীম দয়ায় এমন সময় শীঘ্রই আসবে যখন এই দেশের সমস্ত ব্যাপারই সুশৃঙ্খলভাবে পরিসমাপ্ত হবে। এই রকম অবস্থায় পৌঁছালেই, আল্লার ইচ্ছা হলে, এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করে তোমাদের দেশের দিকে রওনা হব।

কি করে আমি ঐ দেশের আনন্দদায়ক দিনগুলির কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারি? আমার মত লোক যে সুরাপান ত্যাগের শপথ গ্রহণ করেছে এবং জীবনে পবিত্রতা পালনের সঙ্কল্প করেছে—সে ঐ দেশের সুমিষ্ট খরমুজ ও আঙুরের কথা কি করে ভুলে যাবে? সম্প্রতি ঐ দেশের মাত্র একটি খরমুজ ওরা আমাকে এনে দেয়। সেই খরমুজটি যখন কটি তখন আমার মনে এক অদ্ভুত একাকিত্ব বোধ এবং দেশ থেকে নির্ব্বাসন জনিত পীড়াদায়ক মনোভাব আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে। সেটি খাওয়ার সময় আমি চোখের জল সংবরণ করতে পারি নি।

তুমি কাবুলের বিশৃঙ্খল অবস্থার দিকে নজর রেখো। আমার বিচারবুদ্ধিতে যতদূর সম্ভব আমি পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে এই ব্যাপার নিয়ে বিবেচনা করেছি এবং এই স্থির সিদ্ধান্ত করেছি যে—যে দেশে সাত আটজন সর্দ্দার রয়েছে সেখানে কোনও নিয়ম মাফিক শৃঙ্খলাযুক্ত অবস্থা আশা করা যেতে পারে না। আমি সেইজন্ত আমার ভগ্নী ও স্ত্রীদের হিন্দুস্থানে চলে আসার জন্ত নির্দ্দেশ দিয়েছি।

এও ঠিক করেছি যে কাবুল ও তৎসংলগ্ন দেশ আমার সাম্রাজ্যের অংশ বলে গণ্য হবে। হুমায়ুন ও কামরাণকে এ বিষয়ে বিশদভাবে লিখেছি। যে চিঠিগুলি এখন পাঠাচ্ছি সেগুলি যেন কোনও বুদ্ধিমান লোক দিয়ে যথাস্থানে বিলি করা হয়। তুমি হয়তো জানো আমি আগেই করণীয় বিষয় সম্বন্ধে মির্জ্জাদের লিখে জানিয়েছি। সেইজন্য এ দেশকে শৃঙ্খলার পথে আনার এবং উন্নতি সাধনের কোনও বাধাবিঘ্ন বা প্রতিবন্ধক থাকতে পারে না। যদি দুর্গের রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় না হয়, যদি রাজ্যের প্রজাগণ দুঃস্থ অবস্থায় জীবনযাপন করে' যদি গোলায় খাদ্যশস্য মজুত না থাকে, যদি রাজকোষ অর্থশূন্য হয়, তাহলে ভবিষ্যতে সমস্ত দোষ দেশের শাসকের ওপর বর্ত্তাবে।

কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ নজর রাখতে হবে যার তালিকা আমি নীচে যোগ করছি। কোনও কোনও বিষয়ে তোমাকে আগেই লিখেছি যাতে তুমি প্রস্তুত হতে পার। তালিকাটি এইরূপ :—দুর্গ সম্পূর্ণভাবে মেরামত করতে হবে। শস্যাগার শস্যপূর্ণ করতে হবে, পশু খাদ্যও মজুদ রাখতে হবে। দূতদের আগমনির্গম ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে—যাতে তাদের কোনও অসুবিধা না হয়, বড় মসজিদ অবশ্যই মেরামত করতে হবে। ফুল ও ফলের বাগানের ওপর যে কর ধার্য্য আছে সেই আয় থেকে ব্যয় নির্ব্বাহ করতে হবে। স্নানাগার ও দুর্গের অভ্যন্তরে যে অলিন্দ ওস্তাদ আলি ইট দিয়ে তৈরী করেছে এবং যে প্রসাদের এখনও নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয় নাই, সেগুলির সংস্কার এবং নির্ম্মাণের কাজ ওস্তাদ সুলতান মহম্মদের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ করতে হবে। যদি ওস্তাদ হাসান আলি কোনও নক্সা ইতিমধ্যে করে থাকে তাহলে সে যেন সেই অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দেয়। যদি সে কোনও নক্সা প্রস্তুত না করে থাকে তাহলে তোমরা দুইজন একত্রে আলোচনা করে একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নক্সা প্রস্তুত করবে। নক্সা করার সময় নজর রেখো যাতে বিচার কক্ষ ও দরবার কক্ষের মেঝের সমতা থাকে। আবার বলছি বাদাসখাকের কাছে ছোট কাবুলে যখন যাবে তখন ওখানকার অট্টালিকাগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়ে যেন সংস্কার করা হয়। গজনির জলের বাঁধও সম্পূর্ণ মেরামত করার ব্যবস্থা করবে। প্রমোদ উদ্যানে জল সরবরাহের ব্যবস্থা অপ্রচুর। এমন একটি স্রোতস্বতীর সন্ধান করতে হবে যার স্রোতের বেগে একটা কল চলতে পারে এবং সেই স্রোতের জল বাগানে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি পূর্ব্বে খাজের (বাস্তের) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি উঁচু জমির পাদদেশ টুটুনদার নদীর

জল এই ভাবে আনার ব্যবস্থা করেছিলাম। সেখানে আমি নানাজাতের বৃক্ষ রোপন করি। এই উদ্যানের ভবিষ্যৎ এত উজ্জল মনে হয় যে—আমি এর নাম রাখি—'নজের গা' (সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর)। নানা ফলের বাগান থেকে উৎকৃষ্ট গাছ সংগ্রহ করে প্রমোদ উদ্যানে রোপণ করে বাগানের চারিধারে সুগন্ধি পুষ্পের চারা ও গুল্ম নক্সা অনুযায়ী লাগাবার ব্যবস্থা করবে।

গোলন্দাজ বাহিনীর লোকদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য সৈয়দ খাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

এ কথা স্মরণ রেখো যে অস্ত্র নির্ম্মাণ বিশারদ ওস্তাদ মহম্মদ হাসানের যেন কোনও রকম অযত্ন না হয়।

এই পত্র তোমার হাতে পৌঁছানোর পর কোনও রূপ কালক্ষেপ না করে আমার ভগ্নী ও পত্নীদের এখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তুমি নিলাব পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে আসবে। কাবুল ত্যাগ করার ব্যাপারে যত বাধা বিঘ্নই আসুক না কেন, এই চিঠি পাওয়ার সাত দিন মধ্যেই তাদের কাবুল ত্যাগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে। হিন্দুস্থান থেকে একদল সৈন্য তাদের সঙ্গে করে আনার জন্য ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। তারা তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। দেরী হলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হবে। যেখানে সৈন্যরা উপস্থিত হয়েছে সেখানকার অধিবাসীদের ও সৈন্য দলের উপস্থিতির জন্য অসুবিধা হবে।

আবদুল্লাকে যেচিঠি লিখেছি তাতেই উল্লেখ করেছি—অনুতপ্ত হয়ে যে সংযমের নীতি গ্রহণ করেছি তার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে খাপ খাওয়াতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। কিন্তু সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বজায় রাখার মত মনেরও জোর আমার আছে।

(তুর্কিতে) 'সুরাপান করি ত্যাগ, মনোপীড়া নিয়ে আছি।
কাজের অযোগ্য হয়ে হতাশায় ভুগছি।
অনুতাপ আমাকে সংযমী করেছে,
সংযম আমার মনে অনুতাপ এনেছে।'

বানাইয়ের একটি গল্প আমার এখনও মনে আছে। সে একদিন মির আলি সেরের পাশে বসে একটা রসাল কথা বলছিল। মির আলিসেরের গায়ে ছিল দামি বোতাম লাগানো কোর্ত্তা। মির বলেছিল-তোমার রসিকতাটা খুবই সুন্দর। আমি তোমাকে আমার গায়ের কোর্ত্তা বকসিস দিতে পারতাম কিন্তু এই বোতামগুলোর জন্যই পারছি না। বানাই উত্তরে বলে—বোতাম কেন বাধা

দেবে? বোতামের ঘরই বাধা দিচ্ছে। (তুর্কিতে বোতাম ঘরের আর এক অর্থ হচ্ছে নীচতা এবং পুরুষত্বহীনতা)। এই গল্পের সত্যতা অবশ্য যে আমাকে এই গল্প শুনিয়েছে—তারই সততার ওপর নির্ভর করবে। এই নির্বোধ অবাস্তর কথা লেখার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো। এর জন্য আমাকে ভুল বুঝো না।

চতুষ্পদী কবিতাটি, যা আমি উপরে উল্লেখ করেছি, গত বছর লিখেছিলাম। সত্যই গত বছর সুরার পিপাসা এবং সামাজিক মেলামেশার ইচ্ছাটা মাত্রাহীনভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এমন অবস্থায় আমি উপনীত হয়েছিলাম যে হতাশায় ও বিরক্তিতে আমি চোখের জল ফেলতাম। বর্ত্তমান বৎসরে আল্লার অসীম অনুগ্রহে এই যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি। এর প্রধান কারণ আমার মনে হয় এই যে কবিতার অনুবাদে নিজেকে নিযুক্ত করেছি বলে মন একটা খোরাক পেয়েছে। তোমাকেও আমি এই উপদেশ দিই যে তুমিও যেন সংযমের জীবনই গ্রহণ করো। আমুদে বন্ধুবান্ধব ও পুরোণো প্রাণের সুহৃদদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া এবং সুরাপান অবশ্যই আনন্দদায়ক। কিন্তু এমন কোন অকৃত্রিম বন্ধু আছে যার সঙ্গে তুমি সামাজিক সুখের পেয়ালায় চুমুক দিতে পার? সুরাপানের আনন্দ কোন বান্ধবের সঙ্গে উপভোগ করবে? যদি সের আহম্মদ ও হায়দার কুলির মত লোককে তোমার আনন্দময় মুহূর্ত্তে এবং সুরার পাত্র হাতে নেওয়ার সময় সঙ্গী হিসাবে পাও, তাহলে নিজেকে সে সুখে বঞ্চিত করতে এবং আমার উপদেশে সম্মত হতে তোমার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এই চিঠি শেষ করছি। শেষ জুমাদা মাসের ১লা তারিখ বৃহস্পতিবার (১১ই ফেব্রুয়ারি) লিখিত।।"

চিঠিগুলি অনেক কষ্টে লিখে শেষ করে—সমেসউদ্দিন মহম্মদের হাতে দিয়ে এবং তাকে মৌখিক কতকগুলি প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় বিদায় দিই।

শুক্রবার আমরা আটক্রোশ অগ্রসর হয়ে জুমানদ্রাতে আসি। কিতিনকারা সুলতানের একজন কর্ম্মচারী কামালউদ্দিন কনাকের কাছে সুলতানের কতকগুলি চিঠি নিয়ে আসে। কামাল উদ্দিনও সুলতানের আর একজন কর্ম্মচারী। সে আমার দরবারে সুলতানের দূত হিসাবে আছে। সেই চিঠিগুলিতে সীমান্তের আমিরদের আচরণ সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ ছিল। ঐ দিকে ডাকাতি ও নানা ধ্বংসকর কাজ ঘটছে বলে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছিল। কনাক ঐ লোকটিকে আমার কাছে পাঠায়। আমি কনাককে দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিই

এবং সীমান্ত প্রদেশের আমিরদের এই আদেশ জানাই যে তারা যেন ডাকাত ও ধ্বংসকার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত শ.স্তি দেয় এবং প্রতিবেশী শাসকদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলে। কিতিনকারা সুলতান (বালখের উজবেগ সর্দ্দার) যে লোক পাঠিয়ে ছিল তার সঙ্গেই আমার আদেশ পত্র পাঠাই এবং তাকে এখান থেকেই বিদায় দিই।

হাসান চালেবি পারস্যবাসী ও উজবেকদের মধ্যে জামের নিকট যে যুদ্ধ চলছিল তার বিবরণ দিয়ে সাকুলি নামে একজন লোককে আমার কাছে পাঠায়। আমি পারস্যের রাজার কাছে এই লোকটির মারফৎ চিঠি পাঠাই। চিঠিতে হাসান চালাবিকে কাজের চাপে ছাড়তে না পারায় ক্ষমা প্রার্থনা করি। সাকুলি ২রা তারিখ আমার কাছ থেকে বিদায় নেয়।

শনিবারও আমরা আটক্রোশ অগ্রসর হয়ে কলেজি পরগনার অন্তর্গত গাপুর ও হেমামনিতে গিয়ে থামি।

৪ঠা তারিখ, রবিবার আমরা নয় ক্রোশ অগ্রসর হয়ে কালপির আর একটি পরগণা দারেপুরে উপস্থিত হই। এখানে আমার মাথার চুল কামাই। প্রায় দুইমাস আমার মাথার চুল কামানো হয়নি। সেদিন শঙ্কুর নদীতে স্নান করি।

সোমবার (১৫ই ফেব্রুয়ারী) চৌদ্দ ক্রোশ অগ্রসর হয়ে কালপির আর একটি পরগণা চিরগিরে পৌছাই। পরদিন মঙ্গলবার সকালে কারচের একজন হিন্দুস্থানী ভৃত্য মাহিম বেগমের (বাবরের প্রিয়তমা স্ত্রী, হুমায়ুনের জননী) ফরমান কারচেব কাছে নিয়ে আসে। এই ফরমানে (রাজকীয় হুকুমনামা) আদেশ ছিল যে বেরে ও লাহোরের লোকেরা যেন গন্তব্যপথে তার নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করে। আমি যে রীতিতে নিজের হাতে হুকুমনামা লিখে থাকি এটাও সেই ভাবে লিখিত। কাবুলে প্রথম জুমাদা মাসের ৭ই তারিখ (১৮ই জানুয়ারি) এই হুকুমনামা লেখা হয়েছিল।

বুধবার (১৭ই ফেব্রুয়ারী) আমরা সাত ক্রোশ অগ্রসর হয়ে আদমপুর পরগণায় শিবির ফেলি। সেই দিন প্রত্যুষে কোনও সঙ্গী না নিয়ে অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়ি। মধ্যাহ্নের কিছু পরে যমুনার তীরে উপস্থিত হই। নদীর ভাটিতে তীরের কাছাকাছি দিয়ে চলতে থাকি ও আদিমপুরের অপর দিকে পৌছাই। নদীর একটা চড়ার ওপর সামিয়ানা খাটানোর ব্যবস্থা করে সেখানে মোদক খাই। এইখানে সাদিককে কালানের সঙ্গে কুস্তি লড়ার আদেশ দিই। কালান কুস্তি প্রতিযোগিতার জন্তই এসেছিল। আগ্রায় সে এই অজুহাত দেখিয়ে

কুস্তি লড়তে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল যে অনেক দূর থেকে আসায় সে পথশ্রমে ক্লান্ত, সুতরাং তাকে একুশ দিনের জন্য কুস্তি লড়া থেকে রেহাই দেওয়া হয়। তারপর চল্লিশ পঞ্চাশ দিন পার হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তার আর কোনও অজুহাত দেওয়ার উপায় ছিল না। সাদিক খুব সুন্দর কুস্তি লড়ে। সে কালানকে অতি সহজেই পরাস্ত করে। সাদিককে দশ হাজার মুদ্রা, একটি সজিন অশ্ব ও বোতামযুক্ত কুর্তা উপহার দিই। কালান পরাস্ত হলেও যাতে সে বেশী মনঃক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য তাকেও তিন হাজ র মুদ্রা ও একপ্রস্থ পোষাক দেওয়ার জন্য আদেশ করি।

নৌকার উপরই বন্দুক ও কামানে গোলা ভর্তি করার জন্য আদেশ দিই। এই সময়ের মধ্যে একটি রাস্তা তৈরি করে তার মাটি সমতল করারও নির্দেশ দিই যাতে কামান-বন্দুক নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধা না হয়। এই জায়গায় তিন চার দিন অপেক্ষা করি।

শেষ জুমাদা মাসের ১২ই তারিখ (২২শে ফেব্রুয়ারি) সোমবার বারো ক্রোশ এগিয়ে গিয়ে কোরাতে থামি।

কোরা থেকে পুনরায় বারো ক্রোশ এগিয়ে কোরার একটি পরগণা কুরিয়েতে বিশ্রাম করি (কোরা উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ জেলায় একটি প্রসিদ্ধ সহর। মাণিকপুরের বিপরীত দিকে গঙ্গার দক্ষিণ-তীরে এই সহর অবস্থিত)। কুরিয়ে থেকে আট ক্রোশ অগ্রসর হয়ে ফতেপুর আসওয়াতে পৌছাই ও ফতেপুর থেকে আট ক্রোশ এগিয়ে গিয়ে সেরাইমিদাতে শিবির স্থাপন করি। এখানে বিশ্রাম করার সময় রাতের নামাজের কাছাকাছি সময় সুলতান জালালুদ্দিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও অভিবাদন জানায়। সে তার সঙ্গে দুটি ছেলেকেও নিয়ে এসেছিল।

পরদিন সকালে শনিবার (২৭শে ফেব্রুয়ারি) আট ক্রোশ অগ্রসর হয়ে গঙ্গার তীরে কোরার আর একটি পরগণা ডাকডাকিতে পৌছাই।

রবিবার (২৮শে ফেব্রুয়ারি) মহম্মদ সুলতান মির্জা' কাসিম হোসেন সুলতান, বেয়াকুব সুলতান ও তাদিক এই জায়গায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সোমবার আসকারিও এইখানে এসে আমাকে অভিবাদন জানায়। এরা সকলেই গঙ্গার পূর্বদিক থেকে আসে। গঙ্গার অপর পারে যেখানে কতক সৈন্য এসে পৌছিয়েছে তাদের নিয়ে আসকারিকে অগ্রসর হতে হবে এবং যেখানেই সৈন্যরা বিশ্রাম করবে আস কারিকে তার বিপরীত তীরে শিবির ফেলতে হবে।

আমি এই জায়গার কাছাকাছি থাকার সময় অনবরত আমার কাছে এই সংবাদ আসতে থাকে যে সুলতান মামুদ এক লক্ষ আফগান সংগ্রহ করেছে, সে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সেখ বেজিদ ও বিবনকে সারওয়ারের (গোরখপুর) নিকটে পর্যুদস্ত করে তাদের পৃথক করে ফেলেছে। সে এবং ফতে খাঁ সেরওয়ানি গঙ্গার দুই তীর আয়ত্তে এনে চুণারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সের খাঁ সুর, যাকে আমি পূর্ব্বে অনুগ্রহ দেখিয়ে কতকগুলি পরগণার অধিকার দিয়ে ঐ দিককার শাসনভার অর্পণ করেছিলাম, সেও আফগানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আরও কয়েকজন আমিরের সঙ্গে সে নদী পার হয়েছে। • সুলতান জালালুদ্দিনের লোকজন বেনারস রক্ষা করতে অক্ষম হয়ে সে জায়গা ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছে। তারা অবশ্য এই অজুহাত দেখায় যে তারা বারাণসীর দুর্গ রক্ষার জন্য যথেষ্ট সৈন্য রেখে এসেছে এবং তারা গঙ্গার তীরে শত্রুর মুখোমুখি হবার জন্য অগ্রসর হয়ে এসেছে।

'ডাকডাকি' থেকে রওনা হয়ে ছয় ক্রোশ এগিয়ে এসে কারার দুই তিন ক্রোশের মধ্যে কুশারে শিবির স্থাপন করি। আমি এখানে জলপথে আসি। জালালুদ্দিন সুলতান আমাকে অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন করায় এখানে আমাদের দুই তিন দিন অবস্থান করতে হয়। কারার দুর্গ অভ্যন্তরে জালালউদ্দিনের প্রাসাদে আমার অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থা হওয়ায় আমি তার অতিথি হিসাবে সেইখানে যাই। সে নিজেই আমার সামনে কয়েকটি থালায় আহার্য্য পরিবেশন করে। আমি তাকে আর তার ছেলেদের প্রত্যেককে একটি সোনার জরি খচিত ইয়াকৃতা, জামা ও নিম্‌চে উপহার দিই। (ইয়াকৃতা—আস্তরণ বিহীন কোর্ত্তা, জামা—লম্বা গাউন, নিম্‌চে—কোমর পর্য্যন্ত ঝুলের কোট বিশেষ)। তার জ্যেষ্ঠপুত্রকে সুলতান মামুদ এই পদবী প্রদান করি।

কারা ত্যাগ করে আমি ক্রোশখানেক, অশ্বারোহণে যাই এবং গঙ্গার তীরে বিশ্রাম গ্রহণ করি। গঙ্গার তীরে পৌঁছানোর পর মাহামের চিঠি নিয়ে সাবরেক আমার সঙ্গে দেখা করে। চিঠির উত্তর দিয়ে তাকে ফেরৎ পাঠাই। খাজা ইয়াহিয়ার নাতি আমার আত্মকথার যতটা লিখেছি তার নকল চেয়ে পাঠায়। এক প্রস্থ নকল আগেই করা ছিল। সেইটিই সারবেকের হাত দিয়ে পাঠাই।

পরদিন (৬ই মার্চ) রওনা হয়ে চার ক্রোশ এগিয়ে যাওয়ার পর যাত্রা স্থগিত রাখি। আমার নিয়মানুসারে নৌকায় চড়ি! শিবিরের জায়গা বেশী দূরে ছিল না জন্য তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে যাই। কিছুক্ষণ পর নৌকাতেই আমি

মোদক খাই। খাজা আবদুল সহিদ নূর বেগের বাড়ীতে ছিল। তাকে ডেকে পাঠাই। মোল্লা আলি খাঁয়ের বাড়ী থেকেও আল্লা মামুদকে ডাকিয়ে আনি। কিছুক্ষণ নৌকায় বসে থাকার পর আমরা অপর পারে যাই। সেখানে কুস্তি করার জন্য কয়েকজন কুস্তিগিরকে আদেশ দিই। দোস্ত ইয়াসিন খয়েরকে এই নির্দ্দেশ দিই যে সে প্রথমে যেন শ্রেষ্ঠ মল্লবীর সাদিকের সঙ্গে না লড়ে তার মল্ল নৈপুণ্য যেন অন্যান্য কুস্তিগিরের সঙ্গে লড়ে দেখায়। কিন্তু আমাদের নির্দ্দেশ চল্‌তি নিয়মের বিপরীত—কারণ রীতি এই যে প্রথমে শ্রেষ্ঠ কুস্তিগিরের সঙ্গে লড়তে হয়। যা হোক, সে আট জন বিভিন্ন কুস্তিগিরের সঙ্গে সুন্দর ভাবে কুস্তি লড়ে।

বৈকালিক নমাজের সময় সুলতান মহম্মদ বক্‌সি নদীর অপর পার থেকে নৌকায় এপারে এসে পৌছায়। সে সুলতান ইসকান্দারের পুত্র মামুদ খাঁর—যাকে বিদ্রোহীরা সুলতান মামুদ এই গৌরবজনক পদবী দিয়ে সম্মানিত করেছিল—ধ্বংসের বিবরণ নিয়ে এসেছিল। আমার সৈন্যদলের মধ্যে যে গুপ্তসংবাদ সংগ্রহের কাজ নিয়ে ঐদিকে গিয়েছিল সে মধ্যাহ্ন নমাজের সময় ফিরে এসে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গের সংবাদ দেয়। মধ্যাহ্ন ও বৈকালিক নমাজের সময়ের মধ্যে তাজ খাঁ সারংখানির যে একখানি চিঠি আসে তাতেও গুপ্তচরের সংগ্রহ করা সংবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। জানা গেল যে বিদ্রোহীরা চুণার এসে দুর্গ অবরোধ করে, এমন কি লঘুভাবে আক্রমণও করে। কিন্তু আমার এদিকে আগমনের নিশ্চিত সংবাদ পেয়ে তারা আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে বিশৃঙ্খলভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং দুর্গ অবরোধও তুলে নেয়। যে সব আফগান বারাণসী গিয়েছিল তারাও সেখান থেকে বিশৃঙ্খলভাবে সরে পড়ে। তাদের দুইখানি নৌকা নিমজ্জিত হয় ও তাদের কতক সৈন্য নদীতে ডুবে মারা যায়।

পরের দিনও আমি নৌকায় চড়ি। আধা-আধি ভাটিতে যাওয়ার পর আইসান তাইমুর সুলতান ও তুখ্‌তে বাঘা সুলতানকে দেখতে পাই। তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আমাকে কুর্ণিশ করার জন্য মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাদের নৌকায় ডাকিয়ে আনি। তুখ্‌তে বাঘা সুলতান তার কয়েকটি ঐন্দ্রজালিক খেলা দেখালো। জোর হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। বাতাসের বেগ বেড়ে যেতে আমি মোদক খেতে বাধ্য হলাম। আগের দিন একবার মোদক খেলেও এই দিনেও শিবিরে পৌছিয়ে আবার খেলাম।

পরদিনও এই শিবিরেই বিশ্রাম নিই।

মঙ্গলবার আবার যাত্রা সুরু হয়। দূরে একটি সবুজ তৃণাচ্ছাদিত দ্বীপ দেখতে

পাই। নৌকাযোগে সেই দ্বীপে পৌঁছে ঘোড়ার পিঠে চারদিকে ঘুরে দেখে বেলা প্রহরখানেকের সময় আবার নৌকায় উঠি। নদীর তীর দিয়ে ঘোড়ার পিঠে যেতে যেতে আমি অজ্ঞাতসারে এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছিলাম যার ভেতরটা নদীর স্রোতের টানে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। যে মুহূর্তে আমি সেখানে গিয়েছি অমনি ওপরের মাটি ভেঙ্গে পড়ে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে শক্ত মাটির ওপর পড়লাম। কিন্তু আমার ঘোড়াটা আছাড় খেয়ে পড়লো। যদি আমি ঘোড়ার পিঠেই থাকতাম তাহলে ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পড়তে হতো। এই দিনই আমি আনন্দ করার জন্য গঙ্গায় সাঁতার কাটি। সাঁতার দেওয়ার সময় আমি যতবার হস্ত-চালনা করি তার সংখ্যা গণনা করি। দেখলাম যে তেত্রিশবার হস্তচালনা করে গঙ্গা পার হয়ে এসেছি। এ পারে এসে বিশ্রাম না করেই শুধু নিশ্বাস ফেলার সময় নিয়েই আমি অন্য তীরে ফিরে আসি। সাঁতার কেটে প্রত্যেক নদীই পার হয়েছি— কেবল গঙ্গা নদী বাকি ছিল। যেখানে গঙ্গা ও যমুনা মিলেছে সেইখান থেকে নৌকা চালিয়ে প্রয়াগের দিকে যাই ও রাত দশটা নাগাদ শিবিরে পৌঁছাই।

বুধবার (১০ই মার্চ) সৈন্যদল যমুনা পার হতে আরম্ভ করে। আমাদের সঙ্গে ছিল চারশ' কুড়িটি নৌকা।

রাজেব মাসের পয়লা তারিখ (১২ই মার্চ) আমি নদী পার হয়ে আসি।

৪ঠা তারিখ সোমবার যমুনার তীর থেকে সসৈন্যে বেহারের দিকে এগোতে থাকি। পাঁচ ক্রোশ এসে লাওয়ানে এসে থামি। অভ্যাস মত নৌকায় চড়ি। সৈন্যরা অবশ্য সারাদিনই পথ চলতে থাকে। আমি এই সময় নির্দেশ দিই যে কামান ও কামানের গাড়ী যেগুলি আদমপুরে নামানো হয়েছে সেগুলো আবার প্রয়াগ থেকে নৌকায় চাপিয়ে জল পথেই পাঠাতে হবে। মাটিতে নেমে আমরা কুস্তিগিরদের নৌকার মাঝি লাহোরি পালওয়ানেয় (লাহোরের কুস্তিগির) কুস্তি লড়তে লাগিয়ে দিই। দোস্ত তাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয় বটে কিন্তু সেটা অনেক চেষ্টার পর এবং অতি কষ্টে। তাদের দুইজনকেই এক প্রস্থ করে পোষাক দিই। কিছু দূরেই ঘোলা জলের তুব নদী। আমরা এই জায়গায় দুই দিন অবস্থান করি। উদ্দেশ্য ছিল নদী পার হওয়ার জন্য এমন একটা জায়গা ঠিক করা যেখানে জল কম এবং একটি রাস্তা তৈরি করা। রাত্রের দিকে একটা নদীপথ আবিষ্কার করা গেল যেখানে ঘোড়া ও উট পার করানো যেতে পারে কিন্তু বোঝাই গাড়ী পার করানো সম্ভব নয়, কারণ জলের তলা টুকরো পাথরে

ভর্তি। যাহোক, আদেশ দেওয়া হলো যে মাল বোঝাই শকটগুলি যে কোনও উপায়ে নৌকায় পার করতে হবে।

বৃহস্পতিবার (১৮ই মার্চ) সেখান থেকে রওনা হই। নৌকায় চড়ে যেখানে তূষ নদী প্রধান নদী গঙ্গায় এসে মিশেছে সেইখানে এসে পৌঁছাই। এই দিন সৈন্যরা ছয় ক্রোশ অগ্রসর হয়।

পরদিন সকালে এই জায়গায় বিশ্রাম নিই।

শনিবার আমরা বারো ক্রোশ এগিয়ে নিলাবে গঙ্গার তীরে পৌঁছাই। সেখান থেকে পরদিন সকালে রওনা হয়ে ছয় ক্রোশ পথ চলার পর একটি গ্রামে পৌঁছিয়ে বিশ্রাম করি। সেখান থেকে চার ক্রোশ চলার পর নান্নুপুরে পৌঁছাই। এই জায়গায় বাকি খাঁ তার পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে চুণার থেকে এসে আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

এই সময় মামুদ বক্সির চিঠি থেকে এই সংবাদ পাই যে আমার পত্নীগণ পরিবারবর্গসহ কাবুল থেকে যাত্রা করেছে।

বুধবার (২৪শে মার্চ) এখান থেকে চুণার দুর্গ দেখতে যাই। চুণার থেকে এক ক্রোশ অগ্রসর হয়ে শিবিরে বিশ্রাম করি। প্রয়াগ থেকে যাত্রা কবার পর আমার শরীরে কতকগুলি যন্ত্রণাদায়ক স্ফোটক দেখা দেয়। এখানকার একজন চিকিৎসক আমার চিকিৎসা করে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি সম্প্রতি এইখানে আবিষ্কৃত হয়। পদ্ধতিটি এইরূপ। একটি মাটির পাত্রে গোলমরিচের গুঁড়া সিদ্ধ করা হয়। ফুটন্ত জলে যে গরম বাষ্প উঠতে থাকে সেই ধোঁয়া ঘাগুলিতে লাগাতে হয়। যখন বাষ্প কমে আসে তখন সেই গরম জলে ঘা ধুয়ে ফেলতে হয়। দুই ঘন্টা ধরে এই ভাবে চিকিৎসা চলে।

একটা লোক এসে সংবাদ দেয় যে আমাদের শিবিরের জায়গার কাছাকাছি সে একটা সিংহ ও গণ্ডার দেখেছে। পরদিন সকালে আমরা সেই জায়গাটা ঘিরে ফেলি। হাতী নিয়ে এসে শিকারের জন্য প্রস্তুত হই। কিন্তু কোনও সিংহ বা গণ্ডারের পাত্তা পাওয়া গেল না। শিকারের জন্য যে জায়গাটা ঘেরাও করা হয় তারই এক ধারে একটা বুনো মহিষ দেখা যায়। এই দিন জোড়ো বাতাস উঠেছিল। ধুলোয় ও ঝড়ে আমাদের খুব বিরক্তির কারণ হয়েছিল। যাহোক, জলপথে উজানে বারাণসী থেকে দুই ক্রোশ দূরে শিবিরে ফিরে আসি।

চুণারের চারদিকে জঙ্গলে অনেক হাতী আছে। হাতী শিকারের জন্য যখন সবেমাত্র এই জায়গা থেকে বের হবো সেই সময় বাকি খাঁ এই খবর নিয়ে আসে

যে মামুদ খাঁ শোণ নদীর তীরে এসে পৌঁচেছে। আমি তৎক্ষণাৎ আমিরদের আহ্বান করে আলোচনা করি যে আচম্বিতে আমাদের শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করা উচিত কিনা। আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত হয় যে আমরা অতিদ্রুত এবং ক্ষণমাত্র সময় ক্ষেপণ না করে দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে যাব।

সেইখান থেকে রওনা হয়ে নয় ক্রোশ অতিক্রম করে বানুয়ায় (বারাণসী জেলার একটি সহর) এসে পৌঁছাই। এখান থেকে সোমবার সন্ধ্যায় (২৮শে মার্চ) তাহেরকে আগ্রায় পাঠাই। কাবুল থেকে যে সব অভ্যাগতরা এসেছিল —তাদের কোষাগার থেকে টাকা দেওয়ার জন্য নির্দেশনামাগুলি সে সঙ্গে নিয়ে যায়।

এই দিনও আমি নৌকায় চড়ি। ভোরের আগেই নৌকায় উঠে জৌনপুরের গোমতী নদী যে জায়গায় গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলেছে সেই সঙ্গমস্থলে পৌঁছিয়ে সেখান থেকে নৌকাতেই আরও কিছুদূর উজানে গিয়ে আবার ফিরে আসি। গোমতী সঙ্কীর্ণ ছোট নদী হলেও জলের মধ্যে হেঁটে পার হওয়ার মত কোনও জায়গা পাওয়া গেল না। সেই জন্য সৈন্যরা বাধ্য হয়ে কখনও নৌকায় ও ভেলায়, কখনও বা সাঁতার দিয়ে, কখনও ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘোড়াকে জলে সাঁতরিয়ে নদী পার হতে হয়। গত বছব যেখানে ছাউনি ফেলে আমার সৈন্যরা জৌনপুরে এগিয়ে গিয়েছিল সেই শিবির আমি আশ্বারোহণে দেখে আসি।

অনুকূল বাতাস বইছে জন্য বাংলা দেশের একটা নৌকায় পাল খাটিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই নৌকার সঙ্গে একটি বড় নৌকা বেঁধে খুব দ্রুত চালিয়ে নেওয়া হয়। সৈন্যরা বারাণসী ত্যাগ করে উজানের দিকে এক ক্রোশ দূরে শিবির ফেলে। তখন দিনের মাত্র দুই ঘড়ি অবশিষ্ট ছিল। আমরা শিবিরে পৌঁছে যাই কারণ রাস্তায় কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না। যে নৌকাগুলো আমাদের পেছনে আসছিল সেগুলোও খুব তাড়াতাড়ি রাতের নমাজের সময় এসে পৌঁছায়। চুণারে আমি এই আদেশ দিই যে যখনই আমি ডাঙ্গাপথে আসবো, মোগল বেগকে সেই রাস্তাটা মাপের ফিতে দিয়ে মেপে ফেলতে হবে। আর প্রায়ই যখন আমি নদী পথে নৌকায় যাই, তখন লুংফি বেগকে নদীর তীর বরাবর মেপে যেতে হবে। রাস্তার মাপ হলো এগারো ক্রোশ আর নদী তীরের মাপ হলো আঠারো ক্রোশ।

পরদিন (৩০শে মার্চ) এই জায়গাতেই থেকে যাই।

বুধবার (৩১শে মার্চ) নদী পথে যাত্রা করে গাজিপুরের এক ক্রোশ ভাটিতে বেয়ে থামি।

বৃহস্পতিবার (১লা এপ্রিল) যখন শেষ উল্লিখিত স্থানে ছিলাম সেই সময় মহম্মদ খাঁ লাহোরি এসে আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এই দিন লাহোর থেকে শেষ জুমেদা মাসের ২০শে তারিখে (২রা মার্চ) লেখা আবদুল আজিজ আখুরের চিঠি পাই। যেদিন এই চিঠি লেখা হয় সেই দিন করাচের হিন্দুস্থানি ভৃত্য, যাকে আমি কালপির নিকটবর্ত্তী স্থান থেকে পাঠিয়েছিলাম, সে সেখানে পৌছেছিল। আবদুল আজিজের চিঠিতে জানতে পারি যে সে এবং অন্যান্য সকলে আমার আদেশ অনুসারে যাত্রা সুরু করেছে এবং শেষ জুমাদা মাসের ৯ই তারিখ (১৯শে ফেব্রুয়ারী) আমার পরিবারবর্গের সঙ্গে নিলাবে এসে মিলিত হয়েছে। আবদুল আজিজ আমার পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান করার জন্য চেনাব পর্য্যন্ত এসেছিল। তারপর তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে আগেই লাহোরে এসে পৌছেছে এবং সেখান থেকে এই চিঠি লিখেছে যেটা এখানে পেলাম।

শুক্রবার (২রা এপ্রিল) সৈন্যরা পুনরায় যাত্রা সুরু করে আর আমি আমার রীতি অনুযায়ী জলপথে অগ্রসর হয়ে চুসের বিপরীত দিকে যেখানে আমাদের আগের বছর শিবির ছিল ও যেখানে যাবার সময় সূর্য্যগ্রহণ হয়েছিল এবং আমরা উপবাস পালন করেছিলাম, সেইখানে এসে নৌকা থেকে মাটিতে নামি। আমি অশ্বারোহণে জায়গাটা পর্য্যবেক্ষণ করে আবার নৌকায় উঠি। মহম্মদ জেমান মির্জ্জা নৌকাতেই আমার সঙ্গে আসে। তার পীড়াপীড়িতে আমি একদফা মোদক খাই। সৈন্যরা কর্ম্মনাশার তীরে ছাউনি ফেলে। হিন্দুরা এই নদীর সংশ্রব কঠোরভাবে বর্জ্জন করে। তারা নৌকায় গঙ্গা নদী দিয়ে পার হয়। তাদের বিশ্বাস যদি কেউ কর্ম্মনাশার জল স্পর্শ করে তাহলে তার ধর্ম্ম নষ্ট হবে। তাদের মতবাদের সমর্থনে বলে যে কর্ম্মনাশা নামটির উৎপত্তির কারণই এই।

আমি নৌকায় উঠে পাল তুলে দিয়ে উজানে কিছুদুর যাই এবং ফিরে এসে গঙ্গানদী পার হয়ে উত্তর তীরে আসি। অন্য নৌকাগুলিকে এই তীরের কাছাকাছি আনা হয়। কিছু কিছু সৈন্য নানারকম ক্রীড়ায় মত্ত হয়। কেউ কেউ বা কুস্তি লড়তে থাকে। সাকি মহসিন চার পাঁচ জনকে কুস্তি লড়তে আহ্বান জানায়। একজনকে সে ধরে ফেলে এবং তৎক্ষণাৎ তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সাদে ওয়ান ছিল দ্বিতীয়। সে আবার মহসিনকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে।

এই পরাজয়ে মহসিন অত্যন্ত লজ্জিত ও অপদস্থ হয়। কয়েকজন ওস্তাদ কুস্তিগিরও আসরে নামে এবং কুস্তি করে।

পরদিন শনিবার সকালে একটি দলকে কর্মনাশা নদী পার হওয়ার উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচনের জন্য নিযুক্ত করি। নিজেও রওনা হই। ঘোড়ার সওয়ার হয়ে এক ক্রোশ নদীর উজানে এসেও যখন বোঝা গেল যে নদী পার হওয়ার সুবিধা জনক জায়গা অনেক দূরে তখন আমার অভ্যাস মত নৌকায় উঠে শিবিরে পৌছাই। সেনাবাহিনী চুসের এক ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করেছিল।

এই দিন আমি আবার ওষুধ ব্যবহার করি। ওষুধটি কিছু বেশী রকমের উত্তেজক দিল।—ফলে আমার সমস্ত শরীর ফেটে রক্ত বেরোবে বলে মনে হচ্ছিল। এতে আমি বেশ অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। কিছু দূরেই একটা পঙ্কিল ছোট নদী। পরদিন (৪ঠা এপ্রিল) সকালে আমরা এই জায়গাতেই ছিলাম। কারণ নদীর ধারের রাস্তা মেরামত করার প্রয়োজন ছিল। সন্ধ্যায় যে হিন্দুস্থানী হরকরাটি আবদুল আজিজের চিঠি নিয়ে এসেছিল তাকে চিঠির উত্তর দিয়ে ফেরত পাঠানো হলো।

সোমবার (৫ই এপ্রিল) সকালে নৌকায় উঠি। বাতাস অনুকূল না থাকায় নৌকা গুণ টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। গত বছর সেনা বাহিনীকে বক্সারের বিপরীত দিকে একটা জায়গায় অনেকদিন থাকতে হয়। সেই জায়গায় পৌছিয়ে নদী পার হয়ে তীরে নামি। জল থেকে ডাঙ্গায় ওঠার জন্য সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছিল। সিঁড়ির সংখ্যা চল্লিশের কাছা কাছি তবে চল্লিশের কম ছিল। ওপরের দিকে কয়েকটি মাত্র সিঁড়ি আছে আর সব জলে ভেসে গেছে। আমি আবার নৌকায় চড়ে মোদক খাই। শিবির থেকে কিছু উজানে একটা দ্বীপের মত জায়গা দেখে সেখানেই নৌকা নোঙর করে মল্লবীরদের কুস্তির কসরৎ দেখাতে বলা হয়। রাতের নমাজের সময় আমরা শিবিরে ফিরে আসি। গত বৎসর গঙ্গা নদী সাতার পার হয়ে যে জায়গায় আসি—যেখানে এবার শিবির পড়েছে—সেই জায়গাটা দেখতে এসেছিলাম। কেউ বা ঘোড়ার পিঠে কেউ বা উটের পিঠে নদী পার হয়েছিল। সেদিন আমি আফিং খাই।

পরদিন (৬ই এপ্রিল) মঙ্গলবার সকালে কাশিম বর্দি, মহম্মদ আলি হাইদার কিতাবদার (গ্রন্থাগারিক) এবং বাবা সেখের সঙ্গে বাছাই করা শ' খানেক লোককে শত্রু পক্ষের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য পাঠানো হয়। এই জায়গাতেই

-বঙ্গ দেশের দূতকে আমার তিনটি প্রস্তাব তার মনিবকে জানানোর জন্য আদেশ দিই।

বুধবার (৭ই এপ্রিল) ইউনিশ আলি ফিরে আসে। তাকে মহম্মদ জেমান মির্জ্জার কাছে পাঠানো হয়েছিল—বেহারের শাসক পদে তাকে নিযুক্ত করা সম্বন্ধে তার মনোভাব কি জানবার জন্য। (মহম্মদ জেমান মির্জ্জা খোরাসানের রাজা বদিয়াজ্জুমান মির্জ্জার পুত্র এবং বাবরের জামাতা)। মহম্মদ জেমান একটা এলোমেলো গোছের উত্তর দিয়েছে। বেহারের সেখজাদা বংশের একজন একখানি চিঠি নিয়ে আসে। তাতে সংবাদ ছিল যে শত্রুপক্ষ বেহার ত্যাগ করে পালিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৮ই এপ্রিল) রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কতকগুলি চিঠি বেহারীদের মধ্যে বিলি করার জন্য মহম্মদ আলি জং জংএর পুত্র তারদি মহম্মদকে পাঠাই। কয়েকজন তুর্কি ও হিন্দু আমির এবং দুই হাজার তীরন্দাজ সৈন্যকে তার সঙ্গে নেওয়ার জন্য আদেশ দিই। খাজা মুরসিদ ইরাকিকে বেহার সরকারে দেওয়ান নিযুক্ত করে তাকেও তারদি মহম্মদের সঙ্গে পাঠানো হয়। পরদিন সকালে সেখ জনি ও ইউনুস আলির সঙ্গে কয়েকটি আবেদন পত্র পাঠিয়ে মহম্মদ জেমান মির্জ্জা বেহারে যাওয়ার সম্মতি জানায়। আবেদন পত্রে নানা বিষয়ের মধ্যে একটি বিশেষ অনুরোধ ছিল যে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য কিছু সৈন্য যেন নিযুক্ত করা হয়। তার অধীনে কাজ করার জন্য কিছু সৈন্য নিযুক্ত করা হলো। সে নিজেও কয়েকজন নিযুক্ত করে।

১লা সাবান শনিবার (১০ই এপ্রিল) এই জায়গায় তিন চার দিন কাটানোর পর পুনরায় যাত্রা করি। এই দিনে একাই দল ছাড়া হয়ে ভোজপুর এবং বিহিয়া (সাহাবাদ জেলায়—বাবরের সময় যে জায়গা সুবাবাংলার মধ্যে ছিল) পরিদর্শন করে শিবিরে ফিরে আসি। সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরিত মহম্মদ আলি এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী একদল বিধর্ম্মীকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে তাদের পরাস্ত করে যেখানে সুলতান মহম্মদ ছিল সেইখানে পৌছায়। সুলতান মহম্মদের সঙ্গে ছিল দুই হাজার সৈন্য। অঘোর অগ্রগামী প্রহরীদের আগমন বার্ত্তা শোনা মাত্র ভয়ে ব্যকুল হয়ে দুইটি হাতীকে হত্যা করে দ্রুতবেগে সরে পড়ে। তার একজন কর্ম্মচারীকে কিছু সৈন্যের সঙ্গে অগ্রবর্ত্তী ফৌজ হিসাবে পাঠিয়েছিল। আমাদের কুড়িজন সৈন্যের একটি দলের সঙ্গে তাদের সঙ্ঘর্ষ হওয়ার পর তাদের অনেকেই পলায়ন করে। কয়েক জনকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে বন্দী করা

হয়। একজনের শিরচ্ছেদ করে তাদের দলের দুইজন সেরা লোককে বন্দী করে আমার কাছে নিয়ে আসে।

পরদিন সকালে (১১ই এপ্রিল) আমরা আবার রওনা হই। আমি নৌকায় উঠি। এই সময় মহম্মদ জেমান মির্জ্জাকে আমার নিজের তোষাখানা থেকে একটি সম্মানসূচক পোষাক, ছোড়া, কটিবন্ধ, একটি যুদ্ধ ঘোটক এবং একটি ছত্র উপহার দেওয়া হয়। বেহার সুবার ভার প্রাপ্ত হওয়ায় সে নতজানু হয়ে আনুগত্য ও শ্রদ্ধা জানায়। বেহার সরকারের রাজস্ব এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা স্থির করে এই টাকা আমার নিজস্ব কোষাগারে পাঠানোর ভার দেওয়ান হিসাবে মুরসিদ্ ইরাকের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

বৃহস্পতিবার (১৫ই এপ্রিল) বিশ্রাম স্থল থেকে আবার যাত্রা করি। আমি নৌকায় উঠি। সবগুলি নৌকা এক সারিতে পাশাপাশি আনার জন্য নির্দ্দেশ দিই। আমি নৌকায় চড়ার পর সমস্ত নৌকা একসঙ্গে চালানোর নির্দ্দেশ দিই। নদীর প্রস্থের অর্দ্ধেকেরও বেশী নৌকায় ভরতি হয়ে গেল। অবশ্য সমস্ত নৌকা এক সারিতে চালানো সম্ভব হলো না—কারণ নদীর গভীরতা কোনও জায়গায় কম কোনও জায়গায় বেশী। কোনও জায়গায় নদীর স্রোতের টান প্রবল আবার কোনও জায়গায় নদীর জল স্থির। এই সব কারণে অনেক সময়েই সমান দূরত্বে রাখা গেল না নৌকাগুলি। নৌকার সারির মধ্যে জলে একটা কুমির (ঘড়িয়াল) দেখা গেল। মানুষের উরুর মত একটা বেশ বড় গোছের মাছ কুমিরের ভয়ে জল থেকে লাফিয়ে একটা নৌকায় পড়ে। সেটাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসা হয়।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে আমি কয়েকটি নৌকার নাম করণ করি। যে নৌকাটি রাণা সঙ্গের সাথে যুদ্ধের আগে তৈরী হয়েছিল সেই 'বাবুরি' নামের পুরাণো নোকাটির নতুন নাম দেওয়া হলো—'আয়েসঁ'। ঐ বছরেই আরইস্ খাঁ একটা নৌকা তৈরী করে আমাকে পেশকোশ হিসাবে দেয়। সেই নৌকায় এসে নৌকার ওপর উঁচু মঞ্চ নির্মাণের আদেশ দিয়ে নৌকার নাম দিই—'আরাইস (অলঙ্কার)। সুলতান জালাল উদ্দিন যে নৌকাটি আমাকে 'পেশকোশ' হিসাবে দেয় তার ওপর একটা মঞ্চ আগেই তৈরী করা হয়। সেই মঞ্চের ওপর আর একটি মঞ্চ তৈরী করার আদেশ দিয়ে এর নাম করণ করি—'গুনিয়াইস্। আর একটা ছোট নৌকা যেটা সাধারণতঃ যখন তখন এবং যে কোনও কাজে আমার ভৃত্যরা ব্যবহার করতো—তার নাম দিলাম—'ফরমাস'।

পরদিন শুক্রবার (১৬ই এপ্রিল) এখানেই থাকি। মহম্মদ জেমান মির্জ্জার বেহার যাত্রার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে সে প্রায় দুই এক ক্রোস দূরে গিয়ে শিবির ফেলে। সেই দিনই সে ফিরে এসে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যায়। বাংলাদেশ থেকে দুইজন গুপ্তচর এসে আমাকে জানায় যে মকদুম আলমের নেতৃত্বে বাঙ্গালীরা চব্বিশ ভাগে বিভক্ত হয়ে গণ্ডক নদীর তীরে ঘাঁটি গেড়ে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। সুলতান মামুদের অধীন একদল আফগানি তাদের পরিবার বর্গ ও আসবাব পত্র দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু তাদের তা করতে না দিয়ে সেনাদলের সঙ্গে যাওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় আমি মহম্মদ জেমান মির্জ্জাকে বেহারে যেতে নিষেধ করে এক আদেশ পাঠাই এবং সেখ ইসকান্দারকে তিন চার শ' লোক সঙ্গে নিয়ে আগেই বেহারে পাঠিয়ে দিই।

শনিবার (১৭ই এপ্রিল) দুদু এবং তার পুত্র জালাল খান বেহার খানের একজন পত্র বাহক আমার শিবিরে আসে। (দুদু বেহারের আফগান রাজা সুলতান মহম্মদ সা লোহানির স্ত্রী এবং তার নাবালক পুত্র জালান উদ্দিন লোহানির অভিভাবিকা। সুলতান মহম্মদ ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান)। জানা গেল যে বাঙ্গালীরা তাদের সন্দেহের চোখে দেখছে। তাদের মনোগত অভিপ্রায় এই যে তারা যে কোনও সময় উপস্থিত হতে পারে এই কথা জানানোর ব্যবস্থা করে তারা বাঙ্গালীদের সঙ্গে মারামারি করে কোনও রকমে পালিয়ে নদী পার হয়ে বেহার প্রদেশে পৌঁছেছে। আমার প্রতি আনুগতা প্রদর্শনের জন্য তারা এই দিকেই আসছে।

এই দিনই বাংলার দুত ইসমাইল মিতার কাছে খবর পাঠাই যে আমি যে তিনদফা লিখিত প্রস্তাব তাঁর হাতে দিয়েছিলাম এবং যা তিনি বাংলার দরবারে পাঠিয়েছিলেন তার উত্তর পেতে অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে। তিনি অবশ্য অবশ্য জরুরি চিঠি লিখে তাঁর দরবারকে জানিয়ে দেন যে প্রস্তাবগুলির প্রত্যেকটির যথাযথ জবাব অবিলম্বে আমি চাই। তাঁর প্রভু যদি সত্যই বন্ধুজনোচিত মনোভাব এবং শান্তি রক্ষার ইচ্ছা পোষণ করেন তা হলে সেই কথা প্রকাশ করতে তাঁর কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যদি সত্যই তাঁর ঐ মনোভাব থাকে তাহলে সে কথা জানাতে যেন আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করেন।

রবিবার তারদি মহম্মদ জং জংএর কাছ থেকে একজন সংবাদ বাহক আসে। তার কাছ থেকে জানা গেল যে ৫ই সাবান বুধবার তার অগ্রগামী প্রহরী সৈন্যরা

একদিকে পৌঁছিলে সেখানকার শিকদার অন্য নৌকা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে।

রবিবার (১৮ই এপ্রিল) আমি আবার যাত্রা সুরু করে আরা পরগণায় এসে থামি। এখানে সংবাদ পাই যে খরিদের (একটি পরগণা—বালিয়া জেলার বাঁশদি তহশীলের অন্তর্গত এবং সিকেন্দারপুরের চার মাইল দূরে অবস্থিত) সেনাবাহিনী গঙ্গা ও সরযূর মোহনায় সমবেত হয়েছে এবং একশো, দেড়শোটি নৌকা সংগ্রহ করেছে। আমি তখনও বঙ্গদেশের সঙ্গে সদ্ভাব পোষণ করে আসছি। সব সময়ে আমি এই মনোবৃত্তি অবলম্বন করে থাকি যে যার সঙ্গে আমার সদ্ভাব ও শান্তির চুক্তি বিদ্যমান আছে, আমার পক্ষ থেকে কোনও কাজ সেই শান্তির যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। এরা অবশ্য আমায় গতিপথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার দেখাচ্ছে না। তবুও আমার উল্লিখিত নীতির বশে এবং এতদিন তাদের সঙ্গে সদ্ভাব পোষণ করায় মনে করলাম যে বাংলার দূত ইসমাইল মিতার সঙ্গে মোল্লা মহম্মদ মজাহাবকে বাংলায় পাঠানো উচিত। স্থির করলাম যে মোল্লা আমার পূর্ব্বের তিনটি প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করে তার কি প্রতিক্রিয়া হয় জেনে আমার কাছে ফিরে আসবে।

সোমবার (১৯শে এপ্রিল) বাংলার দূত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসে। তাকে বাংলায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে জানিয়ে দিলাম যে আমি এগিয়ে যাব না পিছিয়ে আসবো তা নির্ভর করবে আমার নিজের মেজাজের ওপর। বিদ্রোহ যেখানেই দেখা দেবে সেখানেই আমি উপস্থিত হয়ে বিদ্রোহ দমন করবো। কিন্তু আমি এইটুকু তাকে জানাচ্ছি যে তার প্রভুর রাজ্য—জলে ও স্থলে—ক্ষতিগ্রস্থ করার আমার ইচ্ছা নাই। তবে তাঁরও সেই মনোভাব দেখাতে হবে। আমার তিনটি প্রস্তাবের একটি হচ্ছে—আমি যে পথ ধরে চলেছি সেই পথ থেকে খরিদের সৈন্যকে সুরিয়ে নেওয়ার আদেশ দিতে হবে। আমি কয়েকজন তুর্কিকে তাদের সঙ্গী হিসাবে দিতে চাই যাতে তারা নিরাপদে ঘরে ফিরে যেতে পারে। এই আশ্বাসও দিতে পারি যে তাদের কোনও ক্ষতি করা হবে না। তারা নিরাপদে তাদের বাড়ী ফিরে যেতে পারবে। যদি তিনি আমার পথ মুক্ত করতে অস্বীকার করেন এবং আমার প্রস্তাবগুলি মেনে নিতে অবহেলা করেন তাহলে তাঁর মাথার ওপর যে বিপদই ঘনিয়ে উঠুক না কেন তার জন্য তিনিই দায়ী হবেন এবং এরপর যে অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হবে তার জন্য একমাত্র তিনিই দোষী হবেন।

বুধবার বাংলার রাজদূত ইসমাইল মিতাকে সম্মানসূচক পোষাক ও অন্যান্য উপহার দিয়ে বিদায় দিই।

২২শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার তুহু ও তাঁর পুত্র জালান খাঁর কাছে নিরাপদ আশ্রয়ের ভরসা ও শুভ কামনা জানিয়ে চিঠি লিখে সেখ জামালির হাতে পাঠাই।

২৫শে এপ্রিল, রবিবার মোল্লা মহম্মদ মজাহাবকে উপযুক্ত উপহার দিয়ে বিদায় দিই॥

সোমবার খলিফা ও অন্যান্য আমিরদের কোনখানে নদী পার হওয়া সুবিধা জনক তা ঠিক করতে পাঠাই।

২৮শে এপ্রিল বুধবার পুনরায় ঘাগরা ও গঙ্গা এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী জমি পরীক্ষার জন্য খলিফাকে পাঠাই। আমি ঘোড়ায় চড়ে দক্ষিণ দিকে আরার কাছাকাছি আসি। উদ্দেশ্য জলপদ্মের ক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করা। পদ্মবনের মধ্যে যখন আমি ঘুরছি সেখ গুরণ তখন কয়েকটি তাজা পদ্মবীচি আমাকে দেয়। এগুলো দেখতে অবিকল টাটকা পেস্তার মত। খেতেও সুস্বাদু। এই ফুলকে আমরা বলি—নিলুফর। হিন্দুস্থানীরা একে বলে 'কাওয়েল কাকেরি' আর এর বীচিকে বলে—'তুদা'।

সোন্ নদী নিকটেই শুনে ঘোড়ায় উঠে সেই দিকে গেলাম। সোন্ নদীর ভাটিতে মুনিরে অনেক রকমের গাছ আছে। (গাজিপুর জেলার মুনির একটি সহর)। আমরা শিবির ছেড়ে এতদুর এসেছি আর মুনির যখন এত নিকটে তখন সোন্ নদীর ভাটিতে তিন চার ক্রোশ গিয়ে মুনিরে পৌছাই। এইখানে সেখ সরাফউদ্দিন মুনিরের পুত্র ইয়াহিয়ার সমাধি আছে। (সেখ ইয়াহিয়া বেহারের খ্যাতনামা সুফি সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ পুরুষ। তিনি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সম সাময়িক। ১৩৮০ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। সোন্ এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে তাঁর সমাধিক্ষেত্র মুসলমানদের কাছে অতি পবিত্র বলে গণ্য)।

মুনিরের উদ্যানগুলির মধ্যে ঘুরে আমি সমাধিক্ষেত্র পরিদর্শন করি। তারপর সোন নদীর তীরে এসে নদীতে স্নান করি। দুপুরের নমাজের কিছু পূর্ব্বেই শিবিরে ফিরে আসি। আমাদের কয়েকটি ঘোড়া পথ চলার শ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং আমাদের নতুন ঘোড়া সংগ্রহ করতে হয়। ক্লান্ত ঘোড়াগুলির পরিচর্য্যার জন্য কয়েকজনকে সেখানেই রেখে আসতে হলো। আদেশ দিলাম যে ঘোড়াগুলির বিশ্রামের ব্যবস্থা করে তাদের ক্লান্তি দুর হলে তারা যেন

ধীরে সুস্থে ঘোড়াগুলিকে পরে নিয়ে আসে। এই রকম ব্যবস্থা না করে আমাদের অনেকগুলি ঘোড়াকেই হারাতে হতো। মুনির থেকে চলে আসবার সময় আদেশ দিই যে সোন নদীর তীর থেকে শিবির পর্য্যন্ত আসতে একটা ঘোড়া যতবার পদক্ষেপ করবে সেই সংখ্যা গুণতে হবে। গণনায় দেখা গেল যে তেইশ হাজার একশ' হয়েছে—যা মানুষের ছেচল্লিশ হাজার দুইশ' পদক্ষেপের সমান—অর্থাৎ সাড়ে এগারো মাইল। (৪০০০ পদক্ষেপ—এক মাইল)। মুনির থেকে সোন্ নদীর দূরত্ব এক মাইল। সুতরাং শিবিরে ফিরতে আমাদের বারো মাইল পথ আসতে হয়েছে। তা' ছাড়া নানা জায়গা ঘুরে দেখতে আমাদের সেদিন মোটের ওপর পনেরো ষোলো মাইল পথ চলতে হয়েছে। রাতের প্রথম প্রহরের ছয় ঘড়ির (রাত প্রায় সাড়ে আটটা) পর আমরা শিবিরে ফিরে আসি।

বৃহস্পতিবার (২৯শে এপ্রিল) সকালে সুলতান জুনিদ বিরলাস জৌনপুর থেকে সৈন্য নিয়ে পৌছায়। তার বিলম্বের জন্য অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করি। তাকে ভৎসনা করি। তাকে প্রত্যভিবাদন করি না। আমি কিন্তু কাজিজিয়াকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে আলিঙ্গন করি।

এই দিনই আমি তুর্কিও হিন্দু আমিরদের আলোচনা সভায় আহ্বান করে কোনখানে নদী পার হওয়া সুবিধাজনক হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের অভিমত গ্রহণ করি। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হয় যে গঙ্গা ও সরযূ নদীর মাঝখানে একটা উঁচু জায়গায় ওস্তাদ আলি কামানগুলি সাজাবে এবং গোলন্দাজদের প্রস্তুত রেখে সেখান থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণ করবে। দুই নদীর সঙ্গমস্থলের কিছু ভাটিতে একটা দ্বীপের মত জায়গার বিপরীত দিকে—যেখানে অনেকগুলি নৌকা জমায়েত হয়েছে—মুস্তাফা বেহারের দিকের গঙ্গার তীরে কামান, বন্দুক, গোলাগুলি নিয়ে গোলাবর্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। তার অধীনে কয়েকজন গোলন্দাজ সৈন্যকেও নিযুক্ত করা হবে। মহম্মদ জেমান মির্জ্জা এবং আরও অনেককে মুস্তাফার পেছনে ঘাঁটি করে মুস্তাফাকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। ওস্তাদ আলি কুলি ও মুস্তাফার কাজে সহায়তার জন্য কয়েকজন ওভারসিয়ার ও পরিদর্শক নিযুক্ত করতে হবে। তাদের কাজ হবে—যে সব শ্রমিক মাটি খোঁড়া, মাটি ফেলে জায়গা উঁচু করা, কামান ইত্যাদি যথাস্থানে স্থাপন করার কাজে নিযুক্ত থাকবে এবং যারা যুদ্ধাস্ত্র ও গোলা বারুদ বহন করে যথাস্থানে মজুত করবে—তাদের দিকে লক্ষ্য রাখা। আস্কারি, সুলতান এবং খাঁরা যাদের

ওপর কাজের ভার পড়েছে তারা দ্রুত যাত্রা করে হলদি ঘাটের কাছে নদী অতিক্রম করবে। যখন গোলাবর্ষণের জন্য কামান ইত্যাদি বসানোর কাজ শেষ হবে তখন তারা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। এইভাবে শত্রুদের নানা দিক দিয়ে আক্রমণ করতে হবে।

সুলতান জুনিদ ও কাজি জিয়া আমাকে জানায় যে আট ক্রোশ উজানে নদী পারের একটা ভাল জায়গা আছে। একজন মাঝি এবং সুলতান জুনিদ, মহম্মদ খাঁ ও কাজি জিয়ার লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে জারদরুকে সেই পার হওয়ার জায়গাটিরে সন্ধান করতে এবং সম্ভব হলে সেইখানে নদী পার হয়ে যেতে আদেশ দিই। আমার লোকেরা সংবাদ পায় যে বাঙ্গালীরা হলদির ঘাট পাহারা দেওয়ার জন্য একদল লোক নিযুক্ত করার মতলব করছে। ইস্‌কান্দারপুরের শিকদার ও মামুদ খাঁয়ের কাছ থেকে খবর এলো যে তারা হলদিঘাটের কাছে প্রায় পঞ্চাশটি নৌকা সংগ্রহ করে মাঝি মাল্লাও ভাড়া করেছে। কিন্তু বাঙ্গালীরা এইদিকে আসছে শুনে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। সরযূ নদী পার হওয়ার একটা পথ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে মনে করে যারা নদী পার হওয়ার জায়গা ঠিক করতে গিয়েছে তাদের ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করেই আমি শনিবারে আমিরদের আবার আলোচনা সভায় ডাকি। তাদের বলি ইসকান্দারপুর চতুর্ম্মুখ থেকে অযোধ্যা এবং বারহাজ (গোরখপুর জেলার একটি সহর) পর্য্যন্ত সমস্ত নদীতে হেঁটে পার হওয়ার অসংখ্য জায়গা আছে। আমার মতলব এই রকম— সেনা বাহিনীকে ছয় ভাগে ভাগ করে ফেলতে হবে। প্রধান সেনা বাহিনীকে হলদি ঘাটে নদী পেরিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের প্রতিরোধ পরিখা থেকে বের করে এনে যতক্ষণ না ওস্তাদ আলি কুলি ও মুস্তাফা নদী পার হয়ে এসে কামান প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র সাজিয়ে গোলাবর্ষণ সুরু করতে পারে ততক্ষণ তাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আমি স্বয়ং নদী পার হয়ে ওস্তাদ আলি কুলিকে সাহায্য করার জন্য একদল সৈন্য নিয়ে সতর্ক হয়ে আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করবো। সৈন্য বাহিনীর প্রধান দল পথ করে নিয়ে শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছিলে আমার দিক থেকে আক্রমণ সুরু করবো। মহম্মদ জেমান মির্জ্জা এবং অন্যান্য যাদের বেহারের দিকে গঙ্গার তীর থেকে কাজ করতে বলা হয়েছে তারা মুস্তাফাকে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধে নেমে পড়বে।

এই রকম বন্দোবস্ত ঠিক করে গঙ্গার উত্তরের সেনাবাহিনীকে চার ভাগে ভাগ করা হলো। আসকারির অধীনের সৈন্যদের নিয়ে গঠিত হলো প্রথম দল।

অধিনায়ক স্বয়ং আসকারি। দ্বিতীয় দলের অধিনায়ক হলো সুলতান জালাল-উদ্দিন সারকি। তৃতীয় দল গঠিত হলো কাসিম্ হোসেন সুলতান, বিয়াকুব সুলতান, ইৎমিস্ সুলতান, মামুদ খাঁ লোহানি গাজিপুরি, কুকি বাবা বাস্কে, তুনমিস উজবেক, কুবরণ চিরখি, হুসেন খাঁ এবং উজবেক সুলতানদের নিয়ে। তাদের সঙ্গে থাকবে দরিয়া খণিয়ারা (যারা নদীর তীর এবং নদীর স্রোতের ওপর লক্ষ্য রেখে নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করে)। চতুর্থ সৈন্য দলের পরিচালনার ভার দেওয়া হলো মুসা সুলতান ও সুলতান জুনিদ বিরলাসের ওপর। তাদের সঙ্গে ছিল জৌনপুরের কুড়ি হাজার সৈন্য। প্রতিটি বিভাগের সৈন্যদের যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করে অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়ে রবিবার সন্ধ্যাতেই যুদ্ধযাত্রায় রওনা করে দেওয়ার জন্য কয়েকজন দক্ষ কর্মচারী নিযুক্ত করা হলো।

২২শে সাবান (২রা মে), রবিবার সেনাবাহিনী নদী পার হতে সুরু করে। আমি দিনের প্রথম প্রহরে (সকাল ছয়টা) নৌকায় নদী পার হই। জর্দরুই তার দলবল সহ দুপুরে ফিরে আসে। নদী পার হওয়ার উপযুক্ত স্থানের তারা সন্ধান পায়নি। তবে তারা নৌকার সন্ধান পেয়েছে এবং পথে সৈন্যদের নৌকাগুলির দিকে এগিয়ে আসতে দেখেছে।

২৪শে সাবান (৪ঠা মে) যেখানে নদী পার হই সেখান থেকে আমরা এক ক্রোশে পথ চলে নদীর সঙ্গম স্থলে যুদ্ধ ক্ষেত্রের কাছে এসে পৌঁছাই। আমি নিজে ওস্তাদ আলি কুলির কামান দাগার ব্যাপার উপভোগ করার জন্য এগিয়ে যাই। কামানের গোলা বর্ষণ করে সে আজ দুইটি শত্রুপক্ষের নৌকা ভেঙ্গে চূর্ণ করে ডুবিয়ে দেয়। মুস্তাফাও তার দিক থেকে একই ভাবে কাজ করতে থাকে। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে বড় কামান নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি। মোল্লা গোলামকে কামানটি ঠিক জায়গায় বসানোর কাজ পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে কয়েকজন ভাসাওয়াল (মাটি কাটার কুলির সর্দার) এবং তাকে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন সাহসী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে শিবিরের মুখোমুখি নদীর চরে চলে আসি। সেখানে মোদক খাই।

তখনও আমার মোদকের নেশা যায় নি। নৌকাটিকে শিবিরের কাছে আনিয়ে নৌকাতেই ঘুমিয়ে পড়ি। রাত্রে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। রাতের তৃতীয় প্রহরে চীৎকার ও গোলমাল শোনা যায়। খানসামারা ও আরও অনেকে নৌকা থেকে কাঠ টেনে নিয়ে 'মার, মার' করে চীৎকার করতে থাকে। গোলমালের কারণ এই রকম শোনা যায়। আমি 'আসাইস্' নামে যে নৌকায়

ঘুমাচ্ছিলাম তার পাশাপাশি 'ফরমাইস' নামে নৌকায় একজন নৈশ প্রহরী ছিল। সে ঘুম থেকে জেগে চোখ মেলে দেখতে পায় যে একজন লোক 'আসাইসের' ওপর হাত রেখে নৌকায় ওঠার চেষ্টা করছে। সকলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লোকটি জলে ডুব দেয় আবার ভেসে ওঠে। রক্ষীর মাথার দিকে তাক করে একটা কিছু নিক্ষেপ করে। তাতে তার মাথাটা একটু জখম হয়। তারপর ডাঙ্গায় উঠে দৌড়ে পালায়। এর আগেও একবার যখন আমরা মুনির থেকে ফিরছিলাম সেই রাত্রে দুই জন রাত্রের প্রহরী কয়েকজন হিন্দুস্থানিকে নৌকার কাছে দেখতে পেয়ে তাদের তাড়া করে তাদের দুইখানি তরবারি ও একটি ছোড়া ছিনিয়ে নিয়ে আসে।—

(ফার্সিতে) "বিশ্বের যত তরবারি আছে,
যতই খুসী ঘুরাও না,
বিশ্বপতির হুকুম ছাড়া
একটি শিরাও কাটবে না।"

পরদিন (৫ই মে) বুধবার আমি 'গুঞ্জাইসে' চড়ি। যেখান থেকে কামানের গুলিবর্ষণ চলছে সেইখানে উপস্থিত হয়ে আমি প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট কাজ ঠিক করে দিই। আউখান বরদিমোগেলের অধীনে এক হাজার সৈন্যকে নদীর দুই তিন ক্রোশ উজানে নদী পার হওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে নির্দ্দেশ দিই। তারা এগিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পায় যে আস্কারির শিবিরের কাছে বিশ ত্রিশ খানি বাঙ্গালীর নৌকা নদী পার হয়ে এসেছে। আমাদের কোনও এক সৈন্য দলের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্য একদল সৈন্যও তীরে নেমেছে। আমার লোকেরা ঘোড়া দ্রুত চালিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাদের কতক পালিয়ে যায়। কতককে বন্দী করে তাদের শির কেটে ফেলা হয়। অনেকে আহত হয়। তাদের সাত আটটি নৌকা আটক করা হয়। সেইদিনই বাঙ্গালীরা মহম্মদ জেমান মির্জ্জার শিবিরের কাছে (গোগরা ও গঙ্গানদীর সঙ্গম স্থলের কিছু নীচে—গঙ্গানদীতে) নেমে তার ওপর আক্রমণ সুরু করে। সে দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের সম্মুখীন হয়ে তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে এবং তাদের পিছু ধাওয়া করে। তিনটি নৌকা বোঝাই লোককে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। একটি নৌকা আমার কাছে আনা হয়।

এই ব্যাপারে বাবা চিরে বিশেষ সাহস দেখিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আমি

ইয়াক খাজা, ইউনুস আলি, আউথান বর্দি এবং যে দল নদী পার হওয়ার জন্য পূর্বেই নিযুক্ত হয়েছিল তাদের যে সাত আটখানি নৌকা আউখান বর্দি ও তার লোকরা আটক করেছে তাতে চড়ে কিছু উজানে গিয়ে রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতে নদী পার হতে আদেশ দিই।

এই দিনই আসকারির কাছ থেকে একজন সংবাদ বাহক আসে। সে জানায় যে তার সেনাবাহিনীর সকলেই নদী পার হয়ে এসেছে। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে তারা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হবে। আমি তৎক্ষণাৎ আদেশ জারি করি যে আমাদের অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য যারা নদী পার হতে পেরেছে তারা আসকারির সঙ্গে সহযোগিতা করে যেন এক সাথে শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ চালায়।

মধ্যাহ্ন নমাজের সময় ওস্তাদ আলির কাছ থেকে একজন লোক এসে জানায় যে কামান দাগার প্রস্তুতির কাজ শেষ হয়েছে। সে এখন আমার উপদেশের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি তাকে গোলা ছোড়ার জন্য আদেশ দিই এবং আমার পৌঁছানোর আগেই আর একটি কামানে গোলা বোঝাই করে রাখার জন্য নির্দেশ দিই।

বৈকালিন নমাজের সময় বঙ্গদেশের একটি ছোট নৌকায় চড়ে যেখানে কামান সাজানো আছে সেইখানে যাই। ওস্তাদ একবার খুব বড় গোলা এবং তারপর কয়েকবার ফিরিঙ্গি গোলা দাগে। বাঙ্গালীরা গোলন্দাজি কৌশলে নিপুণ বলে খ্যাত। এইবার তাদের নিপুণতা দেখবার সুযোগ পেলাম। তারা কোনও বিশেষ লক্ষ্যের দিকে গুলি ছোড়ে না। এলো মেলো ভাবে গুলি ছুড়তে থাকে। বৈকালিক নমাজের পর আমি কতকগুলি নৌকাকে সারু (সরযু) নদীর উজানে শত্রুপক্ষের সম্মুখ দিকে নৌকা বেয়ে নিয়ে যেতে আদেশ দিই। যাদের নৌকা চালানোর জন্য আদেশ দেওয়া হলো তারা নির্দ্বিধায় অরক্ষিত অবস্থাতেই কুড়িটি নৌকা বেয়ে নিয়ে আসে। ইশান তাইমুর সুলতান, বাবা সুলতান, আরাসি খাঁ ও সেখ গুরেনকে আদেশ দিই যেখানে নৌকাগুলি আছে সেখানে যেন তারা সতর্ক পাহারা দেয়। আমি তারপর সেইস্থান ত্যাগকরে রাত্রের প্রথম প্রহরে শিবিরে ফিরে আসি।

মধ্যরাত্রে নদীর উজানে যে সব নৌকা জময়েত হয়েছে সেখান থেকে সংবাদ আসে যে আদেশ মতই সমস্ত কাজ হয়েছে এবং নৌকাগুলি এগিয়ে এসেছে। কিন্তু নদীর একটা সরু মুখ বাঙ্গালীরা নৌকা দিয়ে বন্ধ করে দখল করে আছে

এবং আমাদের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে তারা আমাদের আক্রমণ করতে বেরিয়ে আসছে। আমাদের একজন নৌকার মাঝির গুলির আঘাতে পা ভেঙেছে। তারা আর অগ্রসর হওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

বৃহস্পতিবার প্রাতে গোলন্দাজ বাহিনীর লোকের কাছে সংবাদ পাই—যে সব নৌকা উজানে ছিল সেগুলো এসে পৌঁছেছে। শত্রুপক্ষের সমগ্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত হয়ে আমাদের অগ্রগামী সৈন্যবাহিনীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ অতি দ্রুত যাত্রা করে যে সব নৌকা রাত্রে রওনা হয়ে গিয়েছিল সেইদিকে আসি। একজন পত্র বাহককে জোর কদমে মহম্মদ সুলতান মির্জ্জা এবং যে সব লোককে নদী পার হওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল তাদের কাছে এই জরুরি বার্ত্তা জাগতে পাঠাই যে তারা যেন কাল বিলম্ব না করে আসকারির সঙ্গে মিলিত হয়। নৌকাগুলি রক্ষায় নিযুক্ত ইলাত তাইমুর সুলতান ও তুখ্‌তে বুঘা সুলতানকে আদেশ দিই যে তারা যেন নদী পার হতে কোনও রকমে বিলম্ব না করে। বাবা সুলতান তখনও নির্দ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি। এই সময় ঈশান তাইমুর সুলতান তার ত্রিশ চল্লিশ জন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় ওঠে। তারা ঘোড়ার কেশর ধরে নৌকার ধারে ধারে তাদের সাঁতরিয়ে নিয়ে অপর পারে এসে ওঠে। প্রথম দলকে নদী পার হতে দেখে বাঙ্গালী পদাতিক সৈন্যের একটি বড় দল তাদের আক্রমণ করতে ধেয়ে আসে। ঈশান তাইমুর সুলতানের সাত আটজন অনুচর ঘোড়ায় উঠে তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের সংঘর্ষে ব্যাপৃত রেখে ঈশান তাইমুরকে প্রস্তুত হবার সময় করে দেয়। এই সময় পেয়ে তাইমুর সুলতান যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চাপে। এর মধ্যে দ্বিতীয় নৌকাখানাও নদী পার হয়ে এসে পড়ে। তখন সে শত্রুপক্ষের বৃহৎ পদাতিক বাহিনীর সম্মুখীন হয়। ত্রিশ পঁইত্রিশ জন অশ্বারোহী নিয়ে অদ্ভুত কৌশলে লড়াই করে তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। এই ব্যাপারে সে নানা বিষয়েই প্রসিদ্ধি লাভ করে।৫ প্রথমতঃ সে অত্যন্ত সাহসিকতা দেখিয়ে অতি দ্রুত সর্ব্ব প্রথমে নদী পার হয়ে আসে। দ্বিতীয়তঃ মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে সে শত্রুপক্ষের বিপুল পদাতিক বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে পর্য্যুদস্ত করে। তুখ্‌তে বুখা সুলতানও নদী পার হয়ে আসে। তারপর অন্য নৌকাগুলি পরপর এ পারে চলে আসে। লাহোরি ও হিন্দুস্থানিরা পৃথক পৃথক ভাবে কেউ কেউ বা সাঁতার দিয়ে কেউ কেউ বা নলখাগড়ার আটির ওপর উঠে নদী পার হয়।

যে সব বাঙ্গালীর নৌকা নদীর ভাটিতে কামান ক্ষেত্রের বিপরীত দিকে ছিল তার আরোহীরা কি ব্যাপারে ঘটতে চলেছে দেখতে পেয়ে নৌকাগুলি নিয়ে নদীর ভাটার দিকে পালাতে সুরু করলো। দরবেশ মহম্মদ সারবান, দোস্তইসাক আগা, মুরবেগ এবং আমাদের সৈন্যদলের অনেকেই কামান ক্ষেত্রের বিপরীত দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুলতানদের কাছে লোক পাঠিয়ে আমি এই ইচ্ছা জানাই যে তারা যেমন এক সঙ্গে নদী পার হয়ে এসেছে সেই ভাবেই যেন একত্র হয়ে যখন শত্রু সৈন্য নিকটে আসবে তখন তাদের পার্শ্ব ভাগ থেকে আক্রমণ করে। সুলতানরা উপদেশ মত যেমন তিন চার ভাগে নদী পার হয়েছিল সেই ভাবেই শত্রুর দিকে এগোতে থাকে। তাদের আসতে দেখে শত্রুপক্ষ তাদের পদাতিক বাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য নিয়োগ করে। তারপর তারা পদাতিকদের অনুসরণ করে তাদের সাহায্যের জন্য পেছনে আসতে থাকে। আসকারির সৈন্য বাহিনীর একটি দল নিয়ে কুকি এক পাশে পৌছায় আর সুলতানরা অন্য পাশ দিয়ে এসে আক্রমণ আরম্ভ করে। তারা শত্রু সৈন্যদের ওপর প্রবলবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পরাস্ত করে। অনেককে বন্দী করে। শেষ পর্য্যন্ত তাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করে। কুকি বসন্তরাও নামে একজন বিধর্ম্মী পদস্থ ব্যক্তিকে ধরে ফেলে তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে তার মাথা কেটে ফেলে। তার দশ পনরো জন সঙ্গী যারা তাকে সাহায্য করতে এসেছিল তাদেরও সেখানেই হত্যা করে। তুখ্‌তে বুঘা সুলতান শত্রু সৈন্যের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখায়। দোস্ত ইসাক আঘাও নির্ভীকতার পরিচয় দেয়। মোগল আবদুল ওয়াহাব এবং তার ছোট ভাইও বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। মোগল সাঁতার না জানলেও উরস্ত্রাণ নিয়েই ঘোড়ার কেশর দৃঢ়ভাবে ধরে নদী পার হয়।

আমার নিজের নৌকা তখনও পেছনে ছিল। সেগুলি তাড়াতাড়ি নিয়ে আসার জন্য সংবাদ পাঠাই। প্রথমে এলো—'ফরমাইস্‌'! তাতে উঠে নদী পার হয়ে বাঙ্গালীদের অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করি। তারপর 'গুণজাইসে' উঠে নদীর ওপরের দিকের বাঁকের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি। মির মহম্মদ জলেবান জানায় যে ওপরের দিকে (উজানে) সরযু নদী পার হওয়ার অনুকুল স্থান পাওয়া যাবে। আমি সেনা বাহিনীকে আদেশ পাঠাই যে তারা যেন অতি দ্রুত তার উল্লিখিত পথে পার হয়ে যায়। মহম্মদ সুলতান মির্জ্জা ও অন্যান্য যাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল—তারা নদী পার হওয়ার সময় ইয়াকে খাজার নৌকা জলে

ডুবে যায়। ইরাকে খাজা আল্লার দরবারে চলে যায়। আমি তার সৈন্য ও সরকারের ভার তার ছোট ভাই কাসিম খাঁকে অর্পন করি।

মধ্যাহ্নে নমাজের সময় যখন আমি ওজু করছি, সুলতানরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আমি তাদের কাজের উচ্চ প্রশংসা করি। তারা যে আমার বিশেষ অনুগ্রহ ও অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য সে সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করি। আসকারিও সেই সময় আসে। এই প্রথমবার সে যুদ্ধ ব্যাপারটি দেখে। তার পক্ষে এটি মঙ্গলসূচক বলেই মনে হয়েছে। সে রাতে শিবিরের সাজ সরঞ্জাম না এসে পৌছায় আমি 'গুণজাইসের' পাটাতনের ওপর নিদ্রা যাই।

শুক্রবার (৭ই মে) খরিদ সরকারের নিরহান পরগণার গুণদ্নে গ্রামে নামি। (নিরহান পরগণা গোগরা নদী তীরে॥ সিকেন্দারপুরের দশ মাইল দূরে নদীর অপর পারে অবস্থিত)।

রবিবার (৯ই মে) কুকিকে তার লোকজন সহ সংবাদ সংগ্রহের জন্য হাজিপুরে পাঠাই। সা মহম্মদ মারুফ গত বছর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে অনেক অনুগ্রহ দেখিয়েছিলাম। তাকে সারণ জেলাটির (বাংলা দেশের পাটনা বিভাগে) ভার দিই। সে অনেকবার আমার সন্তোষজনক কাজ করেছে। সে দুই দুইবার তার পিতাকে (মারুফ ফারমুলি) পরাজিত করেছে। যখন সুলতান বেজিদ কৌশলে বেহার জয় করে সেই সময় বিবণ ও সেখ বেজিদ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয়। সে তখন উপায়ান্তর না দেখে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এই সময় আমি তার কয়েকটি চিঠি পাই। তখন তার সম্বন্ধে নানা রকম গুজব শোনা যাচ্ছিল। আসকারি যখন হলদি অতিক্রম করছে সেই সময় সে তার দলবল নিয়ে আসকারির সঙ্গে দেখা করে এবং বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আসকারির সঙ্গে যোগ দেয়। আমি এখানে থাকার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে শ্রদ্ধা জানায় এবং আমার কাজে নিযুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

আমরা বারংবার সংবাদ পাই যে বিবন ও সেখ বেজিদ সরযু নদী পার হওয়ার মতলব করছে। এই সময় একটি অপ্রত্যাসিত সংবাদ সম্‌বল থেকে আসে। আলি ইউসুফ সেখানকার অধিনায়ক। সে সেখানে ক্রমে ক্রমে শৃঙ্খলা আনার ও সেই রাজ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তন করার কাজে নিযুক্ত ছিল। সে ও আর একজন যে তার চিকিৎসক হিসাবে তার কাছে থাকতো তারা দুজনেই একদিনে মারা যায়। আমি আবদাল্লাকে সমবলে রওনা হওয়ার জন্য আদেশ দিই যাতে সে উপস্থিত হয়ে সে দেশের সরকারে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে

পারে। ৫ই রমজান (১৪ই মে) সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যায়।

এই সময় চিন্ তাইমুর সুলতানের কাছে থেকে একখানি চিঠি পাই। সে জানিয়েছে যে সব আমিরকে কাবুল থেকে আমার পরিবারবর্গকে নিয়ে আসার জন্য নির্দ্দেশ গিয়েছে তারা তার সঙ্গে আসতে পারবে না। মহম্মদি, ও আরও কয়েকজন সুলতানের সঙ্গে একশ' ক্রোশ দূরে লুণ্ঠন অভিযানে যায়। সেখানে বালুচিদের গুরুতব শিক্ষা দেয়। আমি আবদাল্লার সঙ্গে চিন্ তাইমুর সুলতানের কাছে এক হুকুমনামা পাঠিয়ে জানাই যে সুলতান মহম্মদ দলদাই, মহম্মদি ও আরও কয়েকজন আমিরের কাছে নির্দ্দেশ গিয়েছে যে তারা যেন আগ্রায় তার সঙ্গে মিলিত হয়ে যে দিকেই শত্রু দেখা দেবে সেই দিকে ধাওয়ার জন্য যেন প্রস্তত থাকে।

৮ই রমজান্ (১৭ই মে) সোমবার দরিয়া খাঁয়ের পৌত্র জালাল খাঁ কয়েক জন বিশিষ্ট আমিরের সঙ্গে এখানে পৌছায়। তাকে নিয়ে আসার জন্য জামালি খাঁকে পাঠানো হয়েছিল। জালাল খাঁ আমার সঙ্গে দেখা করে শ্রদ্ধা জানায়। এই দিনই ইয়াহিয়া লোহানি—যে পূর্ব্বে তার ছোট ভাইয়ের মারফৎ আমার কাজে নিযুক্ত হওয়ার অভিপ্রায় জানিয়েছিল এবং যাকে এক সদয় পত্র লিখে আশ্বস্ত করেছিলাম—এসে পৌছায় এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সাত আট হাজার লোহানি আফগানি কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার আশা নিয়ে আসে। তাদের মনস্তুষ্টির জন্য এক কোটি টাকা বেহারের রাজস্ব থেকে পৃথক রাখার জন্য নির্দ্দেশ দিই। তার মধ্যে মহম্মদ খাঁ লোদিকে দিই পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট অংশ জালাল খাঁকে দিই। তাকে আদেশ দেওয়া হয় যে আমার কাজের জন্য আরও এক কোটি টাকা যেন পৃথক ভাবে আদায় করা হয়। মোল্লা গোলাম যশ ওয়ালকে সেই টাকা আনার জন্য পাঠানো হয়। জৌনপুর সরকারের শাসন ভার আমি মহম্মদ জেমান মির্জ্জার ওপর অর্পণ করি।

বুধবার (১৯শে মে) গোলাম আলি নামে খলিফার একজন ভৃত্য ইসমাইল মিতা তাঁর দরবারে পৌছানোর পূর্ব্বেই মুঙ্গেরের রাজার আবদুল ফতে নামে একজন ভৃত্যের সঙ্গে তিনটি শান্তি প্রস্তাব নিয়ে মুঙ্গেরের শাসক ও উজির হাসান খাঁ লস্করের কাছে যায় এবং খলিফার নামে পত্র নিয়ে আবুল ফতের সঙ্গেই ফিরে আসে। তাঁরা ঐ তিনটি প্রস্তাবে বাংলার রাজা নসরৎ সাহের পক্ষ হয়ে সম্মতি জানায় এবং শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমার এই

অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহী আফগানদের শাস্তি দেওয়া। তাদের মধ্যে কতক দূরে পালিয়েছে। অনেকে আমার কাজে যোগদান করেছে। তাদের মধ্যে কিছু এখনও বাঙ্গালীদের আশ্রয়ে আছে। বাঙ্গালীরা তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবে এই ভার নেওয়ায় এবং বর্ষাকাল আসন্ন দেখে আমি শান্তি চুক্তি ও পূর্ব্ব উল্লিখিত চিঠিগুলি অনুমোদন করে পাঠাই।

শনিবার (২২শে মে) ইসমাইল জালওয়ানি, আহুয়াল খাঁ লোহানি, আউলিয়া খাঁ উস্তারানি এবং তাদের সঙ্গে আরও পাঁচজন আমির তাদের বশতো জ্ঞাপন করার জন্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

এই দিন আমি ইশান তাইমুর সুলতান ও তুকৃথে বুখা সুলতানকে (এই দুই জন ছোট খাঁ সুলতান আমেদ খাঁর পুত্র) একটি তরবারি ও কটিবন্ধ, কটিবন্ধ সহ ছোড়া, বর্ম্ম, সম্মানসূচক পোষাক ও তিপ্‌চাক অশ্ব উপহার দিই। ইসান তাইমুর সুলতানকে নারমুল তহশিল (পাতিয়ালা রাজ্যের তহশিল) থেকে ছত্রিশ লক্ষ টাকা এবং তুখ্‌তে বুঘা সুলতানকে সামসাবাদ পরগণা থেকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য আদেশ দিই। তারা নতজানু হয়ে আমাকে শ্রদ্ধা জানায়।

১৫ই রমজান, সোমবার (২৪শে মে) বাংলা ও বেহারের ব্যাপারগুলির সমস্ত কাজ সমাধা করে গুণদনের সন্নিহিত অঞ্চল থেকে শিবির তুলে বিদ্রোহী বিবন ও সেখ বেজিদের শত্রুতা দমন করতে যাত্রা করি। দুই দিন পথ চলার পর তৃতীয় দিন বৃহস্পতিবার আমরা চৌপাড়া চতুর্ম্মুখের (বর্ত্তমানে ছাপড়া—পূর্ব্বে বঙ্গ দেশভুক্ত সারণ জেলার প্রধান সহর) পথে সেকেন্দারপুরে পৌঁছাই। সেই দিনই আমার লোকেরা নদী (ঘোগ্‌রা) পার হওয়ার জন্য উদ্যোগ সুরু করে। অনবরত সংবাদ আসতে থাকে যে বিদ্রোহীরা সরযু ও ঘোগরা পার হয়ে লক্ষ্ণৌ-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

তাদের গতিরোধ করতে আমার তুর্কি ও হিন্দুস্থানি কর্ম্মচারীদের মধ্যে সুলতান জালাল উদ্দিন সারকি (জেনিপুরের ভূতপূর্ব্ব রাজা), আলি খাঁ ফারমুলি, তার্দিকে নিজাম খাঁ, সালি কারিমিস, উসেথ, কুরবান চিরখি, হুসেন খাঁ দরিয়াখানিকে নিযুক্ত করি। তারা বৃহস্পতিবার রওনা হয়ে যায়।

সেই রাতে 'তেরাউই' নমাজের শেষে (রমজান পর্ব্বের সময় এই নমাজ গভীর রাতে পড়া হয়। তেরাউই অর্থ বিশ্রামের স্থান। এই নমাজকে তেরাউই নমাজ বলা হয় এই কারণে যে একবার নমাজ পড়ার পর প্রার্থনাকারীরা কিছুক্ষণ

বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার নমাজ সুরু করে) রাতের দ্বিতীয় প্রহরের পাঁচ ঘড়ির পর (রাত এগারোটার পর) বর্ষকালের মেঘ প্রবল বর্ষণ সুরু করে। এমন প্রবল ঝড় হঠাৎ সুরু হয় যে তাঁবুগুলির অধিকাংশই ঝড়ে উড়ে যায়। আমার শিবিরের মাঝখানে বসে লিখছিলাম। সেই সময় এমন দমকা ঝড় ওঠে যে আমার কাগজ পত্র গুছিয়ে তোলার আর সময় পেলাম না। আমার সদ্য লেখা বিচ্ছিন্ন কাগজগুলি পরদা সমেত আমার মাথার ওপরের তাঁবু উড়ে যাওয়ার সময় ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে গেল। তাঁবুর মাথাটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু আল্লার দয়ায় আমি রক্ষা পেলাম। আমার কোনও ক্ষতি হয়নি। পুঁথিপত্র ও কাগজগুলো জলে ভিজে গিয়েছিল। সেগুলো অনেক কষ্টে সংগ্রহ করে পশমের কাপড়ে মুড়ে বিছানার তলায় রেখে তার ওপর একটা গালিচা ঢাকা দেওয়া হলো। দুই ঘড়ি (পৌনে এক ঘণ্টা) পর ঝড়ের বেগ কমে এলো। তোষাখানার তাঁবুটা কোনও রকমে খাড়া করে অনেক কষ্টে একটা মোমবাতি ধরিয়ে আগুণ জ্বালার ব্যবস্থা করা হলো। ভোরের আগে আর ঘুমোতে পারিনি। রাতটা বই পত্র ও লেখার কাগজগুলো শুকোতেই কেটে যায়।

বৃহস্পতিবার (২৭মে) নদী পার হই।

শুক্রবার আমি অশ্ব পৃষ্টে খরিদ ও সেকেন্দারপুরের চারদিক ঘুরি। সেই দিনই আবদুল্লা ও বাকির পত্রে জানতে পারি যে শত্রুরা লক্ষ্ণৌ দখল করেছে।

শনিবার কুকিকে তার দলবল নিয়ে এগিয়ে যেতে বলি যাতে সে বাকির বাহিনীকে পুষ্ট করতে পারে।

রবিবার সুলতান জুনিদ বিরলাস, হাসান খলিফা ও মোল্লা আপাকের লোকদের এবং মুমিন আতকের ভাইদের যাত্রা করার জন্য আদেশ দিই যাতে তারা বাকির সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার পৌঁছানোর পূর্ব্বেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

সেই দিনই বৈকালিক নমাজের সময় আমার নিজের তোষাখানা থেকে একটি সম্মানসূচক পোষাক এবং একটি তিপচাক অশ্ব দান করে সা' মহম্মদ মারুফকে বিদায় দিই। আগের বছরে যেমন সারণকে তীরন্দাজদের মাহিয়ানা দেওয়ার জন্য একটা অর্থ বরাদ্দ করেছিলাম সেইভাবে ইসমাইল জিলওয়ানিকে সারওয়ারের রাজস্ব থেকে বাহাত্তর লক্ষ টাকা (সরযূপুর—বর্ত্তমানে গোরক্ষপুর) ভাতা এবং আমার নিজস্ব তোষাখানা থেকে একটি সম্মানসূচক পোষাক ও একটি তিপচাক অশ্ব উপহার দিয়ে বিদায় দিই। আলাম্বল খান লোহানি ও তার সঙ্গের লোক-

জনকেও সারওয়ারের রাজস্ব থেকে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে তারা বিদা নেয়। স্থির হয় যে তাদের প্রত্যেকেই তাদের পুত্র এবং ছোট ভাইকে আগ্রা রেখে যাবে যাতে তারা সময়মত আমার আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

বাঙ্গালীদের সঙ্গে এই কথা হয় যে তারা ত্রিমোহিনির দিকে দুইটি বাঙ্গলা নৌকা—গুণজাইস, ও আরাইসকে নিয়ে যাবে। যে সব নৌকা আমার হাতে ধরা পড়ে তাদের মধ্যে এই দুইখানাকে সেই দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্ব্বাচিত করি। ফরমাইস ও আসাইসে শিবির ও মালপত্র বোঝাই করে সরযু নদী বেয়ে খেতে আদেশ দিই।

বেহারে এবং সারওয়ারে আমার মনোমত কাজ সমাধা করে সোমবার (৩১শে মে) চৌপাড়া চতুর্মুখের ঘাটে নদী পার হয়ে সরযু নদীর উজানে নদীর তীর ধরে অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হতে থাকি। দশ ক্রোশ পথচলে ফতেপুরের অন্তর্গত কালা পাহাড়ার কাছাকাছি জায়গায় শিবির ফেলা হয়। এখানে দেখলাম—সুন্দর সুন্দর উদ্যান নদী স্রোতে উর্ব্বরা এবং মনোরম সৌধ। বিশেষ করে আমগাছগুলি এবং নানা জাতের উজ্জ্বল রং বিশিষ্ট পাখী আমাদের বিস্ময়াভিভূত করে। কয়েকদিন বিশ্রাম করার পর সেনা বাহিনীকে গাজিপুরের দিকে যাত্রা করার আদেশ দিই। ইসমাইল খাঁ জিলওয়ানি ও আলুয়াল খাঁ লোহানি তাদের দেশে যাওয়ার জন্য ছুটি চায়। ছুটির শেষে তারা আগ্রায় ফিরে আসবে বলে অঙ্গীকার করে। এক মাস পরে তাদের ছুটি দিতে সম্মত হই।

আমার সেনা বাহিনীর কয়েকজন রাতের অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফতেপুরের বড় পুকুরের ধারে যায়। নিকটেই যারা পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের নিয়ে আসার জন্য এক দলকে পাঠানো হয়। আর কুচেক খাজাকে সারারাত পুষ্করিনীর ধারে অপেক্ষা করে যে সব সেনা সেখানে আছে তাদের সকালে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিই।

সেখান থেকে ভোরে (১লা জুন) আমরা যাত্রা করি। যাত্রা পথের মাঝে আমি আসাইসে উঠে নদী পথে শিবিরে আসি। এই পথে সা মহম্মদ দেওয়ানার এক পুত্র আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাকে খলিফার পত্র দিয়ে বাকি এখানে পাঠায়। সে লক্ষ্ণৌয়ের অবস্থার নিখুঁত বিবরণ দেয়। জানা যায় যে রমজান মাসের ১৩ই তারিখ শনিবার (২২শে মে) শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে কিন্তু বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারে না। আক্রমণের সময় কিছু শুকনো ঘাস যা সংগ্রহ করা ছিল তার ওপর আতসবাজির আগুণ, তার্পিন ও অন্যান্য দাহ্য সামগ্রী

নিক্ষিপ্ত হলে তাতে আগুণ ধরে যায়। আগুণের তাপে দুর্গের অভ্যন্তর চুল্লীর মত গরম হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় দুর্গ প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তার ফলে দুর্গের পতন হয়। দুই তিন দিন পর আমার ফিরে আসার খবর পেয়ে শত্রুপক্ষ ডাল.মৌর (উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলি জেলার পূবে) দিকে যাত্রা করে। এই দিনও আমরা দশ ক্রোশ অগ্রসর হয়ে সরযু নদীর তীরে সিকৃরি পরগণার জলসির গ্রামের কাছে থামি।

পশুদের বিশ্রাম দেওয়ার জন্য বুধবারেও এখানেই অবস্থান করি। অনেকে সংবাদ আনে যে সেখ বেজিদ ও বিবন গঙ্গা নদী পার হয়ে তাদের সেনাবাহিনী চালনা করে জৌনপুর ও চুণার দখল করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে। আমিরদের আহ্বান করে একটা পরামর্শ সভা বসালাম। ঠিক হয় সুলতান জেমান মির্জ্জা ও সুলতান জুনিদ বিরলাস যারা জৌনপুরের বদলে চুণার ও অন্যান্য পরগণা পেয়েছে এবং মহম্মদ খাঁ লোহানি, কাজিজিয়া ও তাজ খাঁ সারংখানি দ্রুত এগিয়ে শত্রু পক্ষকে চুণার পৌছানোর পূর্ব্বে প্রতিরোধ করবে।

পরদিন বৃহস্পতিবার প্রত্যুষেই যাত্রা করি। সরযু নদী থেকে এগারো ক্রোশ অগ্রসর হয়ে পারসেরু নদী পার হয়ে নদীর তীরেই তাঁবু ফেলি। এখানে আমিরদের সঙ্গে পরামর্শ করি। পরামর্শের পর ইমান তাইমুর সুলতান, কাসিম খাজা, জাফর খাজা, খাজা জাহিদ, খাজা জান বেগ, আসকারির কর্ম্মচারীদের এবং হিন্দের আমিরদের মধ্যে আলিম খাঁ কাল্পি, মালিকদাদ কররাণি ও রসিদ সরওয়ানিকে বিবন ও বেজিদের সন্ধানে ডালমৌর দিকে যাত্রা করার জন্য নিযুক্ত করি। সৈন্য বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শত্রুদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য তাদের নির্দ্দেশ দিই। আমি পারসেরু নদীর জলে অবগাহন করে পবিত্র হই। আমি ও আমার কয়েকজন সঙ্গী একটা কাঠের খুটিতে কয়েকটি দীপ জ্বালিয়ে সেটা নদীর জলে নাড়তে নাড়তে কতকগুলো মাছ ধরি।

শুক্রবার (৮ঠা জুন) পারসেরু নদীর একটি শাখার তীরে শিবির ফেলি। শাখা নদীটি খুব ছোট। সৈন্য বাহিনীর নদী পারাপারের অসুবিধা লাঘব করার জন্য নদীর ওপর একটা বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। দশ হাত লম্বা ও দশ হাত প্রস্থ ঘিরে একটা স্নানের জায়গা করা হয়। আমরা এইখানেই রমজান মাসের ২৭শে তারিখ (৪ঠা জুন) কাটাই।

পরদিন এই শাখা নদী ছেড়ে তুষ নদীর তীরে তাঁবু ফেলা হয়।

রবিবারও এই নদীর তীরেই অবস্থান করি।

২৯শে রমজান তুষ নদীর তীরেই থাকি। আকাশ খুব পরিষ্কার না থাকলেও কয়েকজন নাকি চাঁদ দেখতে পায়। এই কথা যে সত্য তা তারা কাজির উপস্থিতিতেই জানায়। এতেই রমজান মাস শেষ হয়ে গেল সাব্যস্ত হলো।

পরদিন মঙ্গলবার আমরা ইদের নমাজ পড়ার পর যাত্রা আরম্ভ করি। দশ ক্রোশ অতিক্রম করে গোমতি নদীর ধারে তায়েক-এর এক ক্রোশ মধ্যে শিবির ফেলি।

মধ্যাহ্নে নমাজের কাছাকাছি সময়ে সেখ জইন মোল্লা সাহেব ও খোন্দ আমিরের সঙ্গে মোদক খাই।' মল্ল যোদ্ধারা বৈকালে মল্লক্রীড়া দেখিয়ে আমাদের আনন্দ দেয়।

বুধবার (৯ই জুন) আমরা এখানেই থেকে যাই। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় মোদক খাই। মালিক সারথ, যাকে তাজ খাঁকে চুর্ণার থেকে বিতাড়িত করার জন্য পাঠানো হয়েছিল—আজ ফিরে আসে। সেদিনও মল্লক্রীড়া হয়। অযোধ্যার ওস্তাদ কিছুদিন আগেই এসেছিল। সে একজন হিন্দুস্থানি কুস্তিগিরের সঙ্গে নিপুণভাবে লড়ে তাকে ভূপাতিত করে। আমি তাকে পনরো লাখ মুদ্রণ ভাতা মঞ্জুর করে এবং একটি সম্মানসূচক পোষাক দিয়ে বিদায় দিই।

পরদিন সকালে আমরা এগারো ক্রোশ পথ চলে সেই গোমতি নদীর তীরেই নামি। এখানে শুনতে পাই সুলতান ও আমিরদের যে দলকে অভিযানে পাঠানো হয়েছে তার ডালমৌ পৌঁছেছে। তারা প্রথমে গঙ্গা পেরিয়েছে তারপর শত্রুদের অনুসরণ করে যমুনা পেরিয়ে তাদের সঙ্গে আলিম খাঁকে নিয়ে অত্যন্ত দ্রুত শত্রুর পেছনে পেছনে অনেক ক্রোশ এগিয়েছে। তারপর যমুনা নদীর তীর ছেড়ে দিয়ে তিনবার মার্চ করার পর ডালমৌতে ফিরে এসেছে। এই দিন সেনাবাহিনীর অধিকাংশই পারাপারের একটা জায়গা ঠিক করে গঙ্গা অতিক্রম করে আসে। শিবিরের সাজ সরঞ্জাম এবং সেনা বাহিনী পার হওয়ার পর আমি কিছু ভাটিতে একটা দ্বীপে বসে মোদক খাই। যেখানে আমরা নদী পার হই, সেখানে একদিন অপেক্ষা করি। যে সব সৈন্য পথ হারিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে তারা যাতে ফিরে আসতে পারে সেইজন্যই আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা। সেই দিনই বাকি তাসকেন্দি অযোধ্যা থেকে তার সেনা বাহিনী নিয়ে পৌঁছায় এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

গঙ্গা নদীর পার থেকে দুইবার মার্চ করে আমরা কোরায় (উত্তর প্রদেশের

ফতেপুর জেলার একটি সহর) কাছাকাছি এসে বিন্দ নদীর তীরে শিবিরে ফেলি। ডালমৌ থেকে কোরার দূরত্ব একুশ ক্রোশ।

বৃহস্পতিবার (১৭ই জুন) আমরা ভোরে শিবির থেকে যাত্রা করে আদমপুর পরগণার কাছে নামি। আমরা আগেই কয়েকজন মাঝিকে কাল্‌পিতে পাঠাই যাতে তারা শত্রুদের অনুসরণ করার জন্য সেখানে যতগুলি নৌকা পাওয়া যায় নিয়ে আসতে পারে। সন্ধ্যার সময় কতকগুলি নৌকা পৌঁছে যায়। নদী পারাপারের একটা জায়গারও সন্ধান মেলে। তাঁবুগুলি অত্যন্ত ধূলিমলিন হওয়ায় আমি একটি দ্বীপেই নিদ্রা যাই। আমি এখানে কয়েক দিন দিনরাত থাকি। শত্রুপক্ষের সঠিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য আমি কিছু সৈন্যের সঙ্গে বাকি সাঘাওয়ালকে নদীর অপর পারে পাঠাই।

পরদিন (১৯শে জুন) জুমা নামে বাকির একজন ভৃত্য সংবাদ নিয়ে আসে যে সেখ বেজিদ ও বিবনেব একটি ঘাঁটিকে তচনছ করে মুবারক খাঁ জৈওয়ানি নামে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী এবং আরও কয়েকজনকে হত্যা করেছে। কয়েক জনের মাথা কেটে ফেলে সেগুলি একজন জীবন্ত বন্দীর সঙ্গে সে আমার কাছে পাঠিয়েছে।

শনিবার সকালে খাঁ হোসেন বক্‌সি এসে পৌঁছায়। সে শত্রুপক্ষের এই পরাজয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং যে ভাবে যা ঘটেছে তার বিশেষ ব্যাখ্যা করে।

রবিবার রাত্রে যমুনা নদীতে জলস্ফীতি দেখা যায়। তার ফলে আমরা দ্বীপের যেখানে তাঁবু খাটানো হয়েছিল সেখানে থাকতে পারি না। কিছুদূরে আর একটা দ্বীপে আমাদের চলে আসতে হয়। সেখানে আর একটা তাঁবুতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়।

সোমবার (২১শে জুন) শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানকারী সুলতান ও আমিরদের কাছ থেকে জালাল তাসকেন্দি এখানে পৌঁছায়। তাদের বাম দিকের সৈন্যদের আগমনের সংবাদ পওয়া মাত্র বিবন ও সেখ বেজিদ মহোবা পরগণার (উত্তর প্রদেশের হামিরপুর জেলার একটি তহশিলের প্রধান সহর) থেকে পালিয়ে যায়। বর্ষা সুরু হওয়ার এবং আমরা পাঁচ ছয় মাস নানা অভিযানে ব্যাপৃত থাকায় সৈন্যদলের অশ্ব ও অন্যান্য পশু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমি সেইজন্য সুলতান ও বেগদের—যারা আমাদের আগে রওনা হয়ে গিয়েছিল—যেখানে

তারা পৌঁছেচে সেইখানেই অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিই—যতক্ষণ না নতু অশ্বারোহী বাহিনী আগ্রা ও নিকটবর্ত্তী জায়গা থেকে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

সেইদিন বৈকালিক নমাজের পর আমি বাকি সাম্বাওয়াল ও তার অযোধ্যা সেনাবাহিনীকে ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিই। মারুফ ফারমুলির পু মুসা যখন আমার সেনাবাহিনী ফেরার পথে সরযু নদী পার হয় সেই সম আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার আনুগত্য জানিয়েছিল। তাকে আমেরহা তহশিলের মধ্যে (সম্ভবতঃ উত্তর প্রদেশের মোরাদপুর জেলার আমরোহ তহশিলের একটি শহর) ত্রিশলাখের একটি পরগণা তার ভরণ পোষণের জন্য দান করি এবং তাকে আমার নিজস্ব তোষাখানা থেকে এক প্রস্থ সম্মা সূচক পোষাক, জিনসহ একটি অশ্ব উপহার দিয়ে বিদায় দিই।

এ দিকের সমস্ত কাজের বিলি ব্যবস্থা করে মঙ্গলবার রাতের চতুর্থ প্রহরের এক ঘড়ি পার হওয়ার পর (রাত সাড়ে তিনটা) আগ্রার দিকে যাত্রা করি।

পরদিন সকালে (২২শে জুন) ষোল ক্রোশ অশ্বারোহনে আসার পর মধ্যাহ্নে কানজির অন্তর্গত বলাদের পরগণায় দুপুরটা কাটাই। অশ্বগুলিকে কিছু বিশ্রাম দিয়ে সন্ধ্যে নমাজের পর পুনরায় যাত্রা সুরু করি। রাত্রে তেরো ক্রোশ পথ চলে তৃতীয় প্রহরের শেষে কালপির অন্তর্গত সুগন্ধপুর পরগণার ভাও (বাহাদুর) খাঁ সের ওয়ানির সমাধিস্থলে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। প্রত্যুষের (২৩শে জুন) নমাজ সমাধা করে আবার যাত্রা করি। ষোল ক্রোশ পথ চলার পর দুপুর নাগাদ এটোয়ায় পৌঁছে যাই। সেখানে মেহেদি খাজা (বাবরের শ্যালক) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসে। আমি পুনরায় অশ্বারোহন করে কিছুদূর চলে রাতের প্রথম প্রহরে বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য পথেই কিছুক্ষণ থামি। তারপর ষোল ক্রোশ পথ চলে আমি আবার সকালে ফতেপুরে বিশ্রামের জন্য থামি। পুনরায় মধ্যাহ্ন কালীন নমাজের সময় যাত্রা করি। ষোল ক্রোশ এগিয়ে আসি। রাতের দ্বিতীয় প্রহরের শেষে আমি আগ্রার হেস্ত বেহেস্ত উদ্যানে পৌঁছিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামি।

পরদিন শুক্রবার (২৫শে জুন) মহম্মদ বক্‌সি ও আরও কয়েকজন এসে আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। দুপুরের নমাজের সময় যমুনা পার হয়ে দুর্গে পৌঁছিয়ে বেগমদের ও পিসিমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বাল্‌কের একজন অধিবাসী কিছু খরমুজের ক্ষেত করেছিল। সে আমার রন্ধনশালা সংলগ্ন উদ্যানের মালি ছিল। তাকে আমি খরমুজা উৎপাদনের জন্য আগ্রায় নিয়ে আসি।

সে কয়েকটি খরমুজা আমার কাছে নিয়ে আসে। খরমুজা খেতে খুব উপাদেয় মনে হলো। হেস্ত বেহেস্ত উদ্যানেও আমি কিছু আঙুর লতার চারা লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলাম। তাতেও বেশ সুন্দর গোছা গোছা আঙুর ফলেছে। সেখ গুরণ ও আমাকে এক ঝুড়ি সুস্বাদু আঙুর পাঠিয়েছিল। আমি সত্যই এই ভেবে আনন্দ পেলাম যে হিন্দুস্থানে এখন খরমুজা ও আঙুর ফলেছে।

শনিবার রাতের তৃতীয় প্রহরে (২৭শে জুন) মাহাম পৌঁছায়। তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি। প্রথম জুমাদা মাসের ১০ই তারিখ আমি সেনা বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিই। একটা অদ্ভুত সংঘটনের ব্যাপার এই যে সেই দিনই মাহাম কাবুল ত্যাগ করে।

১লা জিক্কদ (৮ই জুলাই) বৃহস্পতিবার হুমায়ুন ও মাহামের (হুমায়ুনের জননী) শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দরবার কক্ষে আমার সামনে রাখা হয়। এই দিনেই কাগপুরের দেওয়ানের একজন ভৃত্যের সঙ্গে শ'দেড়েক মাল বাহককে কাবুল থেকে খরমুজা, আঙুর ও অন্যান্য ফল আনতে পাঠানো হয়।

৩রা তারিখে (১০ই জুলাই) হিন্দুবেগ যে কাবুল থেকে আমার পরিবার বর্গের সঙ্গে রক্ষী হিসাবে এসেছিল এবং যাকে আলি ইউসুফের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর সম্বলে পাঠানো হয়েছিল ফিরে আসে ও আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

হাসামউদ্দিন খলিফাও আলোয়ার থেকে পৌঁছিয়ে আমাকে সেলাম দেয়।

পরদিন রবিবার (১১ই জুলাই) আবদুল্লাও যাকে আলি ইউসুফের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ত্রিমোহিনি থেকে সম্বলে পাঠানো হয়েছিল—ফিরে আসে।

যে সব লোক কাবুল থেকে ফিরে এসেছে তাদের কাছে শুনতে পেলাম যে সেখ সরিফ করবাখি আব্দুল আজিজের কুপরামর্শেই হোক বা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যই হোক আমাকে অত্যাচারী বলে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে এবং যে সব দোষ কোনও দিন অনুষ্ঠিত হয়নি সেই সব দোষে আমাকে অপরাধী করে লাহোরের ইমামদের কাছে আমার বিরুদ্ধে ফতোয়া লিখে তাতে তাদের নাম সই করতে বাধ্য করেছে এবং সেই ফতোয়ার নকল উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য নানা জায়গায় পাঠিয়েছে। আবদুল আজিজও যে সব আদেশ এখান থেকে তার কাছে গিয়েছে সে সব অমান্য করে নানা অসঙ্গত উক্তি করেছে এবং নানা কুকাজে লিপ্ত হয়েছে। এই সব কারণে আমি কাম্বরের আলি আরঘুনকে এই ব্যাপারের বিহিত ব্যবস্থা করতে পাঠাই এবং সেখ সরিফের সঙ্গে মোকাবিলা

করার জন্য তার কাছে লাহোরের ইমামদের এবং আবদুল আজিজকে নিয়ে আসতে আদেশ দিই।

১৫ই বৃহস্পতবার (২২ শে জুলাই) সুলতান তাইমুর তাতারা থেকে এখানে পৌঁছায় ও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এই দিন ওস্তাদ সাদিক ও অযোধ্যার মল্লবীরের সঙ্গে জোর কুস্তি লড়াই হয়। সাদিক অতি সহজেই অযোধ্যার মল্লবীরকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই পরাজয় তাকে নিদারুণ মর্ম্মাহত করে।

১৯শে সোমবার (২৬ শে জুলাই) কিজিলবাসের দূত মুরাদ কোরচিকে একটি কটিবন্ধসহ জোব্বা দিয়ে তাকে সম্মানসূচক পোষাকে ভূষিত করে ও দুইলক্ষ তন্‌খা উপহার দিয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিই।

এই সময় সৈয়দ মেহেদি গোয়ালিয়র থেকে এসে জানায়—রহিমদাদের বিদ্রোহের কথা। খলিফা, সা মহম্মদ নামে শিলমোহর বক্সী তার এক কর্ম্মচারীর সঙ্গে একটি উপদেশ পূর্ণ পত্র দিয়ে রহিমদাদের কাছে পাঠায়। সা মহম্মদ রহিমদাদের কাছে যায়। অল্পদিনের মধ্যেই সে রহিমদাদের পুত্রকে নিয়ে আসে। কিন্তু রহিমদাদ নিজে আসে না। যাহোক, রহিমদাদের সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য জিলহজ্জ মাসের ৫ই তারিখ আমি নুরবেগকে গোয়ালিয়র পাঠাই। সে কিছুদিন পরে ফিরে এসে রহিমদাদের দাবীগুলি সম্বন্ধে জানায়। যখন আমি তার দাবীগুলি মেনে নিয়ে ফার্মান পাঠাব এমন সময় রহিমদাদের একজন কর্ম্মচারী পৌঁছায়। সে জানায় যে তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে রহিমদাদের পুত্রকে কোনও রকমে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। পিতার এখানে আসার কোনও রকম ইচ্ছা নাই। এই সংবাদ পাওয়ার পর আমার অবিলম্বে গোয়ালিয়র যাওয়ার ইচ্ছা হলো। কিন্তু খলিফা অনুরোধ করতে লাগলো যে সে আর একখানা চিঠি রহিমদাদকে উপদেশ দিয়ে লিখতে চায়। তার মনে হয় তার চিঠি পেয়ে রহিমদাদ শান্ত হবে ও আনুগত্য দেখাবে।

জিলহজ্জ মাসের ৭ই তারিখ, বৃহস্পতিবার মেহেদি খাজা (এটোয়ার শাসক) এটোয়া থেকে এসে পৌঁছায়। ইদের দিন আমি হিন্দুবেগকে আমার নিজস্ব তোষাখানা থেকে এক প্রস্থ সম্পূর্ণ পোষাক, একটি তরবারি, বহুমূল্য প্রস্তর খচিত কটিবন্ধ ও একটি তিপচাক অশ্ব প্রদান করি। চাঘতাই তুর্কিদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি, হাসান আলিকে সম্মান সূচক পোষাক, রত্নখচিত কটিবন্ধ ও সাত লক্ষ টাকার একটি পরগণা প্রদান করি।

হিজরা ৯৩৬ সালের ঘটনাবলী

মহরম মাসের ১৩ ই তারিখ (৭ই ডিসেম্বর, ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দ) সেখ মহম্মদ ঘাউস, সাহেবউদ্দিন খসরু নামে রহিমদাদের পক্ষের একজন মধ্যস্থকে নিয়ে গোয়ালিয়র থেকে আসে। (মন্তব্য-রহিমদাদ এই মহম্মদ ঘাউসের যোগাযোগেই ১৫২৬ সালে গোয়ালিয়র অধিকার করে।) লোকটি (মহম্মদ ঘাউস) সৎ ও সাধু প্রকৃতির। তারই জন্য রহিমদাদের সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করি। সেথ গুরণ ও নুরবেগকে গোয়ালিয়রের অধিকার নিতে পাঠাই।

পরিশিষ্ট

হিজরা ৯৩৬ সালের প্রথম থেকেই বাবরের আত্মজীবনী লেখা বন্ধ হয়ে যায়। এর পরের কোনও সময়েরই লেখার সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাঁর জীবনের শেষ পনরো মাসের কোনও আত্মজীবনী লিখেছিলেন কিনা তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি বা সন্ধান মেলেনি। স্বাস্থ্যের অবস্থার দ্রুত অবনতি হওয়ায় তাঁর স্বভাবজাত কর্ম্মপ্রেরণা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তাঁর রাজত্বের শেষ কয়েক মাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরাও নীরব। সুতরাং এই ধারণা স্বতঃই মনে ওঠে যে এই সময়ের কোনও কথাই আর লেখা হয়নি। যদি বা হয়েও থাকে তা লোক চক্ষুর অগোচরেই থেকে গেছে।

হুমায়ুন সুদীর্ঘ নয় বছরের অধিকাংশ সময় (১৫১৯ থেকে ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দ) সুদূর বাদাকসান থেকে সেখানকার সরকার পরিচালনা করছিলেন। তিনিও ৯৩৬ হিজরি সনে সাম্রাজ্যের রাজধানীর কাছে থাকার জন্য বিশেষ উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন সম্ভবতঃ পিতার ভগ্নস্বাস্থ্যের সংবাদ শুনে। তিনি হঠাৎ বাদাকসানের শাসন ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করে সেই শাসনভার সুলতান উইসের ওপর ন্যস্ত করে কাবুলের পথে হিন্দুস্থানের দিকে যাত্রা করেন। কাবুলে তাঁর ভ্রাতা কামরাণের সঙ্গে পরামর্শ করে আগ্রার পথে রওনা হন। কামরাণ ঠিক সেই সময়েই কান্দাহার থেকে কাবুলে পৌঁছেছিলেন। ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাবর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র কামরাণকে তার শৈশবাবস্থাতেই কাবুল ও কান্দাহারের সাধারণ ভার দিয়েছিলেন।

হুমায়ুন বাদাকসান ছেড়ে চলে আসার পরেই কাসঘরের সৈয়দ খাঁ সুলতান উইস্ ও দেশে উপস্থিত অন্যান্য আমিরদের আমন্ত্রনে রসিদ খাঁকে ইয়ারকন্দে রেখে বাদাকসানের দিকে অভিযান করে। বাবরের কনিষ্ঠ পুত্র দশবৎসর বয়স্ক হিন্দল সেই সময় আগ্রায় ফিরে যাওয়ার জন্য আদেশ পেয়েছিলেন। কিন্তু হুমায়ুনের আগ্রহাতিশয্যে তাঁর স্থলে বাদাকসানের ভার নেওয়ার জন্য অনুরুদ্ধ হন। হিন্দল সৈয়দখাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে জাফর দুর্গে অবস্থান করে দুর্গ

রক্ষার জন্য এমন তেজের সঙ্গে চেষ্টা করতে থাকেন যে সৈয়দখাঁ উপায়ান্তর না দেখে দুর্গ-অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়।

ইতিমধ্যে বাবরের কাছে সংবাদ এসে গেছে যে সৈয়দ খাঁ সমস্ত বাদাকসান রাজ্য অধিকার করে নিয়েছে। এই অশুভ সংবাদ অনবরত ঐদিক থেকে আসতে থাকায় বাবরের মনের ওপর আঘাত হানতে থাকে। তাতে তাঁর স্বাস্থ্য আরও ভেঙ্গে যায়। তিনি তাঁর প্রধান মন্ত্রী খলিফাকে বাদাকসান উদ্ধার করার জন্য নির্দ্দেশ পাঠান। কিন্তু সেই আমির নানা অজুহাত দেখিয়ে এই নির্দ্দেশ পালন করেন না। সম্ভবতঃ খলিফার এই ধারণা হয়েছিল যে বাদাকসান যাত্র র আদেশ হুমায়ুনের জননীর পরামর্শ মতই বাবর দিয়েছেন। বাবরের ওপর তাঁর এই স্ত্রীর প্রভাব অত্যন্ত বেশী। তিনিই তাঁর পুত্র হুমায়ুনের শক্তিধর শত্রু খলিফাকে এই সময় দূরে পাঠিয়ে দিতে চান—এই ধারণাই খলিফার হয়েছিল।

অনুরূপ আদেশ বাবর পুত্র হুমায়ুনকেও দেন—কারণ বাদাকসানের শাসনভার হুমায়ুনের ওপরই দিল। কিন্তু হুমায়ুনও যেতে অস্বীকার করেন এই অজুহাতে যে তাঁর পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা এতই বেশী যে তিনি এই সময় পিতার কাছ থেকে অতদূরে কিছুতেই যেতে পারেন না। তারপর বাবর সুলতান উইসের জামাতা এবং বাবরের জ্ঞাতি ভাই ষোল বছরের সুলেমানকে ঐ দেশের শাসনভার দিয়ে পাঠান। সুলেমানের পিতা খান মির্জ্জাও বাদাকসানের শাসক ছিলেন। সুলেমানের সঙ্গেই সৈয়দ খাঁর নামে বাবর চিঠি দিয়ে তাকে জানিয়ে দেন যে তার এই বিরুদ্ধাচরণ অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।

কাবুল পৌঁছানোর পূর্বেই সুলেমান সৈয়দ খাঁর পিছিয়ে আসার সংবাদ পায়। তবুও সে তার যাত্রাপথে অগ্রসর হয়ে হিন্দলের কাছ থেকে বাদাকসানের ভার গ্রহণ করে। তারপর, হিন্দল হিন্দুস্থানের পথে যাত্রা করে। বাবরের মৃত্যুর পর যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তারই সুযোগে সুলেমান বাদাকসানের অধিকার বজায় রাখে। তার বংশধররাও অনেকদিন এই রাজ্যের শাসন পরিচালনা করে।

হুমায়ুন কোনও নির্দ্দেশ ছাড়াই অযাচিত ও অপ্রত্যাসিত ভাবে আগ্রায় এসে পৌঁছান। তাঁর প্রতি পিতার অসীম স্নেহ এবং তাঁর মাতার পিতার ওপর প্রবল প্রভাবের জন্য তিনি ভাল অভ্যর্থনাই পান পিতার কাছ থেকে। তাঁর অপরাধ ভুলে যাওয়া হলো। কিছুদিন দরবারে থাকার পর তাঁর ভারপ্রাপ্ত সম্বল সরকারে চলে যান। সেখানে প্রায় ছয়মাস থাকার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতার সংবাদ বাবরকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। তিনি তাঁকে

নৌকাপথে আগ্রায় আনার জন্য আদেশ দেন। তিনি আগ্রায় পৌঁছান বটে কিন্তু তাঁর জীবনের কোনও আশা ছিল না। যখন নানা রকমের চিকিৎসায়ও কোনও ফল হলো না এবং যখন নানা জ্ঞানী ব্যক্তি সম্রাটের কাছে তাঁর পুত্রের এই নিদারুণ দুঃখজনক পীড়া সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন সেই সময় আবুলবাক নামে একজন মহান ব্যক্তি—যাঁকে সাধুতার জন্য সকলেই শ্রদ্ধা করে—বাবরকে বলেন যে এই রকম অসহনীয় অবস্থায় সর্ব্বশক্তিমান আল্লা কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে তাঁর সব চেয়ে মূল্যবান জিনিষ তাঁকে অর্পণ করার শফৎ নিলে তার বিনিময়ে একজন মুমূর্ষু প্রাণ পেতে পারে। বাবর বলেন যে তাঁর জীবন হুমায়ুনের সব চেয়ে প্রিয় এবং হুমায়ুনের জীবনও তাঁর কাছে সব কিছুর ওপরে। হুমায়ুনের প্রাণের পর তাঁর জীবনের মূল্য বেশী। সুতরাং তাঁর জীবনই আল্লার উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। তাঁকে ঘিরে যে সব আমিররা ছিলেন তাঁরা সকলেই তাঁকে এই কঠোর শফতের কথা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। তাঁরা বল্লেন—তাঁর এই প্রথম শফৎ পরিবর্ত্তন করে যে বহুমূল্য হীরক আগ্রায় আছে সেইটি আল্লার নামে উৎসর্গ করুন, কারণ সেই হীরক পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু। কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞায় তিনি অটল রইলেন। বল্লেন—কোনও হীরক যতই মূল্যবান হোক তার সঙ্গে তাঁর জীবনের মূল্যের তুলনা হয় না। তিনি তিনবার মরনোম্মুখ পুত্রের শয্যা প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর সেখান থেকে চলে এসে আন্তরিক ভাবে আল্লার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি চীৎকার করে উঠলেন—পুত্রের পীড়া আমি টেনে নিয়েছি। মুসলমান ঐতিহাসিকরা জানিয়েছেন যে সেই সময় থেকে হুমায়ুন ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করতে লাগলো। বাবরের সেই অনুপাতে স্বাস্থ্য ও শক্তি ক্রমশঃ হীন হয়ে আসতে লাগলো। বাবর তাঁর মৃত্যু কালীন উপদেশ জানিয়ে দিলেন—খাজা খলিফা, কামবার আলি বেগ ও তারদি বেগকে। তাঁরা যেন হুমায়ুনকে সর্ব্ববিপদ থেকে রক্ষা করেন। পরিবার পরিজনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা যা তিনি তাঁর জীবনব্যাপি দেখিয়ে এসেছেন তারই প্রেরণায় তিনি হুমায়ুনকে তাঁর ভাইদের প্রতি সদয় থাকার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। হুমায়ুন তাঁর কথা মেনে চলবেন বলে অঙ্গীকার করলেন। যা এ রকম অবস্থায় কদাচিৎ ঘটে থাকে তিনি সত্যই সে শফৎ পালন করেছেন। আর তাঁর আমিরদের কাছে তাঁর অনুরোধ তাঁরা শুনলেন বটে কিন্তু সচরাচর যা ঘটে থাকে তাই হলো। বাবরের মৃত্যুতে তাঁরা বিভেদমূলক পরিস্থিতিই তৈরী করেন। খাজা খলিফা হুমায়ুনকে অত্যন্ত অপছন্দ

করতেন—যার কারণ কিছুই জানা যায় না মৃত্যুপথ যাত্রী সম্রাটের দরবার ষড়যন্ত্রের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়ালো।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে খলিফার—যাঁর উপাধি ছিল নিজাম উদ্দিন আলি খলিফা তুর্কির আমিরদের ওপর প্রভূত প্রভাব ও অসীম কর্তৃত্ব ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে বাবরের কোনও পুত্রই তাঁর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে। তিনি বাবরের আত্মীয় মেহদি খাজাকে বাবরের উত্তরাধিকারী করার সাব্যস্ত করেন। মেহেদি খাজা খুবই সাহসী কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল ও গোঁয়ার যুবক। খলিফার সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের জানা শোনা। যখন এই কথা প্রকাশ পেলো যে খলিফা তাঁর নিজের স্বার্থেই তাকে সিংহাসনে বসানোর সংকল্প করেছে তখন সেনা বাহিনীর প্রধানেরা তার উত্তরাধিকারিত্ব একেবাবে পাকা মনে করে মেহেদি খাজাকে সম্মান দেখাতে বিলম্ব করলো না। মেহেদি খাজাও তার হাব ভাবে সেই যে রাজতক্তে বসতে পারে এমন আচারণই দেখাতে স্বরু করলো। যখন সব কিছুই ঠিক যে সেই হিন্দুস্থানের সম্রাট হবে এমন সময় খলিফা সহসা আদেশ দিল যে তাকে তা'র নিজের বাড়িতে প্রহরাধীনে থাকতে হবে।

এই বকম নানা ষড়যন্ত্রের মধ্যে—যা বোধহয় বাবরের অজ্ঞাত ছিল—তিনি আগ্রার সন্নিকটে চারবাগে মারা যান—৯৩৭ হিজরা সনের প্রথম জুমাদা মাসের ৬ই তারিখ (২৬শে ডিসেম্বর, ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ) যখন তাঁর বয়স আটচল্লিশ।

বাবর তাঁর মৃত্যু কালে সাতটি সন্তান রেখে যান—চারটি পুত্র, তিনটি কন্যা। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসির উদ্দিন মহম্মদ হুমায়ুন তাঁর স্থলে সমগ্র রাজ্যের সম্রাট পদে অভিষিক্ত হলেন। হুমায়ুন তাঁর রাজ্যাভিষেকের পর তাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতা কামরাণকে তাঁর পূর্বের ভার প্রাপ্ত কাবুল ও কান্দাহারের সঙ্গে পাঞ্জাবের শাসন ভার দেন। হিন্দাল মির্জ্জাকে যিনি সবেমাত্র বাদাকসান থেকে এসে পৌঁছেছেন মেওয়াতের এবং আসকারিকে সম্বলের শাসন ভার দেন। পরবর্ত্তী রাজত্বকালে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তাতে প্রত্যেক সম্রাট পুত্রই বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছিলেন।

বাবরের তিন কন্যা গুল রং বেগম, গুলচেরে বেগম ও গুল বদন বেগম একই মায়ের সন্তান।

শেষ